সোণার কণ্ঠী।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা যে প'ড়ে এল দিন যে যায়,
তিমির ঘনাইয়ে ধরারে ছায়!

[illegible] গীত হইতেছিল ;—শব্দ অনেক দূরে গেল। বিতস্তা তীর-সৈকত সায়ন্তন-শান্তি ভেদ করিয়া স্বর বহিয়া গেল। নদী-তরঙ্গ মন্দীভূত,—নীলজল বিতস্তায় স্থির। যেখানে আকাশ জলের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে যেন একটু তরঙ্গচাঞ্চল্য, তাহার উপর ফেনের রেখা। সৈকতে জলের অলস-উচ্ছ্বাস. শব্দ অস্পষ্ট সোহাগের ভুলা। কেবল পূর্ণতার চঞ্চলতা, অস্থিরতার নহে।

নদীর একদিকে জলের মধ্যে, বেলাভূমির নিকটে কয়েকটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। চারিদিকে জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আছড়াইতেছে, সে শব্দও [illegible] [illegible]। যেন সেই পর্ব্বত ও সেই বিশালকায়া নদী এবং সেই যোজন-

ব্যাপী সৈকত, সন্ধি করিয়া, মনুষ্যকণ্ঠের সায়ন্তন-সংগীত শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্য শব্দ স্থগিত রাখিয়াছে।

বিতস্তার বক্ষঃ হইতে পাষাণবান্ধা সোপানশ্রেণী উত্থিত হইয়া রাজপথে মিশ্রিত হইয়াছে। রাজপথের দক্ষিণপার্শ্বে রাজপুরের জমীদারের উদ্যান, নাতিদূরে তাঁহার কনক-নিকেতন।

উদ্যান মধ্যে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া এক যুবতী নিবিষ্ট মনে কি ভাবিতেছিল। সহসা তাহার কর্ণে ঐ স্বর-সংগীত যমুনাবেলায় শ্যামসুন্দরের বাঁশীর তানের ন্যায় প্রবেশ করিল। যুবতী কপোলপতিত গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশদাম সরাইয়া দিয়া, স্থির কর্ণে গান শুনিতেছিল, সহসা এক বৃদ্ধ পুরুষ আসিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া বলিল, "কমল; আবার,—আবার কি শুনিয়া ব্যাধ-মুখ-নিঃসৃত বাঁশরার তানে হরিণীর ন্যায় উৎকর্ণ হইতেছ?"

যুবতীর নাম কমলেশ্বরী, কাজেই লোকে কমল বলিয়া ডাকিত। কমল অতিশয় বিরক্তি স্বরে ব্রীড়া-বিভঙ্গি সহকারে বলিল, "বাবা! তুমি কোথা হইতে আসিলে? যাই হোক্—আমাকে ওগান শুনিতে দাও।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার একটা কথা শোন।"

কমল বিরক্তিস্বরে বলিল, "চুপ কর ছাই—গানটা শুনি!"

তখন দূরান্তর হইতে সান্ধ্য-বায়ু সে গান বুকে করিয়া আনিতেছিল

আমার তপ্তবুকে, সে কি ঘুমাবে সুখে

কোথা কমল?—রবি যে যায়।

বৃদ্ধ, যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া, তদবস্থাতেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন, "কে গান গাহিতেছে, বুঝিতে পারিয়াছ?"

গোলাপদলনিভ রক্তিম ওষ্ঠপল্লবদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া, কমল বলিল,

"তোমার পায়ে পড়ি, একটু চুপ কর। গান অনেক দূরে হইতেছে বলিয়া, কথাগুলি অতি স্থির কর্ণে শুনিতে হইতেছে।"

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। গান হইল,—

কোকিল কুহরিছে, তনুয়া শিহরিছে,
কমল-বিরহে রবি রক্তিমকায়।

বৃদ্ধ। ছোঁড়াটা ক্ষেপেছে না কি ?

কমল কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া বলিল, "তুমিও যে ক্ষেপেছ দেখ্‌ছি। চুপ করিতে পারিতেছ না।"

গান হইতে লাগিল,—

ক্ষুদ্র জল-পাখী, উড়িছে থাকি থাকি
বিতস্তা কলু কলু বিলাপ গায়,
চক্রবাক কাঁদে লুঠি বেলায়।
সাঁজের সাধা সুরে কে ডাকিছ ও কি সুরে ?
রবি রবি বলি, কে তুমি কাহায় ?
কি হবে রবি বলি ? রবি যে গেছে চলি,
এবে গো রবি শুধু কমলময়।

কমলের আকর্ণবিশ্রান্ত নীলপদ্মবৎ চক্ষু দুইটী স্থির বিস্ফারিত—ওষ্ঠদ্বয় মৃদু মৃদু কম্পিত হইতেছিল। দেহ নিশ্চল স্থাণুবৎ। বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি অমন হইলে কেন ? প্রেমটা কি জান ?"

কমল সে কথায় কোন উত্তর করিল না। কথা তাহার কর্ণে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না। বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া, পুনরপি বলিলেন, "দেখ কমল, প্রেমটা কিছুই না। মানুষে মানুষে প্রেম,—সেটা ভুল; কথার কথা! যে মজে, সেই মরে।"

কমল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "তোমার কাছে অনেক

ব্যাখ্যান শুনিয়াছি, আর শুনিতে চাহি না। বেলা গিয়াছে,—সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি বাড়ী যাই।"

বৃদ্ধ। আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, রবীশ্বরের প্রণয়ে আত্ম-বিস্মৃত হইও না। তাহা হইলে, অসীম কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

কৃষ্ণ-তড়াগ-তুল্য সংক্ষুব্ধ সমীরণান্দোলিত মস্তকের কৃষ্ণকেশরাশি চাপিয়া ধরিয়া কমল বলিল, "কষ্টভোগ কপালে থাকিলে, কে তাহা হইতে রক্ষা পায়? সুখী হইব, সকলেই ইচ্ছা করে,—যাহাতে সুখী হইতে পারা যায়, সেই চেষ্টাই সকলে করিয়া থাকে,—কিন্তু সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসিয়া মানুষকে বিদগ্ধ করে কেন? অদৃষ্টই কি তাহার কারণ নহে? আমার অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে, আমি কি সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেই সুখী হইতে পারিব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এতদিন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কি, ইহাই শিক্ষা করিয়াছ? পুরুষকার কি একেবারেই নাই?"

কমল। এখন আমি যাই।

বৃদ্ধ। আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া দিতেছি, ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইও না। রবীশ্বরকে ভুলিয়া যাও।

কমল। সে আমায় ভালবাসে।

বৃদ্ধ। তাহাতে তোমার কি? আমি বলিতেছি,—দিব্য নেত্রে প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতেছি,—তাহাকে ভাল বাসিলে, তুমি দুঃখ ভিন্ন সুখ পাইবে না। যখন শাস্ত্র পড়িয়াছ, তখন ত বুঝিতে পারিয়াছ, জগতের সবই মায়ার খেলা। কেন, মায়ার বাঁধনে অত করিয়া জড়াইতে চাও?

কমল। তোমার মতে আমি তবে সন্ন্যাসিনী হইব?

বৃদ্ধ। পারিলে মন্দ হয় না। না পারিলে ঘটনা-স্রোতে গা ঢালিয়া দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইও না। আমি তোমার অধ্যাপক কৃষ্ণানন্দঠাকুরকে

পাত্র স্থির করিতে বলিয়াছি, তিনি একটি সৎপাত্র স্থির করিয়া দিলে, তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সংসার পাতাইও।

কমল। তিনি যাহাকে স্থির করিয়া দিবেন, সে যদি আমায় ভাল না বাসে?

বৃদ্ধ। এমন কি কোথাও শুনিয়াছ যে, বিবাহিত দম্পতীর মধ্যে প্রীতি-ভালবাসা জন্মে নাই?

কমল। শুনি নাই.—জানি না। কিন্তু ভয় হয়। দেখ, জন্মিয়া কখন মার মুখ দেখি নাই। পিতার স্নেহ বাহুযুগলের মধ্যে বড় হইতেছিলাম। পিতৃ-স্নেহের অপার্থিব করুণায় সংসার সুন্দর দেখিতাম,—কিন্তু বিধাতার বিধানে, সে আনন্দ—সে সুখ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। হতভাগিনীর জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে পিতাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। স্রোতে ভাসা কুটার মত সেই অবধি এই জগতে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। কেহ কোন দিন ভালবাসার একটী কথাও বলে নাই, করুণার একটু বিন্দুও কখনও এ দগ্ধ বুকে পড়ে নাই। তাই রবির ভালবাসার আহ্বানে তাহার দিকে প্রাণটা বড় ঝুঁকিয়াছে।

বলিতে বলিতে কমলের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। অশ্রুমুখী কমল আর সেখানে দাঁড়াইল না। দ্রুত অথচ মন্থর গমনে, বাগান হইতে বাহির হইয়া, রাজপথ ধরিয়া নদী-কিনারে চলিয়া গেল।

শ্রাবণের নদী স্ফীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও নদী ও বর্ষার জল মিশিয়া চারিদিকে জলাকীর্ণ করে নাই। ক্ষেত্রের স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভা এ পর্য্যন্ত জল-মগ্ন হয় নাই। চারিদিকে পুলকিত প্রকৃতি-মূর্ত্তি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে আনন্দে, আবর্ত্তে নৃত্য! ধরণীর অঙ্গে উজ্জ্বল শ্যাম অম্বর। আকাশে জলভরা মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন। প্রাণী পুলকমগ্ন; নর নারী উল্লসিত।

কমল নদীর জলে নামিয়া, একটা কলসী ডুবাইয়া জল লইল,—একবার নবীন বর্ষা-চঞ্চল নদীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া কলসী কক্ষে লইয়া তীরে উঠিতে যাইতেছিল,—সহসা দেখিতে পাইল,—একখানা নৌকা অতি দ্রুতবেগে তীরাভিমুখে আগমন করিতেছে। নৌকাখানি অত্যন্ত সুসজ্জিত। মাস্তুলে লোহিত পতাকা পত পত শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে, সম্মুখ হইতে ডঙ্কা বাজিতেছে। কমল বুঝিল, কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী নৌকারোহণে গ্রামে আসিতেছেন। সে দ্রুত পদে চলিয়া গেল,—নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জমীদারের সমুন্নত প্রাসাদশ্রেণী আলোক-মালা ও পত্র-পুষ্পদামে সুলঙ্কীকৃত। সন্ধ্যা হইতেই নাট-মন্দিরে নর্ত্তকী আসর লইয়াছে। সে তাহার অলঙ্কারপূর্ণ সুগোল গোলাপীরঙ্গের হাত নাড়িয়া, কামশরাসনতুল্য ভ্রূযুগল আকুঞ্চন-প্রসারণ করিয়া, আয়ত-লোচনের বিলাস-বিভঙ্গি করিয়া, অলক্তরাগরঞ্জিত চরণের নানাবিধ ভঙ্গি করিয়া,নৃত্য করিয়া গাহিতেছিল,

"খোজত ফিঁরু সারি বন বন,
কতহুঁ ন মিলে যদুকে নন্দন,
কওন সওয়ত কিহু মোহন।"

নর্ত্তকীর হাব-ভাবে ও গীত-স্বরে দর্শকমণ্ডলীর প্রাণ উধাও উড়িতেছিল। জমীদার রতনচাঁদও সভায় সমাসীন। একমাত্র অহিফেন-প্রসাদাৎ তিনি নর্ত্তকীকে স্বর্গের অপ্সরা কল্পনায় একাগ্রমনে তাহার রূপ-সুধা অনুপানে সঙ্গীত সোমরস পান করিতেছিলেন। অপর প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যে মধ্যে শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরের শব্দ উত্থিত হইয়া শ্রোতাগণের

বরাক্ত উৎপাদন কারতেছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণদেবের সান্ধ্য অর্চ্চনা হইতেছিল। আজি ঝুলনোৎসব।

জমীদার রতনচাঁদের নিকটে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল, "বহির্দ্বারে মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ শিবিকায় অপেক্ষা করিতেছেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

জমীদারমহাশয়ের আর গীত শ্রবণ করা হইল না। শশব্যস্তে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী পাল্কীর ভিতরে উপবেশন করিয়াছিলেন। রতনচাঁদ ঝুঁকিয়া অভিবাদন করিয়া পাল্কী ধরিয়া কহিলেন, "দাসের কি সৌভাগ্য। হুজুর স্বয়ং দীনের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন।"

চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ রতনচাঁদের স্কন্ধে ভর দিয়া, পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "রতনচাঁদ; তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে।"

যে স্থানে নৃত্যগীত হইতেছিল, রতনচাঁদ মন্ত্রীকে সেস্থানে না লইয়া গিয়া, একটা নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রীকে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ বলিলেন, "রতনচাঁদ; আমি তোমায় কত ভালবাসি, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিতেছ। আমি গুরুতর রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তোমার বাড়ী আসিয়াছি। আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছ, কিন্তু উপবাসী রাখিও না, আমার হৃদয়ে বড় ক্ষুধা—বড় পিপাসা হইয়াছে, তোমাকে তাহা মিটাইতে হইবে।"

চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ যে ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, তাহাতে অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বাহুল্য। রতনচাঁদ মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "হুজুরের হৃদয়ের ক্ষুৎ-পিপাসা অনন্ত। দাসের সাধ্য কি যে তাহা নিবৃত্তি করিতে

পারে! কোন্ ভাগ্যবতীর রূপলাবণ্য-ভাণ্ডারের সঞ্চিত সুধা সেবনের আশা হইয়াছে ?"

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে রাজমন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণের বড় নিন্দা ছিল। তিনি নিত্য নূতন প্রেমে পতিত হইতেন। নিত্য নূতন প্রণয়িনীর অনুসন্ধান করিতেন। রতনচাঁদ মন্ত্রীর চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, এবং তিনি মন্ত্রীর সেই বাসনার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া নিত্য নূতন পরগণা জায়গীর লাভ করিতেছিলেন।

মন্ত্রী হৃদয়ের উপরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, "মিথ্যা নহে, রতনচাঁদ ; প্রাণের ভিতরে দুরন্ত পিপাসা। জ্বলিয়া মরিতেছি। তুমি উপায় না করিলে, বাঁচিব না।

রতন। কে, সে ভাগ্যবতী ! নিবাস কোথায় ?

মন্ত্রী। তোমারই এই গ্রামে। আমার নৌকা যখন তোমার ঘাটে আসিয়া লাগিল, সেই সময় সেই অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী কলসী করিয়া জল লইয়া, তড়িৎগতিতে গ্রামের মধ্যে চলিয়া আসিল। অমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই, রতনচাঁদ !

রতন। তার সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাইলেন না কেন ? সন্ধান পাওয়া যাইত—কে সে।

মন্ত্রী। আমার নৌকা তখনও তীরে পঁহুছায় নাই। আমি নৌকা হইতেই সে রূপ দেখিয়াছিলাম।

রতন। তবে বোধ হয় সাঁজের ঘোরে—দূর হইতে কোন কুরূপাকে সুরূপা বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকিবে।

মন্ত্রী। না রতনচাঁদ ? ভ্রম হয় নাই। আমি ভাল করিয়াই দেখিয়াছি, —অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী। এখন তাহাকে পাইবার উপায় কি, তাহাই বল। সে নহিলে আমার বাঁচাই দায়।

রতন। সে কে, কোথায় নিবাস, কি জাতি, তাহার সন্ধান না লইয় কেমন করিয়া কি করি ?

মন্ত্রী। সে তোমার এই গ্রামেরই বাসিন্দা।

রতন। গ্রামে বহুলোকের বাস। সে ভাগ্যবতী সুন্দরীর সন্ধান কোন্ সূত্রে করি, তাহাই ভাবিতেছি।

মন্ত্রী। আমায় রক্ষা কর রতনচাঁদ ; শুধু ভাবিলে চলিবে না।

রতন। দাসের চেষ্টার ক্রুটী হইবে না। জিজ্ঞাসা করি, সে সময় ঘাটে আর কেহ ছিল কি ?

মন্ত্রী। মনে পড়ে না। হাঁ—একটু দূরে একজন জেলে যেন তাহার নৌকার উপরে বসিয়া, "থেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছিল।

রতনচাঁদ বাহির হইয়া নায়েবকে তৎপ্রতি আদেশ করিলেন "কোন্ জেলে সন্ধ্যার সময় সদরঘাটের কিনারায় নৌকা লাগাইয়া থেলো হুঁকায় তামাকু খাইতেছিল, সন্ধান করিয়া এখনই তাহাকে ডাকিয় আন।"

কাযটা অতি প্রহেলিকাময় ভাবিয়া নায়েব মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে গমন করিলেন। কেন না, এই বহুজনশালী গ্রামের মধ্যে উৎসবের দিনে সন্ধ্যার সময় কোন্ জেলে সদরঘাটে নৌকায় বসিয় থেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছিল, তাহার সন্ধান করা সহজ নহে যাহা হউক, যখন মনিব রতনচাঁদের আদেশ হইয়াছে, তখন তাহাকে সে কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

নায়েব একজন সরকার ডাকিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি একজন পদাতিক সঙ্গে লইয়া এখনই সদরঘাটে যাও এবং সেখানে গিয়া দেখ ঘাটে কয়খান জেলেনৌকা আছে। যে কয়খানা থাকিবে, তাহা প্রত্যেক খানার অধিকারীর নাম জানিয়া আইস। আর যদি, সন্ধ্যাকালে

কোন নৌকায়, কোন জেলের থাকার বিষয় অবগত হইতে পার, তবে তাহার নাম জানিয়া আসিবে।"

সরকার চলিয়া গেল। জমীদারবাড়ীতে যেমন গীতবাদ্য দেবার্চ্চনা হইতেছিল, তেমনই হইতে লাগিল। রতনচাঁদ মন্ত্রী চিরঞ্জীবের নিকটে বসিয়া তাহার প্রবল বাসনার বাতাস দিতেছিলেন, এবং নানাপ্রকার সেবা শুশ্রূষা করাইতেছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সরকার ফিরিয়া আসিয়া নায়েবের নিকটে নিবেদন করিল, "ঘাটে অনেকগুলি জেলেনৌকা আছে। সেই সকল নৌকার অধিকারীদিগের নামও লিখিয়া আনিয়াছি; আর ঘাটে সন্ধ্যার সময় রণাজেলে নৌকায় বসিয়াছিল। আর কেহই ছিল না।

নায়েব, সে কথা জমীদারের নিকটে নিবেদন করিলে, তিনি তখনই রণাজেলেকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই রণাজেলে দুইজন পদাতিকে পরিবৃত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে জমীদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে গৃহে কেবল রতনচাঁদ ও মন্ত্রীমহাশয় অবস্থিত ছিলেন।

রতনচাঁদ রণাজেলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সন্ধ্যার সময় তুই, ঘাটে তোর নৌকায় বসিয়া তামাকু খাইতেছিলি?"

জেলে সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না! হয় ত বা ঘাটে নৌকার উপরে বসিয়া সন্ধ্যার সময় খেলো হুঁকায় তামাকু সেবন কোন দণ্ডার্হ অপরাধ! তখন জমীদার রতনচাঁদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐ সময়-কার কোন একটা সংবাদ আমরা জানিতে চাহি, তখন তুই ঘাটে ছিলি কি না, তাই বল্।"

স্ত্রীদিগকে এবং রাজসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না,—এই উপদেশ স্মরণ করিয়াই হয় ত জেলে, জমীদারের অভয় প্রাপ্ত

হইয়াও সে কথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত পীড়াপীড়িতে স্বীকার করিয়া বলিল "হাঁ—আমিই তখন ঘাটে ছিলাম। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়ের নৌকা ঘাটে লাগিতে দেখিতে পাইয়াই হুঁকা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলাম।"

রতনচাঁদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তখন ঘাটে কোন স্ত্রীলোক কলসী করিয়া জল লইয়া গিয়াছিল? কেবল এই কথা জানিবার জন্য তোকে ডাকিয়াছি।"

রণাজেলে হাঁফ ছাড়িল। মনে মনে বুঝিল, মন্ত্রী মহাশয় হয় ত নৌকা হইতে সেই রূপের ছটা দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছেন; তাই তার সন্ধান লওয়া হইতেছে। কিন্তু বুড়া জেলে একবার ভাবিল, না না—সে রমণীর নাম করিব না। তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। আবার ভাবিল, যদি আমি নাম বলিয়া না দেই, আমি দেখিয়াছি, ইহা হয় ত মন্ত্রী মহাশয় জানিতে পারিয়াছেন—না বলিলে আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "হুজুর! সে ঠাকুর-বাড়ীর সেই পাগ্‌লী মেয়ে, কমল!"

রতনচাঁদের প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অনল-দহন উপস্থিত হইল। রতনচাঁদ গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "ওঃ! সেই পাগ্‌লীটা যা, তুই যা!"

জেলে হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

তখন বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত একটু ক্ষীণ হাসির সহিত রতনচাঁদ মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেটা পাগল! একেবারেই পাগল। তার জন্য আর চেষ্টা করিয়া কি হইবে?"

মন্ত্রী। তবু একবার আমি দেখিব।

রতন। সেটা কিছু নহে—একেবারে উন্মাদ।

মন্ত্রী। কিন্তু অমন রূপ, আমি কখনও দেখি নাই।

রতন। না, না, তেমন নহে; যেমন ভাবিতেছেন, রূপ তেমন নহে। তবে সন্ধ্যার ঘোরে দূর হইতে দেখিয়াছেন, তাই একটু ভাল বলিয়া ভাবিতেছেন।

মন্ত্রী। তাহা হইলেও দেখিব।

তখন রতনচাঁদ বলিলেন, "একটা কথা কি জানেন;—সেটা কৃষ্ণ-নন্দঠাকুরের পালিতা: তাকে বিপথে লইয়া গেলে, রাজ্য জুড়িয়া একটা গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিতে পারে। দেশের লোক তাহাতে বড়ই অসন্তুষ্ট হইবে।"

মন্ত্রী। আমি কাহাকেও ভয় করি কি? রতনচাঁদ, তাহাকে দেখিব —আমার জীবন পর্য্যন্ত পণ! তুমি আমার সহায়তা কর, সুনাৎ পরগণা জায়গীর লিখিয়া দিব।

রতনচাঁদের প্রৌঢ় হৃদয়ে একটা আগুনের ঝলকা বহিয়া গেল। বিস্ময়! খুব একটা পরগণা—কিন্তু কমলের কাছে কি পরগণা! কমলকে যে, বিবাহ করিতে হইবে!

রতনচাঁদ বলিলেন, "তবে একটা কাজ করা হউক—কয়েক দিন অপেক্ষা করুন। গোপনে উহাকে হরণ করাই সুবিধা!"

মন্ত্রী কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা প্রগাঢ় এবং প্রায় চারিদণ্ডকাল স্থায়ী। রতনচাঁদ নির্নিমেষ নয়নে মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, মন্ত্রী কমলের কথাই ভাবিতেছেন! অনেকক্ষণ পরে, মন্ত্রী বলিলেন, "আমি এখনই রাজ-ধানীতে ফিরিয়া যাইব।"

সুচতুর রতনচাঁদ বুঝিলেন, কমলের সর্ব্বনাশের কোন কৌশল-জাল বিস্তারের জন্যই মন্ত্রীর এত শীঘ্র বাড়ী যাওয়া। রতনচাঁদও এতক্ষণ

বনিয়া বসিয়া, এক কৌশল আটিয়া লইলেন। বলিলেন, "দাসের ভবনে যদি পদার্পণ হইয়াছে, কিছু আহার করিলে কৃতার্থ হইব।

মন্ত্রী স্বীকৃত হইলে, ভোজন-গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। মন্ত্রী সেই রাত্রেই রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে স্থলের ও যে সময়ের ঘটনা লিখিতেছি, এইবার তাহার একটু উল্লেখ করিব।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান বঙ্গদেশে আসেন। তাঁহারা পদার্পণ করিয়াই, তাৎকালিক গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনকে বিতাড়িত ও তদীয় সিংহাসন অধিকৃত করিলেন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর এবং প্রদেশের পর প্রদেশ তাঁহাদের কবলে পতিত হইতে লাগিল। ক্রমে আসাম প্রদেশের যাবতীয় নৃপতিগণ তাঁহাদের কর্তৃক পরাজিত এবং উৎসন্ন হইলেন। অথবা কেহ কেহ তাঁহাদের অনুগ্রহাধীন করদ রাজ্যরূপে গণ্য হইতে পারিলেও আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত বিজয়-পতাকা এক দিকে গৌহাটি ও অপর দিকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়া যাবতীয় পার্ব্বত্যজাতি এবং ব্রহ্মাধিবাসিগণকেও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। কোরাণ গ্রহণ অথবা পদলেহন ব্যতীত নিস্তার ছিল না। তখন মুসলমানের ভীষণ জয়-নিনাদ বঙ্গের সর্ব্ববিভাগে, প্রান্ত-সীমা ও প্রান্ত বন-পর্ব্বত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ঘোষিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছিল,—সর্ব্বত্রই বিথর বিকম্প ভাব। এই অবস্থা অল্প দিন নহে,—সার্দ্ধ পাঁচ শত বৎসর ব্যাপিয়া চলিয়াছিল।

এমন সর্ব্বগ্রাসকারী দাবানল মধ্যেও যাহারা স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মান রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সামান্য সৌভাগ্যবান্ ও বীর্য্যবান্ নহে। সে রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, কেবল উত্তরে নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং পূর্ব্বে মণিপুর ও ব্রহ্মদেশ।

এই সময় বঙ্গদেশ হইতে অনেক জমীদার, অনেক ব্যবসায়ী এবং অনেক স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তি আপনাদের বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাগুক্ত রাজ্য সকল মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, এবং নিজ নিজ প্রতিভাবলে সেই সেই রাজ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছিল।

আমাদের প্রসঙ্গোক্ত রতনচাঁদ বঙ্গদেশবাসী। তিনিও মুসলমান কর্ত্তৃক, লাঞ্ছিত ও দলিত হইয়া স্ত্রী এবং নগদ সম্পত্তি লইয়া মণিপুর রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এবং মণিপুর হইতে ক্রোশৈক দূরে রাজপুর গ্রামে পূর্ব্ব রাজাদিগের রাজপুরস্থ গুপ্ত প্রাসাদ, বর্ত্তমান মন্ত্রীর নিকট লাভ করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। নিজ বিষয় বুদ্ধির কুটীলতাগুণে, রাজমন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণকে হস্তগত করিয়া, এতদ্দেশে প্রচুর সম্পত্তি ও সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন।

মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ কোন্ দেশের লোক, তাহা কেহ জানে না। তবে তিনি যে খাস মণিপুরী নহেন, এবং তাঁহার পৈতৃক আবাস যে মণিপুরে নহে, তাহা সকলে জানিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া এতদ্দেশে ব্যবসায় উপলক্ষে আগমন করেন। কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে চিরঞ্জীব নিজ প্রতিভাবলে লেখাপড়া শিক্ষা করেন, এবং ক্রমে রাজসরকারে ছোটখাট পদ লাভ করিতে করিতে অবশেষে প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং রাজাকে তিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ক্রীড়নক স্বরূপে রাখিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্, নামে মন্ত্রী

হইলেও কাযে রাজারও রাজা। তাঁহারই প্রভুত্ব সমস্ত মণিপুরে ব্যাপ্ত সে দেশে তখন তিনি যাহা করিতেন, তাহাই হইত।

এই সময়ে, মণিপুরের রাজসিংহাসনে মণিপুরের রাজবংশাবতংস কেহ অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন হৃতরাজ্য ও বিতাড়িত।

আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মণিপুর-রাজ কুকি, লুসাই প্রভৃতির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতেছিল। বিশেষতঃ নাগারা বড়ই দৌরাত্ম্য করিতেছিল। অপর দিকে, ব্রহ্মরাজ, মণিপুর রাজ্যটীকে স্বীয় অধিকার-ভুক্ত করিবার প্রয়াসে সতত আক্রমণ ও নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কাযেই মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এই সুযোগে নাগারা দিন দিন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। মণিপুরাধিপতি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ বেগ সম্বরণে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নাগাসর্দ্দার পামহেবা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র রাজ্য এবং মণিপুরের সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক রাজ্যাধীশ্বর হইলেন। পামহেবা রাজা হইবার পরেই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং "গরীব নেওয়াজ" উপাধি ধারণ করিলেন। "গরীব নেওয়াজ" বাক্যটী পারস্যভাষাজাত উহার অর্থ "দরিদ্রের আশ্রয়।" যদিও মণিপুর এবং নাগাপ্রদেশ মুসলমান শাসনাধীন হইয়াছিল না, তথাপি মুসলমান-প্রভাব ও পারস্য ভাষা বিস্তার যে বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এই ঘটনাতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে।

যাহা হউক, নাগাসর্দ্দার পামহেবা পাশববলে রাজ্যগ্রহণ, তৎপর হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত—ও "দরিদ্রের আশ্রয়" নাম গ্রহণ করিলেও তিনি চির স্বাধীন ও ধর্ম্মতৎপর মণিপুরবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না।

বিশেষতঃ অসভ্য নাগাসর্দ্দার সুসভ্য মণিপুরবাসীর আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও ধর্ম্মমহিমাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এতদবস্থায় কেহই তাঁহাকে রাজোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিত না। পরন্তু, তিনি মণিপুর গন্ধর্ব্বকন্যাগণের সঙ্গীত শ্রবণে, অপ্সরা-রূপের জ্বলন্ত জ্যোতিঃতে, কুসুমপরাগ-ধূসর-দেহ-লাবণ্যহিল্লোলে দিন দিন যুবতীজীবন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পামহেবা বিলাসের দাস ও কাযের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়, রাজমন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণের একাধিপত্য হইয়াছিল। মণিপুর-বাসিগণ দুই তিনবার রাজদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু চিরঞ্জীব বর্ম্মণের কূট-নীতিতে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। চিরঞ্জীব বর্ম্মণের নিত্য নূতন প্রণয়িনী-লালসা থাকিলেও মণিপুরে তাঁহার এক প্রণয়িনী ছিল। ইঁহার নাম চন্দ্রাবলী। ইনি মণিপুর-রাজবংশসম্ভূতা কামিনী। চিরঞ্জীব ইঁহার কথায় বাঁচিতেন ও মরিতেন। প্রত্যুত মণিপুর রাজ্যমধ্যে এই চন্দ্রাবলীরই সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। ইনি রাজার রাজা, মন্ত্রীমহাশয়ের উপদেষ্টা—ইঁহার অঙ্গুলি-হেলনে, মণিপুর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে পারিত। কিন্তু মণিপুরের সাধারণ প্রজাগণ এই রমণীকে দুই চক্ষুর বিষ দেখিত, তাহাদের প্রতিজ্ঞা, সুযোগ পাইলে ইহাকে হত্যা করিয়া তদ্বিনিময়ে যদি শতজনেরও জীবনাহুতি দিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ।

মণিপুরবাসিগণের এই রমণীর উপরে যে জন্য এতাদৃশ জাতক্রোধ, তাহা এ স্থলে বলিয়া রাখাও মন্দ নহে। কেন না, সেই ঘটনার সহিত আমাদের এই আখ্যায়িকার বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

পামহেবা মণিপুররাজ্য অধিকার ও মণিপুরেশ্বরকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিবার কয়েক বৎসর পরে, বঙ্গদেশাগত কোন সৈনিক যুবকের উপর ইঁহার অনুগ্রহ-দৃষ্টি পতিত হয়। কিন্তু যুবক সচ্চরিত্র—এবং পূর্ব্ব রাজার অনুগত। সেই রাজভক্তি স্মরণ করিয়া, তিনিরে

ভিতরে একটা দল সংগ্রহ করিতেছিল—এবং সেই যুবক যুদ্ধবিদ্যায় সমধিক পারদর্শী বলিয়া অনেক রাজভক্ত প্রজা তাহার মন্ত্রণামূলে আসিয়া জমায়েৎ হইয়াছিল।

সেরূপ বীর-জীবনে এরূপ কলুষিতা রমণীর প্রেম, বিরক্তিজনক সন্দেহ নাই। কাযেই যুবক, চন্দ্রার প্রেম উপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহাপাতকে মন্ত্রীর নিকট অন্য কথার ভাণে তাহাকে কারারুদ্ধ করান হয়। কিন্তু বাহিরের লোকের সহায়তায় যুবক কারাভগ্ন করিয়া, শান-প্রদেশস্থ পঙ্গনামক স্বাধীন রাজ্যে পলায়ন করেন। সেই যুবকের নাম বিজয় সিংহ। বিজয় সিংহ বাঙ্গালী।

বিজয় সিংহ পলাইয়া শানদেশে গমন করেন। সেখানে গিয়া রাজ-প্রসাদ লাভ করতঃ সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মণিপুরবাসী প্রজাগণ সেই সময় হইতে চন্দ্রার উপরে একেবারে চটিয়া আছে। তাহাদের ধারণা, যদি চন্দ্রার কামনাবহ্নিতে বিজয় সিংহ না পতিত হইতেন, তবে তাঁহার দ্বারাই মণিপুর আবার স্বাধীন হইতে পারিত। মণিপুরের পবিত্র ক্ষত্রিয় বংশ, আবার মণিপুরের রত্ন-সিংহাসনে অধিরোহণ করিতেন।

এক্ষণে আমরা বঙ্গীয় পাঠকের অবগতির জন্য, মণিপুরের ভৌগোলিক তত্ত্ব ও আচার-ব্যবহারের একটু আভাস প্রদান করিয়া, এই নীরস-কঠিন পরিচ্ছেদের শেষ করিব। আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই পরিচ্ছেদটী অত্যন্ত নীরস-কঠিন হইয়াছে, কিন্তু উপায়ান্তর নাই। ইক্ষুরস পান করিতে হইলেই, একবার চর্ব্বণজনিত কষ্টটাও ভোগ করিতে হয়। তবে শুধু-রস-পিপাসু ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র,—তাঁহারা কলে মাড়া ইক্ষুরস পান করেন। কিন্তু সকলের রুচি ত একপ্রকার নহে?

আসাম, কাছাড়, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম ব্যাপিয়া যে দুর্গম ও বন্ধুর পার্ব্বত্য

প্রদেশ, তাহার ঠিক মধ্যস্থলস্থ উপত্যকা লইয়াই প্রধানতঃ মণিপুর রাজ্য সংগঠিত। ইহার বিস্তার, পশ্চিম সীমার দিক্ অপেক্ষা পূর্ব্বভাগে কিছু অধিক, মধ্যভাগে অপেক্ষাকৃত কম, আবার, উত্তরাংশ হইতে দাক্ষিণদিকে অনেক অধিক।

মণিপুর পর্ব্বতময় দেশ। ইহাতে শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ সানু অধিত্যকা ও উপত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ব্রহ্মসীমায় কুবো একটী বিখ্যাত উপত্যকা। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান উপত্যকায় মণিপুর অবস্থিত।

মণিপুরে স্বাভাবিক জলাশয় অনেক আছে। গিরি-শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে অনতিবৃহৎ হ্রদ সকল দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতোপরিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ স্থানবিশেষে রহিয়াছে। রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদের নাম লোগটাক। পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উপত্যকার দিকে যাইতে সম্মুখ ও দক্ষিণ ভাগে ইলাই। পার্শ্বস্থ অনুচ্চ পর্ব্বতনিচয়, তাহার জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অতি সুন্দর দেখায়। লোগটাক হ্রদের দক্ষিণতীরে—পর্ব্বত-পাদমূল পর্য্যন্ত অকর্ষিত পতিত ভূমি—কুশ, কেশে, দুর্ব্বা প্রভৃতি নানা প্রকার ঘাসের জঙ্গলে আচ্ছাদিত; সে দিকে বৃক্ষাদি প্রায় নাই। লোগটাকের উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গ্রাম ও নগরাদি বিরাজ করিতেছে। উত্তরদিকের এককোণে রাজধানী মণিপুর অবস্থিত। সহরের অনতি-দূরেই গিরিরাজি পরিশোভিত। এ বিভাগে বৃক্ষাদি বিস্তর আছে। এই লোগটাক নদীকেই পূর্ব্বে বিতস্তা বলা হইত। আমরা যে সময়ের কথা এই আখ্যায়িকায় সন্নিবেশিত করিতেছি, তখন এই নদী বিতস্তা ও লোগটাক উভয় নামেই পরিচিত ছিল। এখনও তথাকার প্রাচীন পুস্তকে বিতস্তা বা লোগটাকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মণিপুরীরা হিন্দু,—তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতির বসতিও আছে। রাজপরি-বার ক্ষত্রিয়—অর্জ্জুন-পুত্র কীর্ত্তিমান্ বভ্রুবাহন-বংশ সম্ভূত। তদ্ভিন্ন

হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই অধিক। এ ক্ষত্রিয়েরা চন্দ্রবংশীয় বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকেন। সুদূর রাজপুতনার ন্যায় মণিপুর রাজ্যে ক্ষত্রিয় জাতির মানসম্ভ্রম যথেষ্ট। ক্ষত্রিয় গৌরবে মণিপুর পরিপূরিত ও গৌরবান্বিত। হিন্দু মণিপুরিগণ বেদ-বিহিত শাস্ত্র ও প্রথা অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দেব-দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। মণিপুরীরা প্রায়ই গৌরাঙ্গ—স্ত্রীলোকেরা সচরাচর পরমা সুন্দরী, সাধারণ স্ত্রীলোকের একটু নাক-বসা, কিন্তু "শুক-চঞ্চু বিনিন্দিত" নাসাও সেখানে অনেক রমণীর আছে। মণিপুরীদিগের চক্ষুর চাহনিতে একটু বিশেষত্ব আছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সেই অপাঙ্গ দৃষ্টি, চক্ষুর সেই বক্র মনোহর ভাব, দর্শকের নয়ন আকর্ষণ করে।

মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরাবদ্ধা নহে। কেহই পরিচিত বা অপরিচিত পুরুষের সমক্ষে সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠনবতী থাকে না। ইহারা গীতবাদ্য নর্ত্তনে পারদর্শিনী, এবং বিবিধ সুবাস কুসুমে ইহাদের কমবপু সুসজ্জিত করিয়া রাখে। ফুলের ভূষণ, ফুলের সজ্জা ইহারা বড় ভাল বাসে। পুরাণে ইহাদিগকে গন্ধর্ব্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ এ দেশে নাই, বা ছিল না। প্রণয়ই এদেশের বিবাহের ঘটক,—প্রীতিই বিবাহের যৌতুক।

মণিপুরীরা ধূর্ত্ততা ও শঠতা বর্জ্জিত হইলেও বিষয়-বুদ্ধি, ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও সাংসারিক জ্ঞান এবং মনস্বিতাহীন নির্ব্বোধ নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—ঃ৺ঃ—

নবীন বর্ষা চঞ্চল। মেঘ জলভারে অবনত, কিন্তু চঞ্চল; বিদ্যুৎ চঞ্চল,—বায়ু চঞ্চল, জলস্রোত চঞ্চল। স্বদেশে, প্রবাসে মানুষের মন চঞ্চল,—পৃথিবী চঞ্চলা।

বর্ষার বেলা বিদায় মাগিতেছে,—রাঙ্গা মুখে পার্ব্বতীয় বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া দিনদেব চলিয়া পড়িতেছেন। এই সময় গ্রামের এক প্রান্তভাগে বিতস্তাতীরে এক ভদ্র যুবক মাছ ধরিতে ছিলেন। স্থানটী অতি মনোহর। সবুজ কার্পেটের বিছানার মত নবদূর্ব্বাদলে বহুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। নদীতীরস্থ ঘন নিবিষ্ট বংশীবটের শাখা-পল্লবচয়-বিনির্ম্মিত সুচারু ছায়ামণ্ডপ! কোথাও বা নাগেশ্বর চম্পকের বহুদূরব্যাপী অপূর্ব্ব কুঞ্জ; বংশ-গুচ্ছ, ঝাটিগাছ, ঝাউ-বনাদি বৃহদ্বনস্পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে অনুগত দাস-দাসীর ন্যায় যেন তাহাদের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত সহস্র প্রকারের লতা-বল্লরী স্ত্রী-কন্যাবৎ তাহাদের আশ্রয়ে ও অঙ্গে জড়াইয়া অতুল শোভা বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাহাদের ছায়া বিতস্তার জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া খেলা করিতেছে। ঘন-বিটপি-ছায়া-সংযুক্ত বলিয়া স্থানটি বড় শীতল। আকাশ নীলবর্ণ,—খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ মেঘে ভরা। মেঘেরা দৌড়া-দৌড়ি করিতেছে,—এ উহার সহিত মিশিতেছে, ঝগড়া করিতেছে,—আবার আপন মনে আপনি গড়াইয়া গড়াইয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে। বন্যকুসুম-পরিমল বুকে করিয়া উদাস পবন আপন মনে দিকে দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

যে যুবক মাছ ধরিতেছিল, তাহার বয়স বিংশতি বৎসরের উপরে হইবে না। দেখিতে প্রিয়দর্শন। প্রশস্ত ললাট, কৃষ্ণ-কেশকলাপ,

উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, সৌষ্ঠবময় মুখ-মণ্ডল, ঝঙ্কারিণী বাণী, সরল হাস্য। মাছধরার উপাদানের একধারে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি ও হস্তলিখিত একখানা খাতা—সেখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুথি। যুবকের নাম রবীশ্বর রায়।

বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল দেখিয়া, তিনি ছিপ গুটাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একখানা ক্ষুদ্র তরণী অতি তীব্রবেগে রাজপুরাভিমুখে চলিয়া আসিতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে রবীশ্বর সেদিকে চাহিয়া থাকিল। এ কৌতূহল অন্য কিছুই নহে। গাড়ী, নৌকা বা পাল্কী আসিতে দেখিলে, পল্লীগ্রামের লোকের হৃদয়ে যে কৌতূহল হইয়া থাকে,—অথবা নিস্তব্ধ নিভৃত স্থলে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে, তৎপরে কোন মনুষ্যাগমন দর্শনে যে কৌতূহল হয়, কিম্বা ভবিষ্যগর্ভ কোন ঘটনা ঘটিবার প্রাক্কালে মানব যে সূত্র অবলম্বন করিবার কোন অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে তৎপ্রতি কৌতূহলী হয়, ইহা তাহারই কোন্ এক প্রকার কৌতূহল। কিন্তু রবীশ্বরকে অনেকক্ষণ কৌতূহলচিত্তে সে দিকে চাহিয়া থাকিতে হইল না। নৌকা তাহার অনতিদূরে আসিয়া একটা আবর্ত্তনে পড়িয়া বানচাল হইয়া, সেই বিতস্তার গভীর গাঢ় নীল-জলের মধ্যে নিমজ্জমান হইল। একখানা সুন্দর রমণী-হস্ত একবার সেই জলের মধ্যে আলোড়িত হইয়া যেন ডাকিয়া কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে করিতে ডুবিয়া পড়িল।

রবীশ্বর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিপন্নের সাহায্যার্থ তখনই বিতস্তাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। যেখানে নৌকা ডুবিয়াছিল, অতি দ্রুত সন্তরণে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নৌকায় যে একজন মাঝি ছিল, সে সন্তরণ দিয়া অপর পারে উঠিয়া গেল,—আর একটী রমণী ডুবিয়া তলাইয়া যাইতেছিল। বলিষ্ঠ যুবক সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিলেন, এবং

সেই জল মধ্য হইতে রমণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া ভাসিয়া জলোপরি উত্থিত হইলেন এবং ধীর সন্তরণে রমণীকে লইয়া তীরে উঠিলেন। রমণী তখন অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল।

সেই নব-ঘন দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত ভূমির উপরে রমণীকে শায়িত করিয়া রবীশ্বর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহার উদরে অধিক জল প্রবেশ করে নাই। তখন যাহাতে জল নির্গমন হইয়া যায়, তাহার উপায় অবলম্বন করিলেন। উদরস্থ জল নির্গত করিয়া দিয়া পাথর ঠুকিয়া অগ্নি বাহির করিলেন এবং শুষ্কপত্ররাশি সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিয়া রমণীর গাত্রে উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। রবীশ্বরের সুশ্রূষায় রমণীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন,—চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার সমস্ত কথা ও ঘটনা স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। সুন্দর বলিষ্ঠ যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি জলে ডুবিয়াছিলাম, আপনিই আমাকে উদ্ধার করিয়া জীবন দান করিয়াছেন। যদি বাধা না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় বলুন।"

বিনীত রবীশ্বর নম্রস্বরে বলিলেন, "আপনাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া, আমি কোন নূতন কায করি নাই। ইহা জগতের লোকে সকলেই করিয়া থাকে। সেজন্য কৃতজ্ঞ হইয়া আমাকে লজ্জিত করিবেন না।"

রমণী। আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহা কি বলিতে বাধা আছে ?

রবি। না,—পরিচয় বলিতে কোন বাধাই নাই।

রমণী। তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

রবি। আমার নাম রবীশ্বর রায়। আমি মণিপুররাজের কুবো উপত্যকা বিভাগের অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন কাপ্তেন এবং রাজপুরের রায় রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু—

রমণী। কিন্তু কি ? আমার জীবনদাতার আমার নিকট কোন কথা গোপনীয় নাই। যাহা বলিতেছেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রবি। ভদ্রতার বিরুদ্ধ,—স্ত্রীলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা ভদ্রতার বিরুদ্ধ। আপনার পরিচ্ছদাদি দর্শনে আপনাকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়াই বোধ হইতেছে। যে সুবর্ণবলয় আপনার সুন্দর হস্তে শোভা পাইতেছে,—উহা রাজমহিলার হস্তে দিবার অধিকার আছে।

রমণী। আমার পরিচয় জানিবার ইচ্ছা করিতেছেন ?

রবি। কিন্তু তাহা ভদ্রতার বিরুদ্ধ। তবে কোথায় পঁহুছিয়া দিলে আপনি নিরাপদ হইতে পারেন, তাহাই ভাবিতেছি।

রমণী। যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন; তাঁহার নিকট পরিচয় দিতে আমার কোন বাধাই নাই। আমার নাম রাণী চন্দ্রাবলী।

রবীশ্বর একদিন মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য রাণী চন্দ্রাবলীকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতেই দর্শন মাত্রেই চিনিতে পারেন নাই। এখন নাম শুনিয়া অদ্যোপান্ত চাহিয়া দেখিয়া রাণী চন্দ্রাবলীকে চিনিতে পারিলেন।

এই সময় সূর্য্যের শেষ বিদায়-রশ্মি-কিরীট আসিয়া রমণীর মুখ-মণ্ডলে আপতিত হইল। রাণী চন্দ্রার বয়স পঞ্চত্রিংশ বর্ষের সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কেহই তাহা অনুমাণ করিতে পারে না। দেহ মধ্যাকৃতির এবং সুগোল ও নিটোল। যৌবনের মাধুরী এখনও সর্ব্বাঙ্গে ঢল ঢল করিতেছে। আকর্ণবিশ্রান্ত নীল চক্ষুর ভাস্বর চাহনি এখনও যুবতীর আদর্শ।

রবীশ্বর রাণী চন্দ্রাবলীকে চিনিতে পারিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এই রমণী মন্ত্রী চিরঞ্জীবের হৃদয়াধিকার করিয়া সমগ্র মণিপুরে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কেবল রূপ,—রূপ ভিন্ন ইহার আরও কিছু গুণ আছে

কি? আছে বৈ কি। যে মানুষের উপরে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, তাহার অবশ্যই একটা গুণ আছে।

আরও বিনয় নম্র স্বরে রবীশ্বর বলিলেন, "আপনার ভিজা কাপড়, আর এখানে অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।"

চন্দ্রা। এ অবস্থায় কোথায় যাইতে বলেন?

রবি। আপনার সম্ভ্রমের যদি কোনরূপ হানি না হয়, তাহা হইলে অদূরে—গ্রামোপান্তে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ী। সেই স্থানে গিয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রাজধানীতে গমন করিবেন।

চন্দ্রা। রায় রতনচাঁদের বাড়ী এখান হইতে কত দূর?

রবি। অধিক দূর নহে—গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে। অর্দ্ধ মাইলের কিছু কম হইবে।

চন্দ্রা। আমি সেই স্থানেই বেড়াইতে যাইতেছিলাম।

রবি। কিন্তু পদব্রজে যাওয়া হইতে পারে না। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ী গিয়া কোন প্রকার সুযোগ করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে যাওয়াই সুযুক্তি।

চন্দ্রা। তোমার ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আমার কথা মনে রাখিও, আমি তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ভুলিব না।

রবি। আমি আমার কর্ত্তব্য কাযই করিয়াছি।

উভয়ের পরিধানেই আর্দ্র বস্ত্র। সেই প্রায়াগতা সন্ধ্যাসময়ে, সান্ধ্য-কুসুম-পরাগ-ধূসর-ভৃঙ্গ-গুঞ্জরিত, বিহগকূজিত ধীর সমীর-প্রবাহিত সময়ে নদীতট বহিয়া একটী সুন্দর যুবক ও একটী সুন্দরী যুবতী আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া পদব্রজে চলিয়াছে। রবীশ্বরের হৃদয় একটী বিপন্ন রমণীর একটা উপকার করিতে পারিয়া প্রফুল্ল,—রিপুপরতন্ত্রা চন্দ্রার হৃদয় সুন্দর যুবকের সুন্দর ছবি দর্শনে কণ্টকিত।

অল্পক্ষণ পরেই উভয়ে গিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের দ্বার দেশে উপনীত

হইলেন। সাঁঝের প্রদীপ লইয়া কমল তখন দ্বারদেশস্থ তুলসীমঞ্চে দেখাইতে আসিতেছিল। রবীশ্বরের সঙ্গে একটী রমণীকে দেখিয়া এবং উভয়েরই ভিজা কাপড় দর্শনে সে কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রবি, উনি কে?"

বিদ্যুত্তাড়িত হৃদয়ে রবীশ্বর বলিলেন, "পরিচয় পরে দিব। বাড়ীর মধ্যে চল। ঠাকুর কোথায়?"

কমল। বাড়ীর মধ্যে আছেন, চল।

দীপ হস্তে করিয়া কমল অগ্রে এবং রাণী ও রবীশ্বর তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর তখন সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন। রবীশ্বর ও তাহার সঙ্গে চন্দ্রাকে দেখিয়া এবং উভয়েরই আর্দ্র বস্ত্র দর্শনে ঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বাঘিনী চন্দ্রাকে ভালরূপেই চিনিতেন। কিন্তু তখন অন্য কথা কিছু না বলিয়া, কমলকে শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিতে এবং বসিতে আসন দিতে বলিয়া পুনরায় উপাসনায় মনঃসংযোগ করিলেন।

কমল শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিলে উভয়ে বস্ত্র ত্যাগ করিলেন এবং কমল তাঁহাদিগকে বসিতে আসন প্রদান করিল।

অনেকক্ষণ পরে, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত হইলে তিনি বলিলেন, "রবীশ্বর? তোমাদের উভয়ের কাপড় ভিজিয়াছিল কেন?"

রবীশ্বর অতিশয় বিনীত ভাবে মাছ ধরিতে যাওয়া হইতে আর রমণীর নৌকা ডুবি পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন। তৎপরে বলিলেন, "এই ভদ্র মহিলাকে কি আপনি চেনেন?"

কৃষ্ণা। হাঁ,—অল্প অল্প চিনি।

চন্দ্রার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। বিরক্তিস্বরে বলিলেন, "কি ঠাকুর? অল্প অল্প চেন? মাসের মধ্যে দশদিন যে মন্ত্রীভবনে তোমার সহিত

আমার সাক্ষাৎ হয়। যে দিন তোমার দেনার টাকা পরিশোধের জন্য, তোমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবে বলিয়া মন্ত্রী আদেশ দেন, তৎপরে তুমি আরও কিছু দিনের জন্য সময় চাহিতে গেলে মন্ত্রী বলেন, টাকা আমার নহে, রায় রতনচাঁদের; রতনচাঁদ আর রাখিতে চাহে না। সে দিনও ত আমাকে দেখিয়াছ? সে আর ক'দিনের কথা?"

কৃষ্ণা। সেখানে বিষয়কর্ম্ম জন্য গমন করিয়া থাকি। তোমাকে দেখিবার জন্য যাই না। কাযেই ঠাওর নাই। যাহা হউক, যখন আমার বাড়ী আসিয়াছ, তখন তুমি যেমনই হও,—আমি অতিথি-সৎকার করিব। সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তোমার সম্ভাষণ করিব। কিন্তু আমার মন কাহারও বশবর্ত্তী নহে, মন আমার নিজের।

চন্দ্রা ক্ষুব্ধা সিংহীর মত ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে মস্তক নাড়িল,—কোন কথা কহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একটী বর্ষীয়সী রমণী আসিয়া চন্দ্রাকে ডাকিয়া বলিল, "আপনার শরীর বোধ হয়, বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে। নারায়ণের প্রসাদ গরম দুধ আছে, একটু খাবেন আসুন।"

দুগ্ধ খাইবার জন্য রবীশ্বরও অনুরোধ করিলেন। তখন একবার চন্দ্রা তাহার কামশরাসন তুল্য ভ্রূযুগল আকুঞ্চন করিয়া, রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া, বর্ষীয়সী রমণীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। চন্দ্রার চাহনিতে কেবল যে কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। নবজলভারাবনত মেঘের কোলে বজ্রের মত চাহনির ভিতর আরও কিছু যেন লুক্কায়িত ও প্রচ্ছন্ন ছিল।

সেখানে তখন আর কেহই ছিল না,—ইতঃপূর্ব্বে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর উঠিয়া গিয়াছিলেন; কেবল কমল ও রবীশ্বর বসিয়াছিল। সম্মুখে সন্ধ্যার প্রদীপ মৃদু সমীরণে কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। যুবক যুবতীর মনও কোন বায়ুর মন্দ মন্দ ঘাত-প্রতিঘাতে জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁপিতেছিল। উভয়েই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ছিল, কিন্তু উভয়ের চক্ষুই উভয়ের দিকে পুনঃপুনঃ সতৃষ্ণ চাহনিবিক্ষেপে বুঝি আপনাদিগের দর্শনপিপাসার শান্তি করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে রবীশ্বর বলিলেন, "কমল, আমায় চিনিতে পার।"

কমল বলিল, "হাঁ চিনি বৈ কি। কিন্তু তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়ীর দিকে আইস নাই। অনেক দিন তোমায় দেখি নাই।"

রবি। আমিও সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি আমায় চিনিতে পার কি না?

কমল। তুমি আর আমাদের বাড়ী এস না কেন?

রবি। আমি ত এখানে থাকি না। কুবো উপত্যকায় সৈন্যদলে কায করি। তিন মাসের ছুটি লইয়া, সবে মাত্র তিন দিন হইল বাড়ী আসিয়াছি।

কমল। তি—ন, দি—ন, বাড়ী এসেছ, এদিকে ত আইস নাই?

রবি। এদিকে কি করিতে আসিব?

কমল। এর আগে কি করিতে আসিতে?

রবি। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতাম।

কমল। এখন এস না কেন?

রবি। এখন এখানে আসিলে আর শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারি না।

কমল। কেন?

রবি। মনঃসংযোগ হয় না।

কমল। কারণ ?

রবি। সত্য কথা বলায় যদি কোন পাপ বা দোষ না থাকে,—তবে বলিতেছি কমল; কারণ তুমি। তোমায় দেখিয়া অবধি আমার অন্য সমস্ত জ্ঞান বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। সেই জ্ঞানের সিংহাসনে মায়ার আস্তরণ পাতিয়া, এখন তুমি উপবেশন করিয়াছ ?

কমল। তোমার ও খাতায় কি লেখা ?

রবি। শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কমল। আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক হইতেও কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কঠিন ? সে সকল ত আমি পড়িয়াছি।

রবি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার, সর্ব্ব দর্শনের শ্রেষ্ঠ, সমস্ত-তত্ত্বের একমাত্র সমাবেশ। ইহার এক একটী শ্লোকে দশ বিশ খানা সাংখ্য, পাতঞ্জল সৃষ্টি হয়।

কমল। আমাকে উহা পড়াইবে ?

রবি। আমার কাছে পড়িলে তোমার নামে কলঙ্ক রটিতে পারে।

কমল। কেন ? সৈনিক পুরুষের নিকটে কি শাস্ত্র পাঠ করিতে নাই ?

রবি। (হাসিয়া) দূর, তাহা কেন ?

কমল। তবে কি ?

রবি। আমি যুবক, তুমি যুবতী। এরূপ নির্জ্জন আলাপে দোষ হইতে পারে।

কমল। যদি দোষ হয়, তবে পড়িব না।

রবি। কমল, আমি তোমায় বড় ভাল বাসি; তুমি কি আমায় ভালবাস ?

কমল। ভালবাসা কাহাকে বলে, আমি জানি না। পিতামাতার ভালবাসা কখনও পাই নাই। আত্মীয় স্বজন জগতে আমার কেহ নাই—সুতরাং কখনও কেহ আমায় ভালবাসে নাই। ঠাকুরের নিকট আবাল্য প্রতিপালিত—কিন্তু সামান্য ক্রটীতেও বড় বকেন। আর সংসারের কাযে খাটিতে খাটিতে প্রাণ যায়। এ বাড়ীর চাকর-চাকরাণীদেরও সেবা আমাকেই করিতে হয়। ভালবাসা যে কখনও জানে না, সে কি প্রকারে ভালবাসিবে রবীশ্বর? তবে তুমি এলে, তোমায় দেখিলে, আমি বড় সুখী হই। ইচ্ছা করে, আজীবন তোমার নিকট বসিয়া থাকি।

রবি। ঠাকুরের সংসারে খাটুনিতে কি তোমার বড় কষ্ট হয় কমল?

কমল। না, না,—রবীশ্বর; ইহাতে আমার কোন কষ্ট নাই। সংসারে যার কোন কায নাই—তার ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, রাঁধা-বাড়াই সুখ—তাহাতেই সময় কাটিয়া যায়।

রবি। ভাল, ঠাকুরের ত আরও কতকগুলি দাস-দাসী আছে! ঐ সকল কায কি তাহারা করে না?

কমল। আগে করিত,—আ'জ এক বৎসর পর্য্যন্ত ও সকল কায করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

রবি। কেন নিষেধ করিয়া দিয়াছেন? তাহার কারণ কিছু জান কমল?

কমল। অন্য কোন কারণ জানি না। তবে এক কারণ এই জানি যে, একজন কালো মত মোটা পুরুষ মানুষ, মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে আসে, তার নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলে না; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তার বড় ভাব, সেইই ঐরূপ করিতে বলিয়া গিয়াছে।

রবি। তুমি জানিলে কি প্রকারে?

কমল। সে যখন বলে, পাশের ঘরের জানেলা হইতে আমি শুনিয়াছিলাম।

রবি। ঠাকুরের এ বড় অন্যায়। আমি ঠাকুরকে একবার এ বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিব।

কমল। না,—ইহাতে আমার কোন কষ্ট নাই। প্রথম প্রথম কষ্ট হইত বটে, কিন্তু এখন কায না করিতে পাইলে কষ্ট হয়। কায করা বন্ধ হইলে কষ্ট হইবে।

রবি। কার কায কর?

কমল। কার কায করি? কে কার কায করে? সংসার ত মায়া! কায না করিলে নিস্তার নাই—কায করি। আমার বলিয়া সংসার পাতাইয়া কায করিলে, সে কাযও যেমন কাযে লাগে, পরের সংসারে কায করিলে সে কাযও তেমনি কাযে লাগে। মেয়াদ ফুরাইলে নিজের সংসার—টাকাকড়ি, সন্তান সন্ততিও ফেলিয়া যাইতে হয়। পরের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেও সাজান গুছান সংসার ফেলিয়া চলিয়া যাইতে হয়। ফলে একই। তবে কায করা চাই। কায করিলে সুখ আছে।

রবি। আমি তোমায় ভগবদগীতা পড়াইব।

কমল। এই যে বলিলে,—দোষ হয়!

রবি। তুমি গীতা পাঠের যথার্থ অধিকারিণী। আর এক স্থানের অধিকারিণী যদি তোমায় করিতে পারি—মানব জন্ম সার্থক জ্ঞান করিয়া তখন পড়াইব।

কমল। এইবার বোধ হয়, তোমার চাকুরীতে উন্নতি হইবে।

রবি। কেন?

কমল। তুমি রাণী চন্দ্রার সুনজরে পড়িয়াছ।

রবি। তাতে কি হয়?

কমল। চন্দ্রার আজ্ঞায় সব হয়। এবার তুমি সেনাপতি হবে।

রবি। আমি বেশ্যার প্রসাদে পৃথিবীপতি হইতেও ঘৃণা বোধ করি।

রবীশ্বরের কথা শুনিয়া, কমলের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি যেন অভিনব ভাব ধারণ করিল। তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দিত-গোলাপ-কান্তি দর্শনে রবীশ্বরের প্রাণের ভিতরে কি একটা অনিভব ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। সরল, পবিত্র, প্রেম-পরিপূর্ণ সংসার-রস-অনভিজ্ঞা শিক্ষা-দৃপ্তা কমলও রবীশ্বরের সাহস-ব্যক্ত কথায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া, ভক্তিপূর্ণ চাহনিতে যুবকের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই জনের চক্ষুতেই কেমন এক টল টল, ছল ছল, প্রীতি-প্রেম মাখান ভক্তিময় হিল্লোলের ভাব খেলা করিতেছিল। অনতি-দূরে প্রদীপটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া, উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া সমস্ত গৃহখানির অন্ধকার বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

রবীশ্বর বলিলেন, "কমল; আমি তোমায় বড় ভাল বাসিয়াছি, তোমাকে পাইবার কোন উপায় কি নাই? একদিন—সে আজি অনেক দিনের কথা, তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকটে বলা হইয়াছিল, তিনিও স্বীকৃত ছিলেন। এক্ষণে সে প্রস্তাব কি কার্য্যে পরিণত হয় না? যদি তুমি বলিতে বল, আমি কোন লোকের দ্বারা এ প্রস্তাব তাঁহার নিকটে করিতে পারি। তোমাকে পাইলে, আমি মনুষ্য-জন্ম সার্থক জ্ঞান করিতে পারি!

কমল। তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না।

নিদাঘের মেঘে দামিনী দমকিলে প্রান্তরের পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, রবীশ্বর তদ্রূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন—কেন কমল? তুমি কি আমায় ভালবাস না।

স্মিতমুখে কমল বলিল, "সে কথা বলিতেছি না। ঠাকুর তোমার সহিত আমার বিবাহ দিবেন না।"

রবি। কেন, ঠাকুর ত আগে স্বীকৃতই ছিলেন?

কমল। মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের নিকটে কালো ও মোটা চেহারার একটা মানুষ আসে; এর আগেই সে কথা বলিয়াছি।—আমাকেও সময় সময় বড় জ্বালায়—যেখানে সেখানে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু কে সে, কোথায় বাড়ী—তাহা জানি না। ঠাকুরও তাহা বলেন না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু দেব-বাক্যের মত ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়া কায করেন। সে-ই ঠাকুরকে তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছে।

রবি। কেন?

কমল। কেন, তা আমি শুনি নাই,—ঠাকুর অবশ্য শুনিয়াছেন।

রবীশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গিনী পাইলে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে পারিতাম।

কমল। ঠাকুর যদি বিবাহ না দেন, আমি কি করিতে পারিব।

রবি। ঠাকুর তোমার কে? পিতা নহেন, ভ্রাতা নহেন,—আত্মীয় স্বজন কেহই নহেন। আমার প্রতি যদি করুণা হয়,—আমার সঙ্গে যাইতে যদি স্বীকার কর,—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। হৃদয়ের অধীশ্বরী করিয়া আজীবন পূজা করিব।

কমল। ঠাকুর আমার কেহ নহেন সত্য,—কিন্তু কে কার রবীশ্বর? প্রেম ত বিস্তৃতি? বিস্তৃতিরই সোপান আত্মীয়তা। তিনি আশ্রয়দাতা, শিক্ষাদাতা,—হৃদয়ের আবেশে, প্রাণের টানের স্বার্থের খাতিরে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কি পাতক নয়?

রবীশ্বরের মুখ-মণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। ধরা গলায়, ভরা আওয়াজে বলিলেন "কমল; তুমিই যথার্থ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তুমিই যথার্থ ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছ, কিন্তু আমি কি তোমায় পাইব না? জানি না, কোন্ ভাগ্যধর তোমাকে লাভ করিয়া অনন্তসুখে সুখী হইবে! যাহা

হউক, সুখে থাক। আমি আজীবন তোমারই ধ্যান করিয়া কাটাইব,—কখনও বিবাহ করিব না।”

কমল। যদি একজনকে ভালবাসা যায়,—বিবাহ করিতে বাধা পাইলে, না হয় লোকত বিবাহই না হইল, মনের মিলন—আত্মার মিলন কেন যাইবে?

রবি। তোমায় দেখিতে প্রাণ কেমন করে? মধ্যে মধ্যে না দেখিলে থাকিতে পারিব না।

কমল। তুমি এস।

রবি। কোথায়?

কমল। এইখানে।

রবি। ঠাকুর কি বলিবেন?

কমল। তিনি তাঁহার শিষ্যকে চেনেন,—তিনি কিছু বলিবেন না।

এই সময় তাহারা কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া নিস্তব্ধ হইল। গৃহমধ্যে চন্দ্রা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কাম-কামনা-জড়িত তৃপ্ত চাহনি, সুন্দর মুখের বিলাসভার—রবীশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমাকে পঁহুছাইয়া দিবার কি করিতেছেন? না, রাত্রি এক সঙ্গে কাটাইতে হইবে?”

কথা শুনিয়া কমল ঘৃণায় লজ্জায় মুখ ফিরাইল। রবীশ্বর তখন কমলের ভাবনায় বিভোর, তিনি সে রসিকতার ভাব গ্রহণ করেন নাই। তবে কথাটা শুনিয়াছেন। উত্তরে বলিলেন, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বোধ হয় যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিতেই বাহিরে গিয়াছেন, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

চন্দ্রা তখন রবীশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন, “আপনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আপনি না থাকিলে, আমি আজি আর

এ পৃথিবীর মুখ দেখিতে পাইতাম না। আপনার নিকটে আমি বিক্রীত হইয়াছি। ইহার মধ্যে এক দিন আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইব। ভরসা করি, আপনি অধীনার গৃহে পদার্পণ করিবেন। সেই দিন মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আপনার আলাপ করিয়া দিব। আর পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি, যদি কখন কোন বিপদে পড়েন,—কোন ভাল বা মন্দ কার্য্যের জন্য প্রয়োজন পড়ে,—আমাকে বলিলেই আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিব। আপনি বোধ হয়—"

চন্দ্রার কথা সমাপ্ত না হইতেই কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর অতিশয় দ্রুতপদে গৃহমধ্যে আগমন করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক আকার প্রকার দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্য ও ভীত হইল।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "চন্দ্রা, কতকগুলি লোক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া, তোমাকে আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছে। তাহারা সংখ্যায় অনেক,—পাঁচশতের কম হইবে না। আমি তাহাদিগকে অনেক প্রকার বুঝাইয়াছি। বাধা দিতে অনেক প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই বাধা দিতে পারিলাম না। আমার দুর্ব্বলতায় আমি লজ্জিত,—কিন্তু কি করিব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এ দুর্ব্বলতায় দোষ দিও না। তুমি স্ত্রীলোক; আমার সাধ্য থাকিলে কখনই তোমার অনিষ্ট করিতে দিতাম না। এক্ষণে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পলায়ন কর; পলায়ন ভিন্ন তোমার প্রাণরক্ষার অন্য উপায় নাই।"

চন্দ্রা দৃপ্তা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া, মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "কি ঠাকুর, পলায়নের কথা কি বলিতেছেন? আপনি কি আমায় চেনেন না? মণিপুর-রাজ্য মধ্যে কাহার এত শক্তি যে, আমার মুখপানে চাহিয়া কথা কহে!"

কৃষ্ণা। সে আমি জানি। কিন্তু চাষাদের হাতে প্রাণ বাঁচিলে

তবে ত তাহাদিগকে দমন করিবে বা শাস্তি দিবে! এক্ষণে তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। আমার সাধ্য নাই যে, তোমাকে কোন প্রকারে রক্ষা করিব। এ রাগের সময় নহে—রাগ অভিমান পরে করিও, এক্ষণে যাহাতে প্রাণরক্ষা হয়, তুমি তাহা কর। রবীশ্বর! যাহাতে চন্দ্রার প্রাণরক্ষা হয়, তুমি তাহা কর। তুমি চন্দ্রার সঙ্গে থাকিও। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে চন্দ্রার প্রাণ থাকিবে না।

পুচ্ছ-বিমর্দ্দিত অজগরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া রবীশ্বর তরবারি গ্রহণ জন্য নিজ কটিদেশে হস্তার্পণ করিলেন; কিন্তু তথায় তরবারি ছিল না। কারণ, তখন তিনি সৈনিকের বেশে ছিলেন না। কম্পিত ওষ্ঠাধর ফুলাইয়া রবীশ্বর বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর; আমায় একখানি তরবারি দিন,—স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে এত অত্যাচার কোন পুরুষেই সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমিই উঁহাকে এখানে আনিয়াছি। এক্ষণে উনিই আমার রক্ষিতা!"

কৃষ্ণা। তুমি পাগল নাকি? অস্ত্র পাইলেই বা একা এত লোকের সঙ্গে কি করিয়া পারিবে? বিশেষতঃ আরও লোক ত জমায়েৎ হইতে পারে! যাহাতে উনি রক্ষা পান, তাহাই কর। উঁহাকে লইয়া আমার সঙ্গে আইস। আর বিলম্ব করিও না। ঐ শুন,—জনকোলাহল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

চন্দ্রার সুন্দর মুখ ঘামিয়া ঘামিয়া পাংশুবর্ণ হইল। ভীতা ক্ষুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমায় রক্ষা করুন।"

"তবে আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র উঠিয়া আইস।"—এই কথা বলিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর দ্রুত চলিলেন। চন্দ্রা ও রবীশ্বর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল, দরোজার নিকটে পঁহুছিয়া তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, অনতিদূরে অনেক লোকের কোলাহল হইতেছে।

দরোজার সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র ঘর—কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ত্বরিত গতিতে সেই গৃহের চাবি খুলিয়া উহাদিগকে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং একখানা বড় প্রস্তর টানিয়া সরাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, "মাটির নীচে যে সিঁড়ি গিয়াছে, ঐ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাও—নীচে পথ আছে, পথ বহিয়া চলিয়া যাইও। কোন ভয় নাই।"

তৎপরে রবীশ্বরের কাণে কাণে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর কতকগুলি কথা বলিয়া দিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া রবীশ্বর বলিলেন, "এমনতর?—ইহা আমি জানিতাম না। কখনই জানি না!"

তদনন্তর ভীতা চন্দ্রাকে রবীশ্বর বলিলেন, "কোন ভয় নাই। চলুন,—আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি।"

চন্দ্রা। আপনি আগে আগে চলুন,—আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। ওখানে বুঝি অন্ধকার? আমার বড় ভয় করিতেছে।

রবীশ্বর নামিয়া পড়িয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া চন্দ্রাও নামিলেন,—সে ঘোর অন্ধকারের রাজ্য।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। রবীশ্বর চন্দ্রাকে লইয়া চলিয়া গেলে, সে কুটীরে কমল একা বসিয়াছিল। বসিয়া কি ভাবিতেছিল—সহসা একটা বাতাস আসিয়া প্রজ্জলিত প্রদীপটাকে নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া গেল। বিমুক্ত বাতায়ন দিয়া চন্দ্রালোক আসিয়া সমস্ত গৃহখানি তাহার স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল শ্রীতে আপ্লুত করিল। কমল অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া, এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আপন মনে অনুচ্চ-স্বরে গাহিতে লাগিল,—

মনে করি চলে যাই
যাইতে পারি না কেন,
মুখ-পানে যত চাই
বাঁধা পড়ি তত যেন!

কি যে ও লাবণ্য-রাশি
কি জানি কি আছে গুণ,
মুখখানি যে হাসি হাসি
আঁখি দু'টি সুনিপুণ।

চাহি না স্বরগ-সুখ
তাহার মিলন চেয়ে,
তার ওই চাঁদ মুখ
মরি যেন বুকে নিয়ে।

মরিলেও মুছিব না
মরমে রাখিব লিখে,
মরিতে বাসনা মোর
তার বুকে মাথা রেখে।

পূজিব জনম ধ'রে
দেখিতে তা দিব কেন,
লুকা'য়ে হৃদি মাঝারে
রেখে দিব চির দিন।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর এই সময় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কমল যে ঘরে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইলেন, কমল আপন মনে, অনুচ্চস্বরে গান গাহিতেছে। গানে মানুষের প্রাণের ভাব বাহির হয়। গানে প্রাণের কথা বুঝা যায়,—তাই কৃষ্ণানন্দ, কমলের মনের ভাব বুঝিবার জন্য দেওয়াল-সংলগ্ন হইয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া গানটীর আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, মৃদু হাসিতে হাসিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন, "কমল!"

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া, কমল লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি গান বন্ধ করিয়া দিল। লজ্জাতাড়িত স্বরে উত্তর দিল, "কেন ?"

কৃষ্ণা। ঘরে আলো নাই কেন ?

কমল। এই মাত্র বাতাসে নিবিয়া গেল।

কৃষ্ণা। জ্বাল নাই কেন ?

কমল। জ্বালিব বলিয়া উঠিতে যাইতেছিলাম, এর মধ্যে আপনি আসিলেন।

কৃষ্ণা। জ্বালিয়া আন।

কমল উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। কৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "কি গান গাহিতেছিলে ?"

কমল লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "ও একটা গান।"

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "ও যে একটা গান, তা আমিও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। গানটা কথায় বল, আমি শুনিব।

কমল। উহা আমি আপনার সাক্ষাতে বলিতে পারিব না।

কৃষ্ণা। কেন ?

কমল। লজ্জা করে।

কৃষ্ণা। যাহা বলিতে লজ্জা করে, তাহা গাহিতেছিলে কেন ?

কমল। সকল সময়ে, সকলের সাক্ষাতে কি এক বিষয় বলা যায় ?

কৃষ্ণা। রবীশ্বর চলিয়া গিয়াছে—তাই কি উহা গাহিতেছিলে।

কমল। সে আমার কে ? সে ত থাকিতে আসে নাই,—চলিয়া যাবে জান, তবে সে চলিয়া গেল—বলিয়া নৃত্যগীত করিব কেন ?

কৃষ্ণা। পাগ্‌লী ; আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছ ? ও কি নৃত্যগীত ? ও গান ত মরণ-সঙ্গীত।

কমল। হ'তে পারে।

কৃষ্ণা। শোন কমল!

কমল। বলুন।

কৃষ্ণা। এতকাল ধরিয়া তোমায় বৃথা শিক্ষা দিলাম। তোমায় বারে বারে বুঝাইতেছি, রবীশ্বরের কথা ভুলিয়া যাও উহাকে পাইবার তোমার উপায় নাই। তবু কি তুমি উহাকে ভুলিতে পারিবে না?

কমল। না পাই, নাই পাইব। বন্ধুত্ব স্থাপনে দোষ কি? শুধু চোখে দেখিতে দোষ কি?

কৃষ্ণানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বন্ধুত্ব অস্বাভাবিক কথা! স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের বন্ধুত্ব—নির্জ্জন ভ্রমণ, অধিক ভাষণ, হাস্য কৌতুক একেবারেই নিষিদ্ধ।"

কমল। যাহারা তাহা করে?

কৃষ্ণা। তাহাদের অধিকাংশই পতিত হয়।

কমল। তবে একটা কথা বলিব?

কৃষ্ণা। বল।

কমল। রবীশ্বরকে দেখিলে আমি সকলই ভুলিয়া যাই। কেন এমন হয় বলিতে পারি না। চিত্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করি, চিত্ত বুঝে না। জানি আপনি গুরু—আপনি নিষেধ করিয়াছেন—জানি, আপনার সেই বন্ধুটী নিষেধ করিয়াছেন। আরও জানি, আমার হিতের জন্যই আপনারা নিষেধ করিয়াছেন। মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করি—কিন্তু জানিয়া শুনিয়া, তবুও তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি কেন? আমার জ্ঞান আছে যে, উহা অন্যায় করিতেছি, তথাপিও মনকে বুঝাইতে পারি না কেন?

কৃষ্ণা। ক্ষেপা মেয়ে;—সেই কি জ্ঞান? সে বিষয় জ্ঞান,—এ জ্ঞান পশুতেও আছে। প্রণয়ীকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে; প্রণয়ী দর্শনে সুখী হইবে বলিয়া কপোতীও কপোতের দিকে ছুটিয়া আইসে—কপোত-

কপোতী ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া মুখোমুখী হইয়া বসিয়া থাকে ! তাহাই কি জ্ঞান ? এত দিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি এই জ্ঞান লাভ করিলে ?

কমল। জ্ঞান না হউক, আমি বলিতেছিলাম,—উহা যে অন্যায়, সে জ্ঞান আমার আছে। তথাপিও আমি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি কেন ?

কৃষ্ণা। আমিও তাহাই বলিতেছিলাম,—উহা জ্ঞান নহে, মায়া ! মহামায়া জীবকে বাঁধিবার জন্যঐ রূপ ধারণ করিয়া জীবের জীবত্ব বজায় রাখিতেছেন। তিনি কাহাকেও কিছু বুঝিতে দেন না।

কমল। কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণা। অনেকদিন ইহা বুঝাইয়াছি,—মনে না রাখিলে কি করিব ? বহির্জ্জগতের মত এই অন্তর্জ্জগতেও অনন্ত-বিস্তার ; বৈচিত্রভেদে এই বিস্তৃতির সীমা নাই। নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ দেখিলে যেমন মন বিস্ময়-রসে আপ্লুত হয়,—অনন্ত বৈচিত্রময় মানুষের মনের (অন্তর্জ্জগতের) দিকে চাহিলেও তেমনি বিস্মিত হইতে হয়। অন্তর্জ্জগৎ বৃত্তিময় ; বৃত্তি মানস-বিকার ;—এই বৃত্তি বৈচিত্রভেদে অনন্ত, তাই অন্তর্জ্জগৎও অনন্ত-বিস্তার। কিন্তু সকল বৃত্তিই সুন্দর নহে। যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, মানব তাহার অনুশীলনে উন্নতি করিবে,—সুবৃত্তি গুলির যে সূক্ষ্মাত্মিকা শক্তি, তাহার রাশ নাম বিদ্যা, আর কুবৃত্তির সূক্ষ্মাত্মিকা শক্তির রাশ নাম

কমল। মানুষ যখন সুবৃত্তি-কুবৃত্তির অধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাদিগের বাধ্য হইতে হইবে।

কৃষ্ণা। তাহা ভুল। আগুন জ্বালিলে ভাত রাঁধিতে,—গৃহ দাহ হইতে দিবে কেন ? নদীতে স্নান করিয়া শীতল হইবে, ডুবিয়া মরিবে কেন ? সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কাঁটারও প্রয়োজন। কাজেই বাড়ীর কর্ত্তা, গৃহিণীকে যথোপযুক্ত কাযে ব্যবহার করিবার জন্ত অন্যান্য

আসবাবের সঙ্গে ঝাঁটাও কিনিয়া দেন ; কিন্তু গৃহিনীর কি কর্ত্তব্য, চন্দন-চুয়ার পরিবর্ত্তে ঝাঁটা দিয়া কর্ত্তার পৃষ্ঠদেশ রঞ্জিত করা ? উৎকট ক্রোধ, বিকট ঘৃণা, কদর্য্য কাম, জঘন্য লোভ, নৃশংস ঈর্ষা ইহাও বৃত্তির অনুশীলনের ফল ;—আর সরল প্রেম, বিমল সখ্য,মধুর স্নেহ, করুণ বিরহ, শান্ত ভক্তির ভাব, ইহাও বৃত্তির অনুশীলনের ফল। যাহা সমাজের হিত, আত্মার হিত, দেহের হিত—জ্ঞানী তাহাই করিবে। অজ্ঞানী, রিপুর বশে দিশেহারা হইয়া যাহা তাহা করিয়া আসে।

কমল কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া কথা শুনিতে ছিল,—ঠাকুরের কথা সমাপ্ত হইলে বলিল "অত বুঝিতে পারি না ঠাকুর। তুমি নিষেধ করিয়াছ—তাই পিছাইবার চেষ্টা করিতেছি। তুমি বল, দাও—পারিব।"

কৃষ্ণা। অজ্ঞানতাকে দূর করিয়া মানসিক বৃত্তিকে সুপথে লইতে হইলে, অজ্ঞানতাবিষয়ক চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে দূর করিতে হয়। সে বিষয় একেবারে ভুলিতে হয়। তাহার বিপরীত বৃত্তিকে হৃদয়ে জাগাইয়া লইতে হয়। এক্ষণে তুমি আমার জলযোগের আয়োজন কর গে। আমি একটু ঘুরিয়া আসি। বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। কমল দীপ নিবাইয়া, গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহান্তরে গমন করিল। ঠাকুরের জলযোগের আয়োজন করিতে বসিয়া দুধের বাটীতে ইক্ষুগুড় ঢালিয়া ফেলিল এবং ছানায় সৈন্ধব মাখাইয়া, শশায় চিনি মাখাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

রায় রতনচাঁদের কথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশ হইতে মণিপুর রাজ্যে যখন আগমন করেন, তখন মণিপুরেশ্বর রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পামহেবা তখনও মণিপুর রাজ্য আক্রমণ বা অধিকার করেন নাই। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ এবং মণিপুর-রাজবংশের গুরু। তিনি মণিপুরেই বসতি করিতেন। রায় রতনচাঁদকে বিপন্ন বাঙ্গালী জানিয়া, রাজাকে বলিয়া রাজ্যের মধ্যে স্থানদান ও অনেক সুবিধা করিয়া দেন। তৎপরে রাজা পামহেবা কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিতাড়িত হইলে, কৃষ্ণানন্দের সম্মান প্রভুত্বের একেবারে হ্রাস হইয়া গেল, কিন্তু রায় রতনচাঁদ আপন কূট-বুদ্ধির বলে পামহেবার প্রধান মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্‌কে বশীভূত করিয়া, আপন স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে লাগিলেন। রাজপুরের যে প্রাসাদে রায় রতনচাঁদ এখন বসতি করিতেছেন, ইহা পূর্ব্বে মণিপুর-রাজাদিগের বিশ্রাম-ভবন ছিল। নামে বিশ্রাম-ভবন, কিন্তু কাযে গুপ্তভবন ছিল।

তখন মণিপুর-রাজ্যাধিপতিগণ সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। চারিদিকে শত্রুগণ সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই সে সময়ে তাঁহাদিগের একটী গুপ্তভবনের প্রয়োজন ছিল। কোন প্রবল শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিলে, তাঁহারা পুরস্ত্রীগণকে রাজপুরের এই প্রাসাদে পাঠাইয়া দিতেন। যদি তাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত বা ধৃত হইতেন, এবং রাজপ্রাসাদ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইত, তবে পুরস্ত্রীগণ এই গুপ্তভবনের গুপ্ত পথ দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেন। পামহেবা কর্ত্তৃক মণিপুরের রাজসিংহাসন অধিকৃত

হইলেও রাজকুল-ললনাগণ এই প্রাসাদের গুপ্ত পথ দিয়াই পলায়ন করিয়াছিলেন। পামহেবা মণিপুরস্থ রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া, একটী রাজপুর-রমণীকে না দেখিতে পাইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, পুরস্ত্রীগণ পূর্ব্বেই রাজপুরের প্রাসাদে গমন করিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া তখনই পামহেবা রাজপুরের প্রাসাদে গমন করেন,--কিন্তু সেখানে গিয়া দেখেন, তিনি সন্ধান জানিবার পূর্ব্বেই রমণীগণ চলিয়া গিয়াছে। তখন তাঁহার বিজয় ঘোষণা প্রচার করিবার জন্য ঐ বাড়ীর সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া হতশ্রী করিয়া দেন।

ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে, যখন চিরঞ্জীব বর্ম্মণের একাধিপত্য হইয়া উঠে এবং রতনচাঁদ তাঁহাকে আপন স্বার্থজালে বিজড়িত করিতে সমর্থ হয়েন, তখন বসবাস করিবার জন্য চিরঞ্জীবের নিকট ঐ বাড়ীটী চাহিয়া লয়েন এবং তদবধি উহাতে বসবাস করিতেছিলেন।

রতনচাঁদ যখন বঙ্গদেশ হইতে মণিপুরে আগমন করেন, তখন স্ত্রী, দুই বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্র রবীশ্বর এবং হরেরাম নামক এক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আসেন।

রতনচাঁদ স্ত্রীকে লইয়া সুখী হইতে পারেন নাই। জনরব উঠে, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার ভৃত্য হরেরামকে ভাল বাসিয়াছে। রতনচাঁদ একথা শুনিয়া গোপনানুসন্ধান করিয়াও বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। হরেরাম ব্যাপার অবগত হইতে প্যারিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। রতনচাঁদের স্ত্রী স্বামীর অনেক প্রহার ও বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নাকি মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। কিন্তু সেটা জনরব—কেহই সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিত না। তবে আজ প্রায় পনর বৎসর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কাজেই ভাল লোকে বলিত, তিনি মরিয়া বাঁচিয়াছেন,—মন্দ লোকে বলিত, হরেরাম আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে।

রতনচাঁদের বাড়ীতে দাসদাসী অধিক ছিল না। নায়েব, সরকার প্রভৃতি তিন চারি জনের অধিক নহে। যে কয়জন লোক না হইলে, একেবারে বিষয়কার্য্য চলিতে পারে না—তিনি তাহাই রাখিতেন। ব্যয় করিতে তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত—সঞ্চয়ের উপর সঞ্চয় করিয়াই তিনি সুখী হইতেন। টাকা দেখিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি যেমন সুখী হইতেন, মানুষের সঙ্গে সদালাপে অথবা ধর্ম্ম, সাহিত্য বা সঙ্গীতাদির আলোচনায় তেমন হইতেন না, বরং সে সকলে বিরক্তই ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত ও খিট্‌খিটে,—এজন্য কোন দাসদাসী বা লোকজনই তাঁহার বাড়ীতে এক বৎসরের অধিক থাকিতে পারিত না। কেবল, সদয় নামক একজন ভৃত্য ও সদয়ের স্ত্রী বহুদিন ধরিয়া সে বাড়ীতে থাকিতে সক্ষম হইয়াছিল।

রতনচাঁদের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অনেক দিন পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দেহ অস্বাভাবিক লম্বা ও অস্বাভাবিক চিকণ। চক্ষু দুইটী ক্ষুদ্র কোটরপ্রবিষ্ট,—কিন্তু সেই চক্ষুদ্বয়ের এমন একটা ভাব আছে, যাহা দেখিলেই ভয় হয়;—নির্দ্দয়, স্বার্থপর ও রুক্ষ স্বভাবের লোক বলিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

যে দিন চন্দ্রা জলে ডুবিয়া রবীশ্বরের সঙ্গে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং দুর্ঘটনা ঘটে,—সেই দিন অপরাহ্ণ হইতেই রায় রতনচাঁদ একটু সাজিয়া গুছিয়া, একটা সুসজ্জিত গৃহে বসিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন রাত্রি প্রায় ছয়দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তিনি নিরাশ হইয়া সেই গৃহস্থিত বাক্স হইতে কতকগুলি দলিল পত্র বাহির করিয়া দীপালোকে বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মনটা এক একবার যেন যে আসিবে, তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইতেছিল, আবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় নিরাশা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিতেছিল।

এমন সময় ভৃত্য সদয় আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পায়ের শব্দে দলিল হইতে চক্ষু তুলিয়া লইয়া সদয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রতনচাঁদ বলিলেন,—"কিরে, সংবাদ কি ?"

সদয়। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর আসিয়াছেন। এখনই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছেন, বোধ হইল অতিশয় বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়াছেন।—এই সামান্য পথ আসিয়াই ঘোড়াটা ধুঁকিতেছে।

রতন। তাহাকে এই ঘরের মধ্যেই ডাকিয়া আন্।

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বেই কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরই রতনচাঁদকে মণিপুরে প্রতিষ্ঠিত করেন, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরই রতনচাঁদের প্রতিপত্তি ও পসারের মূল—কিন্তু জগতে কয়জন লোক উপকারীর উপকার চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখে ? কৃষ্ণানন্দের এখন সে দিন নাই—কৃষ্ণানন্দই এখন পর-মুখাপেক্ষী, সুতরাং রায় রতনচাঁদ কৃষ্ণানন্দকে আর পূর্ব্ববৎ গুরুর মত খাতির-যত্ন কেন করিতে যাইবে ! বিশেষতঃ কৃষ্ণানন্দ এখন রায় রতন-চাঁদের অনেকগুলি টাকা ধার করিয়াছেন,—অনেক উত্তমর্ণের ধারণা—যে তাহাদের নিকট টাকা ধার করে, তাহার ভদ্রতা, বিদ্যাবুদ্ধি, বংশমর্য্যাদা সমস্তই বুঝি দলিলের সঙ্গে তাঁহাদিগের বাক্সে আবদ্ধ হইয়া থাকে। দলিল খালাস করিয়া না লইলে, সে গুণগুলিও আর পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিলে, রতনচাঁদ তাঁহার মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আসুন। কি মনে করিয়া এ রাত্রে আসিয়াছেন ? আমি আপনার নামে টাকার বাবদ নালিশ করিব বলিয়া উকিল-সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি, সেই কথা শুনিয়াই বোধ হয় আসিয়া থাকিবেন ?"

কৃষ্ণা। না ; সে কথা শুনিয়া আমি আসি নাই। আমি যে জন্য আসিয়াছি, সে একটা বিশেষ গোপনীয় কথা।

রতনচাঁদ ভৃত্যকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি মহাশয় ;—কি বলিতে আসিয়াছেন, বলুন।"

কৃষ্ণা। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র রবীশ্বর, আমার আলয় হইতে একটি ভদ্র মহিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছেন।

রতন। আমার ভাইপো আপনার আলয় হইতে কোন্ ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছেন ?

কৃষ্ণা। আমরা এখানে বসিয়া গল্প করিতেছি, তাঁহারা এতক্ষণ বোধ হয়, সেই ঘোরান্ধকারে কষ্ট পাইতেছেন। আমি তাঁহাদিগের অনেকক্ষণ পরে তবে বাটী হইতে বাহির হইয়াছি।

রতন। কেন, আপনি অনেকক্ষণ পরে বাহির হইলেন কেন ?

কৃষ্ণা। সে সকল কথা পরে শুনিলেই চলিবে। এখন তাঁহাদিগকে আগে লইয়া আসুন। নতুবা তাঁহারা বড় কষ্ট পাইবেন।

রতন। আমার ভাইপো কি কোন ভদ্র মহিলাকে আপনার সহায়তায় চুরি করিয়া আনিতেছে ? যদি তাহা হয়, তবে আমি দ্বার খুলিব না। কখনই আমার বাড়ীতে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিব না।

কৃষ্ণা। তুমি কি ক্ষেপিয়াছ, রতনচাঁদ ! আমাকে কি এতই নীচাশয় ভাবিতেছ ?

রতন। তবে ঘটনাটা কি আমি না শুনিয়া, কখনই উঠিব না।

কৃষ্ণ। তবে শোন। কিন্তু সেই অন্ধকার-বিভীষিকাময় স্রোতে তাহাদের কষ্টই হউক, আর বিষধর সর্পেই কামড়াক—তুমি ঘটনা

শুনিয়াই তবে যাও। যদি তাঁহাদের মৃত্যু হয়, তোমার বাড়ীতেই হইবে, আমার বাড়ীতে ত আর হইবে না।

এই কথা বলিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর কপালের ঘাম মুছিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র রবীশ্বর আজি বিকালে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, বোধ হয় জান ?"

রতন। হাঁ—হাঁ, জানি বটে! ওটা তার একটা রোগ! তারপরে ?

কৃষ্ণা। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যখন বাড়ী আসিবার জন্য ছিপ গুটাইতেছিলেন,—ঠিক সেই সময়ে বিতস্তাবক্ষে একখানি নৌকা জলমগ্ন হয়। মাঝি আত্মজীবন লইয়া পরপারে পলায়ন করে,—নৌকারোহিণী একটী সুন্দরী রমণী বিতস্তাবক্ষে নিমজ্জিতা হয়। রবীশ্বর বিপন্নার উদ্ধারার্থ আত্মজীবনে অবহেলা করিয়া জলে পড়িয়া রমণীকে তীরে তুলিয়া আনেন। সেটী ধনে মানে সম্ভ্রান্ত মহিলা,—তদবস্থাতে বাড়ী আনিতে পারেন না। নিকটেই আমার আলয় জানিয়া তথায় লইয়া যান এবং ভিজা কাপড় বদ্‌লাইয়া কিছু সেবন করাইয়া সুস্থ করিয়া লইয়া আসিবেন, স্থির করেন—

রতন। তারপর—তারপর ? সে রমণীটী কে, আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি ?

কৃষ্ণা। বলিতেছি, শুনিয়া যাও। যখন ঘটনার আদ্যোপান্ত না শুনিয়া তুমি দ্বারোদ্ঘাটন করিবে না, তখন সমস্ত ঘটনাই বলিতেছি।

রতন। হাঁ, হাঁ, বলুন। সমস্ত ঘটনা না শুনিয়া, গুপ্তদ্বার খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কৃষ্ণা। রবীশ্বরের সঙ্গে ঐ রমণীকে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দুই চারিজন লোক ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সহযোগী লোকদিগকে সংবাদ দিল,—অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রায় পাঁচশত লোক আমার বাড়ী

আক্রমণের জন্য দল পাকাইল। সেই সময় আমি ঐ রমণীর গমনের জন্য যান-বাহনের বন্দোবস্ত করিতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া ঐ কাণ্ড দেখিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক আয়াস পাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই সমবেত চাষারা গোঁ ধরিল—ঐ রমণীকে খুন করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, এবং গুপ্তপথ দিয়া তাঁহাদিগকে আপনার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলাম। আমি ব্রাহ্মণ, ইহার অধিক আর কি করিতে পারি? তৎপরে আমার আসিতে যে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহার কারণ এই,—উহাদিগকে গুপ্তপথে বাহির করিয়া দিয়াছি, এমন সময় ঐ চাষারা আসিয়া আমার বাড়ী পঁহুছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা অনর্থক গোলযোগ করিও না। তাহারা চলিয়া গিয়াছে। তাহারা ঐ গুপ্তপথের বিষয় অবগত ছিল না, কাজেই এদিক্-ওদিক্ খুঁজিয়া প্রস্থান করিল। আমি তখনই বাটীর বাহির হইলে, চাষারা যদি পথে থাকে—এবং কিছু মনে করে, এই ভাবিয়া বাড়ীতে একটু অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি।

রতন। মহাশয়;—সে সুন্দরী রমণীটি কে, বলিলেন না?

কৃষ্ণা। সে রমণী—রাণী চন্দ্রা।

রতন। ওঃ! মন্ত্রী মহাশয়ের আরাধ্য দেবী রাণী চন্দ্রা! বটে! বটে! তাঁহার আজি সন্ধ্যার সময় আমার এখানে আসিবার কথা ছিল। ওঃ! এই দুর্ঘটনাতেই তিনি আসিয়া পঁহুছিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণা। আপনি যান,—আর বিলম্ব করিবেন না।

রতন। হাঁ—যাই, যাই, আপনি কি একটু বসিবেন?

কৃষ্ণা। না,—আমার কার্য্য সমাধা হইয়াছে, আমি এখনই চলিলাম।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। রতনচাঁদ ভৃত্য

সদর্য়কে ডাকিয়া, সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া, এক তাড়া চাবি হাতে করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

শত্রু কর্ত্তৃক মণিপুর প্রাসাদ আক্রান্ত হইবার সংবাদ পাইলেই মণিপুরের রাজকুল-বধূগণ রাজপুরের ভবন হইতে গুপ্তপথ দিয়া, তাঁহাদিগের গুরু কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতেন। কৃষ্ণানন্দ একদিকে যেমন শাস্ত্র-পারদর্শী, সংসারে মিশিয়াও সংসারে অনির্লিপ্ত ও পরমযোগী; অপরদিকে তদ্রূপ কঠোর সংসারী, ঘোর বিষয়ী এবং অত্যন্ত সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ। তিনি রাজকুল-ললনাগণকে নিরাপদে রাখিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতেন। এই গুপ্তপথের কথা বর্ত্তমানে আর কেহই জানিত না,—কেবল রতনচাঁদ ও কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর অবগত ছিলেন। এমন কি রবীশ্বরও ঐ পথের কথা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর, রবীশ্বর ও চন্দ্রাকে সেই অন্ধকারময় পথে নামাইয়া দিয়া, গৃহের চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলে, তাঁহারা সেই অন্ধকার পথে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিলেন। চন্দ্রা প্রথমে বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভয় যেন সাহসে পরিণত হইয়া উঠিল। সমস্ত কাযেই এইরূপ হয়। তখন ধীর-মন্থর গমনে উভয়ে গল্প করিতে করিতে চলিলেন। কিন্তু গতি অতি মন্থর—অতি মৃদু।

চন্দ্রা বলিল, "আপনার নাম কি, কি বলিয়াছিলেন?"

রবি। আমার নাম রবীশ্বর।

চন্দ্রা। (হাসিয়া) নামটী কিন্তু আপনার সুন্দর চেহারার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে কাব্যের অবমাননা করা হইয়াছে। রবি ত প্রেমের ধার ধারে না। এক কমলের প্রণয়ে উন্মত্ত—অন্য ফুল তাঁহার করে—অনাদরে, অভিমানে শুকাইয়া, ঝরিয়া, মরিয়া যায়। আপনার চন্দ্র হওয়া উচিত ছিল। সব ফুল আপনার মুখ চাহিয়া, প্রেমের কিরণ-ধারা গায় মাখিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিত।

রবি। যদি আমার নাম কেবল রবি হইত,—তবে আমি বড়ই সুখী হইতাম, বস্তুতই কমলের প্রেমে বিভোর থাকিতাম। কিন্তু নামটী তাহা নহে—রবীশ্বর।

চন্দ্রা। রবীশ্বর কাহাকে বুঝায়?

রবি। শ্রীকৃষ্ণকে।

চন্দ্রা। কেন?

রবি। তিনিই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী—তিনিই সবিতার বরেণ্য।

চন্দ্রা। তবে ঠিক্ হইয়াছে—ষোলশো গোপী তোমায় লইয়া রাসলীলা করিতে পারিবে।

রবি। আমি কি তাই? বালুকার শক্তিও রাখি না।

চন্দ্রা। ভাল, আপনার পরিচয়ে বলিয়াছেন—আপনি রায় রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র—আপনার পিতা-মাতা আছেন?

রবি। জানি না। বোধ হয়, না থাকিতে পারেন। আমার পিতৃব্য, যখন আমার দুই বৎসর বয়স, তখনই আমায় বঙ্গদেশ হইতে এদেশে আনিয়াছিলেন।

চন্দ্রা। আপনি বিবাহ করিয়াছেন?

রবি। না।

চন্দ্রা। কেন?

রবি। বিবাহ বোধ হয় করাও হইবে না।

চন্দ্রা। কেন?

রবি। বিবাহ করিয়া শান্তি পাইব না।

চন্দ্রা। বেশ্—বেশ্। আমারও ঐ মত রবীশ্বর!

রবি। কেন, আপনারও ঐ মত কেন?

চন্দ্রা। বিবাহ করিয়া আজীবন একজনের হইয়া থাকাটা কি ভাল? নিত্য নূতন জিনিষ কত ভাল লাগে! পরিবর্ত্তনের জগতে পরিবর্ত্তনই সুখ। মধ্যে মধ্যে ব্যঞ্জন বদ্‌লাইয়া না খাইলে অরুচি ধরিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে শয্যা পরিবর্ত্তন না করিলে শয়নে আনন্দ হয় না। মধ্যে মধ্যে মানুষ না বদ্‌লাইলে প্রেমে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

রবীশ্বর ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। অন্ধকারে চন্দ্রা তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু রবীশ্বর চন্দ্রার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন। বুঝিলেন, কাম-কামনাময়ী রমণীর ইন্দ্রিয়গ্রাম আজীবনই উচ্ছৃঙ্খলিত ও দুর্দ্ধর্ষ। বাসনার বহ্নি ধূ ধূ জ্বলিতেছে। প্রেম কি, শান্তি কি, ধর্ম্ম কি, কর্ম্ম কি,—কখনও বুঝিতে পারে নাই। সংসার মরুভূমে পিপাসা লইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কখনও পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর সুশীতল জলপানে আত্মাকে শীতল করিতে পারে নাই!

রবীশ্বরকে নিস্তব্ধ জানিয়া চন্দ্রা পুনরপি বলিল, "আপনি মণিপুর যান না?"

রবি। যাই বৈ কি – মধ্যে মধ্যে যাই। তবে বাড়ী থাকি না – কুবো উপত্যকায় থাকি, যখন বাড়ী আসি, তখন কালে ভদ্রে এক আধ দিন যাই।

চন্দ্রা। এই সামান্য পথ—রোজ গেলেই বা কি হয়!

রবি। আমি নির্জ্জন বড় ভালবাসি। তাই জনকোলাহলময়ী রাজধানীতে না গিয়া, বিতস্তার তীরে বসিয়া মৎস্য শিকার করিয়া থাকি।

চন্দ্রা। আপনাকে আমি একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইব। সে দিন অবশ্য অবশ্য যাবেন।

রবি। যদি তত দিন বাড়ী থাকি, অবশ্যই যাইব।

চন্দ্রা। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে রাজধানীর সৈন্য-দলের মধ্যেই রাখিয়া দিতে পারি।

রবি। প্রয়োজন হইলে আপনাকে জানাইব।

চন্দ্রা। আপনি আ'জ আমার প্রাণ দিয়াছেন,—এ উপকারের কথা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

রবি। আপনি পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া, আপনার উন্নত মনেরই পরিচয় দিতেছেন। ফলে আমি যাহা করিয়াছি—বোধ হয়, একজন অশিক্ষিত নাগাও তাহা করিত।

চন্দ্রা। আর হাঁটিতে পারিতেছি না,—পথ বড় খারাপ।

রবি। বোধ হয়, আর অধিক দূর নাই। একটু ধীরে ধীরে চলুন। যদি নামিবার সময়কার মত সিঁড়ি থাকে, আমাদের পায়ে লাগিবার সম্ভাবনা।

চন্দ্রা। তবেই ত ভয়ানক কথা।

রবি। আপনি না হয়, এখানে দাঁড়ান—আমি একটু অগ্রগামী হইয়া দেখিয়া আসি, পথ কি প্রকার?

ভীতি-ব্যঞ্জকস্বরে চন্দ্রা বলিল, "আপনি আমাকে অন্ধকারে একা রাখিয়া, যাইতে পারিবেন না।

রবি। আপনার কোন ভয় নাই।

চন্দ্রা। আমার এখন আবার বড় ভয় করিতেছে। আমরা কতদূরে আসিয়াছি—কৈ সিঁড়ি ত পাইলাম না। কেহই ত দরোজা খুলিয়া দিল না। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য—আমাদিগকে

চিরকাল অন্ধকারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য—আমাদের মরণের জন্য ত এরূপ করেন নাই ?

রবি। তিনি সে প্রকৃতির লোক নহেন। আমি তাঁহাকে ভালরূপেই জানি—তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই।

চন্দ্রা। যাহা অদৃষ্টে আছে ঘটিবে।—আপনার সঙ্গে থাকিয়া মরণেও সুখ আছে। সুন্দর পুরুষের বুকে মাথা রাখিয়া মরণে নাকি সুন্দরী রমণীগণের বাহাদুরী ও প্রেমের জয় জয়কার হয়। কিন্তু রবীশ্বর ; আমার অনেক টাকা কড়ি, অনেক বিষয় বিভব আছে। আর রূপ-যৌবন, তাও ত এখন ষোলআনাই বজায় আছে।—ও কি ? ও কিসের শব্দ ? বোধ হয়, দরোজা খোলার শব্দ হইতে পারে। শুনুন না—ও কিসের শব্দ। বুঝি আমাদের কষ্টের লাঘব হইল।

রবীশ্বর স্থিরকর্ণে সে শব্দ শুনিয়া বলিলেন, "ওঃ! উহা দরোজা খোলার শব্দ নহে। বিষধর নাগগণ পাশের গহ্বর হইতে গর্জ্জন করিতেছে।"

"ও মা ;—গেছি গো! আমায় খেয়ে ফেলেছে গো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া চন্দ্রা রবীশ্বরকে গাঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল।

রবি। ভয় নাই—এখনও ত কামড়ায় নাই। এত ভয় কেন ?

চন্দ্রা। আমায় যেন কামড়াইয়াছে।

রবি। কোথায় ?

চন্দ্রা। তা বলিতে পারি না।

রবি। তবে ?

চন্দ্রা। সর্ব্ব শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে।

রবি। কোন ভয় নাই—আমায় ছাড়িয়া দিন।

চন্দ্রা। আমি ছাড়িব না।

রবি। আপনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে,—উভয়কেই এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। তাহা হইলে, আর আমাদের যাওয়া হইবে না। সাপেও কামড়াইতে পারে।

চন্দ্রা। আপনাকে ছাড়িয়া দিলেই আমি পড়িয়া যাইব। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। আমি বড়ই শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছি।

রবীশ্বর মহা বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। সহসা চাবি খোলার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আনন্দের সহিত বলিলেন, "ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন— ঐ চাবি খোলার শব্দ হইয়াছে। চলুন একটু চলুন।"

চন্দ্রা চাবি খোলার শব্দ শুনিয়া হৃদয়ে যেন বল লাভ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সিঁড়ির পথে আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন। তখন রবীশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রা তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিলেন,—উভয়ে সিঁড়ির পথ দিয়া একটা গৃহমধ্যে উপনীত হইলেন।

সেই গৃহমধ্যে রায় রতনচাঁদ আলোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, —গৃহটী ক্ষুদ্র আয়তনের এবং তাহা জানালা পরিশূন্য।

রাণী চন্দ্রাকে দেখিবামাত্র রায় রতনচাঁদ অতীব বিনয় নম্রতা ও কৃতজ্ঞতার সহিত বলিলেন, "আপনার কষ্টের কথা শুনিয়া আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছি। এক্ষণে আসুন,—আপনার আগমনে আমার গৃহ পবিত্র হউক।"

একটা অসতী রমণীকে পিতৃব্য মহাশয় এরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিলেন, ইহাতে রবীশ্বরের মুখখানা যেন কিঞ্চিৎ পাংশুবর্ণ হইল। চন্দ্রা বলিল, "আপনার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণ আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।"

রতনচাঁদ শিরোনমন করিয়া বলিলেন, "আপনার কৃপা, আপনার কৃপা।"

সহসা রায় রতনচাঁদের পশ্চাদ্ভাগের গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। সহসা ঐ গৃহের মধ্য হইতে কে দ্রুত বেগে দৌড়িয়া আসিয়া রতনচাঁদের হস্তস্থিত আলোকটী নির্ব্বাণ করিয়া দিল। সহসা সেই পার্শ্বের গৃহ হইতে উন্মত্ত মানবের হাসির ন্যায় উচ্চ হাস্যধ্বনি এবং তৎসঙ্গে বহুলোক একত্রে উদ্দাম্ নৃত্য করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ শুনা গেল। তদনন্তর বহু লোকের ঠেলা ঠেলি, মারা-মারি, চীৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণ-বিদারক শব্দ উত্থিত হইল। তন্মধ্যে যে স্বরে প্রথমে উচ্চ হাস্য হইয়াছিল,—সেই স্বরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সহসা—মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে এই অলৌকিক কাণ্ড সংঘটন হইয়া গেল। গৃহের আলো নিবিয়া গিয়াছে,—তদুপরি, এই ভীষণ ভাব—অলৌকিক কাণ্ড, রাণী চন্দ্রা ভয়ে, বিস্ময়ে একেবারে স্থাণুবৎ অচল, নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছেন। রবীশ্বরও এই ব্যাপার দর্শনে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন।

রায় রতনচাঁদ সাহসের স্বরে অভয় বাক্যে বলিলেন, "রাণী, আপনি ভীত হইবেন না। এ ঘরে অমন হয়,—এই আমি আগে আগে যাইতেছি। আপনি তারপরে আসুন। আপনার পশ্চাতে রবীশ্বর আসিতেছে। কোন ভয় নাই। এই গৃহটা ছাড়াইলেই বাড়ীময় আলো দেখিবেন।"

কলের পুতুল যেমন চলিয়া যায়, রাণী চন্দ্রা তদ্রূপ রায় রতনচাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। রবীশ্বরও সন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া আলো দেখিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। রায় রতনচাঁদ গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া চাবি লাগাইয়া দিলেন।

রবীশ্বর অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, রায় রতনচাঁদ সুন্দরী ও প্রগল্ভা

রাণী চন্দ্রাকে লইয়া সুসজ্জীকৃত গৃহমধ্যে গমন করিলেন। চন্দ্রা আসনে উপবেশন করিলে, রায় রতনচাঁদ কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, "অধীন আজি আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বড়ই কষ্ট দিয়াছে। সে জন্য অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

চন্দ্রা তাঁহার কর্ণায়ত উজ্জ্বল চক্ষু বিস্তার করিয়া বলিলেন, "না—না, —সে জন্য আর আপনার অপরাধ কি? দুর্দ্দৈব জন্য বিপদ্-আপদ্ ঘটে বৈ কি! তবে আপনার ভাইপো না থাকিলে আমি আ'জ মারা পড়িতাম। কৈ,—তিনি কোথায় গেলেন?"

রতন। বোধ হয়, সে তাহার ঘরে চলিয়া গিয়াছে।

চন্দ্রা। একবার ডাকুন না। আমার উদ্ধারকর্ত্তার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া যাই।

রতন। সে কি! এখন কোথায় যাইবেন?

চন্দ্রা। মণিপুর।

রতন। যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন—আ'জ রাত্রি না হয়, অধীনের গৃহ পবিত্র করুন। এও ত আপনারই।

চন্দ্রা। মুচ্‌কী হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে! কিন্তু মন্ত্রীকে জানেন তো? একরাত্রি চক্ষুর আড়াল হইলে, সে পৃথিবীকে শূন্য দেখি।"

রতনচাঁদ হাসিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে প্রেমের রাজ্যের খাস প্রজা করিয়া ফেলিয়াছেন। তা আপনার মত অলোক-সামান্যা কামিনীর কাছে কোন্ পুরুষ না অনুগ্রহপ্রার্থী?"

চন্দ্রা। আমি মণিপুরে যাব, তার বন্দোবস্ত করিয়া দিন, আর আপনার ভাইপোকে একবার ডাকিয়া দিন।

রতনচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন "বেটি দেখিতেছি রবীশ্বরের চাঁদ মুখের

নিকট আত্মহারা হইয়াছে।" কিন্তু ছোঁড়াটা শূয়ার। আমাদের উপর যদি ঐরূপ নেকু-নজরটা পোড়তো—একহাত খেলিয়া নিতাম।

রতনচাঁদ বলিলেন, "যে জন্য আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, সে বিষয়টা শ্রবণ করুন। অধীনের এখানে কিছু জলযোগ করুন,—তৎপরে যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

চন্দ্রা। না। আজি আর কিছুই আহারাদি করিব না। আমি এখনই যাইব। সন্ধ্যার পরেই মণিপুর যাইবার কথা ছিল,—রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। আর আপনার কথাও আজি আর শুনিব না। নানা কারণে আমার মনটা কেমন হইয়া গিয়াছে।

রতন। আমি বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছিলাম।

চন্দ্রা। আর একদিন হইবে।

রতন। সে কবে?

চন্দ্রা। যে দিন হয়—আর আট দিন পরে, আপনি এক দিন না হয়, যাবেন।

রতন। খুব শীঘ্র না হইলে সে কায নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে আমার এবং আপনার উভয়েরই স্বার্থ জড়িত আছে।

চন্দ্রা। আপনি বুঝিতেছেন না। আমাকে পুনঃপুনঃ কেন বিরক্ত করিতেছেন। আপনার ভাইপোকে ডাকিয়া দিয়া, আপনি যানবাহনের বন্দোবস্ত করুন। আমি এখনই যাইব।

আর বিরক্ত করিলে কুফল উৎপত্তির সম্ভাবনা বিবেচনায়, রতনচাঁদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একজন ভৃত্যকে রবীশ্বরকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিয়া যানবাহনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, যৌবন কি

ফিরিয়া আসে না! তাহা হইলে রবীশ্বরের মত অদৃষ্ট হইত! মাগীর মন খারাপ আর কিছুর জন্য নহে,—মাগীর মন রবীশ্বরের যৌবনতরঙ্গেই হাবু-ডুবু খাইতেছে!—কিন্তু সে পরম বোকা! আমি তাহাকে ভালরূপেই জানি—সে ভগবদ্‌গীতার কবিতার অর্থ করিতে জানে;—কিরূপে মানুষ বশ করিয়া বিষয় করিতে হয়, টাকা করিতে হয়, তাহা জানে না। জগতে আসিয়া যে ব্যক্তি বিষয় রসে অনভিজ্ঞ, সে কি আর মানুষ!*

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভৃত্যের নিকটে পিতৃব্যের আদেশ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রবীশ্বর রাণী চন্দ্রা যে গৃহে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়াছিলেন, সেই গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রবীশ্বর গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আসুন, আসুন। আপনি এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিলেন?"

রবি। আমি আমার ঘরে গিয়াছিলাম। শরীরটা তত সুস্থ নাই।

চন্দ্রা। বসুন,—এই বিছানায় আসিয়া বসুন। আমার সহিত খানিক গল্প-গুজব করিলে, শরীর সুস্থ হইয়া যাইবে।

রবীশ্বর শয্যার প্রান্তভাগে উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্রা বলিল, "ভাল হইয়া উঠিয়া বসুন না। আমার জীবনদাতাকে আমার নিকট অত আদব-কায়দা করিয়া চলিতে হইবে না।"

রবি। এই বেশ বসিয়াছি। আপনি বসুন।

চন্দ্রা। আপনাকে কিছু অন্যমনস্ক দেখিতেছি—কারণ কি বলুন

দেখি। হাঁ—হাঁ আপনি কি আপনাদের বাড়ীর—সেই গুপ্তপথের ঘরের সেই অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া ওরূপ হইয়াছেন? ভাল. এর আগে কি ও সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানিতেন না?

রবি। না, আমি ও সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না।

চন্দ্রা। তবে বলুন, আজ আমার জন্যে আপনার অনেক কাণ্ড দেখা হ'ল। আচ্ছা,—ও কাণ্ড কি?

রবি। শপথপূর্ব্বক বলিতে পারি, ঐ ব্যাপারের আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

চন্দ্রা। বোধ হয়, উহা ভূতের উপদ্রব! আপনি ভূত মানেন?

রবি। ভূত মানি বৈ কি!

চন্দ্রা। অনেকে ভূত মানে না। আপনি মানেন কেন?

রবি। অনেকে ঈশ্বর মানে না,—সে জন্য কি আমিও মানিব না?

চন্দ্রা। যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাহা না মানাই ভাল।

রবি। ভাত খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ক্ষুধা ত দেখা যায় না। তবে ক্ষুধা মান্য করা কেন।

চন্দ্রা। ভাত খাওয়ার জন্য ইচ্ছা হয়,—সেই ইচ্ছাকে না হয়, ক্ষুধা বলা গেল,—তার অনুভবও হয়।

রবি। অনুভবও তবে স্বীকার করিতে হয়। ঈশ্বর আছেন, তাও অনুভব হয়।

চন্দ্রা। ভূত আছে—অনুভব হয়?

রবি। অনুভব কেন, সময় সময় অনেকে প্রত্যক্ষও করেন।

চন্দ্রা। মানুষ মরিলে আবার জন্মায় ত?

রবি। জন্মে বৈ কি।

চন্দ্রা। তবে ভূত হয় কে?

রবি। যে জন্মে সেই ভূত হয়,—জীবাত্মা। যত দিন না জন্মে, তত দিন ভূতও হইতে পারে।

চন্দ্রা। তবে সকলেই ভূত হইবে?

রবি। ভূত মানে গত। তবে কোন আকর্ষণে বাধ্য হইয়া জীবাত্মা ঊর্দ্ধরাজ্যে গমন করিতে না পারিলে এই মর্ত্ত্যভূমে ঘুরিয়া বেড়ায় বা মানুষকে দেখা দেয় ও নানারূপ ক্রিয়া করিয়া থাকে। আপনি কি ভূত মানেন না?

চন্দ্রা। ও মা! আমি আবার ভূত মানি না। ভূতের নামে আমি বড় ভয় খাই। আচ্ছা,—তোমাদের বাড়ীর ঐ কাণ্ড কি ভূতের বলিয়া বোধ হইল?

রবি। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

চন্দ্রা। তোমার কাকাকে জিজ্ঞাসা করিব, ভাবিয়াছিলাম,—কিন্তু তিনি সহসা ঐ রহস্যের সদুত্তর দিবেন বা সত্য বলিবেন, বলিয়া ভরসা হয় নাই, তাই বৃথা কথা পাড়িয়া সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি নাই। যাক্‌ —যা ঘটিবার ঘটিয়া গিয়াছে, আমাদের যে মুণ্ডটী ঘুরাইয়া দেয় নাই, এই পুণ্য। আপনি কবে মণিপুর গিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন?

রবি। ইহার মধ্যে একদিন যাইব।

চন্দ্রা। আচ্ছা, আমি দিন স্থির করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইব। কিন্তু ভুলিবেন না।

রবীশ্বর সে কথার বিশেষ কোন সদুত্তর প্রদান করিলেন না। অঙ্গ-ভঙ্গির দ্বারা কেবল কৃতজ্ঞতা জানাইলেন মাত্র।

এই সময় রায় রতনচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রবীশ্বর শয্যা হইতে ভূমিতলে নামিয়া দাঁড়াইলেন। রতনচাঁদ বলিলেন, “আপনার জন্য পাল্কী আসিয়াছে।”

রবীশ্বরের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ হওয়াতে চন্দ্রার যেন বিরক্তি বোধ হইল। যাহা হউক, তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং রতনচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। যাইবার সময় একবার কাম-কটাক্ষ বিক্ষেপে রবীশ্বরের প্রতি চাহিয়া গেলেন।

তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেও রবীশ্বর অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিলেন। কারণ, তাঁহার পিতৃব্য বা ভৃত্য কেহ আসিয়া গৃহ দ্বার বন্ধ না করিলে তিনি যাইতে পারেন না—তাঁহার পিতৃব্যের দলিলাদি সমস্তই এই গৃহে অবস্থিত থাকিত।

কিয়ৎক্ষণ পরে রায় রতনচাঁদ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিতেই রবীশ্বর যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। রতনচাঁদ তাঁহার গমনে বাধা দিয়া বলিলেন,—"রবি, শোন্!"

রবীশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিলেন।

রতন। ভাল, তোরা আসিতে আলো নিবান দেখিয়া কি মনে ভাব্লি? সে সম্বন্ধে রাণী চন্দ্রা কোন কথা বলিয়াছিলেন না কি?

রবি। না, তিনি এমন কিছু বলেন নাই। কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ঐ অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি?

রতন। তুই কি বোল্লি?

রবি। আমি তার কিছু জানিনা বলিলাম।

রতন। আলোটা যখন নিবিয়া যায়—তখন কি তোরা কিছু দেখিতে পাইয়াছিলি?

রবি। একটা মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম।

রতন। বটে! বটে! আচ্ছা, সেটা পুরুষের আকৃতি কি স্ত্রীলোকের আকৃতি, তাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিস্?

রবি। না,—তাহা আমিও পারি নাই, রাণীও পারেন নাই।

রতন। ওটা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই বোধ হয় না ?

রবি। তা হইতে পারে।

রতন। তোর কি বিশ্বাস হয় ?—রাণী কি বলিলেন ?

রবি। তিনিও ভূত বলিয়া ভাবিলেন,—আমিও সেই কথাই বলিলাম।

রতন। ও পথটায় মধ্যে মধ্যে ঐ রূপই হয়। সেই জন্যই ওদিকে বড় কাহাকেও যাইতে দিই নাই। তা সুড়ঙ্গ পথ গোপনীয়—আর ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব—সেটাও একটা গোপনীয় ব্যাপার সন্দেহ নাই। কথাটা যেন কোথাও প্রকাশ না হয়।

রবি। আমার দ্বারা কখনই হইবে না।

রতন। রাণীর দ্বারা বোধ হয় প্রকাশ হইতে পারে,—নয় ?

রবি। রাণীকে সে জন্য অনুরোধ করিলে বোধ হয়, নাও বলিতে পারেন।

রতন। তা, বেশ্—বেশ্। তোর সঙ্গে রাণীর খুব আলাপ পরিচয় হইয়াছে ; না হয় একবার কাল সকালে বেড়াতে বেড়াতে মণিপুর গিয়ে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে নিষেধ কোরে দিয়ে আসিস্।

রবি। আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য,—কিন্তু—তার কাছে যাইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

রতন। কেন ?

রবি। সে বেশ্যা।

রতন। ওঃ! ওকথা মুখেও আনিস্ না। মন্ত্রী মহাশয়ের অতি আদরের মেয়ে মানুষ। রাণী যদি শুনতে পান,—মাথা থাকিবে না। উহার অনুগ্রহ লাভের জন্য এ দেশের এমন লোক নাই যে, উহাকে ভয়-ভক্তি মান্য এবং উহার অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত না হয়। যদি তোর প্রতি ওঁর সুনজর পড়ে—চাই কি সেনাপতি কোরে দেবেন।

রবি। তা বটে,—

রতন। তোর ও একগুঁয়েমি ছেড়ে দে। যাবি ত?

রবি। যে আজ্ঞে যাব।

রতন। তবে যা, এখন আহার কোরে শয়ন কোর্‌গে।

রবীশ্বর চলিয়া গেলেন। আহারান্তে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাকর্ষণ হইল না,—ভাবিলেন, রাত্রি এখনও অধিক হয় নাই বলিয়া নিদ্রা আসিতেছে না—উঠিয়া বসিলেন এবং ভগবদ্গীতা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অর্থ বোধ হইল না। হৃদয়ের মধ্যে কতকগুলি চিন্তা একেবারে কিলি মিলি করিয়া বেড়াইতেছিল, সুতরাং কোন বিষয়েই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

রবীশ্বর পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। সন্ধ্যার আকাশে তারকার মত তাহার হৃদয়ে একটী একটী করিয়া অনেক বিষয়ের চিন্তা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমেই আলোক নির্ব্বাণ, বীভৎস চীৎকার ও ক্রন্দনের বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন.—ব্যাপারটা কি? উহা কি বাস্তবিকই ভৌতিক কাণ্ড! যদি ভৌতিক কাণ্ড হইবে, তাহা গোপন করিবার জন্য তাঁহার পিতৃব্যের এত চেষ্টা কেন? বরং উহার যাহাতে শান্তি হইতে পারে, তদ্বিষয়েই পরামর্শ করিতেন। তবে কি? কোন বন্দী হইবে! বোধ হয়, একজন উন্মত্ত বন্দী—অপর লোকগুলি তাহার প্রহরী হইবে। যদি তাহাই হইবে—তবে ঐ প্রকারে তাহাদিগকে গোপন ভাবে রাখিয়াই বা প্রয়োজন কি? বাল্যকাল হইতেই রবীশ্বর বাড়ীর ঐ দিকটা, ঐরূপ অব্যবহার্য্যরূপে থাকিতে দেখিয়া আসিতেছেন।—তিনি এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার মন ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত হইতে চাহে না। তিনি যতই ঐ চিন্তা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে চাহেন, ততই যেন তাহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিতে

চাহে। তখন ঝটিতি নিদ্রাকর্ষণের জন্য গৃহে দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু তথাপিও তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তখন বাতাস লাগাইয়া শরীর শীতল করিবার অভিপ্রায়ে উন্মুক্ত বাতায়নসমীপে গিয়া উপবেশন করিলেন।

রাত্রি তখন বোধ হয়, দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। বর্ষার আকাশে চারিদিক্ ছড়াইয়া যে, খণ্ড বিখণ্ড, চূর্ণ বিচূর্ণ মেঘমালা বিরাজ করিতেছিল, এতক্ষণে তাহারা জমাট পাকাইয়া সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু মেঘ গাঢ় নহে—তরল। তথাপিও রাত্রি অন্ধকারময়ী। গর্জ্জনবিরত শ্বেত কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি নক্ষত্রমালা তাহাদের ক্ষীণ কিরণ লইয়া প্রাণপণে জগতের অন্ধকার বিদূরিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষুদ্রের চেষ্টাতেও কিছু কাজ হয়, তাহাদের চেষ্টাতেও একটু একটু অস্পষ্ট আলোক দেখা যাইতে লাগিল। রবীশ্বর গবাক্ষ-সান্নিধ্যে উপবেশন করিয়া বাটীর সেই পরিত্যক্ত অংশের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। জীবনে কখন সে দিকে চাহিবার জন্য কৌতূহল জন্মে নাই—আজি যেন কি একটা অজ্ঞান তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য প্রাণটা সেইদিকে ধাবিত হইতেছিল।

সহসা সেই জনহীন পরিত্যক্ত অংশের একটী রুদ্ধ গৃহ হইতে অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মি আসিয়া রবীশ্বরের চক্ষুতে আপতিত হইল। রবীশ্বর চমকিয়া উঠিলেন,—এ কি চক্ষুর ভ্রম! ওদিকে ত জন-মানব নাই। তিনি ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, দ্বারোদ্‌ঘাটনের শব্দ শুনিতে পাইয়া রবীশ্বর আরও নিস্তব্ধ—আরও স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। এইবার স্পষ্ট—স্পষ্টতর রূপে দেখিতে পাইলেন, দুই জন মনুষ্য সেই গৃহের শিকলী টানিয়া দিয়া, চাবি লাগাইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পাশের পথ দিয়া চলিয়া গেল। একে

অন্ধকার—তাহাতে একটু দূরের পথ,—আবার মানুষ দুইটীর সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, তাহাতেই রবীশ্বর মনুষ্য দুইটীকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, একটী মনুষ্যের পৃষ্ঠদেশে একটী থলিয়া,—থলিয়ায় কি বোঝাই। রবীশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন।

প্রথমে ভাবিলেন, দস্যুগণ বোধ হয়, পিতৃব্য মহাশয়ের গুপ্তধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। পার্শ্বস্থ দেওয়াল-বিলম্বিত তরবারির দিকে চাহিলেন। আবার ভাবিলেন, গুপ্তধন পরিত্যক্ত অংশে থাকিবে কেন? —আমরা গুপ্তপথের ব্যাপার জানিতে পারিয়াছি ভাবিয়া, তাই কি কাকা মহাশয় তাঁহার গুপ্তকাণ্ড স্থানান্তরিত করিতেছেন?—যদি তাই হয়, তবে আমার উহাদের সম্মুখীন হওয়া নিতান্ত অন্যায়। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা হইতেছে না।

রবীশ্বর ধীরে ধীরে দরোজার কীলক খুলিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহের বাহির হইলেন,—বারেন্দা বহিয়া একটু যাইতেই দেখেন, সেই দুইটী মনুষ্য ঘুরিয়া উদ্যানের দিকে গেল। তিনি দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদে সেই দিকে গিয়া, অন্ধকারে একটা থামের সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। অন্ধকারে—মেঘাকীর্ণ নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, সেই দুইটী লোক যথার্থই উদ্যানের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। একজন উদ্যানের চাবি খুলিয়া ফেলিল। যাহার পৃষ্ঠে থলিয়া ছিল, তখন সেই অগ্রে বাগানে প্রবেশ করিল, তৎপশ্চাৎ যে লোক চাবি খুলিয়াছিল,—সেও প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে চিনিবার জন্য রবীশ্বর একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—কিন্তু কৃষ্ণবস্ত্রে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকাতে চিনিতে পারিলেন না।

রবীশ্বর একবার মনে ভাবিলেন, উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরিয়া

ফেলি। আবার ভাবিলেন, যদি উহার মধ্যে কাকা থাকেন,—তবে অনিষ্ট হইবে। শেষে স্থির করিলেন, লোক দুইটী বাহির হইয়া কোথায় যায়, দেখিয়া তাহার পরে যাহা হয় করা যাইবে। স্তব্ধশ্বাসে থামের সঙ্গে মিশিয়া তিনি অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কিন্তু তাহারা আর ফিরে না।

প্রায় ছয় দণ্ড পরে লোক দুইটী বাহির হইল,—উদ্যানের দরোজায় চাবি দিয়া রায় রতনচাঁদের শয়ন-প্রকোষ্ঠাভিমুখে চলিল। যাহার পৃষ্ঠে থলিয়া ছিল,—সে এখন শূন্যপৃষ্ঠে, থলিয়া আর নাই। এবার নিকট দিয়া যাওয়ায়, রবীশ্বর তাহাদের দেহায়তনে কতকটা বুঝিলেন, যিনি দীর্ঘাকার, তিনি তাঁহার পিতৃব্য এবং যে খর্ব্বাকৃতি, সে ভৃত্য সদয়।

এতৎসম্বন্ধে আর অধিক অনুসন্ধান লওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, রবীশ্বর ধীরে ধীরে নিজ শয়নকক্ষে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিলেন। আকাশের মেঘ আরও তাল পাকাইয়া কয়েকবার গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ আরম্ভ করিল। জলীয় বাতাসে রবীশ্বরের শরীর শীতল হইল। সকল চিন্তা বিদূরিত হইয়া গেল; তাঁহার হৃদয়ে কমলের অনিন্দ্য সুন্দর মুখকান্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহাই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাকালে রবীশ্বর অনেক দুঃখও দর্শন করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু যামিনীর শেষভাগে নিদ্রাগত হওয়ায়, রবীশ্বরের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আকাশে তরুণ-তপন উদিত হইয়া, তাহার লোহিত-রশ্মি উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া রবীশ্বরের শয্যায় আসিয়া পতিত হইয়াছে। পাখীগণ গৃহছাদে, প্রাঙ্গণে ও কুসুমিত

শাখাগ্রে বসিয়া গা খুঁটিতেছে, মধুর স্বরে ডাকাডাকি করিতেছে। দাস-দাসীগণ তাহাদের আপন আপন কাযকর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিয়াছে।

রায় রতনচাঁদ অনেকক্ষণ হইল, শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "রবীশ্বরের কি ঘুম ভাঙ্গে নাই? যদি সে না উঠিয়া থাকে, তাহাকে ডাকিয়া দে—আর মণিপুর যাইবার কথা ছিল,—সে কথা তাহাকে স্মরণ করিয়া দিয়া আয়।"

ভৃত্য আজ্ঞামাত্র রবীশ্বরের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে দরোজা বন্ধ দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, রবীশ্বরের এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই,—তখন দরোজার কড়া নাড়িতে লাগিল।

শব্দ পাইয়া রবীশ্বর জাগিয়া উঠিলেন; চাহিয়া দেখিলেন,—সূর্য্যরশ্মি তাঁহার সমস্ত গৃহে পড়িয়া শয্যাদি প্লাবিত করিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরোজা খুলিয়া দিলেন। ভৃত্য অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার কাকা মহাশয়, আপনাকে মণিপুর যাইবার কথা স্মরণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।"

রবি। হাঁ,—আমি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। তিনি এক্ষণে কি করিতেছেন?

ভৃত্য। তাঁহার ঘরে বসিয়া তামাকু খাইতেছেন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। রবীশ্বর ভাবিলেন, রাত্রিশেষে নিদ্রা হওয়ায় উঠিতে আমার এত বিলম্ব হইয়াছে,—কাকা যদি সেই সকল ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহারও উঠিতে বিলম্ব ঘটিতে পারিত! তবে কি তিনি তাহার মধ্যে ছিলেন না? ইহাও কি ভৌতিক কাণ্ড! উদ্যান মধ্যে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে তাঁহার বড় কৌতূহল জন্মিল।

রবীশ্বর প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া, শৌচাদিক্রিয়া সমাধানান্তে পূতবস্ত্র পরিধান করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন, এবং প্রত্যহ এক অধ্যায়

শ্রীশ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে যে সময় লিপ্ত থাকিতেন,—সময় না পাইলে, কয়েক শ্লোক মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, অন্ততঃ তাহা পাঠ করিতেন। এক্ষণে সে সমুদয় কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া পিতৃব্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাত্রিতে ভালরূপে নিদ্রা না হওয়ায় এবং কতকগুলি চিন্তা ও দুঃস্বপ্ন-দর্শনে রবীশ্বরের আয়ত লোচন-যুগল রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল,—মুখশ্রী ম্লান পাংশু হইয়াছিল। তদ্দর্শনে রায় রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রবি, কাল রাত্রে কি তুই ঘুমাস্‌নি ?"

রবীশ্বর বড় বিপদে পড়িলেন। পিতৃব্যের সহিত মিথ্যা কথা বলাতেও মহাপাতক,—আবার সত্য কথা বলিলে, তাহার কাকা যদি উদ্যান-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, তবে রহস্য-প্রকাশ-আশঙ্কায় রবীশ্বরকে বিপদেও ফেলিতে পারেন। রায় রতনচাঁদের স্বভাব, রবীশ্বর ভালরূপেই অবগত ছিলেন। তিনি স্বার্থের জন্য না করিতে পারেন, জগতে এমন কার্য্য কিছুই নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "হাঁ—নিদ্রার একটু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।"

রতন। কেন ?

রবীশ্বর মুখ নত করিয়া রহিলেন। তখন রতনচাঁদ নিজেই তাহার কারণ স্থির করিয়া লইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, মাগীর অমন চাঁদপানা মুখ—অমন হাব ভাব, যুবক রবীশ্বর ভুলিতে পারে নাই। বাসনা-অসিদ্ধ-বিধায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রূপের আগুনেই পুড়িয়াছে। বলিলেন, "মণিপুর যাইবার কথা ছিল। এখনই যাইবে কি ?"

রবি। আপনার প্রয়োজন থাকলে, যাইব।

রতনচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, বেটা কি চালাক ! কতক্ষণে গিয়া সে চাঁদমুখ দর্শন করিবে, ইহাই জপমালা—তবু আমার কাযের উপর

নির্ভর! প্রকাশ্যে বলিলেন, "হাঁ, এখনই যাও। আমি একখানা পত্র লিখিয়া দিব, তাহা রাণী চন্দ্রাকে দিবে। পত্রখানা খুব আঁটা থাকিবে,—তুমি কদাচ তাহা পড়িও না; এবং তাহাতে কি লেখা আছে, তাহাও রাণী চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

রবি। যে আজ্ঞা।

রতন। তবে সহিসকে ঘোঁড়া আনিতে বলিয়া পাঠাই?

রবি। হাঁ। আমি ততক্ষণ কতকগুলি ফুল পসন্দ করিয়া তুলাইয়া আনি। সেখানে যাইতে হইলে, ভাল ভাল ফুল উপহার লইয়া গেলে, তিনি সুখী হইবেন।

রতনচাঁদ মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ঐ ত রোগের গোড়া!" কিন্তু প্রকাশ্যে আর কিছু বলিলেন না।

রবীশ্বর ধীর পাদবিক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ কজেইমালী, বসিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র কুসুম-বৃক্ষে কেয়ারি করিতেছিল। রবীশ্বর সেখানে পঁহুছিলে, সে অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রবীশ্বর বলিলেন, "বাঃ! গাছগুলি বড় সুন্দর ভাবেই সাজাইয়াছ।"

কজেই। আরও সুন্দর হইয়াছিল,—কিন্তু গাছগুলিকে কাহারা দলাইয়া, চটকাইয়া হতশ্রী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

রবি। সত্য নাকি? কবে এমন করিল?

কজেই। বোধ হয় কা'ল রাত্রে। আমরা কায করিয়া সন্ধ্যার সময় বাগান হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলাম।

রবি। তাই ত! এমন কাজ কে করিল? বোধ হয়, কোন গুপ্ত প্রণয়িযুগল হইতে পারে।

কজেই। না, মহাশয়! তাহা হইলে, তাহারা কোদাল-খোন্তা কি করিবে?

রবি। কোদাল-খোন্তা! তোদের কোদাল-খোন্তা কি চুরি গিয়াছে?

কজেই। না, চুরি যায় নাই। তবে, তাহারা ব্যবহার করিয়াছিল। আমরা কায সারিয়া, সন্ধ্যার সময় অস্ত্র-শস্ত্র সমুদয়ই ধুইয়া রাখিয়া যাই। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, তাহাদের গায় কাঁচামাটি লাগিয়া রহিয়াছে। আর সব ওলট পালট হইয়া রহিয়াছে।

রবি। তবে বোধ হয়, ঐ সকল অস্ত্র দিয়া, কোন ফল বা ফুলের গাছ চুরি করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কজেই। না, মহাশয়! তাহাও কিছু লয় নাই; আমি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছি। একটি পাতাও চুরি যায় নাই।

রবি। তবে বোধ হয়, বাহির হইতে কোন জিনিষ আনিয়া বাগানের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কজেই। সম্ভব।

রবি। সন্ধান করিয়া দেখিয়াছ কি?

কজেই। দেখিয়াছি বৈ কি,—কিন্তু খুঁজিয়া পাই নাই। যদি তাহা করিয়া থাকে, বেমালুম করিয়াছে। আরও কাল রাত্রে জল হওয়ায়, বাগানে কোপান জমী সব এক হইয়া গিয়াছে।

রবি। আচ্ছা, সন্ধান করিবার চেষ্টা কর। আজ না হয়, দু'দিন পরেও ত সন্ধান পাইবে!

কজেই। যে আজ্ঞা।

রবি। কতকগুলি ভাল ফুল তুলিয়া, দুইটা ডালা সাজাইয়া দাও—মণিপুর যাবে!

কজেইমালী একজন বালককে লইয়া ফুল তুলিতে গেল। রবীশ্বর পদচারণা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতে লাগিলেন, যখন মালীর খোন্তা-কোদালে মাটি লাগিয়াছে,—সে সকল স্থানভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে—

কোয়ারি করা বৃক্ষশ্রেণী মনুষ্য-পদ-দলিত হইয়াছে, তখনই নিশ্চয়ই রাত্রি দৃষ্ট মনুষ্য দুইজন, সেই থলিয়ায় করিয়া কোন দ্রব্য আনিয়া এই বাগানের কোন গুপ্ত স্থানে তাহা পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহারা কে? দস্যু কখনই নহে। দস্যু হইলে, এই বাড়ী হইতে কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়া, আবার এই বাড়ীতেই পুঁতিয়া রাখিয়া যাইবে কেন? তবে কি কাকা, সদয়কে সঙ্গে করিয়া,এই বাগানে কোন গুপ্তধন্ পুঁতিয়া রাখিয়া গেলেন? কিন্তু বাড়ীতে এত নিভৃত যায়গা থাকিতে, এখানে পুঁতিবেন কি জন্য? বিশেষতঃ সদয় সঙ্গে ছিল,—গুপ্তধন তাহার সাক্ষাতে বাহিরে আনিয়া পুঁতিয়া রাখিবেন,—সে যদি একদিন রাত্রে তাহা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইতেই পারে না। কিন্তু তবে কি? রবীশ্বর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে মালী, প্রায় দুই ঝুড়ি সদ্য প্রস্ফুট সুবাস-সুরভি-পূরিত পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া, তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি সে গুলি তাঁহার কাকার নিকটে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন এবং পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, পিতৃব্য সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ঘোড়া প্রস্তুত ছিল,—রতনচাঁদের নিকট হইতে রৌপ্যবাক্সে আঁটা পত্র লইয়া অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মণিপুর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। একজন ভৃত্য বাঁকে করিয়া ফুল লইয়া, তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রবীশ্বর যখন মণিপুরে উপস্থিত হইলেন, তখন দিবা দ্বিপ্রহর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। রবীশ্বর স্থির করিলেন,—এখনই রাণী চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। একটু বেলা পড়িলে—আহারাদির

সময় উত্তীর্ণ হইলে—তখন সাক্ষাৎ করিব। তাহাই হইল। রবীশ্বর বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে, রাণী চন্দ্রার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সুরভিত কুসুমের সহিত পিতৃব্য প্রদত্ত রৌপ্যকৌটা উপহার প্রদান করিলেন।

কাম-কামনা-বিদগ্ধ-হৃদয়া, বিলাস-বাসনা-বিক্ষোভিত-প্রাণা চন্দ্রা, রবীশ্বরকে তাহার অতৃপ্ত লালসার অদম্য কামনার ভিতর আজি দুই দিন ধরিয়া বসাইয়াছে—এত শীঘ্র তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী মনে মনে গৌরবের হাসি হাসিল। মনে মনে স্থির করিল—যে কারণে মন্ত্রী মরিয়াছে—যে কারণে একটু কটাক্ষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই মারিতে পারি,—সেই কারণেই রবীশ্বর মজিয়াছে,—মজিয়াছে বলিয়াই, একটা ছুঁতা করিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছে। চন্দ্রা তাহার রূপ-সাগরে বাণ ডাকাইয়া লহর-লীলা তুলিয়া দিল। হাব-ভাবে, কাম-কটাক্ষে হাসি-চাহনিতে রবীশ্বরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রবীশ্বর অচল—অটল!

চন্দ্রা স্পষ্ট বলিল,—"আমি একটা গান গাহিব, তুমি বাজাইতে জান?

রবীশ্বর লজ্জাবনত বদনে বলিলেন,—"আমি বাজাইতে জানি না। অনুমতি হইলে, চলিয়া যাইতে পারি।"

চন্দ্রা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল,—"কেন, ভয় করিতেছে?"

রবি। ভয় করিতেছে না,—কিন্তু ভদ্রতার বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া লজ্জা করিতেছে।

চন্দ্রা। বুঝিয়াছি। মন্ত্রী দেশের রাজার রাজা, পাছে তিনি মনে কিছু করেন,—কেমন?

রবি। হাঁ,—তিনি আমাকে অভদ্র ভাবিতে পারেন।

চন্দ্রা। না, রবীশ্বর;—সে ভয় করিও না। মন্ত্রী তেমন নহেন।

আমি যদি তোমাকে ভালবাসি—তিনি কখনই তোমার উপরে ক্রুদ্ধ হইবেন না।

রবীশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি যদি তাঁহার' প্রণয়-উদ্যানের সুবাসটুকু সরাইয়া লই ?

চন্দ্রা। তবু তিনি কিছু বলিবেন না।

রবি। তবে তিনি আপনাকে ভালবাসেন না।

চন্দ্রা। ঠিক বলিয়াছ রবীশ্বর ;—যথার্থই মন্ত্রী আমায় ভালবাসে না। ভালবাসিতে সে জানে না,—

রবি। আপনি তাঁহাকে ভালবাসেন ?

চন্দ্রা। আমি ?—আমি তাহাকে একটুকুও ভালবাসি না।

রবি। কেন ?

চন্দ্রা। কেন,—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ ? তাহার রূপ নাই,—গুণ নাই,—সখ নাই,—বয়স নাই ! কি জন্য ভালবাসিব ?

রবি। ভালবাসা কি বাহিরের ?

চন্দ্রা। কোথাকার ?

রবি। উহা অধ্যাত্ম জগতের।

চন্দ্রা। ঐ ত তোমাদের ভুল ;—আমি বুঝি, ভালবাসা সখের জিনিষের একটা অশরীরী পদার্থ। নিত্য নূতন,—নিত্য রকম রকম হইলে ভাল হয়।

দর্পণে যেমন তৎসম্মুখস্থ পদার্থের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখা যায়, রবীশ্বরও তদ্রূপ চন্দ্রার হৃদয় দর্শন করিলেন। তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল, ধমনীর ক্রিয়াও বুঝি একটু দ্রুততর স্পন্দিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলেন,—জগতে সাধনারই জয় ! মানুষ আপনার হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে লইয়া যেরূপ সাধনা করে, সেইরূপই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। চন্দ্রার হৃদয় দানবী-

দৃপ্তির রশ্মিছটায় পরিপূর্ণ! তৎপরে স্থির করিলেন, বর্ত্তমানে চন্দ্রার মনের মত কথা বলিয়াই প্রস্থান করা আমার পক্ষে যুক্তি সঙ্গত। বাঘিনী চন্দ্রা, আমাকে তাহার কবলে পাইয়াছে—বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইলে, আমার কণ্ঠরক্ত পান করিতে পারে।

তখন রবীশ্বর মৃদু হাস্য সহকারে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার সৌন্দর্য্য দেশ বিখ্যাত। পূর্ণিমার দিন ষোলকলার [illegible] নীলনভে চাঁদ উঠিলে একান্তে বসিয়া তাহা দেখিবার সাধ কাহার [illegible]?"

[illegible]র রাঙ্গা অধরে বৈদ্যুতিক বিকাশ হইল। ফুলধনুর মত ভ্রূ দুইখানি কুঞ্চিত করিয়া. দীর্ঘায়ত চক্ষুর বিলোলকটাক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া বলিল, "তাতে বাধা কি?"

রবি। অদৃষ্ট কিছু সকলের সমান নহে! কপাল-গুণে বসন্তের নির্ম্মল পৌর্ণমাসী-রজনীতেও মেঘের উদয় হয়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতও হইতে পারে. কাযেই বাসনা থাকিলেও চাপিয়া যাইতে হয়।

চন্দ্রা। তোমার কোন ভয় নাই—রবীশ্বর! তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিতে পার। মন্ত্রী আমার পদানত,—আমি তাহাকে যাহা বলি, সে তাহাই করে। আমি তাহাকে যে বিষয়ে যেমন বুঝাই, সে তাহাই বুঝে।

রবি। অন্য বিষয়ে হইতে পারে—কিন্তু প্রণয়ে ভাগ দিতে সকলেই নারাজ!

চন্দ্রা। সে ততটা বুঝে না।

রবি। সেরূপ কখনও ঘটে নাই।

চন্দ্রা। আমি তোমার উপকারের কথা কা'ল আসিয়াই তাহাকে বলিয়াছি। সেই পরিচয়ই দিব এবং বলিব—আমি সেই জন্যই তোমাকে আনাইয়াছি।

রবি। আমার কাকার কাযের জন্যই আসিয়াছি—হইতে পারে, সে কায খুব গোপনীয়। আমি এখানে থাকিলে, তাহার ব্যাঘাতও ঘটিতে পারে। আমার ইচ্ছা,—আমি আ'জ চলিয়া যাই,—সময়মতে আপনি মন্ত্রী মহাশয়কে বলিয়া, এক দিন আমাকে নিমন্ত্রণ করিবেন; প্রথমে, তাঁহার সমক্ষে ঐরূপে আগমন করা যাইবে।

চন্দ্রার হৃদয় থামিতে চাহে না। সে বিষাক্ত হৃদয়-তরঙ্গে একবার আবেগ-উদ্বেল হইলে, তাহার সাধ্য নাই যে, তাহা স্থগিত রাখে। কিন্তু রবীশ্বরের পুনঃপুনঃ অনুরোধে, অগত্যা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইল। তখন রবীশ্বর, তাহার নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

যে লোকটা ফুল লইয়া আসিয়াছিল, সে ফুল পঁহুছিয়া দিয়াই প্রস্থান করিয়াছিল,—অশ্বটা একটা বৃক্ষে বাঁধা ছিল। রবীশ্বর অশ্ববল্গা খুলিয়া লইয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক মৃদুমন্থর গমনে আবাসাভিমুখে চলিলেন।

রবীশ্বর যখন তাহাদের গ্রামোপান্তে পঁহুছিলেন, তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না। দিনকর উন্নতশীর্ষ পাহাড়শ্রেণীর উপর দিয়া তাঁহার রাঙ্গা-রশ্মিটুকু লইয়া, ধীরে ধীরে পশ্চিমসাগর-তলে ডুবিয়া পড়িতেছিলেন। পুষ্পভারাবনত পাদপ-শীর্ষে পক্ষিকুল পক্ষবিধূনন করিতে করিতে বিদায়ী সঙ্গীত গাহিতেছিল। সন্ধ্যার আকাশে ধূসর মেঘগুলার রক্তরশ্মি লাগিয়া মহান্ ভাবের চিত্র আঁকিয়া দেখাইতেছিল;—আর বিতস্তা-বক্ষে সেই ছবি পড়িয়া, নীলজলে খেলা করিতেছিল।

অশ্বারোহণে—ধীর মন্থর গমনে, সন্ধ্যা-দিবসের মিলন-ম্লান গীত শুনিতে শুনিতে রবীশ্বর বিতস্তা-তীর দিয়া গ্রামাভিমুখে যাইতেছিলেন।

যে পথে গমন করিলে শীঘ্র রতনচাঁদের বাড়ী উপস্থিত হওয়া যায়, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, রবীশ্বর ঘুরিয়া—নদী-তীর দিয়াই গমন

করিতে লাগিলেন। তাহার অন্য কারণ কিছুই নাই—নদী-তীরের পথ দিয়া গমন করিলে, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ীর নিকট দিয়া যাওয়া যায়। কিন্তু সেই পথ দিয়া গেলেই কি কমলের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! না হউক,—তথাপি মানুষের বাঞ্ছিত-দর্শনের এমন একটা পিপাসা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

রবীশ্বর কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাটীর সন্নিকটস্থ নদীসৈকতে উপস্থিত হইয়া, একবার দূরদৃষ্টিতে তাঁহার বাটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই—সন্ধ্যার ম্লান-পাংশু আচ্ছাদনে দিগন্ত আচ্ছাদিত—সাঁজের আধ-আঁধারে বাড়ীখানি যেন নিস্তব্ধ। রবীশ্বর অশ্বের গতি স্থগিত করিয়া, একটুখানি সেখানে দাঁড়াইয়া কি দেখিলেন,—বুঝি সেই বাড়ীর কঠিন ইট কাঠগুলা—বাড়ীর নির্জীব গাছপালাগুলা, কমলের হইয়া, স্নেহ-প্রেমের শতবাহু সৃজন করিয়া, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। রবীশ্বর সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া, যখন কমলের দর্শনের কোন সম্ভাবনাই বুঝিতে পারিলেন না,—তখন ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইয়া নিজালয় মুখে চলিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই নদী-তীরস্থ পথের উপরে একটী রমণীমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের ধমনীগুলা একবার অতি দ্রুততর বেগে নাচিয়া উঠিল। এ কে? কমল কি?—রবীশ্বরের চক্ষু দিয়া আগুনের ঝলক বহিয়া গেল। ও কে? একজন বলবান্ পুরুষ, ঐ রমণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছে—উহাকে লইয়া যাইবার জন্য বল প্রয়োগ করিতেছে। নদী-তীরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী তাহাদিগকে লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রমণী যদি কমল হয়!

চক্ষুর পলক ফেলিতে যতটুকু সময় অতীত হয়, ততটুকু সময়ের মধ্যে অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, বিদ্যুদ্গতিতে রবীশ্বর ছুটিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইলেন। কি সর্ব্বনাশ!—এ ত সত্যই কমল!

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কমলকে ধরিয়া লইতেছে,—রবীশ্বর তাহাকেও চিনিতে পারিলেন, সে একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ।

সৈনিক পুরুষটা কমলের মৃণালনিভ বাহু দুইটী দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিয়া নৌকার দিকে টানিয়া লইতেছে,—কমল বলপ্রয়োগে তাহাতে বাধা দিতেছে, কিন্তু চীৎকার করিতে পারিতেছে না—পাষণ্ড অগ্রেই অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সৈনিক পুরুষের বলের নিকট রমণীর বল কতক্ষণ? কমল দুর্ব্বল হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, তথাপিও বলপ্রয়োগে গড়াগড়ি দিবার চেষ্টা করিতেছে,—পাপাত্মা সৈনিক-পুরুষ, তাহাকে পাথরকোলা করিয়া তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। আর বিলম্ব নাই;—কোমলাঙ্গী রমণীর শক্তি বিপর্য্যস্ত করিয়া, দানবী-বলে পুরুষটী তাহাকে তুলিয়া লইবে, এমন সময় রবীশ্বর তথায় উপস্থিত হইয়া, পশ্চাদ্ভাগ হইতে সৈনিকের পৃষ্ঠদেশে এক ভীম পদাঘাত করিলেন।

অতর্কিত প্রহারে ব্যথিত হইয়া সৈনিক পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। রবীশ্বরকে চিনিতে পারিয়া বলিল,—"রবীশ্বর, তুমি? আমার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলে? আমাকে কি তুমি চেন না?"

রোষকষায়িত লোচনে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রবীশ্বর বলিলেন "তোমায় চিনিব না কেন,—তুমি সেনাপতির সহকারী!"

সৈনিক। তবে কোন্ সাহসে আমার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলে?

রবি। তুমি কোন্ সাহসে একজন ভদ্র কুলকামিনীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে?

সৈনিক। জান,—কোন নিম্নপদস্থ সৈনিক, উচ্চপদস্থ সৈনিকের অবাধ্য হইলে তাহার কি দণ্ড—তাহার অবমাননা করিলে কি দণ্ড—তাহার গায়ে হাত তুলিলে কি দণ্ড?

রবি। বিচারকের যেমন অভিরুচি।

সৈনিক। মৃত্যু দণ্ড।

রবি। না হয়, তাহাই হইবে।

সৈনিক। কোন্ সাহসে আমার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিলে? কা'ল, সূর্য্যাস্ত না হইতে তোমার দেহ শৃগাল-কুকুরে খাইবে।

রবি। দেশে বিচারক থাকিলে তাহা হইবে না। তুমি একটী কুললনার সর্ব্বনাশ করিতেছিলে, আমি তোমার কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পদাঘাত করিয়াছি, ইহাতে দোষ হয় না।

সৈনিক। বিচার!—বিচারের আশা করিতেছ? যিনি রাজার রাজা—বিচারকের বিচারক, সেই মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে—তাঁহারই বিলাস-ভোগার্থে এই যুবতীকে হরণ করিতে আসিয়াছি;—মূঢ়, তুমি কোথায় সুবিচার পাইবে? এখনও কামিনীকে উদ্ধার করিবার আশা পরিত্যাগ কর—দণ্ড যাহাতে লঘু হয়, তাহা করাইব।

রবি। দেহে একবিন্দু রক্ত থাকিতেও কমলকে পরিত্যাগ করিব না।

সৈনিক। আমার সঙ্গে কি করিয়া পারিবে? আমার নিকট পিস্তল আছে।

রবীশ্বর আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদানে সৈনিককে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে ভূতলশায়ী করিলেন, এবং তাহার বুকের উপরে বসিয়া তাহার গাত্রবস্ত্রের মধ্য হইতে পিস্তল ও ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া, বিতস্তার জলে টানিয়া ফেলিয়া দিলেন।

সৈনিকও বলপ্রকাশ করিতে লাগিলেন,—তখন উভয়ে ভারি একটা মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল। কখনও সৈনিক উপরে রবীশ্বর নিম্নে, কখনও

রবীশ্বর উপরে সৈনিক নিম্নে পতিত হইতে লাগিল,—ব্যাধ-কর-বিমুক্তা হরিণীর ন্যায়, কমল সৈনিকের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া, মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া, দূরে সরিয়া গিয়া,—প্রাণতম রবীশ্বরকে সহসা আগমন করিয়া তাহারই জন্য বিপন্ন হইতে দেখিয়া, সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তাহার আশা—চীৎকার শুনিয়া, গ্রাম্যলোক তথায় উপস্থিত হইয়া, রবীশ্বরের সাহায্য করিবে।

তাহাকে চীৎকার করিতে শুনিয়া, একটু অবসর প্রাপ্ত হইয়া, ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে সৈনিক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিল। রবীশ্বর উঠিয়া গা ঝাড়িলেন।

অদূরে কমল দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল,—রবীশ্বর তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই, আর চীৎকার করিতে হইবে না। সৈনিক পলায়ন করিয়াছে।"

কম্পিত কণ্ঠে কমল বলিল, "তুমি আসিয়াছিলে, তাই আমি বাঁচিয়া গেলাম, কিন্তু তোমার কথা কি শুনিলাম?"

রবীশ্বর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার কি কথা শুনিলে কমল?"

কমল। কেন,—ঐ যে সৈনিক বলিল, তাহাকে অবমাননা করার জন্য তোমার কি দণ্ড!

রবি। তার জন্য তুমি ভয় করিও না, কমল! কর্ম্মই মানুষকে ফলদান করিয়া থাকে, কেহ ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও সুখী বা দুঃখী করিতে পারে না।

কমল। তাহা মানিলাম—কিন্তু যাহার হাতে বিচার, সেই যে প্রয়োক্তা। তাও ত শুনলে?

রবি। সে ভাবনা পরিত্যাগ কর। তোমাকে রাক্ষসের কবল

হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়া যে আনন্দ অনুভব করিতে পারিয়াছি—সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারিলেও আমার সে আনন্দ হইত না।

কমল। কিন্তু ভাল হয় নাই,—যদি তোমার কোন বিপদ হয়! না হয়, আমার প্রাণই যাইত—আমার ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া কি করিব?

রবি। প্রাণের প্রয়োজন সকলেরই। জীবনই সাধনার ক্ষেত্র।

কমল। তুমি কোথায় গিয়াছিলে,—এ সময় এখানে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে?

রবীশ্বর পূর্ব্বদিনের ঘটনা হইতে, আর বর্ত্তমান সময়ের ঘটনা পর্য্যন্ত, সমস্তই কমলের নিকট সংক্ষেপে বলিলেন। কমল বলিল, "তবে এখন আমাদের বাড়ী চল।"

রবি। তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিব,—কিন্তু তোমাদের বাড়ীর মধ্যে যাইব না।

কমল। কেন?

রবি। আমাকে তোমার সহিত আনুগত্য করিতে দেখিলে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর যেন বিরক্ত হয়েন।

কমল রবীশ্বরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিল, কোন কথা বলিল না। তাহার মুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া মাখিয়া উঠিল। রবীশ্বর বলিল, "তুমি কি ভাবিতেছ"

"কিছু না। এখন তবে যাই"—এই কথা বলিয়া তড়িদ্-গতিতে কমল তাহাদের বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রবীশ্বর বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ঘোড়াটা ছাড়িয়া দেওয়ায় সে পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল—সুতরাং এক্ষণে রবীশ্বরকে পদব্রজেই যাইতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের তরুণ তপনের প্রথম রশ্মিকিরীট দিগন্তে বিকীর্ণ না হইতেই একজন রাজকীয় দূত আসিয়া রায় রতনচাঁদের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

রতনচাঁদ তখনও নিদ্রিত ছিলেন,—ভৃত্য, দূতকে বসিতে আসন প্রদান করিয়া, প্রভুকে সংবাদ দিতে গেল।

যথাসময়ে রতনচাঁদ আসিয়া রাজ-দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দূত বলিল,—"সরকারি পরোয়ানা আছে। আর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের একখানি পত্র আছে।"

রতনচাঁদ অগ্রেই রাজ-পরোয়ানাখানি লইয়া পাঠ করিলেন। সেখানি রবীশ্বরকে ধৃত করিবার পরোয়ানা। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

"যেহেতু রবীশ্বর রায়, তাহার প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে, প্রহার ও অবমাননা করিয়া সামরিক বিধানানুসারে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে; অতএব এই পরোয়ানা দ্বারা তাহাকে ধৃত ও বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করা হইল। যতদিন পর্য্যন্ত তাহার ঐ গুরুতর অপরাধের চূড়ান্ত বিচার না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে রাজকীয় কারাগারেই বন্দী অবস্থায় থাকিবে। কোন প্রকার জামিন আদিতে তাহার মুক্তি হইতে পারিবে না।"

পরোয়ানা পাঠ করিয়া রতনচাঁদ, মন্ত্রী মহাশয়ের পত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিয়া, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"প্রিয় রতনচাঁদ!

তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র রবীশ্বর বড় গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। সামরিক বিধানের নিয়মানুসারে তাহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অবমাননা ও প্রহার করায় গুরুতর অপরাধ করিয়াছে। ঘটনা তাহার নিকটেই শুনিবে। তাহাকে দরবারে পাঠাইবে,—কদাচ অন্যমত করিবে না। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী—হিত চেষ্টায় বিরত হইব না।"

রতনচাঁদের মুখখানা একটু যেন ম্লান হইল। গম্ভীর মুখে রাজদূতকে বলিলেন, "রবীশ্বর আপাততঃ বাড়ীতে নাই। আসিলে, আমিই তাহাকে বন্দী করিয়া দরবারে পাঠাইয়া দিব।"

দূত বলিল,—"সেরূপ আদেশ নাই।"

রতন। তবে কি করিবে? রবি ত বাড়ী নাই।

তখন দূত কিছু পারিতোষিক প্রার্থনা করিল। রতনচাঁদ তাহার হস্তে নগদ চারিটী পয়সা প্রদান করিয়া দিলেন। দূত চলিয়া গেলে, রতনচাঁদ ভৃত্যকে বলিলেন, "রবিকে ডাকিয়া আন্।"

কিয়ৎক্ষণ পরে রবীশ্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিকটে বসাইয়া রতনচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তোর ঊর্দ্ধতন সৈনিক পুরুষের অবমাননা ও প্রহার করিয়াছিস্?"

রবি। হাঁ—কা'ল সন্ধ্যার সময় যখন মণিপুর হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন ঐরূপ ঘটিয়াছে।

রতন। কেন, এমন অবৈধ কায করিলি?

রবি। আমি অবৈধ কায করি নাই—সে-ই অবৈধ কায করিয়াছিল।

রতন। কি করিয়াছিল?

রবি। একটী ভদ্র কুল-ললনার সতীত্ব অপহরণ করিবার জন্য তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল।

রতন। সে রমণী কে?

রবি। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পালিতা—শিষ্যা—কমল।

রতনচাঁদ একটুখানি কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিয়া বলিলেন—"সৈনিক পুরুষ তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিল?"

রবি। ঠিক জানি না,—তবে সে বলিয়াছে, মন্ত্রী মহাশয়ের বাসনা-বহ্নিতে আহুতি দিবার জন্য সুন্দরীকে হরণ করিতে আসিয়াছিল, এবং তাহাতে বাধা দেওয়ায়, আমার যে প্রভূত বিপদ ঘটিবে, তাহারও ভয় দেখাইয়া গিয়াছিল।

রতন। তুমি বাধা দিলে কেন?

রবি। সে ত একটী ভদ্র কামিনী—কোন নিম্নশ্রেণীর কুল-কন্যাকে যদি স্বয়ং মহারাজা অসদুদ্দেশে লইতে আসেন, আমার শরীরের একবিন্দু রক্ত থাকিতেও আমি তাহাতে বাধা দিতাম,—অথবা দিব।

রতন। পুরুষোচিত কথা বটে—কিন্তু সংসারে থাকিতে হইলে, সকল সময়ে মনের মত কার্য্য করা যায় না।

রবি। একার্য্য আমি ভালই করিয়াছি।

রতন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি তোমার গুরুলোক, আমার নিকটে মিথ্যা বলিও না।

রবি। কি বলুন?

রতন। কমল ও তোমার নামে লোকে কলঙ্ক তুলিয়াছে।

নতশির হইয়া রবীশ্বর বলিলেন, "কমল তেমন নয়।"

রতন। তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিবে?

রবীশ্বর নিরুত্তর হইল। রতনচাঁদের গম্ভীর মুখে, নিস্তব্ধে কি ভাবিলেন। ভাবনাটা কিছু অতিরিক্ত,—তাহা তাঁহার মুখের বার্দ্ধক্য-প্রকাশক-শিরাগুলির স্ফীতি ও আকুঞ্চন-প্রসারণ দেখিয়াই বুঝিতে পারা

যাইতেছিল। অনেকক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত করিয়া শেষে রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া, বলিলেন,—"এই মাত্র একজন রাজদূত আসিয়াছিল।"

রবি। কেন?—আমাকে বন্দী করিতে কি?

রতন। হাঁ—তাহাই বটে।

রবি। সে কোথায় আছে?

রতন। আমি তাহাকে অনেকগুলি টাকা খাওয়াইয়া বিদায় করিয়াছি।

রবি। কেন?

রতন। দূতের সহিত বন্দী অবস্থায় যাওয়া অত্যন্ত অপমানজনক।

রবি। রাজাদেশে প্রজার বন্দী হওয়া—তাহাতে অপমান কি?

রতন। আমি তোমাকে কি একেলা ছাড়িয়া দিতে পারি,—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। মন্ত্রী মহাশয় হাতে আছেন,—বিশেষ তিনি সাহস দিয়াও পত্র লিখিয়াছেন।

রতনচাঁদ ধৃত করিবার পরোয়ানা এবং মন্ত্রীর পত্র, উভয়ই রবীশ্বরের হস্তে প্রদান করিলেন। রবীশ্বর দুইখানিই পাঠ করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"আপনি কি মন্ত্রীর নিকটে উপকারের প্রত্যাশা করেন?"

রতন। হাঁ,—তা করি বৈ কি।

রবি। কিছু না।

রতন। নিশ্চয়ই পাইব।

রবি। তবে পাইতে পারেন—যদি ছলে, বলে, কৌশলে ঐ সতী কামিনীকে তাহার দানবী-বাসনার আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু—মনুষ্য দেব-দানব দুইয়েরই মাঝামাঝি—দেব ও দানবের দুইটী প্রবল আকর্ষণ, রাত্রি দিন মানুষকে টানিতেছে। মানুষ ইচ্ছা করিলে আত শীঘ্রই ইহার এক দিকে যাইতে পারে। মনুষ্যজন্ম—দুর্লভজন্ম।

দেবতা না হইয়া দানব হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। এ সংসার কয় দিনের! এ জীবন কয় দিনের!

রতন। সে ভয় নাই—আমি প্রাণপণে মন্ত্রীর গ্রাস হইতে কমলকে রক্ষা করিব।

কথাটা শুনিয়া রবীশ্বরের মুখখানা যেন প্রফুল্ল হইল। মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্র প্রকাশ হইয়াই আবার যেমন আচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকার করে, রবীশ্বরের হৃদয়ও তাহাই হইল। সহসা তাহার মনে পড়িল,—তাহার কাকা সহজ লোক নহেন। তাঁহার কাযে কথায় কিছু মাত্র ঠিক নাই। তিনি উচ্ছে ভাজিয়া পটোলের নাম করিয়া থাকেন।

রবীশ্বর বলিলেন,—এক্ষণে আমাকে কি করিতে বলিতেছেন?

রতন। চল, তোমায় লইয়া দরবারে যাই।

রবি। বিকালে যাইব।

রতন। কেন?

রবি। সংবাদটা একবার কমলকে দিয়া আসিব।

রতন। না, না,—তাতে আর প্রয়োজন নাই। আবার একটা নূতন গোলযোগ ঘটিবে। সে যাহা করিতে হয়, আমিই করিব।

রবি। গোলযোগ যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে,—পাপাত্মা মন্ত্রীর—

রবীশ্বরের কথা সমাপ্ত না হইতেই শিহরিয়া উঠিয়া, অতি ব্যস্তভাবে রায় রতনচাঁদ বলিলেন,—"কি, ও? কি, সর্ব্বনাশ! তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি? কি কথা মুখে আনিতেছিস্?"

রবি। না,—এমন কিছুই নহে। মন্ত্রীরই যখন প্ররোচনায় এই ঘটনা,—তখন নিশ্চয়ই জানিবেন, আমার অব্যাহতি নাই। বাহিরে সে আপনাকে যত ভদ্রতাই দেখাক্, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বেশ এক খেলা খেলিবে।

রতন। তুই ঐ একগুঁয়েমিতেই সকল নষ্ট করিস্ ।

রবি। আমার জীবনের জন্য আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না। জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহার একটা অতি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বিত থাকে। সুখ-দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট কাহারও দ্বারা সংঘটিত হয় না। তবে অবলম্বন মাত্র। ইচ্ছা করিয়া কেহ কাহারও অনিষ্ট বা ইষ্ট সাধন করিতে পারে না।

রতন। সে যাহা হউক,—এখন দরবারে যাইতে হইবে ত?

রবি। আপনার ইচ্ছা।

রতন। পরোয়ানা অমান্য করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। বিশেষতঃ আমি জামিন থাকিয়া দূতকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

রবি। তবে চলুন।

রতনচাঁদ, তখন যেন একটু আশ্বস্ত হইলেন। বোধ হয়, তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, দুষ্ট রবীশ্বর যদি কমলের নিকটে যায়, আর এই সকল কারণ শ্রবণ করাইয়া যদি তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, তবে তাঁহার বহুদিনকার হৃদয়-পোষিত আশালতা বিশুষ্ক হইয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে দরবারে যাইতে স্বীকৃত হওয়ায়, রতনচাঁদ প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "আর বিলম্ব করিয়া কায নাই। তবে তুমি নিশ্চয়ই জানিও—তোমার কোন বিপদ হইতে দিব না। আমার সমস্ত সম্পত্তিই তোমার, তোমার উদ্ধারের জন্য যদি ইহা ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।"

রবীশ্বর সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি "বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসি" বলিয়া বাটীর মধ্যে গমন করিলেন। রায় রতন-চাঁদ দুইটী অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করতঃ নিজে দরবারে গমনের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলেন।

রবীশ্বর বাটীর মধ্যে গমনপূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিয়া একটী দাসীকে

ডাকিয়া পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে দশটী মুদ্রা দিয়া বলিলেন,—"এই পত্রখানি কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ী যে কমল থাকে, তাহার হাতে গোপনে দিয়া আসিবে। সাবধান! যেন, আর কেহ জানিতে না পারে।"

দাসী রবীশ্বরকে পাইয়া বসিল। সে মনে ভাবিল, অমন সুন্দরী যুবতী মেয়েটাকে দেখিয়া, রবীশ্বর বাবু মজিয়া—মরিয়া গিয়াছেন,—তাই প্রেমপত্র লেখা হইতেছে। সে ছুঁড়ী যে, আমাদের বাবুর এমন চাঁদপারা মুখখানা দেখিয়া, না মজিয়াছে,—তাও হইতে পারে না। তা; যৌবন-কালে অমন হয়, একদিন আমাদেরও অমন হয়েছিল। আমাদের পাড়ার জহরীর ভাই, আমাকে কত টাকাই দিত।

দাসী তাহার স্ফীতাধরে একটু হাসির রেখা ছুটাইয়া ক্ষুদ্র চক্ষুর একটু কটাক্ষ ফুটাইয়া বলিল,—"তিনি আবার যে পত্র দেবেন, তাও কি আপনাকে এনে দিতে হবে?"

রবীশ্বর দাসীর হাব-ভাব দর্শনে কিছু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন,—"না না, পত্রের উত্তর আর আনিতে হইবে না।"

দাসী। বাগানে যে বড় বড় গন্ধরাজ ফুটিয়া আছে,—তার এক ছড়া মালা গাঁথিয়া, তাঁহার জন্যে নিয়ে যাব কি?

রবি। না,—না। সে সকল কিছুই করিতে হইবে না। ঐ পত্র-খানা দিয়া আসিবে।

দাসী সে দিকে তত সুবিধা না পাইয়া, তাহার পরিধেয় বস্ত্রের অগ্র-ভাগে পত্রখানি বাঁধিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল। রবীশ্বর সৈনিক—কাযেই দরবারে সৈনিকের পোষাক পরিয়াই যাইতে হইবে। তিনি সৈনিকের পোষাক পরিধানপূর্ব্বক পিতৃব্য সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য রায় রতনচাঁদ, তখন বহুমূল্য পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া, কেবল

সটকার নলে মুখারোপিত করিয়াছেন। রবীশ্বরকে বসিতে বলিয়া, তিনি তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক্—কেহ কোন কথা কহিতেছেন না। সম্ভবতঃ উভয়েই মনে মনে কোন বিষয়ের চিন্তা ও আন্দোলন করিতেছিলেন।

এমত সময়ে, সেই গৃহে বাগানের কজেই মালী বস্ত্রাবৃত একটী গোলাকার বস্তু লইয়া প্রবেশ করিল। রতনচাঁদ ও রবীশ্বর তদ্দর্শনে ভাবিলেন, ঐ বস্ত্রের মধ্যে কোন নূতন ফল বা পুষ্প হইতে পারে; দরবারে যাওয়া যাইতেছে,—মহারাজকে উপহার দিবার উপযুক্ত জিনিষ বলিয়া, মালী বোধ হয় দেখাইতে আনিয়াছে। রায় রতনচাঁদ কথা না কহিতেই রবীশ্বর বলিলেন,—"উহাতে কি রে?"

মালী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া আবৃত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল। কি ভীষণ! তাহার মধ্য হইতে মানুষের একটী "কাঁচা-মাথা" বাহির হইল। এখনও তাহার ছিন্নকণ্ঠে রুধিরের দাগ—মাটিতে শোণিতে মাখামাখি! রবীশ্বর চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"একি রে?"

রতনচাঁদ স্থির ও অবিচলিত ভাবে বলিলেন,—"এ কোথায় পাইলি?"

মালী বিনীতস্বরে বলিল,—ভুঁইচাঁপা গাছের গোড়ায়, মাটির মধ্যে?

রবীশ্বরের স্মৃতি-পথে সেদিনকার রাত্রির সমস্ত ঘটনা একে একে উদিত হইল। তিনি যে দুইজন লোককে দেখিয়াছিলেন—এক্ষণে স্পষ্টতর বুঝিতে পারিলেন, সে দুইজন তাহার কারু ও সদয়। কিন্তু এ ছিন্ন মস্তক কাহার? এরূপ ধরণের মানুষ ত তাঁহাদের বাড়ীতে কখনও দেখেন নাই,—মুণ্ডটীর নাসিকাটী আঘাতের দ্বারা চূর্ণ করা হইয়াছে,—রবীশ্বর বুঝিলেন, কেহ যাহাতে মুণ্ডটী কাহার, তাহা না চিনিতে পারে—তজ্জন্য নাসিকাটী চূর্ণ করা হইয়াছে।

রবীশ্বরকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, রতনচাঁদ বলিলেন,—তুই কি ভাবছিস্?

রবি। এরূপ কাঁচা-মাথা কোথা হইতে আসিল ?

রতন। আমার বোধ হইতেছে, আমাদের এ বাড়ীতে বাসের পূর্ব্বে যখন রাজপরিবার থাকিত—তাহাদেরই কাহারও নিহিত মস্তক।

রবি। এতদিন কাঁচা থাকিবে কেমন করিয়া ?

রতন। তা থাকে ;—কোন কোন স্থানের মাটি এরূপ গুণবিশিষ্ট যে, যদি কোন মৃতদেহ তাহার মধ্যে প্রোথিত থাকে, তবে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত কাঁচা অবস্থায় থাকিতে পারে। আমার বিশ্বাস,—ঐ যায়গার মাটি সেইরূপ গুণবিশিষ্ট,—তাই ও মাথাটা ঐরূপ কাঁচা অবস্থায় আছে ?

রবীশ্বর তাহাতেই সায় দিলেন, কিন্তু তাহার মনের গোল বিদূরিত হইল না।

মালী জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি এ মাথাটীকে লইয়া এখন কি করিব ?"

রতনচাঁদ তখন সট্‌কায় টান ধরিয়াছিলেন। এক গাল ধূম ছাড়িয়া বলিলেন,—"হাঁ, মাথাটা আর কি হইবে! কাপড়ে করিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়া বিতস্তার জলে—খুব অনেক জলে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া আয়।"

মালী প্রভুর আদেশ মতে মুণ্ডটীকে, বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া নদী অভিমুখে চলিয়া গেল। তখন রতনচাঁদ বলিলেন,—"রবি : চল্—আর বিলম্ব করা উচিত নহে। বিলম্ব হইলে মন্ত্রী আরও ক্রুদ্ধ হইতে পারেন।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, চলুন আমার আর বিলম্ব কি।"

তখন উভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে দুইটী অশ্ব প্রস্তুত ছিল। দুইজনে তাহাতে আরোহণ করিলেন। কয়েক জন পদাতিক ও চারিজন অশ্বারোহী শরীররক্ষক, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।

পথে যাইতে যাইতে রবীশ্বর ভাবিতে লাগিলেন, "কা'ল সন্ধ্যায় কমলকে যা দেখিয়াছি,—সেই বুঝি আমার জীবনের শেষ দেখা! ইহ-জীবনে—এ মরত-ভূমে আর বুঝি তাহাকে দেখিতে পাইব না।"

রতনচাঁদ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলেন,—আমার বাসনা কি অপূর্ণই থাকিবে। ভগবান্ এত আশা পূর্ণ করিয়া, এই আশাটীকেই কি কেবল অপূর্ণ রাখিবেন! তবে ঘটনা যেরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে,—রবীশ্বর যেরূপ অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে নিশ্চয়ই মন্ত্রী উহাকে কারারুদ্ধ করিবেন,—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া যদি না করেন,—কিন্তু আমি তবে সঙ্গে যাইতেছি কি জন্য? রবীশ্বরকে কমল ভালবাসিয়াছে—আর সদ্য ফোটা ফুল পাইলে, বাসি ফুলই বা কে ভালবাসে।—এত চেষ্টা, এত যত্ন —সকলই কি বৃথায় যাইবে। রাণী চন্দ্রার কৃপাতে মন্ত্রীকে অবশ্যই নিরস্ত করিতে পারিব! তবে রবীশ্বর—সেও ত গেল! রতনচাঁদের হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে আশা-রশ্মি-কিরণ যেন ফুটীয়া উঠিল,—মুখভাব প্রসন্ন হইল।

আশাই মানুষকে সংসারে বাঁধিয়া রাখে,—কামনাই পুড়াইয়া মারে! আশা দেব-কন্যা—কামনা দৈত্যবালা। তবে শীঘ্র ও সহজে সম্প্রীতি বাঁধিয়া যায়—ঐ যা দুঃখ! আশা যখন কামনাকে তাহার দেবীত্বের মধ্যে আনিয়া ফেলে তখন কামনারও দেবীত্ব জন্মে, আর কামনা যখন আশাকে পাইয়া বসে,—তখন আশাও দানবী হয়। দেব-দানবের মিলনে সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা ও গরল উভয়েই উদ্ভব হইয়াছিল। অন্তর্জ্জগতের অনুশীলন-সাগরে এমনই একটা দেব-দানবের প্রীতিসম্মিলন ঘটিয়া, কখন অমৃত—কখন গরলের উদ্ভব হইতেছে। সময়ে সাবধান হইতে পারিলে, অমৃত প্রাপ্তে অমর হওয়া যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রমোদ-কাননে বসন্ত-মুখরিত পিক-কুহরিত মুকুল-বিলম্বিত প্রসূন-বিকসিত কুঞ্জে যখন চাঁদের আলোয় মর্ম্মরের বেদীতে বসিয়া মণিপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ বন্ধুবান্ধব ও বারবনিতা লইয়া বিপুল আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রণয়-উদ্যানের শ্রেষ্ঠ কুসুম চন্দ্রা, আপন-গৃহে বসিয়া, অভিমানের আগুণ জ্বালিয়া, তাহার উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছিল। ক্রমে রাত্রি অনেক হইল, তখনও কান্ত-আগমন অসম্ভাবনা দেখিয়া, পালঙ্কে শুইয়া শুইয়া, চন্দ্রা অনেক জল্পনা-কল্পনা করিল। ক্রমে নিদ্রা আসিয়া তাহার অভিমানের আগুনে জল ছিটাইয়া দিয়া, তাহাকে শান্তির ক্রোড়ে তুলিয়া দিল।

অতি প্রত্যূষে, মন্ত্রী মহাশয় ধীর মন্থর গমনে, চন্দ্রার গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, চন্দ্রা তখনও নিদ্রিতা। কারুখচিত মূল্যবান্ পালঙ্কে, রূপভরা দেহখানি রত্নখচিত বহুমূল্য নীলকৌষেয় বসনে আবৃত করিয়া, চন্দ্রা নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। তাহার সুকৃষ্ণ কেশজাল উপাধানের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে, কবরী খুলিয়া গিয়াছে। কবরী-

প্রোথিত সুরভি কুসুমরাশি শয্যার দুই পার্শ্বে খুলিয়া পড়িয়াছে,—সেই সান্ধ্য তাম্বুল-রাগ-রেখাময় ফুল্লাধরে তখনও হাসির ক্ষীণ রেখা মুছে নাই। সেই সূক্ষ্ম কজ্জল-রেখাঙ্কিত চক্ষু, তখনও নিদ্রার এবং আসবের মোহময় —মদিরাময়—মন্ত্র-শক্তিময় প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই।

কি সুন্দর! চন্দ্রা কি সুন্দরী! পরীর দেশে পরী-রাণীদের কি এমন রূপ আছে? নয়ন ভরিয়া মন্ত্রী মহাশয় সে রূপ দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া—কত নিশি দিন দেখিয়াও যেন চন্দ্রার রূপ তাঁহার নিকট ফুরায় না। এ রূপের মোহ, তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইবার নহে। সৌন্দর্য্যের মোহ শীঘ্র যায় না। কারই বা গিয়াছে! লোকে আজীবন হয় ত, তাহার চোখে লাগা, একই সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া চিতায় শুইয়াছে, তবু তাহার বাসনা পূর্ণ হয় নাই! সংসারে হয় ত তাহার স্ত্রী-পুত্র সবই ছিল, সবই হইয়াছিল,—কিন্তু যে সৌন্দর্য্য তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহার গুপ্ত চিন্তায়, সে প্রাণের নিভৃত-কন্দরে যেন একটা স্বর্গ-মন্দাকিনীর তরল-তুফান লইয়াই ঘুরিয়াছে!

মন্ত্রী দেখিলেন, চন্দ্রা জাগিয়া উঠিতেছে,—রাজবাড়ীর নহবৎ খানার বিভাষের মন-মাতান সুর জাগিয়া, চন্দ্রার স্বপ্ন-রাজ্যটা ছার-খার করিয়া দিয়াছে। চন্দ্রা জাগিয়াছে। চন্দ্রার আকর্ণ বিশ্রান্ত কাম-কটাক্ষ মাখা পদ্ম-চক্ষু উন্মীলিত হইল। চন্দ্রা দেখিল,—সম্মুখে মন্ত্রী মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চক্ষু তখনও বারুণী-প্রসাদে এবং রাত্রিজাগরণ জন্য আধ উন্মীলিত—আধ বিকম্পিত ও রক্তবর্ণ। চন্দ্রার ঘুমন্ত অভিমান ফুটন্ত হইল। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া, ঠোঁট ফুলাইয়া, মন্ত্রী মহাশয়ের মুণ্ড ঘুরাইয়া উপাধানে মুখ গুঁজিল।

মন্ত্রী বলিলেন,—"এত মান কেন?"

চন্দ্রা কথা কহিল না। মন্ত্রী, পালঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া বলিলেন,

—"আমার উপরে মান;—আমি তোমার অমিয় সৌন্দর্য্যে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে যত দেখি,—ততই দেখার সাধ বাড়িয়া যায়। তুমি রাগ করিও না—তুমি এত সুন্দর! আর আমি কোথাও যাইব না।"

দৃপ্তা সিংহীর মত চন্দ্রা উঠিয়া বসিল, একবার কাম-কটাক্ষে—পূর্ণাভিমানের কটাক্ষে মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া, চন্দ্রা উঠিয়া গেল।

পার্শ্বের গৃহে কর্পূর-বাসিত সুশীতল জল রৌপ্যভৃঙ্গারে পূরিয়া, দাসী দাঁড়াইয়াছিল। চন্দ্রা, মুখ প্রক্ষালন করিয়া, কবরী বাঁধিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের সম্মুখে আসিল।

সম্মুখে আসিল, কিন্তু যে পালঙ্কে মন্ত্রী মহাশয় বসিয়াছিলেন,—চন্দ্রা সেখানে গেল না। নীচের ফরাসে,—একটা তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া, অবনত মুখে রহিল। এক একবার যেন চুরি করিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। সে চাহনিতে, মন্ত্রীর প্রাণ দেহছাড়া হইয়া উঠিল। মন্ত্রীর আর সহ্য হয় না,—বুঝি, প্রাণের সমস্ত তারগুলা একেবারে বেসুরা বাজিয়া উঠিয়া, তাঁহার জীবন-সঙ্গীতটা বড় খারাপ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

মোহ এমনই জিনিষ বটে! মায়ার দূতী ছলনায় পরিপূর্ণ। কখন মানবের মনে কি খেলা খেলে—কোন্ বাধনে কাহাকে কখন বাঁধে—কোন্ শ্মশানের অঙ্গারকে, স্বর্গ পারিজাতের ভ্রম করায়, কে জানিবে?—কে বুঝিবে? কখন মানবের মনে কি ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়া, হাসিয়া বেড়ায়—তাহা বলা যায় না।—তা রাজাই বা কি, আর দীনদরিদ্র তুমি আমিই বা কি!

মন্ত্রী মহাশয়, চন্দ্রার চরণ-তলে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি রাগ করিও না; আমি আর কখনও কোথায় যাইব না। তোমার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।"

াবনত মুখে চন্দ্রা বলিল,—"কেন, তুমি এ দেশের সর্ব্বে-সর্ব্বা—অসীম ক্ষমতাশালী—অতুল ঐশ্বর্য্যশালী—শত সহস্র সুন্দরী তোমার করুণার ভিখারী—কত শত সুন্দরী তোমার চরণ-তলে লুটাইবার জন্য লোলুপ,—তোমার সৌন্দর্য্য-ভোগ-বাসনার ভাবনা কি?"

মন্ত্রী কোন উত্তর করিলেন না। চন্দ্রার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল,—জগতে যদি কিছু সুন্দর থাকে,—তবে সে চন্দ্রা! জগতে যদি কিছু দেখিবার থাকে,—তবে সে চন্দ্রা! জগতে যদি কিছু ভোগের থাকে,—তবে সে চন্দ্রা! মোহের অগ্নি-শিখা আজি প্রভাতে সহসা দ্বিগুণতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল। দীপ নিবিবার আগে একবার তীব্র তেজে জ্বলিয়া উঠে,—এও কি তাই? ইহাও কি মন্ত্রী মহাশয়ের প্রেম-বহ্নিতে চন্দ্রার রূপের আজি শেষ আহুতি?

চন্দ্রা বলিল,—"আজি আবার কি ধ্যান? নূতনে মজিবে—নূতনে মধু পান করিবে—তবে আর মিছে আদরে ভুলান কেন? মিছে বাঁধনে বাঁধা কেন? আমি ভালবাসিয়াছি—যে মজায় মজিয়াছি,—আজীবন কাঁদিব। আর কাঁদান কেন?"

চমকিত ভাবে মন্ত্রী বলিলেন,—"কি চন্দ্রা,—কি বলিতেছ চন্দ্রা?"

চন্দ্রা তাহার আয়তলোচনে বৈদ্যুতি বিকাশ করিয়া বলিল,—"কিছু জান না,—ন্যাকা! যাও—আর মিছে সেধো না,—মিছে কেঁদে কাঁদিও না!"

মন্ত্রী। তুমি কি বলিতেছ?

চন্দ্রা। বলিতেছি—আমার যেমন সর্ব্বনাশ করিয়াছ, যেমন মজাইয়া মারিয়াছ,—এখন পায়ে দলাইতেছ, এমন করিয়া আবার তারও সর্ব্বনাশ করিও না। বাজারে বেশ্যা আছে—সেই-ই ভাল।

মন্ত্রী। সে কি? আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

চন্দ্রা। কমল—কমল—কমল!

মন্ত্রীর অধরে হাসি দেখা দিল। বলিলেন,—"সেই কথা! তা কি হয়েছে।"

চন্দ্রা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী মহাশয় তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। চন্দ্রা বলিল,—"ছাড়, আমার কায আছে।"

মন্ত্রী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"ব'স, আমারও কায আছে।"

চন্দ্রা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে বসিল। বলিল,—"আর আমায় কি কায— আমি বাসি হইয়াছি। বাসিফুলে কে যত্ন করে?"

মন্ত্রী। আমি তোমায় ভালবাসি।

চন্দ্রা। তা বিলক্ষণ জানি।

মন্ত্রী। কিসে জান?

চন্দ্রা। এই কাল রাত্রেই তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; আমি সারাটী রজনী তোমার আশা-পথ চাহিয়াছিলাম। আর তুমি আমোদ-সাগরে সাঁতার কাটিতেছিলে।

মন্ত্রী। আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখনও ওসব কাযে যাব না।

চন্দ্রা। কমল—কমল? তাহাকে ত ছাড়িতে পারিতেছ না!

মন্ত্রী। কেন,—তাহাকে ছাড়িতে পারিব না কেন?

চন্দ্রা। সে বড় সুন্দরী।

মন্ত্রী। আমি ভগবানের নামে শপথ করিয়া বলিতে পারি,—তোমার কাছে তার রূপ, রূপই নয়।

চন্দ্রা। তবু তার বয়স নূতন।

মন্ত্রী। সে নূতনেও তোমার মত লাবণ্য নাই।

চন্দ্রা। তবে তাহাকে আনার জন্য এত আয়োজন কেন? তার উপর এত আসক্তি কেন? তার সর্ব্বনাশ করার জন্য এত ষড়যন্ত্র কেন?

মন্ত্রী। সে খুব লেখা পড়া জানে।

চন্দ্রা। লেখা পড়া জানার জন্য যদি তার উপরে ঝোঁক হইয়া থাকে, তবে তাকে কেন—তর্কালঙ্কার মহাশয়কে আনাও না কেন? তবে কেন তাকে আনিয়ে একটী বন্ধুর মনে কষ্ট দাও?

মন্ত্রী। চন্দ্রা;—তুমি রূপে যেমন অদ্বিতীয়া, গুণেও তেমনি লক্ষ্মী—আর বচনবিন্যাসে সুরসিকা। তাকে আনিয়ে কোন্ বন্ধুর মনে কষ্ট দিতেছি?

চন্দ্রা। কেন,—রায় রতনচাঁদের। রতনচাঁদ কি তোমার কম উপকার করে?

মন্ত্রী। ওমা, সে কি! রতনচাঁদের মনে কি কষ্ট হবে?

চন্দ্রা। সে যে কমলের পাদপদ্মে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে,—সে যে তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

মন্ত্রী। সত্য?—কে বলিল?

চন্দ্রা। রতনচাঁদ নিজেই বলিয়াছে।

মন্ত্রী। তোমার সাক্ষাতে?

চন্দ্রা। বিপদে পড়িলে লোক, কাযেই মহতের শরণ নেয়। তা থাক্,—তুমি বল যে, কমলকে তুমি আনিবে না। যদি আমায় চাও—তোমার ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি স্বীকার না কর,—তোমার পায়ের কাছে গলায় ছুরি দেব।

মন্ত্রী। এত কেন?

চন্দ্রা। তবে স্বীকার করিবে না?

মন্ত্রী। তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন,—তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। ইহা কোন্ ছার।

চন্দ্রা। সব মুখে।

মন্ত্রী। কাযেও।

চন্দ্রা। তবে বল, কমল তোমার মা।

মন্ত্রী। হাঁ—কমল আমার মা।

কার্য্য সিদ্ধি হইল বিবেচনায় চন্দ্রা তখন আনন্দিত হইল। মনে মনে বলিল, মন্ত্রী! তোমাকে আমি যদি কলের পুতুল বানাইয়া, যথা ইচ্ছা ফিরাইতে ঘুরাইতে না পারিলাম, তবে বৃথাই আমার রূপের বড়াই! প্রকাশ্যে অধরে একটু হাসির খেলা দেখাইয়া, মন্ত্রী মহাশয়ের মনে আনন্দের তুফান তুলিয়া দিল। বেলাও তখন প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

দাসী আসিয়া বলিল,—"স্নানের আয়োজন হইয়াছে, বেলাও অনেক হইয়াছে।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তুমি স্নান কর গে, আমি এখন যাই! আবার রাজবাড়ী যাইতে হইবে। দরবারে অনেক কায আছে।"

চন্দ্রা। আজি আবার আসিবে তো?

মন্ত্রী। আসিব না, কোথায় যাইব?

চন্দ্রা। কেন, তোমার প্রমোদশালায়! আজ যদি না আইস—তোমারি এক দিন, আর আমারি এক দিন!

মন্ত্রী। ভাল কথা,—রায় রতনচাঁদ আবার এই বুড়া বয়সে বিবাহ করিবে?

চন্দ্রা। মন কি কাহারও বুড়ো হয়। কিন্তু একটা মজার কথা শুনবে?

মন্ত্রী। কি?

চন্দ্রা। সেই কমলের উপর তাহাদের খুড়ো-ভাইপোর সমান ঝোঁক!

মন্ত্রী। এত খবরও তুমি রাখ! মুলুকের খবর তোমায় কে দেয়?

চন্দ্রা। (হাসিয়া) কিন্তু মেয়েটার ঝোঁক রতনচাঁদের ভাইপোর উপরে! সে যেন তাকে ভালবাসে বলিয়া বোধ হয়।

মন্ত্রী। তুমি কমলকে দেখিয়াছ নাকি?

চন্দ্রা। হাঁ-সেই, যে দিন নৌকা ডুবি হয়, সেই দিন রতনচাঁদের ভাইপো আমাকে তাদের বাড়ী লইয়া গিয়াছিল,—তাতেই জানি।

মন্ত্রী। তবে রতনচাঁদ হয় ত ভাইপোর জন্যই মেয়েটীকে চাহিয়াছে।

চন্দ্রা। নাগো, না। কবুল-মাননা।

মন্ত্রী; নিজে বিবাহ করিবে, বলিয়াছে?

চন্দ্রা। হাঁ।

মন্ত্রী। তোমার সাক্ষাতে?

চন্দ্রা। পত্র লিখিয়া।

মন্ত্রী। পত্র কবে পাইয়াছ?

চন্দ্রা। কয়েক দিন হইল,—তার ভাইপো আসিয়া একদিন দিয়া গিয়াছিল।

মন্ত্রী। পত্রে কি লিখিয়াছিল?

চন্দ্রা। লিখিয়াছিল,—আমার গৃহ শূন্য, তাহা আপনি অবগত আছেন। আমি কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পালিতা কন্যার সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইব, বলিয়া সমস্ত স্থির করিয়াছি—সহসা আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ মন্ত্রী মহাশয়ের নজর, সেই কন্যাটীর উপরে পতিত হইয়াছে। তাঁহার বাসনার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইতে পারে?—সে কেবল আপনি। আপনি অধীন ও অনুগত জনের প্রতি কৃপা করিয়া, যাহাতে আমার আশালতা সমূলে নষ্ট না হয়, তাহা করিবেন।

মন্ত্রী। আর, কতটাকা তোমাকে দিতে চাহিয়াছে,—সে কথাটা গোপন করিলে কেন?

চন্দ্রা। কাযেই ;—আমার ঐ ব্যবসায় কি না! সে খাতির করে,—যত্ন করে—অনুগত—তাই তার জন্য বলিলাম। আর তুমিই বা আমা ছাড়া, অন্যে আসক্ত কেন হবে ?

মন্ত্রী। তোমারই জয় হইল,—এক্ষণে তবে বিদায় দাও। রাজবাড়ীতে অনেক কায আছে।

চন্দ্রা। ও কথা বলিতে নাই—বিদায় কি গো ?

মন্ত্রী। তবে এখন যাই ?

চন্দ্রা। যাইও বলিতে নাই—আসি বলিতে হয়।

মন্ত্রী উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময়েও লোলুপ দৃষ্টিতে চন্দ্রার সেই সৌন্দর্য্য-মাখান মুখখানার দিকে পুনঃপুনঃ চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। চন্দ্রা বুঝিল, আজিকার মদন ও মরণের অভিনয়ে তাহারই জিত হইয়াছে ; এমন জিত তাহার নিত্য,—তাহারই অঙ্গুলীহেলনে মন্ত্রী উঠেন বসেন। চন্দ্রা কিন্তু কাহারও বশীভূতা নহে। সে কেবল কথার ছলনে—মোহের বাঁধনে জগৎটাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহে! সকলে কি বাঁধা পড়ে—যে পড়ে সেই মরে!

মন্ত্রী উঠিয়া গেলে, চন্দ্রা হাসিতে হাসিতে কার্য্যান্তরে মনঃসংযোগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

সেই দিবসই সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্ত্রী মহাশয়, রায় রতনচাঁদকে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবার জন্য একজন দূত রাজপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দূত-মুখে বার্ত্তা পাইয়া, রায় রতনচাঁদ সন্ধ্যা না হইতেই আসিয়া মন্ত্রী-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রী মহাশয় এবং রতনচাঁদ একটা সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। বহুবিষয়িণী কথার পরে, মন্ত্রী বলিলেন,—"তুমি কোন্ বিষয়ের জন্য রাণী চন্দ্রার শরণাগত হইয়াছিলে ?"

রতনচাঁদের বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা একবার বড় জোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। মুখখানা একটু ম্লান হইল,—মুখ দিয়া সহসা কোন কথা নির্গত হইল না। কেন না,—খামখেয়ালী মন্ত্রী, যদি তাহার জন্য রাগ করিয়াই থাকেন। নতুবা ডাকিয়া কথা পাড়িবারই বা উদ্দেশ্য কি !

রতনচাঁদকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া, মন্ত্রী বলিলেন, "তোমারই জয় হইয়াছে। তাহা না হইবেই বা কেন ?—ভগবতীর উপাসনা করিয়া রামচন্দ্র শিবোপাসক রাবণকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন। শক্তি-সাধকের জয় সর্ব্বত্র।"

ম্লানমুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া, পতনাবশিষ্ট দন্তগুলির বহির্ব্বিকাশ করিয়া, হস্তোপরি হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে, রায় রতনচাঁদ বলিলেন,—"আজ্ঞে তা ত বটে ; তা ত বটে।"

মন্ত্রী। বলি, এ বুড়া বয়সে আবার বিবাহের সাধ কেন ?

রতন। গৃহটা একেবারে শূন্য—কিছু বিষয়-আশয় আছে। তাই স্থির করিয়াছি, একটা বিবাহ করিব।

মন্ত্রী সহাস্য আস্যে বলিলেন,—"এই জন্য বুঝি, আমি প্রথম যে দিন কমলের কথা বলিয়াছিলাম, সে দিন অত লুকোচুরি খেলিয়াছিলে ?"

রতনচাঁদ সে কথার কোন উত্তর প্রদান না করিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন, "রাণী চন্দ্রার নিকটে যে, আরও একটা সংবাদ শ্রুত হইলাম।"

বিস্ময় সহকারে রতনচাঁদ বলিলেন, "আজ্ঞা—কি ?"

মন্ত্রী। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রও যে কমলের অনুরাগী।

রতন। বটে!

মন্ত্রী। হাঁ,—শুধু তাহাই নহে। কমলও তাহার অনুরাগিণী।

রতন। কাহার নিকট শুনিলেন?

মন্ত্রী। আর কাহার নিকট! রাণী চন্দ্রা—মুলুকের খবর যার কাছে পাওয়া যায়।

রতন। তবে কি করি!

মন্ত্রী। সে যুবা পুরুষ—সুন্দর—সুশ্রী। তাহার ভাগ্যে অনেক কন্যা জুটিবে। তুমি উহাকে হাত-ছাড়া করিও না।

রতন। আপনার আজ্ঞাই আমার শিরোধার্য্য।

মন্ত্রী। ভাল,—তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকেও এক গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার বিচারের দিন আগামী কল্য। সে জন্যও তোমাকে ডাকান হইয়াছে।

রতন। সে জন্য আমাকে ডাকান কেন? সে যেমন অপরাধ করিয়াছে, তাহার মত দণ্ড দিবেন। অপরাধীর দণ্ডবিধানে কে বাধা দিবে?

মন্ত্রী। তাহার সমুচিত দণ্ড—প্রাণদণ্ড!

রতন। কিন্তু—

মন্ত্রী। কিন্তু কি?

রতন। দীর্ঘ দিন কারাবাসের আজ্ঞা দিলেও ভাল হয়।

মন্ত্রী। তাহা হইলে তোমার খুব সুবিধা হয়,—না? ভাইপোটারও প্রাণ বজায় থাকে। এদিকে কমল-সম্বন্ধে আমার গোলযোগটা নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছ—সে জেলে গেলে, সে আপদটাও চুকিয়া যায়। তখন নির্গোলে কমল লাভ ঘটে।

রতন। আপনি যাহার সহায়, তাহার সুবিধা সকল দিকে।

মন্ত্রী। আমি,—না চন্দ্রা। বল না কেন,—যাহার সহায় পার্ব্বতী, তাহার কিসের দুর্গতি?

রতন। তা ঠিক।

মন্ত্রী। ভাল,—এ মানুষটা ত নিজেই গ্রাস করিলে, তার বদলে একটা পাঠিও। খবরদার যেন চন্দ্রা না শোনে। বারে বারে গোল করিলে, মারা পড়িবে।

রতন। আজ্ঞে আপনার হুকুম অমান্য! জানিতে পারি কি,—রবীশ্বরের ভাগ্যে কোন্ দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে?

মন্ত্রী। তুমি অবশ্য যাহাতে অসন্তুষ্ট না হইবে, তাহাই করিব। নতুবা আর ডাকাইলাম কেন? দীর্ঘ কারাবাসের দণ্ডই প্রদত্ত হইবে।

রতন। সে এখন হাজতেই আছে?

মন্ত্রী। হাঁ—হাজতেই আছে।

রতন। তবে অধীন আজ বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।

মন্ত্রী। ভাল,—তাহাই হউক। আমার কথাটা যেন মনে থাকে। আর এক কথা,—

রতন। আজ্ঞা করুন।

মন্ত্রী। তোমার বিবাহ কার্য্যটা যত শীঘ্র সম্ভব, সারিয়া লইও। কেন না, শুভকার্য্যে বিঘ্ন অনেক।

রতন। যে আজ্ঞা,—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

রতনচাঁদ মনে মনে বলিলেন,—তোমাকে ত বলিলাম, স্থির করিয়াছি—কিন্তু কথা পাড়াও হয় নাই। মনে মনেই কালনেমির লঙ্কাভাগ করিয়াছি। এখন কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর স্বীকৃত হইলেই হয়। অতঃপর যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া, রায় রতনচাঁদ প্রাসাদ হইতে বাহির

হইলেন। শিবিকা অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বালয়ে গমন করিলেন।

পরদিন দরবার বসিলে, রবীশ্বরের বিচার আরম্ভ হইল। সামরিক বিচার বিধান-অনুসারে দীর্ঘ কালের জন্য রবীশ্বরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইল। দর্শকগণ হাহাকার করিতে লাগিল। সকলেই জানে—সকলেই অবগত আছে,—দীর্ঘ কারাবাস হইতে কখনই বন্দী উদ্ধার পায় না। প্রাণদণ্ড যাহা—দীর্ঘ কারাবাস দণ্ডাজ্ঞাও তাহাই।

কথাটা অচিরে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাড়ীতেও সে কথার আন্দোলন-আলোচনা হইল,—কমলও শুনিতে পাইল, রবীশ্বর তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া, দীর্ঘ কালের জন্য কারাবাস-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। হয় ত,—ইহ জীবনে আর তাঁহাকে কারাগারের বাহিরে ফিরিয়া আসিতে হইবে না! কথা শুনিবা মাত্র, কমলের চক্ষু দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, সে বহুকষ্টে তাহা রোধ করিয়া, বাড়ীর দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত উদ্যান মধ্যে গমন করিল। সেখানে গিয়া একটা তুলসীবেদীর উপর ঢিপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিতে লাগিল,—তখন তাহার নিজেরই তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না। ভাবনা, তাহার সেই এক। রবীশ্বর;—প্রাণতম রবীশ্বর;—পরার্থপর রবীশ্বর,—কেবল তাহারই জন্য আজি কঠিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত। হায়! সে কি আর ফিরিয়া আসিবে না? তাহার পরিবর্ত্তে কমলকে জেলে দিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না? কমলের দেহ বলি দিয়া, রক্ত পান করিয়া—তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না?

ক্রমে রাত্রি হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল—চাঁদের কিরণ কমলের বিষণ্ণ-ক্লিষ্ট সুন্দর মুখখানি প্লাবিত করিল,—তথাপি কমল যেখানে

বসিয়াছিল, সেই খানেই বসিয়া রহিল। তাহার অন্য কোন জ্ঞান নাই। অন্য কোন চিন্তা নাই। ক্রমে রাত্রি আরও বাড়িয়া গেল।

সহসা কমলের পৃষ্ঠে কাহার কর-স্পর্শ হইল। কমলের চমক ভাঙ্গিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই বৃদ্ধপুরুষ তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এই বৃদ্ধপুরুষকে পাঠক প্রথম পরিচ্ছেদে একবার দর্শন পাইয়াছিলেন। ইঁহার নামধামাদি অবগত হইতে পারেন নাই।—সকলে ইঁহার পরিচয়ও জানে না। কমল জানে তাঁহার নাম দরিয়াবাজ। তিনি কোন্ জাতি, তাহা সেও জানিত না। তবে জানিত—তাহার গুরু কৃষ্ণানন্দের বন্ধু। কোথায় বাড়ী, কোথায় ঘর, সে সম্বন্ধে কমল তাঁহাকে অনেক বার শুধাইয়াছে—কিন্তু কোন প্রকার উত্তর পায় নাই। তিনি কাহাকেও সে কথা বলেন না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "কমল ; রাত্রি অনেক হইয়াছে। একাকিনী উদ্যানে বসিয়া আছ, কেন ?"

কমল কোন কথা কহিল না। কথা কহিতে সে পারিল না। তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ, আরও রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"আমার কথা শুনিলে না, কিন্তু ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

গলা ঝাড়িয়া ধরা ধরা, ভরা ভরা আওয়াজে কমল বলিল,—"কি কথা শুনি নাই ?"

বৃদ্ধ। আমি তোমাকে বারে বারে বলিয়া দিয়াছি—রবীশ্বরকে ভুলিয়া যাও। হৃদয় দৃঢ় কর—তাহাকে ভালবাসিলে কষ্ট পাইবে। আমার কথা শুনিতেছ না, কিন্তু সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে।

কমল বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"তোমার সহিত

যখনই সাক্ষাৎ হয়, তখনই ঐ কথা। এখানে তুমি কি করিতে আসিলে;—কি করিয়া জানিলে যে, আমি এই বাগানে আছি?"

বৃদ্ধ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমরা যোগবলে সব জানিতে পারি, তা কি তুমি জান না?"

কমল। তা, জানি কিন্তু যোগবলে মানুষকে কি জেল হইতে আনিতে পার না!

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—"কেন, তাহা হইলে রবীশ্বরকে বুঝি আনাইতে পারিতে?"

কমল কথা কহিল না। বৃদ্ধ বলিলেন, "শোন মা; জগতে কর্ম্মফল, আর পুরুষকার এই দুইটীতে বড় মেশামেশি ভাবে কার্য্য করে। কিসে কি হয়—কোন্ সূত্র ধরিয়া কর্ম্মফল মানবকে কোন্ পথে লইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তুমি আমি যাহাকে দুঃখ বলি, মানুষ হয়ত কর্ম্মফলের শুভসূত্রে সেই দুঃখের হাত ধরিয়াই সুখের সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হয়। তার উপরে, কোন প্রকার বল প্রকাশ করিতে নাই। সুখ-দুঃখও মোহ—সুখ-দুঃখও মায়া। যাহা মায়া, তাহা ধাঁধা বৈ কি। ধাঁধাঁর উপর বল কি?"

কমল। এখন অত শুনিতে চাহি না,—যদি কোন উপায় থাকে, রবীশ্বরকে উদ্ধার কর। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। বারণ কর, আর রবীশ্বরের নিকটে যাইব না,—কিন্তু তাহাকে উদ্ধার কর। সে যে, আমারই জন্য—আমারই বিপদ উদ্ধার করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছে। আমি মরিলেও আমার এ ব্যথা যাইবে না।

বৃদ্ধ। তবে শোন—আমি চেষ্টা দেখিব, যদি পারি—রবীশ্বরকে মুক্ত করিব,—কিন্তু তুমি রবীশ্বরকে বিবাহ করিতে চাহিও না,—তাহাকে ভুলিয়া যাইও।

কমল। ভুলিতে পারিব? ভাল চেষ্টা করিব—কিন্তু তুমি আর কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর যদি অনুমতি না দাও, তবে তাহাকে বিবাহ করিব না।

বৃদ্ধ। তুমি তাহাকে ভালবাস—ইহা তাহাকে জানিতেও দিও না।

কমল। তাহাও স্বীকার করিলাম।

বৃদ্ধ। তবে বাড়ীর মধ্যে যাও।

কমল। তোমার যেন মনে থাকে।

বৃদ্ধ। তা থাকিবে—আমি চেষ্টা দেখিব, তুমি যাও।

কমল অবসন্ন প্রাণে, ভগ্ন হৃদয়ে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। সে রাত্রে আর সে কিছুই আহারাদি করিল না। শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। নিদ্রাও গাঢ়রূপ হয় নাই—নানারূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে সে নিশা অতিবাহিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অন্ধকার। নগর নিদ্রামগ্ন। আকাশে ক্ষীণ নক্ষত্রালোক স্পন্দিত হইতেছে। শীতল পবন বহিতেছে। বৃক্ষপত্র ঝর ঝর পত পত শব্দে শব্দিত হইতেছে। অন্ধকারে মণিপুরের পাট-দরবারের পার্শ্ব ব্যাপিয়া পরিখার জল বহিয়া যাইতেছে।

সেই অন্ধকার রজনীতে বৃদ্ধ দরিয়াবাজ মণিপুরের পথ বহিয়া হন হন করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। তিনি একেবারে রাণী চন্দ্রার বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া গতি স্থগিত করিলেন। তিনি কতদুর হইতে আসিতেছেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। চলনভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, বহুদুর হইতে আসিতেছেন,—আবার মুখের ভাব দেখিলে বুঝিতে

পারা যায়, ও বাড়ী হইতে এ বাড়ী আসিতেছেন। যাহা হউক, তিনি একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, উপরে তখনও আলোগুলি সমান তেজোগর্ব্বে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে—তখনও নৈশোৎসবের কুসুমগন্ধে দিগন্ত আমোদিত করিতেছে। একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন —"আমি আসিয়াছি, দরোজা খুলিয়া দাও।"

তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে যেন সমস্ত বাড়ীখানা কাঁপিয়া উঠিল, একটী স্ত্রীলোক উপরের ঘর হইতে উঁকি দিয়া দেখিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। অপর একটী স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে আসিয়া দরোজা খুলিয়া দিল,—দরিয়াবাজ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যে, দরোজা খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, —সে একজন পরিচারিকা।

দরিয়াবাজ পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী কোথায়?"

পরিচারিকা বলিল,—"এখনও ঘুমান নাই।"

দরিয়া। মন্ত্রী মহাশয় আসিয়াছিলেন কি?

পরি। হাঁ,—তিনি এই মাত্র চলিয়া গিয়াছেন।

দরিয়াবাজ একেবারেই উপরে উঠিলেন। তাঁহার গমনে কেহই বাধা দিল না।

দরিয়াবাজকে মণিপুরের সকলেই জানিত। সকলেই তাঁহাকে অমানুষী শক্তিসম্পন্ন ও দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী বলিয়া জানিত। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে ইষ্ট দেবতার ন্যায়—ভগবানের ন্যায় ভক্তি করিত; রাজার মত ভয় করিত। সকলেই জানিত,—তাঁহার ইচ্ছায় ভালমন্দ সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে।

দরিয়াবাজ দেখিলেন, আলোক-মালায় উজ্জ্বলীকৃত পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জীকৃত গৃহ-মধ্যে একখানা কারুকার্য্যখচিত পালঙ্কে, একটা বালিশে ঠেসান দিয়া অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় রাণী চন্দ্রা গান গাহিতেছে। দরিয়াবাজ

দেখিলেন, চন্দ্রার চক্ষু তখন বারুণী সেবনে ঢুলু ঢুলু—ফুল্লরক্ত অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা। কিন্নরীকণ্ঠে গাহিতেছিল,—

জানায়ে মনোবেদনা
জুড়াইতে চাও যদি *
বাড়ায়ে শুধু যাতনা
মরিবে কেন কাঁদি ?
সহিবে কহিবে না
মজিবে মজাবে না
পরাণ যায় যদি,
পিয়াসা বেড়ে যাবে
পাষাণে কোথা পাবে
খুঁজিতে গেলে নদী !

দরিয়াবাজ হো হো হো হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "রাণী ; এ গানের অর্থ তুমি বুঝিতে পার কি ?"

অর্দ্ধজ্ঞান-বিলুপ্তা, মদোৎ-ফুল্লপ্রাণা রাণী চন্দ্রা তাহার মদিরা-আঁখির বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "গান বুঝি না ! আমি সব বুঝি।"

দরিয়া। তবে মর কেন ? কেন, ইন্দ্রিয়ের আকুল-আকাঙ্ক্ষা লইয়া তোমার এ দানবী-ক্রীড়া ?

চন্দ্রা সে কথার কোন উত্তর করিল না। উঠিল না,—নড়িলও না। সুরে গাহিল—

তৃপ্ত হয় মরুভূমি পরশি বরষা-নীর।
হইল না ও অমৃতে তৃপ্ত বুক অভাগীর।

দরিয়া। তাই কি, এত ছুটাছুটি ?—কিন্তু যাহাতে তৃপ্ত হইবে, সে দিকে যাও কৈ ?

চন্দ্রা গাহিল,—

মিটিল না এ জগতে এ অতৃপ্তা তৃষা মম।
তাই ছুটি দিবা-নিশি, নিশিঝরা ফুল-সম।

দরিয়া। এ পথ পরিত্যাগ কর। শান্তি পাইবে। পাপের বাসনা, পাপপথে থাকিতে কমে না—পিপাসা বাড়িয়া যায়। একবার রূপ করিয়া সরিতে পারিলে, তখন বাসনা কমিতে থাকে।

চন্দ্রা গাহিল,—

চরণ-চুম্বিত চারু শ্যাম-কুন্তলের ভার;
অলকে কুঞ্চিত মম ক্ষুদ্র কাল-ফণিহার;
কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি ফুল, গাঁথিয়া বিনোদ-মালা,
বিনাইয়া বেণী তায় সাজিব বিনোদ-বালা।
হেম-মণি-বিখচিত পরি শত অলঙ্কার,
কি অমরী কি রাজেন্দ্রাণী এত রূপ আছে কার?
রূপে মোরে দেছে ফাঁকি, নামায়েছে পাপ-পথে,
আমিও দিতেছি ফাঁকি, তুলি নরকের রথে।
শেষ দিন—কিন্তু হবে জীব-লীলা সমাপন।
শেষ দিনে—রূপ-ঘটা তাই এত অতুলন!

পার্শ্বোপস্থিতা সহচরীগণ বুঝিল না,—দরিয়াবাঙ্গ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই আগমনে—মত্ততার ঘোরে রাণীর এ কথার প্রস্রবণ। কেন না, এখন অন্তর্দৃষ্টিটা সহজে ঘটিবে। দরিয়াবাঙ্গ বুঝিলেন, শতভ্রমর-বিচুম্বিতা নলিনী শীঘ্রই সলিল-শয্যায় ঢলিয়া পড়িবে। যোগনিদ্রার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, দরিয়াবাঙ্গ স্বর বিভিন্ন করিয়া বলিলেন, "রাণী; আমি আসিয়াছি।"

চন্দ্রা অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পরিচারিকা দরিয়াবাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গান গাহিতে গাহিতে রাণী সহসা অজ্ঞান হইলেন কেন?"

দরিয়াবাজ মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"মদের কাণ্ডই ঐরূপ। গায়ে হাত দিয়া ডাক।"

পরিচারিকা, রাণীর গাত্রে হস্তার্পণ করিল। চন্দ্রার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিয়া, তাহার মদিরা আঁখি ঘুরাইয়া বলিল, "কি?"

দরিয়া। আমি আসিয়াছি।

চন্দ্রা। কে, দরিয়াবাজ? বাবা;—প্রণাম। এত রাত্রে কিজন্য?

দরিয়া। তুমি মাথায় একটু পুষ্পসার দাও—একটু উঠিয়া বাহিরে আইস। আমি বিশেষ প্রয়োজন জন্য আসিয়াছি।

চন্দ্রা। বাবা;—আমার বড় ঘুম ধরিয়াছে—পা টলিতেছে। উঠিতে পারিতেছি না।

দরিয়াবাজ, পরিচারিকা ও সহচরীকে বলিলেন,—"তোমরা উহার চোক-মুখে জল দাও। মাথায় পুষ্পসার দাও—নেশাটা অধিক হইয়াছে।"

দরিয়াবাজের মুখের দিকে চাহিয়া, পরিচারিকা বলিল,—"আপনিই একটু এদিকে আসুন। আপনি ঐরূপ করুন। আমাদের উপর যদি রাগ করেন। বোধ হয় জানেন,—উনি বড় রাগী।"

পরিচারিকা দরিয়াবাজকে আর কখন দেখে নাই—সে জানিত না যে, দরিয়াবাজ কাহাকেও স্পর্শ করে না,—কাহারও শয্যা দলায় না। কেবল কমলকে তিনি দুই এক দিন স্পর্শ করিয়া থাকেন।

দরিয়াবাজ হাসিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, আমি এখানে আছি।"

পরিচারিকা তাহাই করিল। একটু পরে চন্দ্রার শরীর সুস্থ হইল। তখন চন্দ্রা উঠিয়া আসিয়া—দূর হইতে দরিয়াবাজকে প্রণাম করিল। দরিয়াবাজ বলিলেন,—"তোমার নিকট একটী গুপ্ত কথা আছে।"

চন্দ্রার ইঙ্গিতে সহচরী ও পরিচারিকা তথা হইতে চলিয়া গেল। তখন দরিয়াবাজ বলিলেন,—"রায় রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র রবীশ্বর, তোমার উপকার করিয়াছিল,—মনে আছে ?"

চন্দ্রা। আছে,—কেন ?

দরিয়া। সে যদি সে দিন আপন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিতস্তা-বক্ষে ঝাঁপ না দিত ; তোমাকে উদ্ধার না করিত, তাহা হইলে তুমি কখনই আর তোমার সুখ-ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখিতে পাইতে না।

চন্দ্রা। নিশ্চয়ই না ;—কিন্তু সে সকল কথা আপনাকে কে বলিল ?

দরিয়া। কোন কথা শুনিতে আমার বাকি থাকে না।

চন্দ্রা। এক্ষণে কি করিতে বলেন ? রবীশ্বর কারাগারে— তাই কি উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাকে উদ্ধার করিতে বলেন ?

দরিয়া। হাঁ!

চন্দ্রা। আমি, সে চেষ্টা বিশেষ রূপেই করিয়াছি,—কিন্তু পারি নাই।

দরিয়া। তুমি ইচ্ছা করিয়াও পার নাই—সে কি কথা মা ? তুমি ইচ্ছা করিলে. মণিপুররাজ্যে কি না করিতে পার ?

চন্দ্রা। মন্ত্রী আগেই আমার নিকট অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, রবীশ্বরের বিষয়ে তুমি কিছুই বলিতে পারিবে না। কিন্তু আমি সে কথা না শুনিয়াও অনেক বলিয়াছিলাম মন্ত্রী অতি বিনয়ে,—অতি কাতরে, আমাকে সে বিষয়ে নিরস্ত করিয়াছে।

দরিয়া। তথাপিও উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য।

চন্দ্রা। কি প্রকারে তাহা করা যাইতে পারে ? মন্ত্রী কিন্তু একেবারে নারাজ !

তখন দরিয়াবাজ, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া, অতি

মৃদুস্বরে কয়েকটী কথা বলিলেন। চন্দ্রার অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা প্রতিভাত হইল। বলিল,—"চেষ্টা করিব।"

দরিয়াবাজ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

পর দিবস, সন্ধ্যার পরে যখন চিরঞ্জীব বর্ম্মণ,—রাজ-কার্য্য পরিসমাপনান্তে প্রাণোপমা চন্দ্রার প্রাসাদে আগমন করিলেন; তখন চন্দ্রা, তাহার মদন ও মরণের, তাহার মদিরা ও মোহের, তাহার গরল ও তরলের সৌন্দর্য্য হিল্লোলে মুখরিত করিয়া, অপাঙ্গে কটাক্ষ, অধরে হাসি, কপোলে কাম লইয়া মন্ত্রীর পার্শ্বে বসিল। আদরের মাত্রা একটু অধিক দেখিয়া মন্ত্রী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কেন গো,—আজি আবার কিসের বায়না।"

মলয়ান্দোলিত বসন্তের প্রস্ফুট প্রসূনের ন্যায়, চন্দ্রা তাহার মুখখানা আন্দোলন করিয়া বলিল,—"আমি কি কেবল বায়না ধরিতেই তোমায় আদর করিয়া থাকি! কত যে ভালবাসি, তা'ত জান না!"

এই কথা বলিয়া, চন্দ্রা তাহার হেম-কান্তি বাহুযুগলে চিরঞ্জীব বর্ম্মণের গলদেশ বেষ্টন করিল। তাহার মদনোন্মাদ-হলাহলপূর্ণ সৌন্দর্য্যের ঘটস্বরূপ মুখখানা মন্ত্রীর বক্ষে লুক্কায়িত হইল। চন্দ্রার গলদেশে নাগকেশরের মালা ছিল, তাহার মনঃপ্রাণহারী সুগন্ধ মন্ত্রীর নাসিকারন্ধ্র পূর্ণ করিল। চন্দ্রার স্পর্শ—মন্ত্রীর শরীরে বিদ্যুৎ ছুটাইল। চন্দ্রার প্রেম-কারুণ্যকণ্ঠ—প্রেম-ভাষা-বিজড়িত করুণ কথায় প্রেমাভিব্যক্তি—প্রেমালস-আকুলিত কাতর আলিঙ্গন,—এত বড় শক্তিশালী মন্ত্রীকে ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় লঘু করিয়া দিল। মায়ারাজ্যের আর একটা নূতন স্বপ্নময় উজ্জ্বল দৃশ্য, কাম-কামনার জ্বালা-মায়াময় হৃদয়ে আরও উজ্জ্বলতা আনিয়া দিল। সে উজ্জ্বলতার মধ্যে পরকাল ডুবিল, ইহকাল ডুবিল,—প্রতিজ্ঞা ডুবিল, প্রতিভা ডুবিল, কর্ত্তব্যতা ডুবিল, কাণ্ডজ্ঞান ডুবিল,—রহিল কি?

আমি   দিবস গোঙাব জনম গোঙাব
সোঙারি ও চাঁদ তনুয়া,
তুমি   পার যদি সখা, যাও ভুলে যাও
(আমি) রব তব স্মৃতি লইয়া।—
সখা—শুধু তোমারি স্মৃতি লইয়া।

গান শুনিয়া,—সেই তীব্রোজ্জ্বল, নীললোহিত চন্দ্রার আয়ত চক্ষুর কাম-কটাক্ষ দেখিয়া, চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ মরমে মরমে মরিয়া গেলেন। তাঁহার দেহের পঞ্জরাস্থি ধসিয়া, সমস্ত রক্ত উষ্ণ হইয়া আসিয়া, যেন চন্দ্রার চারু চরণ-তলে পতিত হইতে লাগিল। তিনি চন্দ্রাকে বক্ষে টানিয়া বলিলেন, "আমায় একেবারে খেলে ?"

চন্দ্রা, উপযুক্ত সময় বুঝিল,—দরিয়াবাজের কথা মনে পড়িল,—সে মন্ত্রীর অজ্ঞাতসারে, তাঁহার হস্ত হইতে একটা অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইল। মন্ত্রী তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। তাহার পর আরও কিয়ৎক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিয়া চিরঞ্জীব বর্ম্মণ্ সে নিশার মত বিদায় চাহিলেন। চন্দ্রা ছলে-বলে মন্ত্রীর মন মজাইয়া, তাঁহাকে মোহের ছলনে, মায়ার বাঁধনে আরও বাঁধিয়া বিদায় দিল।

মন্ত্রী চলিয়া গেলে, চন্দ্রা পরিচারিকাকে বলিল, "আমি একটু স্থানান্তরে চলিলাম, আসিতে বিলম্ব হইতে পারে,-তোমরা জাগিয়াই থাকিও।"

পরিচারিকা তাহার ঠাকুরাণীর এরূপ অভিসার-গমন অনেক বার দেখিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে অন্য কিছুই না বলিয়া কেবল বলিল,— "রাত্রি অনেক হইয়াছে, মাদক সেবনে একটু অবস্থান্তরও ঘটিয়াছে— এ সময়ে একাকিনী যাবেন ?"

চন্দ্রা গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল ; "আমার কি ভয়—মণিপুরে আমাকে কে না চিনে ? আমার ভয় নাই।"

পরিচারিকা মনে মনে ভাবিল, যে রমণীর সাররত্ন সতীত্ব সুরক্ষিত নহে, তাহার কোথায়ই বা ভয়!

চন্দ্রা একখানা কৃষ্ণবস্ত্রে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া, বাটীর বাহির হইয়া রাস্তা বহিয়া চলিল।

রজনী অন্ধকারে আপন অঙ্গ আবৃত করিয়াছেন. গগন শূন্য—চাঁদ নাই। হতাশে পিয়াসে তারকাকুল আকুল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া রাত্রি জাগিতেছে। স্বন্ স্বন্ করিয়া নিস্তব্ধ নিশীথিনীর অঙ্গ কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্রের উপর দিয়া বাতাস বহিয়া যাইতেছে। আঁধারে জড়িত নিশীথ পথে একাকিনী চলিয়া যাইতে চন্দ্রার মনে কিছুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার নাই.—সে দ্রুত পদক্ষেপে গিয়া কারাগার সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

-*o*-

মস্ত একটা সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া, একজন কুকীসৈন্য কারাগারের দরোজার সম্মুখে পায়চারা করিয়া পাহারা দিতেছিল। অন্ধকারে কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া, থমক খাইয়া দাঁড়াইয়া চমক-চঞ্চল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে?"

চন্দ্রা তাহার কোমল কণ্ঠে উত্তর করিল, "কেন, ভয় খাইয়াছ নাকি?"

প্রহরী সঙ্গীনের অগ্রভাগ সম্মুখে রাখিয়া, সাহসে ভর করিয়া বলিল,—"এত রাত্রে তুমি কে?"

চন্দ্রা। আমি পেত্নী।

প্রহরীরও সেই ভয় হইতেছিল। গলার স্বরটা বড় মিঠাদার—কিন্তু

রাত্রে—কঠোর কারাগারের কাছে এ স্বর অন্যের সম্ভবে না,—কাজেই প্রেতিনী হওয়াই সম্ভব। কাজেই প্রহরী সঙ্গীন আরও ঠিক করিয়া লইয়া,—মনে ভাবিল,—হাঁ,—হাঁ,—শুনিয়াছি—এখানে একটা প্রেতিনী আছে। আমার আগে যে ছিল, সে ডরিয়েই মারা পড়ে। প্রহরী মন্ত্র আওড়াইতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রা, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এই সাহসে জেলের পাহারাওয়ালা হইয়াছ? আমি যদি রাজা বা মন্ত্রী হই,—তবে তোমাকে অন্দরে শাঁখা পরিতে রাখি।"

প্রহরী সে কোমল-কণ্ঠের ব্যঙ্গপূর্ণ স্বর ও হাসিতে এবং কথাতে, মনে মনে ভাবিল, যথার্থই কি এ প্রেতিনী! হইতেও পারে! প্রেতিনীরা যে, সকল রূপই ধরিতে পারে।

চন্দ্রা বলিল, "আমার একটা কথা রাখ।"

প্রহরীর তখনও ভয় দূর হয় নাই। সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কি?"

চন্দ্রা। আমি ভূত নহি—মানুষ। তোমাদের জেলদারোগাকে একবার চাই।

প্রহরী। এখন তিনি নিদ্রিত। ডাকিতে পারিব না।

চন্দ্রা। আমার কথা না শুনিলে, তোমার বিপদ ঘটিবে।

প্রহরী। কে, তুমি?

চন্দ্রা। আমি মানুষ,—তুমি একবার তাঁহাকে ডাকিয়া দাও।

এই সময় চন্দ্রা, একবার তাহার মুখের বসন একটু উন্মুক্ত করিয়াছিল। জেলখানার দরোজা-বিলম্বিত উজ্জ্বল আলোকে প্রহরী দেখিল,—সোণার মুখে রূপার জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে। মনে ভাবিল, দারোগাসাহেবকে কৃতার্থ করিতে কোন সুন্দরীর আগমন হইয়াছে,—না ডাকিলে, বাস্তবিকই বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু সে যায় কেমন

করিয়া! দরোজার প্রহরায় কাহাকে রাখিয়া যায়। সহসা তাহার মনে পড়িল, দরোজায় পড়িয়া আর একজন প্রহরী ঘুমাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"দারোগাসাহেবকে গিয়া বল, একজন সুন্দরী রমণী আসিয়া আপনাকে খুঁজিতেছে।

সে চলিয়া গেল। দারোগাসাহেব অসময়ে আহ্বান জন্য প্রথমে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, শেষে সুন্দরী রমণীর অনুসন্ধান জানিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সহিত বাহিরে আসিলেন। চন্দ্রা, তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া, রূপের আলেয়াতে দারোগাকে বিভোর করিয়া বলিল,—"আমি আপনাকে ডাকিয়া আপনার নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত করিয়াছি,—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।"

সে কিন্নরীকণ্ঠের মধুর স্বরে—সে অপ্সরা-রূপের জ্বলন্ত-জ্যোতিতে দারোগাসাহেবের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"না, না, সে জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

চন্দ্রা। তা বেশ;—কিন্তু আমি একটা কাযে আসিয়াছি।

দারোগা। আপনি কে?

চন্দ্রা। আমি একটা মেয়ে মানুষ।

দারোগা। তাহা ত দেখিতেছি—পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।

চন্দ্রা। না,—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নিরস্ত থাকুন।

দারোগা। কি কাজে আসিয়াছেন?

চন্দ্রা। ভিতরে চলুন,—সমস্ত বলিব।

দারোগা। রাজকীয় লিপি বা নিদর্শন না পাইলে জেলখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দিতে পারিব না।

চন্দ্রা। আমি সুন্দরী মেয়েমানুষ—আমাকে ভয় কি?

দারোগা। নিয়মের অতীত কায হইতে দিতে পারিব না।

চন্দ্রা। একটু নির্জ্জনে না হইলে, আমি আমার কথা বলিতে পারিব না।

দারোগা। বেশ,—একটু ঐ দিকে চলুন।

চন্দ্রা। একটা আলো চাই।

দারোগা। আলো কি হইবে?

চন্দ্রা। একটা জিনিষ দেখাইব।

দারোগা প্রহরীকে একটা আলো আনিতে বলিলেন। সে আলো আনিয়া দিল। একটু দুরে গিয়া চন্দ্রা দারোগাকে একটা অঙ্গুরীয়ক দেখাইল। সে অঙ্গুরী চিরঞ্জীব বর্ম্মণের—তাহাতে রাজকীয় মোহর আঙ্কত। সদাসর্ব্বদা যে সকল রাজকার্য্য করিতে হয়, তাহাতে এই মোহর অঙ্কিত হইয়া থাকে।

অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া দারোগা সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আপনি কি চান?"

চন্দ্রা। আমি জেলের মধ্যে যাইব।

দারোগা। কেন?

চন্দ্রা। একটী বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

দারোগা। কে সে।

চন্দ্রা। যদি আমি না বলি।

দারোগা। তাহা হইলে, সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই।

চন্দ্রা। কেন?

দারোগা। আমরা না দেখাইয়া দিলে;—এত বড় জেলখানার মধ্যে—শত শত বন্দীর মধ্যে, কি করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইবেন? সে বন্দীর নাম কি?

চন্দ্রা। রবীশ্বর রায়।

দারোগা। দিনে সাক্ষাৎ করাই সুযুক্তি।

চন্দ্রা। এই বুদ্ধির বলেই কি জেলের দারোগা হইয়াছ। আমি কুলরমণী—দিবসে কি করিয়া জেলে আসিব?

দারোগা। যাঁহার হাতে মণিপুরেশ্বরের মোহর যাইতে পারে, তিনি ইচ্ছা করিলে, একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়াও লইতে পারেন। তার জন্যে এত কেন?

চন্দ্রা। সে কথা শুনিতে বা বলিতে চাহি না। এখন, জেলখানার মধ্যে যাইতে দেওয়া হইবে কি না?

দারোগা। রাত্রে—তাই একটু ইতস্ততঃ করিতেছি।

চন্দ্রা। বোধ হয় জানা আছে—এই অঙ্গুরী হাতে করিয়া, আমি তোমাকে জেলখানা হইতে দূরে যাইতে বলিলেও, আমার আদেশ প্রতি-পালন করিতে তুমি বাধ্য।

দারোগার সে কথা স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন।"

চন্দ্রা। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে, কোন বন্দীর অনুসন্ধান করিয়া না দিলে, বাহিরের লোক সহজে সন্ধান করিতে পারে না। আমি যাঁহার নাম করিয়াছি—তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিবে কি?

দারোগা। আপনি জেলখানার মধ্যে চলুন। তালিকা পুস্তক দেখিয়া বলিয়া দিব।

চন্দ্রা, দারোগার পশ্চাদনুগমন করিল। দারোগা তাঁহাকে লইয়া একটা গৃহমধ্যে গমন করিয়া, একখানি লাল কাগজ প্রদান করিয়া বলিলেন, "বাহিরে যাইবার সময় এইখানি হাতে করিয়া যাইবেন, কেহই আপনার গমনে বাধা দিবে না। আর আপনার কথিত বন্দী যে কামরায় আছে,—তাহার সংখ্যা ত্রয়োদশ। আর এই চাবি দুইটী লউন—ইহার একটী দ্বারা বাহিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও অপরটীর দ্বারা মধ্যস্থ দ্বার উদ্ঘাটন হইবে।"

দারোগা, নিদ্রা যাইবার জন্য নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। শিকার-লোলুপা ব্যাঘ্রীর মত চন্দ্রা সেই সুবিস্তৃত জেলখানার প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া, কক্ষের সংখ্যা দর্শন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সংখ্যক কক্ষ দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রা চাবি খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। একটী আলো মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিয়া বাহিরের বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতেছিল। চন্দ্রা বায়ু-বিকম্পিত সেই ক্ষীণ আলোকে দেখিল, দস্যু-দলিত পুষ্পহারের ন্যায় কারাগৃহের মেঝের উপর রবীশ্বর পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। তাহার, রূপ-লালসা-পিয়াস-ভরা-প্রাণ সে ম্লান সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিল, একবার ঐ রূপসুধা প্রাণ ভরিয়া পান না করিয়া ছাড়িতে পারিব না। তাহার এই উত্তম সুযোগ—আজি তাহাকে স্বীকৃত করাইয়া বক্ষে তুলিয়া লইয়া, তবে বাহির হইব। যদি প্রাণের পিপাসা না মিটাইতে পারিলাম—তবে মানুষ হইয়াছিলাম কেন।

চন্দ্রা। আদরে সোহাগে—আবেগে-উচ্ছ্বাসে-আবেশে-অলসে ডাকিল—"রবীশ্বর,—প্রাণাধিক, উঠ।"

রবীশ্বর, নিদ্রার ঘোরে স্বপনের মোহে শুনিলেন, স্বর্গের এক দস্যু-দুহিতা, তাহার দানবী-দীপ্তি বিকাশ করিয়া, ডাকিল—"রবীশ্বর,—প্রাণাধিক, উঠ।"

রবীশ্বর, তখন নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন—অনন্ত বিক্ষোভিত উত্তাল-তরঙ্গ-মালা সমাকুল অনন্ত জীব-সাগরের মধ্যে রবীশ্বর একা! সুদূর সমাগত জীবাণুমালা-সমাকুলিত বায়ু-গর্ভে তিনি একা! দূরে—বহুদূরে গিয়া, রবীশ্বর স্বর্গের দুন্দুভি বাজনা শুনিতে পাইলেন। পারিজাতের মোহন গন্ধ প্রাপ্ত হইলেন। তারপরে দেখিলেন,—অনন্ত সূর্য্য-রশ্মি একত্রিত হইয়া, তরল সোণার বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ

করিতেছে। এমন আলো কখনও রবীশ্বর দেখেন নাই,—সুন্দরের হেমচূড়ায় সোনার তরঙ্গ ছড়াইয়া মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন তাপশূন্য তীব্র উজ্জ্বলতা, এমন একাকার ভাস্বরতা, এমন জ্বালাহীন শুভ্রতা,—আর কখনও তিনি দেখেন নাই! ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্ম-কটাহে এ প্রকার রশ্মি কখনও প্রতিভাত হয় নাই। আলোক-সৌধশিরে ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তরের শিল্প-শতদল! সেই শতদলের উপরে কর্ম্ম-মৃণালের সূত্রে,—তদুপরি পুরুষকারের রত্ন-বেদিকা,—রবীশ্বর চমকিয়া দেখিলেন, সেই রত্ন-বেদিকায় রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তিতে কমলেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছে: তাহার লাবণ্য গিয়া জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে,—স্থূল মরিয়া সূক্ষ্ম হইয়াছে। কমলের গলে পারিজাতের মালা—হাতে প্রেমের ব্যজনী—মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে সোণার ছটায় হীরার ধারা মাখাইয়া রবীশ্বরকে আসিতে ইঙ্গিত করিতেছে। এমন সময় এক দৈত্য-দুহিতা বসা চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহার দানবী-দীপ্তি বিকাশ পূর্ব্বক, বাহুযুগল প্রসারণ করিয়া ডাকিল,—"রবীশ্বর,—প্রাণাধিক, উঠ।"

রবীশ্বর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। দৈত্যকন্যার বধ সাধনের জন্য হস্তোত্তোলন করিলেন। চন্দ্রা দেখিল, রবীশ্বরের পাতলা রাঙ্গা অধর-পল্লব দুইখানি ঈষৎ নড়িল—দক্ষিণ হস্তখানি একবার যেন মুষ্টিবদ্ধ হইয়া একটু উঠিয়াছিল। বুঝিল, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে। পুনরপি ডাকিল,—"রবীশ্বর; শীঘ্র উঠিয়া পড়। আমি আসিয়াছি।"

এবার সম্পূর্ণ মনুষ্যকণ্ঠ-স্বর রবীশ্বরের কর্ণে পঁহুছিল,—তাহার সুখের স্বপ্ন ছুটিয়া গেল, মধুর নিদ্রা টুটিয়া গেল। রবীশ্বর উঠিয়া বসিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তিনি এখন কোথায়? কৈ, কমল কোথায়? রাজরাজেশ্বরী কমল কোথায়? জ্যোতির্ম্ময়ী কমল কোথায়?—সম্মুখে ও কে? দৈত্যকন্যা কি? রবীশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে—ঘোর

কাটে নাই। তিনি যেন উন্মাদের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

চন্দ্রা ডাকিয়া বলিল,—"উঠিয়া শিকের কাছে আইস। আমি আসিয়াছি।"

রবীশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চকিত-চাহনিতে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইল।—ও। এই কি আমার কমল-প্রাপ্তির ব্যাঘাত! এই কি স্বপ্নদৃষ্ট দানবদুহিতা! কারা-ক্লেশ জর্জ্জরিত, স্বপ্নোদ্ভ্রান্ত হৃদয় উন্মত্ত হইল,—পূর্ব্বের গোপন-সংগৃহীত ছুরিকাখানি পার্শ্বে পড়িয়াছিল,—জ্ঞান-শূন্য হৃদয়ে কর্ম্মফলের অদম্য উচ্ছ্বাসে রবীশ্বর তড়িৎ-গতিতে সেই ছুরিকা তুলিয়া লইয়া, গরাদের গাত্র সংলগ্না চন্দ্রার কোমল হস্ত টানিয়া ধরিল। ছুরিকা উত্তোলিত হইল।

চন্দ্রা বলিল,—"এখন রঙ্গ রাখ! আমি তোমাকে হৃদয়ের রাজা করিব বলিয়াই এত কষ্ট সহ্য করিয়াছি।"

স্বপ্নোদ্ভ্রান্ত হৃদয় তখনও স্থির হয় নাই,—রবীশ্বর, চন্দ্রার বুকে ছুরিকা বসাইলেন। চন্দ্রা, কাতরকণ্ঠে জড়িত স্বরে বলিল, "আমায় খুন করিলে, আমি তোমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম।"

সেই কাতর-করুণ-জড়িত-স্বরে রবীশ্বরের জ্ঞান হইল। সুস্পষ্ট জ্ঞান ফিরিয়া আসিল,—রবীশ্বর দেখিলেন, চন্দ্রা। ছুরিকা তুলিয়া লইলেন। চন্দ্রার সমুন্নত বক্ষঃস্থল দিয়া রক্তধারা নির্গত হইল,—রবীশ্বর তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিলেন,—হস্তের শিথিলতায় কি একটা ভিতরের দিকে ঠং করিয়া পড়িল। কুঠার-বিচ্ছিন্ন লতিকার ন্যায় চন্দ্রাও বাহিরের দিকে পড়িল এবং অজ্ঞান হইল।

তখন রবীশ্বর বুঝিলেন, চন্দ্রা তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। অন্যায় করিয়া—অজ্ঞানে পড়িয়া, নিরপরাধিনী একটী স্ত্রীলোককে হত্যা

করিয়া মহাপাতক করিয়াছেন,—ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? রবীশ্বর চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রার শ্লথ হস্ত দিয়া ঠং করিয়া কি পড়িয়াছিল। দেখিলেন, একটা চাবিকাটি। বুঝিতে পারিলেন,—সেটা তাহারই আবদ্ধ গরাদের দ্বারের চাবি। হাত বাড়াইয়া—চাবিতালা ভিতরে টানিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা খুলিয়া ফেলিয়া বাহির হইলেন।

বাহির হইয়া চন্দ্রার নাসিকার নিকট হাত লইয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একবার ভাবিলেন, চীৎকার করি—কারাগারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইলে, ইহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা যাইবে। যদি এখনও জীবিত থাকে, বাঁচিতে পারে। আবার ভাবিলেন, জীবন-মরণ মানুষের অধীন নহে—আমি চলিয়া যাই। কি ঘটিবে না ঘটিবে,—ভাবনা আমার কেন? যাঁহার কর্ম্ম তিনিই করিতেছেন। সহসা রবীশ্বরের চক্ষু মেঝের লোহিত কাগজের উপর পড়িল। বুঝিলেন, চন্দ্রা বাহির হইবার আদেশ-লিপি লইয়া আসিয়াছিল। যদি উহার বাঁচিবার সূত্র থাকে, যে কোন প্রকারেই হউক, বাঁচিবে। আমার উদ্ধারের উপায় হয় ত ভগবান্ এইরূপেই করিয়াছেন—বৃথা সময় নষ্ট করিব না।

রবীশ্বর সেই কাগজখণ্ড কুড়াইয়া লইলেন এবং চন্দ্রার কৃষ্ণবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্বারে প্রহরীর হাতে কাগজ প্রদান করিলেন,—প্রহরী সরিয়া দাঁড়াইল।

কতদিন পরে, আজি মুক্ত-বাতাসে রবীশ্বর নিশ্বাস ছাড়িলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণে শান্তি আসিল না। একটী নিরপরাধিনী—বরং তাঁহারই উদ্ধারকল্পে কারাগারে আগমন করিয়াছিলেন, এমন একটী স্ত্রীলোককে কি যথার্থই তিনি হত্যা করিলেন। এইরূপেই কি মুক্ত হইয়া, ঘৃণিত জীবন বহন করিতে হইবে! রবীশ্বর বাহিরে আসিয়া, যেন বড়ই উতলা হইলেন। এমন সকলেরই ঘটে,—তাড়াতাড়িতে কার্য্য করিয়া পরে

মহান্ অনুতাপ উপস্থিত হয়। রবীশ্বর ভাবিলেন, ফিরিয়া যাই—আমি উদ্ধার হইয়া কি করিব! এই কৃত কর্ম্মের জন্য জীবনে কখনও সুখী হইতে পারিব না! তিনি ফিরিতেছিলেন, এমন সময় রজনীর আবিল-জ্যোৎস্নায় দেখিতে পাইলেন,—সম্মুখে দরিয়াবাজ।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া রবীশ্বর বলিলেন,—"শুষ্ককণ্ঠে শীতল জলের ন্যায় আপনার দর্শন আনন্দপ্রদ হইয়াছে। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

দরিয়াবাজ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি?"

রবি। আমি একটি উপকারানুগতা স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া, তাহারই আবিষ্কৃত পন্থায় কারামুক্ত হইয়া, এখন অনুতাপের বহ্নিতে দগ্ধ হইতেছি।

দরিয়া। এখন কি করিতে চাও?

রবি। কারাগারে ফিরিয়া যাইতে চাই। যদি তাহার দেহে প্রাণ থাকে,—শুশ্রূষা করিব।

দরিয়া। তুমি কি জানন,—জগতের কোন কাযেই মানুষের হাত নাই। হৃষীকেশ যখন যে দিকে নিযুক্ত করেন, তখন তাহাই হয়।

রবি।, তবে কি পুরুষকার নাই?

দরিয়া। পুরুষকার আছে বৈ কি—সে আর একদিন বুঝিও—সম্মুখে বিপদ। এখনই প্রহরী জাগিবে, দারোগা জাগিবে,—চিকিৎসক জাগিবে—একটা হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে, তুমি পলায়ন কর।

রবি। পলাইয়া কোথায় যাইব?

দরিয়া। মণিপুর ছাড়িয়া—শানদেশে।

রবি। দেশ হইতে তাড়িত হইয়া, আত্মীয়-স্বজন-মুখদর্শনে বঞ্চিত হইয়া, জন্মভূমির শ্যামল চারু ছবি পূজা করিতে না পাইয়া,—জীবনে প্রয়োজন কি?

দরিয়া। কোন্ সূত্রে কি হয়, কে বলিতে পারে। হয় ত, আবার এই দেশে আসিয়া রাজরাজেশ্বর হইতে পার।

রবি। হয়ত'র প্রলোভন ছাড়িয়া দিন।

দরিয়া। আমি আজি "দৈববাণী" স্বরূপে তোমাকে কয়টী কথা বলিব—বলিব বলিয়াই, এখানে দাঁড়াইয়া আছি।

রবি। আমি যে আসিব, তাহা জানিলেন কি প্রকারে?

দরিয়া। তুমি কি যোগ-শক্তি মান না? আমরা যোগের দ্বারা সমস্ত জানিতে পারি। আমি এক্ষণে যাহা বলিব—তাহাও যোগ-শক্তির প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াই বলিব। সাবধানে আমার আদেশ প্রতিপালন করিও।

রবি। আজ্ঞা করুন,—যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

দরিয়া। তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ—অদ্য যে কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলে তোমাকে ধরিবার জন্য প্রভাতেই চারিদিকে সৈন্য ছুটিবে।

রবি। হাঁ, তাহা বুঝিতেছি।

দরিয়া। ধরিতে পারিলে, যে কঠোর দণ্ড—তাহাও বোধ হয়, বুঝিতে পারিতেছ?

রবি। হাঁ—তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি বৈ কি!

দরিয়া। সাবধানে এ দেশ ছাড়িয়া,—শানদেশে চলিয়া যাও। সেখানকার যিনি সেনাপতি, তাঁহাকে একছড়া সোণারকণ্ঠী দেখাইবে, তাহা হইলে তিনি তোমাকে আদরে-যত্নে রাখিবেন।

রবি। সে সোণারকণ্ঠীতে বোধ হয়, কোন অভিজ্ঞান আছে?

দরিয়া। হাঁ আছে।

রবি। তাহা আমি কোথায় পাইব?

দরিয়া। মাটির নিম্নে প্রোথিত আছে—আমি দেখাইয়া দিব. তুমি তুলিয়া লইও। আর এক কথা—

রবি। আজ্ঞা করুন।

দরিয়া। তুমি কমলের জন্য বিব্রত হইও না,—কমলের সহিত তোমার বিবাহ হইবে না।

রবি। কেন,—দেব?

দরিয়া। সময়ে এ কেন'র উত্তর পাইবে। আ'জ ইহার অধিক নহে। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্নও আমাকে করিও না।

রবি। আমি তাহাকে যে, ভুলিতে পারিব না!

দরিয়া। সে যদি মরিয়া যায়?

রবি। তাহার স্মৃতিটুকু বুকে রাখিব—জানিব, আমার কমল ঊর্দ্ধরাজ্যে আমারই জন্য বসিয়া আছে।

দরিয়া: কমলকে ভগিনী-ভাবে ভালবাসিও—অভ্যাস কর। পত্নী ভাবে ভালবাসিও না।

রবি। কেন, দেব!

দরিয়া। উহাকে পাইবে না,—কেন পাইবে না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে এখন কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। ইহার পরে শুনিতে পাইবে। ভগবানের সুদর্শন চক্র তোমাদের মস্তকের উপরে ঘুরিতেছে—একটী কার্য্য সংঘটন হইবে। আমার কথা শোন,—মনে কর।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

রবীশ্বর, দরিয়াবাজকে প্রণাম করিলেন। দরিয়াবাজ বলিলেন, "যাহারা মূঢ়,—যাহারা অসংযমী, তাহারাই ইন্দ্রিয়ের দাস—তুমি কেন এমন হইবে রবীশ্বর! আমার সঙ্গে আইস—সোণারকণ্ঠী লইবে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে রবীশ্বর, দরিয়াবাজের পশ্চাদনুগমন করিলেন।

দরিয়াবাজ রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া, একটা বুনোপথ ধরিয়া, রাজবাড়ীর অন্তঃপুরোদ্যানের সম্মুখস্থ বান্ধাঘাটের সোপানশ্রেণীর সপ্তম সোপানে গিয়া দাঁড়াইলেন। রবীশ্বর ষষ্ঠ সোপানে দাঁড়াইলেন।

দরিয়াবাজ বলিলেন, "জলে নাম।"

রবীশ্বর, সোপান-নিম্নে জলে নামিলেন। দরিয়াবাজ বলিলেন, "সোপানের গাঁথা ইটের উল্টাদিক হইতে জোরে লাথি মারিয়া ইটখানা তুলিয়া ফেল।"

রবীশ্বর তাহাই করিলেন। দরিয়াবাজ বলিলেন, "এখন হাত দিয়া আর খান কয়েক ইট সরাইয়া ফেল।"

রবীশ্বর তাহাই করিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন, একটা রৌপ্যের বাক্স। রবীশ্বর সবিস্ময়ে দরিয়াবাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ও কি দেখা যাইতেছে? উহার মধ্যে কি আছে।"

দরিয়াবাজ বলিলেন,—"তুলিয়া ফেল।"

রবীশ্বর, তাহা তুলিয়া তাহার আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন,—হীরক, মণি, মুক্তাদিতে বাক্সটী পরিপূর্ণ। সস্মিতবদনে দরিয়াবাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এ সকল কাহার?"

দরিয়া। যাহারই হউক—তোমার শুনিয়া কায নাই। উহার মধ্যে "সোণারকণ্ঠী" আছে, লইয়া শানদেশে চলিয়া যাইও! কণ্ঠীছড়াটী বিশেষ সাবধানে রাখিবে,—সময়ে ঐ কণ্ঠী দ্বারা বিশেষ কার্য্য হইবে।

রবি। অবশিষ্ট ধন-রত্ন লইয়া কি করিব?

দরিয়া। কতক পাথেয় জন্য সঙ্গে লইও—অবশিষ্টগুলি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

রবি। এ ধন-রত্নগুলি অবশ্য অপরের—আমি ইহা লইতে পারিব না।

দরিয়া। অপর কাহারও নহে—আমার। আমি তোমাকে দিলাম, —তুমি উহার যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।

রবি। এখন আমি কোথায় যাইব?

দরিয়া। যেখানে গেলে ধরা না পড়—এমন স্থানে যাইবে। বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা চাই:

রবি। আপনার সাক্ষাৎ আবার কবে ও কোথায় পাইব?

দরিয়া। তাহার ঠিক নাই—যদি দেখা হয়, এই মণিপুরেই হইবে। তুমি আর বিলম্ব করিও না—রাত্রি আর অধিক নাই।

রবীশ্বর, দরিয়াবাজকে প্রণাম করিয়া বাক্সটী লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন—দরিয়াবাজ আর সেখানে নাই। মনে মনে ভাবিলেন,—দরিয়াবাজ কি যাদুকর! এমন ভেল্কী—এমন কুহক—এমন অমানুষিকা ক্রিয়া সম্পাদন ঐন্দ্রজালিক না হইলে কি করিতে পারে! কোথা দিয়া আসে,—কোথায় যায়—কি উদ্দেশ্য কি করে—কেহই তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

রায় রতনচাঁদ, বহুদিন ধরিয়া যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন, —মন্ত্রীর অনুমতি অনুসারে, সেই কার্য্য-আশা সত্বর পূর্ণ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি, এজন্য ঘটক নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ঘটককে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়াছেন।

আশায় নিরাশ হইয়া, রায় রতনচাঁদ ফুলিয়া উঠিলেন। জীবনে তিনি কখনও আশায় নিরাশ হয়েন নাই—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন কূটপন্থা

অবলম্বন করিতে হয়, তাহা করিয়াছেন—স্বার্থের পদতলে অপরের চক্ষুর জল সিক্ত করিয়াছেন। এত বড় একটা দীর্ঘদিবস-পোষিত আশা—রূপের আশা—সুখের আশা—একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়া, তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি কূটবুদ্ধির বলে, তাহার একটা উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরকে একদিন ডাকাইয়া বলিলেন, "আপনি আমার যে টাকা ধার করিয়াছিলেন, সুদে-আসলে তাহা মিটাইয়া না দিলে, আমি অগত্যা আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইব।"

কৃষ্ণা। ঋণ পরিশোধের বর্ত্তমানে কোন সুবিধা দেখিতেছি না। আর ছয় মাস সময় দিতে হইবে।

রতন। এক দিনও না।

কৃষ্ণা। আপনার অগাধ সম্পত্তি আছে,—দরিদ্র ব্রাহ্মণকে একটু সময় দিলে, গুছাইয়া টাকাগুলি দিতে পারি। নতুবা আমাকে সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে হয়। আপনার যে পরিমাণে টাকা ধারি—তাহা পরিশোধ করিতে হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তিতে কুলাইবে না।

রতন। আমি টাকা দিয়াছি—টাকা লইব, এ সময়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিলে চলিবে না। টাকা দিয়া আদায় করিতে হইলেই অমানুষ হইতে হয়।

কৃষ্ণা। আমি ছয়টী মাস সময় চাহিতেছি।

রতন। আমিও বলিয়াছি—একদিনও সময় দিতে পারিব না।

কৃষ্ণা। তবে আর আমায় ডাকান কেন ?

রতন। আমি দরবারে কাগজও দাখিল করিয়াছি,—আগামী কল্যই তোমার বাড়ী-ঘর-দুয়ার ও বিষয়াদি ক্রোক করিব।

কৃষ্ণা। যখন ধারি—যখন আপনি সময় দিবেন না,—তখন তাহা করিলে, আমি কি করিতে পারিব।

রতন। যে কথা শুনে,—তাহার কথা শুনিতে হয়।

কৃষ্ণা। আমি আপনার কি কথা শুনি নাই--ওহো! আপনার সঙ্গে কমলের বিবাহ!—তাহা হইতেই পারে না। আপনি বৃদ্ধ—আপনি অশিক্ষিত—শাস্ত্রানভিজ্ঞ;—সেই শাস্ত্রদর্শিনী রূপসী যুবতীকে কি করিয়া আমি আপনার করে অর্পণ করিতে পারি?

রতন। কা'ল রাজকীয় কর্ম্মচারী লইয়া আপনার বাড়ী-ঘর-দুয়ারের সহিত সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক করিতে যাইব।

"তাহাই যাইবেন।"—এই কথা বলিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর উঠিয়া গেলেন। রতনচাঁদ মনে মনে বলিলেন—সব যাইবে—সম্পত্তিগুলি--বাড়ী-ঘর-দুয়ার বাগান জমী ক্রোক দিলে—অন্নাভাব হইলে, তখন আমিই আবার শাস্ত্রদর্শী সুন্দর যুবক হইব। আদরে-আহ্বানে—সাধিয়া-কাঁদিয়া কমলকে আমার চরণে অর্পণ করিতে পথ পাইবে না!

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর যথাসময়ে আবাসে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সদা-সহাস্য-মুখে কিঞ্চিৎ চিন্তার রেখা অঙ্কিত দেখিয়া, গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখখানা এত ভার কেন?"

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বলিলেন,—"না, এমন কিছু নহে। তবে সংসারে থাকিলে, ত্রিতাপের হাত হইতে একেবারে অব্যাহতি পাওয়াটা বড়ই দায় কি না!"

গৃহিনী। হ'য়েছে কি বল না।

কৃষ্ণা। রতনচাঁদ তার পাওনা টাকার জন্য, আগামী কল্য আমার বাড়ী-ঘর-দুয়ারের সহিত সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক দিবে।

গৃহিনী। কিছু সময় চাহিলে না কেন?

কৃষ্ণা। সে তা দিবে না।

গৃহিনী। কি বলে?

কৃষ্ণা। কমলকে চায়—বলে, কমলের সহিত তাহার বিবাহ দাও।

গৃহিণী। কি পোড়া কপাল! সেই রাগেই বুঝি টাকা আদায়ের এত তাড়াতাড়ি?

কৃষ্ণা। হাঁ।

গৃহিণী। অন্য উপায় কিছু নাই কি?

কৃষ্ণা। উপায় কিছুই নাই—সুদে-আসলে যে টাকা হইয়াছে, আমার সমস্ত সম্পত্তিতেও পরিশোধ হইবে না।

গৃহিণী। তবে কি সত্য সত্যই পথে দাঁড়াইতে হইবে?

কৃষ্ণা। উপায় নাই।

গৃহিণীরও মুখখানা একটু ম্লান হইয়া গেল। তিনি ম্লান মুখে গৃহান্তরে গমন করিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল,—প্রকৃতির পটে আর একটী নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইতেছিল। শরৎকাল,—আকাশ নির্ম্মল—সেই নীল-নির্ম্মল আকাশের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে পূর্ণিমার চাঁদ তখন শ্বেতবর্ণে ষোলকলায় উদিত হইতেছিলেন।

কর্ত্তা ও গৃহিণীতে যখন কথোপকথন হইতেছিল,—তখন আড়ালে দাঁড়াইয়া, কমল তাহা শুনিতেছিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন দেখিয়া, কমলও বড় বিষণ্ণ চিত্তে চলিয়া গেল। সে একেবারে বাটীর বাহিরের বাগানে গিয়া, একটা বকুলকুঞ্জের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সে বড় অন্যমনস্ক,—বড় চিন্তাক্লিষ্ট। বকুলকুঞ্জবিথীকায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, কি জন্মই আমি পাইয়াছিলাম; জানি না পূর্ব্বজন্মে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম, তাহারই নরক-নিশ্বাসে আমার এই দুর্দ্দশা! জন্মিয়াই পিতামাতার স্নেহ-করুণ-বাহু-পাশ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছি—যিনি আনিয়া প্রতিপালন করিলেন—শিক্ষা দীক্ষা দিলেন,—আমারই জন্য, আজি তাঁহারা সপরিবারে অন্নের কাঙ্গাল হইতে বসিলেন। কেন, আমি এত কি

মহাপাতকী যে, আমার উপর করুণা করিলেই তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে ?

আর, যে আমাকে ভালবাসার অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত করিতে প্রেমের শত বাহু সৃজন করিতেছিল,—সেও ত আমারই জন্য কারাগারে! সে কি আর আসিবে না! আর কি তাহাকে পাইব না! উঃ! সে দিন কি দুঃস্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। যেন আমার বুক হইতে রবিকে, কে সবলে টানিয়া লইল,—আমি তাহার বলের সহিত পারিলাম না,—কেবলি হতাশে-পিয়াশে চাহিয়া রহিলাম। তাহার 'পর, রবি রক্তাম্বর পরিধান করিয়া, ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া চলিল—আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম। এ ছুটাছুটি যেন কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া করিয়াছি - তবু পাই নাই! স্বপ্নের কথা মনে পড়িলে, এখনও শরীর শিহরিয়া উঠে। সে কি নাই! লোকে বলে, রক্তবস্ত্র পরিধান করিতে দেখিলে অমঙ্গল হয়,—তাহা কি সত্য? সত্য হইলে কি করিব? সে কি আর আসিবে না!

কমল, সারাটী রজনী জাগিয়া জাগিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই বকুল-কুঞ্জে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ক্রমে যামিনী শেষ যামে পদার্পণ করিল,—আকাশের সমস্তখানি পথ অতিক্রম করিয়া, চন্দ্রদেব অমৃত বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সুধাকরে উদ্যানের ফুল-ফল, লতা-পাতা, কমলের ম্লান-সৌন্দর্য্য মাখান সুন্দর মুখ সকলই ভাসিয়া যাইতেছিল।

অনেকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে, কমলের মন যেন কোন অপার্থিব ভাবে বিভোর হইল। বহুত্ব অপনোদিত হইয়া, একত্বের উদয় হইল। হৃদয়-খানি কেবল রবির প্রেমে ভরিয়া গেল। সে সেই সুরভি-সুবাস-পুষ্প-ভারাবনত বকুল-কুঞ্জ-বীথিকায় বসিয়া, তাহার সুরভি-সুকণ্ঠে তখন কেবল প্রাণের গাথা গাহিতেছিল। দিকে দিকে—সমীরে সমীরে—

জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়—কুসুমে কুসুমে—তাহার মধুর কণ্ঠ-স্বর হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল।

সে গাহিতেছিল,—

আমি তোমারি তরে রয়েছি জাগিয়া
কত জনম জনম ধ'রে,
আমি তোমারি তরে জনম জনম
ভ্রমিতেছি শুধু ঘুরে।
তুমি কি হবে না আমার—
আমার হবে না কেন!

দেখ ফুলের উপরে শিশিরের বাস
রবি-ফুলে প্রেম ব'লে,
পিয়াসা বুঝিয়া আদর করিয়া
(ভানু) শিশিরে বুকে তোলে।
তুমি আমায় নিবে না কেন—
তুমি আমি এক হব না কেন?

আমার বেড়েছে পিয়াসা হৃদয়ের আশা
কেবল তোমারে চাই,
তোমারই পরাণে পরাণ মিলাব
আন মনে কিছু নাই।
একবার এস হে সখা—
মিশিয়া এক হও না কেন?

যদি এ পিয়াসা মোর না পূরালে তুমি
আর মরিব কত ঘুরে,

আমার জনম কাটিছে পিয়াসা বাড়িছে
কেবল তোমারি তরে।
আর পারি না বঁধু—
সাধ মিটে না কেন ?

তন্ময় হৃদয়ের সংস্কারসমুত্থিত গীত শ্রবণ করিতে করিতে চন্দ্রদেব পশ্চিম আকাশের অনেকখানি নিম্নে নামিয়া পড়িতেছিলেন। কমল বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য—এমন সময়, একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল। গান তাহার হৃদয়ের পরতে পরতে মিশিতে-ছিল।—যে আসিল, সে রবীশ্বর। রবীশ্বরের কক্ষদেশে দরিয়াবাজ প্রদত্ত সেই রত্নপূর্ণ পেটিকা।

প্রেমের কি মহান্ মিলনের ভাব-তরঙ্গ! যাহাকে এখন দেখিবার কোন আশাই ছিল না—রবীশ্বর দেখিলেন, সেই কমল উদ্যানে বসিয়া একাকিনী গান গাহিতেছে। ফুল্ল জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল কিরণে রবীশ্বর দেখিলেন—কমলের শরীরে যেন লাবণ্য নাই—কেবলই জ্যোতিঃ। মুখে ভাস্বর দৈবী-দীপ্তি। চক্ষুতে স্বর্গীয় সুরভি। রবীশ্বরের স্বপ্ন-দৃষ্ট মূর্ত্তিতে আর এ মূর্ত্তিতে প্রভেদ নাই। রবীশ্বর জগৎ ভুলিলেন,—আপনার অবস্থা ভুলিলেন,—দরিয়াবাজের আদেশ বিস্মৃত হইলেন। তিনি ছুটিয়া গিয়া, কমলের পদতলে রত্ন পেটিকাটী রক্ষা করিয়া প্রেম-কারুণ্য কণ্ঠে ডাকিলেন, "কমল,—কমল, সারারাতি কি একাকিনী এই উদ্যানে কাঁদিয়াই কাটাইয়াছ ?"

কমল, চাহিয়া দেখিল। তাহার প্রাণের মাঝে কোন্ এক স্বপ্ন রাজ্যের অমৃতধারা ছুটিয়া গেল। কোন্ অজানা সুরের প্রেমের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কমল ও রবি দু'দণ্ডের জন্য দুইয়ে মিলিয়া এক হইল,—তাহারা দ্বৈতভাবের সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া, অদ্বৈতের কোলে

চলিয়া পড়িল। সহসা বকুল-কুঞ্জের মধ্য হইতে একটা শ্যামা বড় উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। পাখীর ডাকে, তাহাদের জ্ঞান ফিরিল—দৈবভাব ফিরিয়া আসিল।

রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমল, কেমন আছ?"

কমল বলিল, "বেশ আছি—তুমি আমায় ছেড়ে আর যেও না।"

রবি। এস না কেন,—দুইজনে বিতস্তার জলে শয়ন করিগে।

কমল। চল,—এমন সুখের বাসরে—সুখের মরণ, বুঝি আর হবে না, রবি।

সহসা বাগানের এককোণ হইতে একটা পেচক অতি কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। কমল চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ও কি!"

রবি সস্নেহে কমলের শিশিরমথিত সমীরপর্য্যুদস্ত অসংযত চুলগুলি অঙ্গুলিসঞ্চালনে নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,—"বনবিহারিণীর বনপক্ষীর স্বরে ভয় হইল কেন?"

কমল রবীশ্বরের বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল,—"পেঁচকের কণ্ঠ-স্বর যে, অত কঠোর—অত ভয়ঙ্কর,—তাহা আমি আগে শুনি নাই।"

রবি। ঐ পেচক কণ্ঠের ঐ কর্কশস্বর, আমাদের সাধের মরণে বাধা দিতেছে।

কমল। আমাদের মরণে,—আমাদের মিলনে বুঝি সমস্ত জগৎটা প্রতিবাদী। আমি যখন তোমার ছবি আঁকিয়া তাহার চরণতলে আমার ছবি আঁকিতে যাই, তখনই আমার নয়ন-আসারে তাহা ধৌত হইয়া যায়—বুঝি চিত্রেও আমাদের মিলন অসম্ভব।

রবি। কমল!

কমল। কেন?

রবি। ঐ দেখ—পূর্ব্বগগনে উষার আলো দেখা যাইতেছে।

কমল। তাহাতে আমাদের কি ?

রবি। আমি কারাগারে ছিলাম, জান ?

কমলের হৃদয় চমকিয়া উঠিল,—পূর্ণজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে বলিল,—"তুমি জেলখানা হইতে পলাইয়া আসিয়াছ ?"

রবি ! হ্যাঁ,—প্রিয়তমে। আরও কিছু আছে।

কমল। আর কি ?

রবি। রাণী চন্দ্রাকে হত্যা করিয়া আসিয়াছি।

কমল। ও মা ! সে কি ?

রবি। সত্য।

কমল। কোথায় হত্যা করিলে ?

রবি। কারাগারে।

কমল। কারাগারে সে কি করিতে গিয়াছিল ?

রবি। ঠিক জানি না—সম্ভবতঃ আমায় উদ্ধার করিতে !

কমল। তবে তাহাকে হত্যা করিলে কেন ?

রবি। তাহা ঠিক জানি না। তবে হত্যা করিয়াছি—ইহা নিশ্চয়।

কমল। সর্ব্বনাশ করিয়াছ। কা'ল সকালেই তোমাকে ধরিতে সৈন্ত বাহির হইবে।

রবি। নিশ্চয়ই।

কমল। এক্ষণে উপায় ?

রবি। উপায়ের কথা দরিয়াবাজ বলিয়া দিয়াছেন।

কমল। দরিয়াবাজ ! এ রাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ কোথায় পাইলে ?

রবি। তিনি যোগ-বলে সমস্ত ঘটনা জানিয়া, পথে আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

কমল। তিনি কি উপায় নির্দ্দেশ করিলেন ?

রবি। শানদেশে যাইতে বলিলেন।

কমল। শানদেশে ?—মণিপুর ছাড়িয়া ?

রবি। হাঁ।

কমল। আমায় সঙ্গে নেবে ?

রবি। না।

কমল। না ;—কেন ?

রবি। দরিয়াবাজ নিষেধ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, তাহাতে বিপদ আছে।

কমল। যদি তোমার বিপদ হয়,—আমি যাব না। তুমি কবে আসিবে ?

রবি। তিনি বলিলেন,—ঘটনা-স্রোত যে দিন লইয়া আসিবে।

কমল। দীর্ঘ দিন না দেখিয়া বাঁচিব ?

রবি। আত্মসংযম শিক্ষাই যোগের মূল—যোগী কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকট তাহা শিক্ষা করিও।

কমল। প্রেম শিক্ষার জন্যই কি যোগ-সাধনা নহে ?

রবি। তাহা,—বটে। কিন্তু সসীম কেন ?

কমল। বুঝিলাম—তাই শিখিব। ফলে-ফুলে, পাহাড়ে-নির্ঝরে, জলে-স্থলে, কুসুমে-পরাগে,—মলয়ে-তরঙ্গে তোমায় দেখিব।

রবি। তবে এখন যাই ?

কমল। এখনই ?

রবি। ঐ দেখ,—ঊষা দেখা দিয়াছে।

কমল। ও ঊষা নহে—কোন নক্ষত্রের আলো হইবে।

রবি। না, কমল,—প্রকৃতই ঊষা। আমায় বিদায় দাও। মরণে ভয় করি না,—দরিয়াবাজের আদেশ ভঙ্গ হইবে বলিয়া পুনঃপুনঃ যাইতে চাহিতেছি।

কমল। তোমার ও পেটিকায় কি ?

রবি। ভুলিয়া গিয়াছিলাম,—ও পেটিকায় ধন-রত্ন।

কমল। সঙ্গে লইবে ?

রবি। না,—তোমায় দিয়া যাইব।

কমল। আমি উহা কি করিব ?

রবি। প্রয়োজনে লাগিবে।

কমল। কত আছে ?

রবি। পেটিকা পূর্ণ। আমি কেবল উহার মধ্য হইতে একছড়া সোণারকণ্ঠী বাহির করিয়া লইয়াছি!

কমল। কেন ?—সোণারকণ্ঠী কি হইবে ?

রবি। দরিয়াবাজ সঙ্গে লইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি জানি, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর আমার কাকার অনেকগুলি টাকা ধারেন। এই পেটিকার ধন-রত্নগুলি তাঁহাকে দিও—তিনি ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন।

কমল। কা'ল তোমার কাকা ঋণের দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন।

রবি। এই অর্থ দ্বারা তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা হইবে।

রবীশ্বর ঊষার আবিল জ্যোৎস্নায় বিদায় লইলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল,—কমল ততক্ষণ চাহিয়া থাকিল। তারপর অদর্শনে কাঁদিয়া ফেলিল। বকুল-কুঞ্জ-বীথিকায় বসিয়া কমল রবির বিরহে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

ঊষা বিদায় লইল,—তরুণ তপনের প্রথম রশ্মিকিরীট আসিয়া, পূর্ব্বাভিমুখী কমলের নৈশোৎসবের প্রভাতী পুষ্পের মত ম্লান মুখখানির উপরে পতিত হইল। তাহার পরে, আরও কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল।

এদিকে প্রভাত হইতেই রাজকীয় পদাতিকদ্বয় ও এক জন রাজকীয়

কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া রতনচাঁদ কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নামে একদিন, এই মণিপুরে দোহাই ফিরিত। কিন্তু এখন সে দিন নাই—মণিপুরেশ্বর যে দিন সিংহাসন-চ্যুত হইয়াছেন, সেই দিনেই সে সম্ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। মর-জগৎটা এমনই বিচিত্রতাময়।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "কিছু দিন সময় দিলে, আমি টাকা পরিশোধ করিতে পারি।"

কর্ম্মচারী বলিল, "কি করিব মহাশয়! টাকা আমার নহে। আপনার মহাজনকে বলুন—উনি স্বীকৃত হইলে, আমার আপত্তি কি?"

রতনচাঁদ বলিলেন,—"সে হইবে না। ক্রোকী পরওয়ানা জারি করুন। উহাদিগকে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ করুন।"

কর্ম্মচারী মহাশয় রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"মহাশয়, যদি এই দণ্ডে টাকা মিটাইতে পারেন, মিটাইয়া দিন। নতুবা আপনি সপরিবারে বাড়ী হইতে বাহির হউন।"

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর ম্লানমুখে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া মনে মনে বলিলেন, "ঠাকুর, তোমায় লইয়া এখন কোথায় যাই? আমার বন ও ভবন সমান! কতকগুলি কুপোষ্য, কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা আছে।"

ঠিক এই সময়ে, কমল রৌপ্য পেটিকাটী কক্ষে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কৃষ্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উহাতে কি আছে, মা?"

কমল সেটা নামাইয়া বলিল,—"খুলিয়া দেখুন।"

কৃষ্ণানন্দ তাহা খুলিয়া দেখিয়া, গলদশ্রুলোচনে বলিলেন,—"কোথায় পাইলে মা! হরি বুঝি দয়া করিয়াছেন?"

কমল বলিল,—"যেখানে পাইয়াছি, বলিব। ঋণ পরিশোধ করুন।"

তখন একজন জহুরী ডাকিয়া, কতকগুলি রত্ন বিক্রয় করিয়া সুদে-আসলে রতনচাঁদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হইল।

রতনচাঁদ ও রাজকর্ম্মচারী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর, কমলকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, এত ধন-রত্ন তুমি কোথায় পাইলে?"

কমল, যে অবস্থায় তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকটে নিবেদন করিলে, কৃষ্ণানন্দ বলিলেন,—গোবিন্দজী নিজের অর্থ আনাইয়া, নিজদাসকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন! মা কমল; তুমি রবীশ্বরের জন্য কিছুমাত্র ভাবিও না। দরিয়াবাজ সহজ মানুষ নহেন,—তিনি দিব্যনেত্রে দূর-দর্শন করিয়া রবীশ্বরকে যে পথে লইবেন, সে পথ তাঁহার মাঙ্গল্যপন্থা, সন্দেহ নাই!"

কমল, হৃদয়কে বুঝাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ ভাবিতে লাগিলেন,—প্রেমের আকর্ষণ, কি মহা আকর্ষণ! যুগ-যুগান্তরেও বিচ্ছিন্ন হয় না! তবে যাহা রূপজ মোহ—তাহা দুই দণ্ড স্থায়ী! কিন্তু তাহার পরিণাম-বিষ-দংশন সাধারণ নহে।



তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মণিপুরাধিপতিকে পরাজিত করিয়া, পামহেবা সিংহাসন গ্রহণ করিলে, বঙ্গদেশাগত সৈনিক যুবক বিজয়সিংহ পলায়ন করিয়া, শানদেশস্থ পঙ্গ নামক স্বাধীনরাজ্যে গমন করেন; এবং তথায় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হয়েন,—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে সেই সম্বন্ধীয় বিস্তৃত কাহিনী বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিজয়সিংহ, মণিপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া, পঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বতমেখলা শানপ্রদেশও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সমষ্টি! মণিপুর প্রভৃতির ন্যায়, এদেশেও হৃদয়প্লাবী শরীরি-সৌন্দর্য্যে নিমজ্জিত। সুন্দরীর দেহ-ধূপের ন্যায়, ইহার আতট সৌন্দর্য্যে মানুষের বহিরিন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তুলে! ভালবাসা এখানে বুঝি, শুধু দেহজ। কোন এক সুশ্যাম গিরিশৃঙ্গ, উপলভেদী নির্ঝর বা মৃগপদাঙ্কিত বনস্থলী জীবনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আনন্দময় ঘটনার ন্যায়—মানবের হৃদয় স্পর্শ করে। এই কোমল উপভোগ-স্মৃতি শুষ্ক হৃদয়কে চির বসন্তের নবীন কিশলয়ে আবৃত করিয়া রাখে। কখন কখন প্রফুল্ল দিবসে, চকিতদৃষ্ট বনকুসুম-শোভী সরিত্তট বা পরাগ-রঞ্জিত উদ্যান-বীথিকার দিকে মানুষের চিন্তা-

স্রোত আপনি ছুটিয়া যায়। বসন্ত-প্রভাতে, পথ-পার্শ্বে শুভ্রোজ্জ্বলবেশা কোন ইন্দীবরাক্ষী জনপদ-বধ প্রাণে ও দেহে অপূর্ণ কামনা-মদিরা ঢালিয়া দিয়া, যাইবার সময় হৃদয়-পটে যে ছবি রাখিয়া যায়,—তখন পথিকের মনে হয়,—সুখের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চলিয়াছি—সেই অবিরাম আলেখ্যবৎ, এই সৌন্দর্য্য অবিনাশী। মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল তরঙ্গ বক্ষে করিয়া ক্ষিতি-বক্ষে, রক্তবাহিনী শিরার ন্যায়, কৃশ তটিনী-সমূহ ছুটিয়া চলিয়াছে।

বিজয়সিংহ, সেই পর্ব্বত-কুন্তলা সুন্দর নগরে উপস্থিত হইয়া, কি প্রকারে যে রাজা বা রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন,—কি প্রকারে আপন অভীপ্সিত কার্য্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। প্রায় তিন মাস অতীত হইতে চলিল, তথাপি তিনি আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন না। চারি পাঁচ খানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, দরবারের দুই একজন কর্ম্মচারীকে এজন্য কিছু কিছু উৎকোচ প্রদানও করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই।

একদিন, সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পরে, বিজয়সিংহ গ্রামোপান্তে একটা নদী-কিনারে পদচারণা করিতেছিলেন, আর মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—এখানে থাকিয়া আর কি করিব, এত দিনের মধ্যে রাজা বা মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। কাযেরও কোন সুবিধা হইল না,—বেকারে আর কতদিন বসিয়া থাকিব!

সহসা তাঁহার চক্ষু নদী বক্ষঃস্থ একখানা নৌকার উপর পতিত হইল। নৌকার মধ্য হইতে চীৎকার শব্দ হইতেছে, সে শব্দে বোধ হইতেছে, নৌকারোহিগণ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে,—বিজয়সিংহ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না; নদী-বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া

সাঁতার কাটিয়া গিয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকার মধ্যে উজ্জ্বলিত দীপালোক—বিজয়সিংহ দেখিলেন, একটী বৃদ্ধ পুরুষ ও বসনাবৃতা একটী রমনী চারিজন ভীমকায় দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, বিপদে—বিষাদে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তিনি তখনই অসি উন্মুক্ত করিয়া দস্যুগণের লুণ্ঠনব্যাপারে বাধা দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দস্যুগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রণকৌশলাভিজ্ঞ—সিংহবলদৃপ্ত বিজয়সিংহের বল সহ্য করিতে না পারিয়া, দস্যুগণ জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়া নৌকা তীরে লাগিল।

নৌকারোহী বৃদ্ধ বলিলেন,—বীরবর; তুমি কে?

বিজয়। আমি বিদেশী—বিপন্ন। এই দেশে চাকুরীর প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলাম।

বৃদ্ধ। কি চাকুরীর আশা কর?

বিজয়। আমি যুদ্ধবিদ্যা জানি—সৈন্যদলে প্রবেশ লাভই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঘটিল না।

বৃদ্ধ। কেন?

বিজয়। আজি তিন মাস এখানে আসিয়াছি—ইহার মধ্যে রাজা বা মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেই পারিলাম না।

বৃদ্ধ। তাহা নাই বা হইল,—সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেও সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে পার।

বিজয়। তাহা পারি বটে। কিন্তু আমার বিশেষরূপেই জানা আছে—তাঁহারা আনুগত্যাদি অনুসারেই পদ প্রদান করিয়া থাকেন, ক্ষমতা দর্শনে পদ দান করেন না। ইচ্ছা ছিল—আমার শৌর্য্য-বীর্য্য রাজা ও মন্ত্রীকে দেখাইয়া, তদনুচিত পদ লাভ করিব।

বৃদ্ধ। এখন কি করিবে, ভাবিতেছ?

বিজয়। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও যখন তাঁহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না,—তখন অগত্যা আগামী কল্য এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইব—স্থির করিয়াছি।

বৃদ্ধ। আমাদিগকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে তুমি কেন এত কষ্ট করিলে?

বিজয়। আমরা ক্ষত্রিয়,—বিপন্নের উদ্ধারই আমাদের ধর্ম্ম।

এই সময় বিজয়সিংহ একবার বস্ত্রাবৃত রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বস্ত্রের মধ্য হইতে দুইটী স্থির পদ্মের ন্যায় চক্ষু, তাঁহার মুখের উপর সংন্যস্ত রহিয়াছে,—জীবনে এমন চাহনি বিজয়সিংহ বুঝি আর কখনও দর্শন করেন নাই। বিজয়সিংহ সে দিকে চাহিবামাত্র রমণীর চক্ষু নত হইল।

বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুমি এদেশ পরিত্যাগ করিও না। এই স্থানেই তোমার চাকুরী হইবে।"

বিজয়। সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছি—রাজার বা মন্ত্রীর দর্শন কিছুতেই পাইলাম না।

বৃদ্ধ। আগামী কল্য বৈকালে, মন্ত্রীর বাড়ী যেও—দর্শন পাইবে।

বিজয়। মহাশয়!—কত দিন গিয়াছি—কত যত্ন-চেষ্টা করিয়াছি। আপনি বোধ হয়, এ দেশের লোক নহেন,—তাই জানেন না।

বৃদ্ধ। ভাল,—অনেকবার চেষ্টা করিয়াছ, কাল আর একবার যাইয়া দেখিও। তারপরে না হয়, এ দেশ পরিত্যাগ করিও।

বিজয়। ভাল,—আপনার পরামর্শ ই শুনিব।

ইতিমধ্যে সেই সরিত্তটে দুইখানি শিবিকা আসিয়া পঁহুছিল,—তাহার একখানিতে বৃদ্ধ ও অপর খানিতে রমণী উঠিয়া বসিলেন,—বাহকেরা তাহা লইয়া নগর মধ্যে চলিয়া গেল।

বিজয়সিংহ ভাবিলেন, বৃদ্ধ কোন ধনবান্ সওদাগর হইতে পারেন। যদি উঁহার পরিচয় জানিয়া লইতাম—ভাল হইত।

তৎপর দিবস, বৈকালে বৃদ্ধের কথামত বিজয়সিংহ মন্ত্রিভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য দিবস যে প্রহরী মহাপ্রভুরা সেলামী লইয়াও সদ্ব্যবহার করিতেন না,—আজি তাঁহারা সেলাম করিয়া বিজয়-সিংহকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। একজন কর্মচারী আসিয়া তাঁহাকে আদর-আহ্বান করিয়া মন্ত্রীর দরবারে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

বিজয়সিংহ স্তম্ভিত! তিনি বুঝিতে পারিলেন, কন্যকার নৌকারোহী বৃদ্ধ অন্য কেহই নহেন, স্বয়ং মন্ত্রী মহাশয়।

যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া বিজয়সিংহ মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। মন্ত্রী, বিজয়ের করধারণপূর্ব্বক নিজ সন্নিধানে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, "ভদ্রযুবক! তুমি কা'ল আমার যে উপকার করিয়াছ—তাহার ঋণ অপরিশোধ্য। আমি লোকজন সঙ্গে না লইয়াই, কেবল আমার কন্যাকে লইয়া শ্রীপাট দর্শনে গমন করিয়াছিলাম—ভুলের ফল পাইতাম,—তুমিই আমাকে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

বিজয়সিংহ বিনীতস্বরে বলিলেন, "আমি নূতন বা অদ্ভুত কার্য্য কিছুই করি নাই—যাহা মানুষে করিয়া থাকে, তাহাই করিয়াছি।"

মন্ত্রী। এক্ষণে তুমি আমার নিকটে কি চাহ?

বিজয়। আমার মনের ভাব—প্রাণের প্রার্থনা, বোধ হয়, কল্যই অবগত হইয়াছেন।

মন্ত্রী। হাঁ,—অদ্যই তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাজ-সমীপে লইয়া যাইব এবং যাহাতে সৈন্যবিভাগে একটী সম্ভ্রমের পদ পাইতে পার, তাহা করিব।

বিজয়সিংহ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নীরব রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ)*(ঃ০—

বিজয়সিংহ, মন্ত্রীর অনুগ্রহে সৈনাবিভাগে চাকুরী লাভ করিয়া পাঁচশত সৈন্যের মনসবদার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্য-লক্ষ্মী যখন যাহার প্রতি প্রসন্না হয়েন, তখন তাহার যশ ও খ্যাতি নারিকেল-ফলাম্বুবৎ কোথা হইতে, কেমন করিয়া, কোন্ অদৃশ্যপথে আগমন করিয়া থাকে। বিজয়সিংহেরও ভাগ্য প্রসন্ন—তিনি কতকগুলি ছোট-খাট যুদ্ধে আপন শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া, রাজা ও রাজকীয় কর্ম্মচারিবর্গের তুষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন।

এই সময়, ব্রহ্মরাজ শানপ্রদেশ আক্রমণ করেন,—এক বার, দুইবার, তিনবার—পুনঃপুনঃ আক্রমণে পঙ্গ ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল—তৎপরে, বিজয়সিংহের বলদৃপ্ত ভুজ-বলেই ব্রহ্মরাজ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পলায়ন করেন। ইহাতে বিজয়সিংহের খ্যাতি আরও বাড়িয়া উঠে,—লোকের মুখে মুখে তাঁহার গুণ গান হইতে লাগিল। রাজাও তৎপুরস্কার স্বরূপ বিজয়সিংহকে সহকারী সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এবং মন্ত্রী তাঁহার স্নেহের কন্যা মুরলার, বিজয়ের উপর প্রণয়ানুরাগ বুঝিয়া, বিজয়ের সহিত মুরলার বিবাহ দিলেন। বিজয়, এখন হইতে পঙ্গের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি হইলেন। তিনি সহকারী সেনাপতি—তিনি মাননীয় মন্ত্রীর প্রিয় জামাতা।

কিন্তু একজনের হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। সে থঙ্গালসিংহ। থঙ্গালসিংহ রাজবংশসম্ভূত ও বহুদিন হইতে সৈনিক বিভাগে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল—সহকারী সেনাপতির পদে তাহারই দাবী সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু রাজসরকার, তাহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, সেই পদে বিজয়সিংহকে অভিষিক্ত করিলেন। ইহাতে থঙ্গাল জ্বলিয়া উঠিল,—রাজসরকারের

উপরে রাগ না হইয়া, রাগ হইল বিজয়সিংহের উপরে—সে মনে মনে বিজয়ের প্রাণ-সংহারে প্রতিজ্ঞা করিল। সর্ব্বদাই সে বিজয়ের ছিদ্রান্বেষণে নিরত রহিল।

ইহার কিছু দিন পরে পঙ্গের রাজা কম্বাসিংহ, কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়-স্বজন, তাঁহার ব্যাধি-জন্য ম্রিয়মাণ হইল,—চিকিৎসকগণও সম্পূর্ণ ভরসা করিতে পারিতেছেন না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—স্বর্ণসিংহাসনে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় পঙ্গাধিপতি শায়িত। গৃহমধ্যে সুবর্ণ দীপে সুস্নিগ্ধ তৈলে দীপ জ্বলিতেছিল,—শিয়র দেশে একটী চারুকান্তি-ফুল্লেন্দীবর-নয়না বালিকা ও পার্শ্বদেশে রাণী বসিয়া রহিয়াছেন। রাণীর মুখচন্দ্রমা মলিন। এমত সময়ে সেই গৃহে রাজাদেশে বৃদ্ধ মন্ত্রী আগমন করিলেন। রাণী উঠিয়া গিয়া একটু দূরে দাঁড়াইলেন।

যথাযোগ্য অভিবাদনানন্তর করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া মন্ত্রী বলিলেন,—"অধীন ভৃত্যকে আসিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন—দাস উপস্থিত।"

রাজা উপাধানের উপরে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"ঐ আসনে উপবেশন কর।"

আসনখানা রাজ-শয্যার অতি সন্নিকটে ছিল। মন্ত্রী তাহাতে উপবেশন করিলে, রাজা বলিলেন,—"যে রোগ হইয়াছে, এবার বোধ হয় বাঁচিব না।"

মন্ত্রী। ভয় কি মহারাজ? জড়দেহে ব্যাধির অবশ্যম্ভাবিতা নিত্য। ব্যাধি আরোগ্য হইবে বৈ কি!

রাজা। তাহা হউক,—যদি বাঁচি ভালই, কিন্তু তোমাকে ডাকিয়াছি,—তুমি আমার বড় বিশ্বাসী অমাত্য। যদি আমি না বাঁচি—আমার কতকগুলি অনুরোধ আছে—প্রতিপালন করিও।

মন্ত্রী। দাস চিরকালই দাস—তবে মরণের কথা বলিয়া আমাদিগকে কাঁদান কেন, প্রভু!

রাজা। আমি যাহা বলিয়া যাই—শোন। চঞ্চলা আমার একমাত্র সন্তান—ঐ একটী মেয়েই আমার সব—বয়সও উহার সবে ছয় বৎসর. এই শিশুকালে উহাকে ফেলিয়া যাই; তুমি রক্ষা করিবে, শিক্ষা দান করিবে—সৎপাত্র দেখিয়া চঞ্চলার বিবাহ দিবে।

রাজার রোগ-ক্লিষ্ট-নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া উপাধানে পতিত হইল। দূরে দাঁড়াইয়া রাণী আঁচলে চক্ষু মুছিলেন। বালিকা চঞ্চলা পিতার শিয়রদেশে বসিয়া, সে কথা শুনিয়া, ভাবিল—বাবা আমার বিবাহের কথাই বলিতেছেন।

মন্ত্রী। আদেশ প্রাণ দিয়াও প্রতিপালন করিব। কিন্তু ভয় কি!

রাজা। আমার মৃত্যুর পর, শত্রুগণ অবশ্যই রাজ্য আক্রমণ করিবে; তোমায় রাজ্য রক্ষা বিষয়ে অধিক উপদেশ কি দিব—চঞ্চলাকে দেখিয়া, রাণীর মুখ চাহিয়া—তুমিই সাবধানে রাজ্য রক্ষা ও প্রজাপালন করিও।

মন্ত্রী। আমি আজ্ঞাধীন—আজ্ঞা প্রতিপালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু ও সকল কথা এখন কেন?

রাজা। আর একটী কায আছে—সে কাযটী এখনই সম্পন্ন করিতে হইবে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন।

রাজা। ব্রহ্মদেশে এক ধনী ব্যবসায়ীর সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল,—তুমি অবগত আছ।

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ—তাহা জানি।

রাজা। আজি চারি বৎসর গত হইল, তিনি তাঁহার প্রভা নাম্নী কন্যাকে আমার নিকট রাখিয়া পশ্চিম দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করেন তাহার

পর এখানে ফিরিয়া আসেন নাই। মধ্যে ব্রহ্ম হইতে তাঁহার এক লিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—তাঁহার দেহক্ষয়কারী রোগ হইয়াছে, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই—তাঁহার কন্যাকে সেই সময় পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন আমাদের সহিত ব্রহ্মরাজের সমর চলিতেছিল। সে দেশে, এ দেশের লোক কিরূপে যাইবে বলিয়া পাঠান হয় নাই। তৎপরে আর আমার সে বন্ধুর কোন সংবাদ পাই নাই। তিনি বাঁচিয়া আছেন, কি মরিয়া গিয়াছেন—তাহারও সংবাদ অবগত নহি। যাহা হউক, কোন বিশ্বাসী সৈনিকের সহিত সেই প্রভাকে আগামী কল্য প্রভাতেই ব্রহ্মদেশে, তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

মন্ত্রী। সে কন্যাটীর এখন বয়স কত ?

রাজা। সতর আঠার হইবে। সে সুন্দরী।

মন্ত্রী। যদি সেখানে গিয়া তাহার পিতার সাক্ষাৎ না পায় বা মৃত্যু-সংবাদ পায় ?

রাজা। সঙ্গে করিয়া পুনরায় এখানে আনিবে। যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি—তাহার একটা উপায় করিয়া যাইব, সেই জন্যই ত এত শীঘ্র যাইতে বলিতেছি।

মন্ত্রী। সেই সুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে লইয়া, সদ্ভাবে যাইতে পারে—এমন বিশ্বাসী সৈনিক কে ?

রাজা। কেন,—বিজয়সিংহ !

মন্ত্রী। কিন্তু—

রাজা। কিন্তু কি ?

মন্ত্রী। শানপ্রদেশে বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা আছে,—পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইতেছে,—লুসাইগণ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতেছে।

রাজা। তোমরা কি ব্যবস্থা করিতেছ?

মন্ত্রী। আমরাও যুদ্ধোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিতেছি।

রাজা। কিন্তু আর কাহাকেও বিশ্বাস হয় না—বিশেষতঃ আমার সেই বন্ধুগচ্ছিত একবাক্স হীরক আছে—তাহাও ঐ সঙ্গে যাইবে।

"তবে তাহাই হইবে—বিজয়সিংহই ব্রহ্মদেশে গিয়া আপনার বন্ধু-কন্যাকে রাখিয়া আসিবে।"—এই কথা বলিয়া, মন্ত্রী বিদায় হইলেন।

বিজয়সিংহ যথাসময়ে রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলেন। মুরলাকে বলিলেন, "আমি রাজার এক বন্ধু-কন্যাকে লইয়া ব্রহ্মদেশে যাইব।"

মুরলা বলিল,—"আমিও সঙ্গে যাইব।"

বিজয়। কেন, তুমি সঙ্গে যাইবে কেন?

মুরলা। মহারাজার বন্ধু-কন্যা প্রভা যুবতী ও সুন্দরী।

বিজয়। তাহাতে তোমার ভয় কি?

মুরলা। ভয়, পাছে আমার কাঁদাভাঙ্গা কলসীটীকে গলায় বাঁধিয়া সে সাগরে ভাসিয়া পড়ে।

বিজয়। সে ভয় নাই।

মুরলা। ভরসাও নাই—পুরুষ পতঙ্গ বই ত নয়, আগুন দেখলে সামলাইতে পারে না।

বিজয়। যদি এত ভয়, তবে যাইতে পার—কিন্তু সে বড় দূর-দেশ।

সোহাগে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, মুরলা বলিল,—"শুনিয়াছি ব্রহ্মদেশ স্বর্গের ন্যায় সুন্দর। তাই আমার হৃদয়বল্লভের সহিত, সেই স্বর্গ দর্শনে যাইব।"

বিজয়। তত দূরদেশে যাইতে তোমার ভয় হইবে না?

মুরলা। যাহার স্বামীর তরবারিতে শত্রুকুল ভয়ে থরহরি কম্পিত—যাহার স্বামীর বীর-ভুজ-বলে দেশ সুশাসিত,—সে তাহার স্বামীর সঙ্গে

যাইতে ভীত হইবে কেন? স্বামীর গুণ কি স্ত্রীতে পঁহুছে না? তৈল-পায়িকা কাচপোকাকে ভাবিয়া ভাবিয়া কাচপোকা হয়—আর শয়নে স্বপনে স্বামীকে ভাবিয়া ভাবিয়া স্ত্রীলোক কি স্বামীর গুণ বা স্বভাব পায় না?

বিজয় মুরলাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"তবে তাহাই হইবে। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব। তোমাকে রাখিয়া,—তোমাকে না দেখিয়া আমি থাকিতে পারিব না!"

মুরলা স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া বলিল,—"আমি জন্মজন্মান্তরে বহু তপস্যা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। তোমার যশে, তোমার গুণগানে,—তোমার ধার্ম্মিকতায়,—তোমার তেজস্বিতায়—তোমার বীর-বল দৃপ্ত বাহুর প্রশংসা—শুনিয়া শুনিয়া আমার প্রাণ উথলিয়া উঠে। আর তোমার করুণায়—তোমার প্রেমে আমার হৃদয় উদ্বেলিত—উচ্ছ্বসিত—এ সুখের বুঝি পার নাই। দীনবন্ধু আমায় যে সুখ দিয়াছেন, এমন বুঝি আর কাহাকেও দেন নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রভাতে বিজয়সিংহ ব্রহ্ম-গমনোদ্যোগ করিলেন। তাঁহার সহিত পঞ্চবিংশতি জন সৈন্য সাজিল। তিনখানি শিবিকা প্রস্তুত হইল—বিজয়সিংহ, মুরলা ও প্রভা তিন জনে শিবিকারোহণ করিলেন। সহকারী সেনাপতির গমন জন্য, তোপখানা হইতে উপর্য্যুপরি দশটী তোপ-ধ্বনি হইল। বিজয়সিংহ, ব্রহ্ম-যাত্রা করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে, তাঁহারা বহুবিধ দিগ্দেশ, বহুবিধ ভূধর, বহুবিধ নদীপ্রস্রবণ দেখিতে লাগিলেন। তাহাদের সৌন্দর্য্য-সুষমায়, রূপে-রসে

মন আনন্দে ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। তুষার-মণ্ডিত গিরি-চূড়া, পাদপ-সঙ্কুল গহন বন, কলনিনাদিনী নদ-নদী, কুমুদ-কহ্লার কমলশোভী সরোবর দেখিয়া দেখিয়া মনে সৌন্দর্য্যের কিরণ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অরুণ-রাগ-লোলিত বাল-তপন, কৌমুদী-প্রভা-দীপ্ত নীলাকাশ, গগন-বিহারী মলয় পবন, পত্রপুষ্প-খচিত নিকুঞ্জকানন—তাঁহাদিগের মনে সরস-সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস তুলিয়া দিতেছিল। আনন্দে—উল্লাসে, তাঁহারা পথে তিন দিন অতিবাহিত করিলেন।

চতুর্থ দিবসের সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে,—তাঁহারা এক পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় বিজয়সিংহ চাহিয়া দেখিলেন,—পশ্চিম আকাশে কয়েকখণ্ড কাল মেঘ উদিত হইয়া, রাহু কেতুর ন্যায় পূর্ব্বদিগ্‌ভাগোদিত চন্দ্রকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। তখন বিজয়সিংহ সঙ্গিগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"যেরূপ মেঘের উদয় দেখা যাইতেছে, সত্বরেই জল হইবার সম্ভাবনা, ঝড়ও যে না হইতে পারে, তাহা নহে—অতএব, এই স্থানেই বস্ত্রাবাস প্রস্তুত কর।"

তাহাই হইল,—সেই স্থলেই বস্ত্রাবাস প্রস্তুত হইল। বিজয়সিংহ, মুরলা ও প্রভা বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। সৈন্য ও ভৃত্যগণ একটু দূরে অপর বস্ত্রাবাসে আশ্রয় লইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। চাঁদ উঠিতে উঠিতে মেঘে আবৃত হইয়া পড়িল,—পশ্চিম আকাশের মেঘগুলা একত্র মিলিয়া জমাট পাকাইয়া—সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। রাত্রি অন্ধকারের গাঢ় কালিমায় আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিল।

একটু বাতাস নাই—সর্ব্বত্র নীরব—নিস্পন্দ, স্থির, গম্ভীর। সহসা বায়ুকোণ হইতে একবার বিদ্যুৎ চমকিল—বিদ্যুৎ খেলিল, কিন্তু মেঘের গর্জ্জন হইল না। বিজয়সিংহ বুঝিতে পারিলেন—ঝড় হইবে। তাঁহার

প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল,—ঝড়ের বেগ যদি অধিক হয়, তবে এই ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাস কখনই টিকিবে না।

আবার দামিনী চমকিল—উন্মত্ত জলদ-দলের প্রচণ্ডতা বাড়িতে লাগিল; বজ্রনির্ঘোষ মুহুর্ম্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া, বিশ্ব কাঁপাইয়া, যোজন হইতে যোজনান্তরে ছুটিতে লাগিল। প্রচণ্ড প্রভঞ্জন প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল,—বস্ত্রাবাসের নাতিদূরস্থ বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের একটা প্রকাণ্ড শাখা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বস্ত্রাবাসে থাকা নিরাপদ নহে, বিবেচনা করিয়া, প্রভা ও মুরলার হাত ধরিয়া লইয়া, অতিদ্রুত গতিতে বিজয়সিংহ পর্ব্বতের সানুদেশস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর মেঘেরা আরও গর্জ্জিয়া উঠিল—শত শত বজ্র নিক্ষেপ যেন একসঙ্গে হইল,—চমকে চমকে চপলা চমকিল—মুষলধারে বৃষ্টি হইল।

এইরূপে, এক প্রহর কাল দৈবদুর্য্যোগ হইয়া শেষে নিবৃত্তি পাইল। বৃক্ষ-লতাগুলা অনেকক্ষণ দেবাসুরের সংগ্রামে লড়িয়া লড়িয়া এখন স্থির হইল—মেঘান্তের ক্ষীণ চপলা আরও বার কয়েক চমকিয়া নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে আকাশপটে দুই একটী করিয়া নক্ষত্র দেখা দিল। দুই একবার ডুবিয়া ভাসিয়া চাঁদও মধ্য গগনে উদিত হইলেন। দুঃখের পরে, সুখ আসিল,—নিবিড় অন্ধকারের পরে, নির্ম্মল জ্যোৎস্নার উদয় হইল;—প্রকৃতির মুখে হাসি ফুটিল।

তখন বিজয়সিংহ, পর্ব্বতের গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, জ্যোৎস্না-লোকে চাহিয়া দেখিলেন,—ঝটিকাবেগে তাঁহার বস্ত্রাবাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। দূরস্থ সৈন্যাবাসের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। বিষণ্ণ মনে মুরলা ও প্রভাকে লইয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া, একটা সমতল শিলার উপরে উপবেশন করিলেন।

তিন জনে, পাশাপাশি হইয়া বসিলেন। চন্দ্রকরোজ্জ্বল সমীরণে রূপের তরঙ্গ-লীলা তিন জনের চোখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুরলা বলিল,—"প্রভা একটা গান গাও।"

রাজবাড়ী অবস্থান কালে মুরলা ও প্রভাতে পরিচয় এবং সখীত্ব ছিল।

প্রভা হাসিয়া বলিল,—"গান গাহিবার সময়ই বটে।"

মুরলাও হাসিল। হাসিয়া বলিল,—"কেন, দুঃখ গিয়াছে—সুখ আসিয়াছে। মেঘ গিয়াছে—মলয় বহিতেছে। গান গাও।"

প্রভা। তবে তুমিও গাও।

তখন, মুরলা ও প্রভা উভয়ে কিন্নরী-কণ্ঠ একত্র করিয়া সেই চন্দ্র-কর-স্নাত শিলাতলে বসিয়া গান গাহিল।

তাহারা গাহিতে লাগিল,—

কত নিশি জাগি আছি হে বসিয়া,
(তব) আশা-পথ-পানে চাহি,
তুমি দিবে কি না দেখা জ্যোছনার সনে
ফুলের সুবাস মাখি।

কাতর পরাণ কাতর হৃদয়
শুধু, পিয়াসা-কুয়াসা-ভরা ;—
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত বাসনা
ভ্রমি পাগলিনী পারা।

করুণা করিয়া নিবাও এ জ্বালা
কাতরে তোমায় ডাকি,
(কোথা) আছ তা জানি না বলিয়া
যাইতে বিরত থাকি।

মলয়-চুম্বিত, জ্যোৎস্না-মথিত, ভ্রমর-গুঞ্জিত পর্ব্বতোপরি যুগল কিন্নরীর কণ্ঠস্বর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল—কাঁপিয়া কাঁপিয়া দিকে দিকে ধ্বনিত হইতেছিল। বিজয়সিংহ, আনন্দধারা-বিপ্লাবিত ও তন্ময় হইয়া, সেই সুধার-সাগরে নিমজ্জিত ছিলেন। সহসা, সুখের বাসরে অশনি পড়িল—সুখতরা বীণার তার ছিঁড়িল—গাহিতে গাহিতে মুরলা চীৎকার করিয়া, এক বার লাফাইয়া উঠিয়া স্বামীর ক্রোড়দেশে পড়িয়া অজ্ঞান হইল। তাহার পীবর বক্ষে, একটা বিষাক্ত লৌহমুখ তীর আসিয়া বিদ্ধ হইয়াছে—শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

বিজয়সিংহের হৃদয়ের বৈশাখী জ্যোৎস্নায় বজ্রাঘাত হইল। চকিতে একবার চাহিয়া দেখিলেন—দূরে পাহাড়ের উপর দিয়া, একটী লোক একখানি ধনুক হাতে করিয়া, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দূরত্ব বশতঃ লোকটাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন না,—তথাপিও যেন চিনি চিনি রকম একটা ভাব তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু বাণবিদ্ধা বনিতাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না; কাযেই শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করা হইল না। প্রভাও—"এ কি হইল" বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে, তীক্ষ্ণমুখ-শর-বিঘাতন-জনিত শোণিতস্রাবে মুরলার সুকুমার [illegible] এলাইয়া পড়িল।—প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিশাইয়া গেল।

পত্নী বিয়োগে বিজয়সিংহ, বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। প্রিয়-তমার শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন-করুণ-কথায় কঠিন পাষাণস্তূপও যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। বিজয়সিংহ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মুরলা! মুরলা!—প্রাণতমে! এই বিজনে—এই পাহাড়ে—আমাকে ফেলিয়া তুমি কোথায় গেলে? হায়,—তুমি যে বড় সাহসে তোমার বীর পতির সহিত

বিদেশে আসিয়াছিলে—ধিক্ আমাকে,—আমি তোমার জীবন রক্ষায় সমর্থ হইলাম না! আমারি সাক্ষাতে চোরা বাণে তোমার কোমল প্রাণ ধ্বস্ত করিয়া গেল। হা, পাপাত্মা ভীরু, কাপুরুষ! কে তোকে এ বাণ শিক্ষা দিয়াছিল।”

“সখি,—মুরলা! আমায় কি শঠ-কপট ভাবিয়াছ? তাই চিরতরে লোকান্তরে পলাইলে? একবার মুখের সম্ভাষণও করিয়া গেলে না? প্রেম জল-কণা তোমার মুখে ভাসিতেছে;—তুমি কোথায়? হায়, মানবের নশ্বর প্রাণ! মুরলা—মুরলা;—প্রাণের মুরলা; কুসুম-খচিত ভ্রমর-কৃষ্ণ তোমার কুঞ্চিত কেশজাল পবনে উড়িতেছে;—মূঢ় আমি! আশা হইতেছে, বুঝি তুমি ফিরিয়া আসিবে। একবার উঠ—মুরলা;—তুমি আলোক-রূপিণী—হৃদয়ের এ বিষাদ-আঁধার দূর হউক। হায়; তোমার মধুরকণ্ঠে এই মাত্র গীত হইতেছিল—কে রে দুর্ব্বৃত্ত, আমার সাধের বীণার প্রথম আলাপে, তাহার তার ছিঁড়িয়া দিলি!”

সৈন্যগণ, ঝড় জলে চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে একত্র হইয়া, বিজয়সিংহের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। এক্ষণে দূর হইতে, তাঁহার বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইয়া, সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিজয়সিংহের পত্নী-বিয়োগে সকলেই দুঃখিত হইল,—কে হঠাৎ এই দূরদেশে এরূপ কার্য্য করিল—কাহার সহিত এরূপ শত্রুতা ছিল,—তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সে খঙ্গালসিংহ।

খঙ্গালসিংহ এই বিদেশে—সুযোগে, বিজয়সিংহকে নিহত করিতে পারিবে, বিবেচনায় প্রচ্ছন্নবেশে পিছু লইয়াছিল। বিজয়সিংহকে লক্ষ্য করিয়াই তীর ছাড়িয়াছিল—কিন্তু দৈববশে তাহা না হইয়া, সেই তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মুরলার বক্ষঃ ভিন্ন করিয়াছে।

পশ্চাতে শত্রু আছে বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল,—এবং তখন হইতেই বিশেষ সতর্ক ও সাবধান হইল,—কিন্তু যে গেল, সে আর ফিরিল না। গিরি-প্রস্রবিণীতে সেই কমনীয় বপুখানি—সেই প্রেমের প্রতিমাখানি বিসর্জ্জন করিয়া, বিজয়সিংহ প্রভাকে লইয়া ব্রহ্মদেশে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়া সন্ধানে জানিলেন, প্রভার পিতা তাহার আগের বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন,—তাহার মাতাও ছিলেন না। বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভা, এখন তুমি কি করিবে? মহারাজের আদেশ আছে, এরূপ ঘটিলে তোমাকে শানদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। তবে তুমি যদি এখানে থাকা শুভকর বিবেচনা কর—তবে থাকিতেও পার।"

প্রভা বলিল,—"না, আমি থাকিব না। আপনাদের সঙ্গে যাইব।" বিজয়সিংহ প্রভাকে লইয়া শানদেশে ফিরিয়া গেলেন—মন্ত্রী, কন্যাবিয়োগ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলেন।

রাজার ব্যাধি আরোগ্যের পথে আসিয়াছে। মাঝে ব্যাধি নিতান্তই বৃদ্ধি পাইয়াছিল—রাজার জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে কঠিন রোগাক্রান্ত চেতনা-বিলুপ্ত মহারাজের ব্যাধি আরোগ্যোন্মুখ দেখিয়া রাজ্যময় আনন্দের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে,—সংসারে সুখের হাসি ফুটিয়াছে। রাজার ব্যাধি আর নাই বলিলেই হয়,—তবে সামান্য একটু মাত্র শেষ আছে—আর দুর্ব্বলতা।

প্রভা গিয়া মহারাজের চরণবন্দনা করিল। তাহার মুখে সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রাজা দুঃখিত হইলেন। তৎপরে বলিলেন,—"প্রভা এক্ষণে তুমি আমারই পালিতা কন্যা স্বরূপে আমার আলয়ে অবস্থান কর। আমি তোমাকে সত্বরেই পাত্রস্থা করিব।"

প্রভা, লজ্জাবনত আননে বলিল,—"মহারাজ ; আমি একটী অনুমতি চাই।"

রাজা। কি, মা ?

প্রভা। বিপত্নীক বিজয়সিংহের হৃদয়, শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে,—শোকে সান্ত্বনা দিবার তাঁহার আর এদেশে কে আছে ? দাসীর উপরে অনুমতি হইলে, দাসী সেই কার্য্যের ভার লইতে পারে। আমারই জন্য বিজয়সিংহ পত্নী হারা হইয়াছেন।

রাজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি আরোগ্য হইলে অনুমতি দিব।"

রাজার হাসিতে প্রভা লজ্জিত হইয়া সরিয়া গেল।

অল্পদিন মধ্যেই রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। প্রভার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিজয়সিংহের সহিত প্রভার বিবাহ দিলেন। বিজয়ের শূন্য প্রেম মন্দিরে আবার প্রভাতী সঙ্গীতের সুর উঠিল,—আবার শূন্য মন্দিরে প্রেমের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইল। রূপে, গুণে, প্রেমে, সোহাগে শীঘ্রই প্রভা বিজয়সিংহকে বাঁধিয়া লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*:*:*—

প্রাগুক্ত ঘটনার পরে, দশ বৎসর অনন্তের গর্ভে মিশিয়া গিয়াছে,—দশ বৎসরে বিজয়সিংহের নূতন কোন প্রকার ঘটনাই ঘটে নাই,—কেবল প্রভার গর্ভে তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—তাহার বয়স সবে তিন বৎসর।

দশ বৎসরের পরে, বিজয়সিংহকে পুনরায় সমর-সাগরে ঝাঁপ দিতে

হইল। দশ বৎসর অগ্রে লুসাইগণ একবার শানপ্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল—কিন্তু পরাজিত, অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। সেই অপমানে লুসাইগণ এতদিন যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ ও সৈন্যবৃদ্ধি প্রভৃতি করিয়া যুদ্ধের আয়োজন ও শান আক্রমণের ব্যবস্থা করিতেছিল। দশ বৎসরের আয়োজনে—অধ্যবসায়ে—উদ্যোগে, তাহারা বিরাট ভাবে দ্বিতীয়বার শানপ্রদেশ আক্রমণ করিল। শানরাজও নিশ্চিন্ত ছিলেন না,—তিনিও যুদ্ধোপকরণাদির বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ভীম সংগ্রামের ভৈরবতাণ্ডব শ্রুত হইয়া বৃদ্ধ সেনাপতি শানাধিপতিকে বলিলেন,—"মহারাজ; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—এই ভীষণ সংগ্রামে আমি যে, বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিব—এমন ক্ষমতা আমার আর নাই। অন্যকে এই প্রভূত দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করিলে ভাল হয়।"

বহুদর্শী সেনাপতির এই সমীচীন বাক্য শ্রুত হইয়া, রাজা চিন্তান্বিত হইলেন। অগৌণে বিজয়সিংহকে নিজ সন্নিধানে ডাকাইয়া বলিলেন,—"বিজয়সিংহ!—পূর্ব্ব সেনাপতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। লুসাইগণ যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিতে আসিতেছে—তাহা শ্রুত হইয়াই তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। এ মহারণে তুমি সেনাপতি হইয়া, আমার মানসম্ভ্রম ও রাজ্য রক্ষা কর।"

বিজয়সিংহ, অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ; আপনার করুণাতে দাস কৃতার্থ হইল। দাসের শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতেও দাস নিশ্চেষ্ট হইবে না।"

ইহার পরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "দ্বিতীয় লুসাই সমর" আরম্ভ হইল। লুসাইগণ, শান দেশ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই দূতমুখে তাহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়াই বিজয়সিংহ সৈন্যাদি লইয়া রাজশ্রী পর্ব্বতের পাদদেশে ব্যূহ রচনা করিলেন,—লুসাইসৈন্যের শ্রেণীও তথায় আসিয়া ভীম-ভৈরব হুঙ্কার

ছাড়িল। উভয় দলের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল,—এই ভীষণ সময়ে, প্রথমে লুসাইগণ জয় লাভ করে।

ক্ষুব্ধ সিংহের মত, বিজয়সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—তাঁহার বীর ভুজের আস্ফালনে সৈন্যগণ সিংহনাদ ছাড়িল।

বিজয়সিংহ ভাবিলেন—এমন মুখোমুখী ভাবে যুদ্ধ করিলে, সংখ্যাধিক লুসাই সৈন্যগণকে পরাজয় করা যাইতে পারিবে না।

বিজয়সিংহ, সে দিন সৈন্য লইয়া পশ্চিমদিগ্‌ভাগে হটিয়া গেলেন,—সৈন্যগুলি তিন দলে বিভক্ত করিয়া, পাহাড়ের গাত্রে লুকায়িত করিলেন।

যামিনী প্রভাত হইল,—তূর্য্যনাদে শানসৈন্য দূর হইতে লুসাই সৈন্যগণকে আহ্বান করিল। বিজয়োন্মত্ত লুসাইসৈন্যগণ কিছু মাত্র ভীত হইল না। তাহারা আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণের মত, শানসৈন্যের উপর পতিত হইল—তখন বিজয়সিংহের লুক্কায়িত সৈন্য পশ্চাদ্ভাগ হইতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। লুসাইগণ বিপদ গণিল;—সেই দিবসের যুদ্ধে তাহারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল।—অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য লইয়া সে দিন তাহারা শিবিরে ফিরিতে পারে নাই। বিজয়সিংহের সৈন্যগণ, সে দিন জয়োল্লাসের অদম্য তেজে বীরবাহুর আস্ফালন করিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরা আচ্ছন্ন হইলে উভয় দলের সৈন্যই বিশ্রামলাভার্থ যুদ্ধে বিরতিপূর্ব্বক, স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া শোণিতস্রাব ধৌত করিতে বসিল। হায় মানুষে আর পিশাচে প্রভেদ কি?

উভয় শিবির, দূরে দূরে—অতি দূরে অবস্থিত। পার্ব্বতীয় স্থান ভীষণে-সুন্দরে সংমিশ্রিত। গিরিনদী আশ্রম সমাকুল,—অরণ্য কোথায়ও স্নিগ্ধ শ্যাম,—কোথায়ও ভীম-কঠোর—স্থানে স্থানে নির্ঝর ঝর ঝর করিয়া দিক্ শব্দিত করিতেছে। প্রান্তসীমায় লোমহর্ষণ,—দীর্ঘারণ্যে উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল গিরি-গহ্বরে বিস্তৃত রহিয়াছে। বন, কোথায়ও নীরব

নিস্পদ, কোথায়ও বনচরের বিকট রবাকীর্ণ ;—কোথায়ও সুখসুপ্ত ভীম-নাদী ভুজঙ্গের নিশ্বাসাগ্নিদীপিত। পল্বল, রবি-করে প্রায় জলহীন,—তাই তৃষিত কৃকলাসকুল অজগরের স্বেদজল পান করিয়া পরিতৃপ্ত। অরণ্যের মধ্যভাগ প্রশান্ত গভীর। বিবিধ মৃগযুথ নির্ভয়ে নিদ্রিত। নীল নিবিড় তরুণ তরুরাজি ঘন সন্নিবিষ্ট,—শীতল স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী বহিয়া চলিয়াছে। তীরে, ক্ষুদ্র বিহগাধিষ্ঠিত বেতসলতা হইতে সুরভি কুসুম খসিয়া পড়িতেছে,—স্রোত, ফলভার-শ্যাম জম্বু-নিকুঞ্জে প্রতিহত হইয়া মুখরিত হইতেছে। যুবা ভল্লুকের গভীর ফুৎকারধ্বনি গিরিগুহায় প্রতিধ্বনি গম্ভার হইতেছে। শীতল সুরভি পবন করি-দলিত শল্লকীরসে সংস্পৃষ্ট হইয়া বহিতেছে,— ময়ূরী কেকারব করিতেছে,—দূরে, মেঘমালার মত প্রস্রবণ গিরি দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুল বস্ত্রাবাস—লুসাই সৈন্যগণ রাঁধিতেছে, খাইতেছে—গল্প করিতেছে, গান গাহিতেছে—চারিদিকে প্রহরিগণ প্রহরা দিতেছে, সহস্র সহস্র আলো জ্বলিতেছে। তখন নিশীথ কাল—আকাশে চাঁদ নাই—সহস্র সহস্র নক্ষত্র তাহাদের ক্ষীণালোক বিকীর্ণ করিয়া, পৃথিবীর পানে উঁকি দিতেছে।

ত্রাসিত-চমকিত হৃদয়ে, একটী যুবক লুসাইসৈন্যের ছাউনার পার্শ্বস্থ বন হইতে বাহির হইয়া একজন প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইল। প্রহরী চমক-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি ?"

যুবক বলিলেন,—"আমি বিদেশী। শাণদেশে যাইব।"

প্রহরী বলিল,—"তুমি বন্দী।"

যুবক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কাহার বন্দী ? কি জন্য বন্দী ?"

প্রহরী। লুসাইসৈন্যের সামরিক জেলে বন্দী—তুমি শানদিগের গুপ্তচর।

যুবক। নিশ্চয়ই নহে। আমি মণিপুরী—শানদেশে যাইতেছি।

প্রহরী, সে কথায় বড় বিশ্বাস করিল না। বলিল,—"যেই হও, লুসাই সেনাপতির অনুমতি-পত্র না দেখিলে ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

যুবক। এখন কি করিবে?

প্রহরী। বন্দী।

যুবক। তার পরে?

প্রহরী। সেনাপতির নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি সন্ধান ও বিচার করিয়া, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।

যুবক। তবে তাহাই হউক,—তোমার সেনাপতির নিকটে চল।

প্রহরী, একটা বাঁশীতে ফুৎকার প্রদান করিল। একটু পরেই, সেখানে আর একজন প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম প্রহরী, দ্বিতীয় প্রহরীর নিকটে যুবকের কথা বলিয়া, সেনাপতির নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ করিল।

সৈন্যাবাসের মধ্যস্থলে বড় একটা বস্ত্রাবাসের মধ্যে তীব্র তেজে আলো জ্বলিতেছিল। দুই জন লোক, তথায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন,—যুবককে তথায় পঁহুছাইয়া দিয়া প্রহরী অন্তর্দ্ধান হইল। সেই দুই জনের এক জন সেনাপতি ও অপর সমরসচিব। আজিকার ছলনাময় সমরে যে ভীষণ পরাজয় হইয়াছে,—কিরূপে আবার তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইতে পারে—কোন্ ভাবে, কোন্ পথ দিয়া সৈন্য চালিত করিতে পারিলে, সহজে পঙ্গ রাজধানী আক্রমণ করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শেই তাঁহারা পরিলিপ্ত ছিলেন। প্রহরী, যুবককে পঁহুছাইয়া দিলে, সেনাপতি তীব্র কটাক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কে তুমি? কি জন্য—বা কি উদ্দেশ্যে—চুরি করিয়া সৈন্যাবাসের মধ্যে আগমন করিলে?"

যুবক, নির্ভয়চিত্তে ও দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"আমি বিদেশী—মণিপুরী শানদেশে যাইতেছিলাম। পথ জানি না—পার্শ্বস্থ বনপথে আসিয়ে আপনাদের সৈন্যাবাসের মধ্যে পতিত হইয়াছি।"

সেনাপতি। তুমি যে, শানদিগের গুপ্তচর নহ,—তাহার প্রমাণ কি

যুবক। গুপ্তচর বলিয়াই বা আপনারা প্রমাণ করিবেন কি প্রকারে

সেনাপতি উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন, যুবকের ভাস্বর তেজোপূ চক্ষুদ্বয়ে স্বাধীনতা, তেজস্বিতা ও বীরত্বের জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গের লহরী খেলিতেছে।

সেনাপতি বলিলেন,—"যখন আসিবার কারণ নাই—নিশীথ রাত্রি—একাকী সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ—তখন গুপ্তচর বলিয়াই বিশেষ সন্দেহ হয়।"

যুবক। না, মহাশয়,—আমি সত্যই বলিতেছি, আমি গুপ্তচর নাহ বা কোন স্বার্থের জন্য এখানে আসি নাই। যদি আমার কথায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয়, তবে সত্যই জানিবেন—আমি মণিপুর হইতে আসিতেছি।

সেনাপতি। কোথায় যাইবে?

যুবক। বলিয়াছি ত, শানদেশে।

সেনাপতি। সেখানে কি উদ্দেশ্যে, কাহার নিকটে যাইবে।

যুবক। একটু আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য সেখানকার সহকারী সেনাপতি বিজয়সিংহের নিকট যাইব।

সেনাপতি। বিজয়সিংহ এখন আর সহকারী সেনাপতি নহেন;—তিনিই এখন শানরাজার সেনাপতি। যুবক;—

যুবক। আদেশ করুন।

সেনাপতি। তোমার কথায় প্রত্যয় হইতেছে—তুমি বিজয় সিংহে

সহিত সাক্ষাৎ করিতেই যাইতেছ—কেননা, তুমি অবগত নহ যে, তিনি সেনাপতি হইয়াছেন—কিন্তু আমার একটা কায করিতে যদি স্বীকৃত হও—আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি ।

যুবক। কি বলুন,—যদি অনুপযুক্ত না হয় করিব।

সেনাপতি। আমি একখানা পত্র তোমার নিকটে দিব—সেখানা তুমি শান-সেনাপতি বিজয়সিংহকে দিতে পারিবে ?

যুবক। পারিব।

সেনাপতি। বিজয়সিংহ কি উত্তর দেন,—তাহা আমাকে আনিয়া দিতে পারিবে ?

যুবক। যদি তিনি তাহার উত্তর দেন,—তবে নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।

সেনাপতি, একখানা পত্র লিখিয়া যুবকের হস্তে প্রদান করিলেন। যুবক, তাহা লইয়া অঙ্গাবরণী মধ্যে রক্ষা করিলেন। তখন তাহার হস্তে বহির্গমনের আদেশ-লিপি দান করিয়া, একজন সৈনিককে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—"এই যুবককে আমাদের ছাউনির সীমান্তে দিয়া আইস।"

সৈনিক যুবককে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—তাহাদের কামান বন্দুক, গোলা, গুলি, অশ্ব, গজ, তরবারি, বল্লম ও সৈন্যগণের আবাসস্থান চারি পাঁচবার করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া লইয়া চলিল। যুবক মনে মনে হাসিলেন,—মনে মনে ভাবিলেন, আমার সহিত চাতুরী! আমি শান-সেনাপতির নিকটে যাইতেছি—ইহারা ইহাদিগের যুদ্ধোপকরণ ও সৈন্যাদি পুনঃপুনঃ দেখাইয়া, দেখাইতেছে যে,—ইহা বহুল। কিন্তু আমিও সৈনিক—এ সকল ফন্দী আমার নিকটে অজ্ঞাত বা নুতন নহে।

সৈনিক, যুবককে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া—এক এক স্থান অনেক-বার দেখাইয়া, ক্রমে সীমান্ত স্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পঁহুছিয়া বলিল,—"তবে যাও।"

যুবক বিদায় হইলেন,—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল।—পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়া তখন উষার আলো আসিয়া বনভূমি উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল,—যুবক, সৈনিকের নিকটে পথের কথা জানিয়া লইয়া তদভিমুখে চলিলেন। যখন প্রভাত-সূর্য্য বন-পর্ব্বত আলো করিয়া, পূর্ব্ব গগনে উদিত হইলেন, —তখন যুবক, সম্মুখে শানসৈন্যের ছাউনির পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে—দেখিতে পাইলেন। আরও কিয়ৎক্ষণ হাটিয়া, তিনি শান-শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া বিজয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। বিজয়সিংহ তখন সৈন্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন—সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু সে দিন আর বিপক্ষ আক্রমণের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, সৈন্যগণের বীরবাহুর আস্ফালন হইল না।

বিজয়সিংহ যুবককে ডাকিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যুবক অভিবাদন করিয়া নতশির হইয়া দাঁড়াইলেন। বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

যুবক। আমি মণিপুর হইতে আসিতেছি।

সেনাপতি। তোমার নাম কি?

যুবক। আমার নাম,—রবীশ্বর রায়। আপনি বোধ হয় রায় রতনচাঁদকে জানেন,—আমি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র।

বিজয়সিংহের মুখমণ্ডলে ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব অঙ্কিত হইল। বলিলেন,—"রতনচাঁদ! রতনচাঁদকে বিশেষই জানি—তুমি কি জন্য আসিয়াছ?"

রবি। আপনার নিকটে আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসিয়াছি।

বিজয়। কেন,—তুমি কি মণিপুরে কোন অপরাধ করিয়াছ?

রবি। প্রকৃতঃ অপরাধ করি নাই—তবে অপরাধের ভাণ করিয়া আমাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিল।

বিজয়। তাই পলায়ন করিয়াছ ?

রবি। আজ্ঞা হাঁ।

বিজয়। আমার নিকট আশ্রয় পাইবে এ ভরসা তোমাকে কে দিল ?

রবি। দরিয়াবাজ।

বিজয়। দরিয়াবাজ কে ?—আমি ত চিনিতে পারিলাম না।

রবি। তাঁহার অন্য কোন পরিচয় আমি জানি না—তিনি একজন ইন্দ্রজালময় অদ্ভুত অধ্যাত্মশালী বৃদ্ধ পুরুষ। পূজনীয় কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বন্ধু।

বিজয়। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর—রাজগুরু কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর—ধার্ম্মিক কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর—অনেক দিন তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করি নাই,—জীবনে আর যে ভাগ্যে ঘটিবে—সে আশাও নাই। তিনি কেমন আছেন ?

রবি। ভাল আছেন।

বিজয়। যুবক ;—আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে পারিব না।

রবি। কেন, মহাশয় ?

বিজয়। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না।

রবি। কেন, মহাশয় ? আমি আপনার নিকটে কি অবিশ্বাসের কাব করিয়াছি ?

বিজয়। না,—না। তুমি কিছু কর নাই। কিন্তু তোমার কাকা ও পাপাত্মা চিরঞ্জীব বর্দ্ধমান সৌহার্দ্দ সূত্রে সংবদ্ধ,—সেই জন্য, অবিশ্বাস হয়—পাছে তাহারা পরামর্শ করিয়া, একটা কিছুর জন্য যদি তোমায় পাঠাইয়া থাকে।

রবি। আমি সেরূপ লোক নহি—আপনি অকপটে আপনার অনুগত দাস ভাবিয়া, আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন।

বিজয়সিংহ দেখিলেন, কথা বলিতে বলিতে রবীশ্বরের মুখ হইতে

একটা রশ্মি বাহির হইল,—যাহা সাধারণ মানবের থাকিতে পারে না,—যাহা অবিশ্বাসীর থাকিতে পারে না,—যাহা পাপীর থাকিতে পারে না।

পুনরপি রবীশ্বর বলিলেন,—"আমায় আশ্রয় না দেন আপত্তি নাই। তৃণ-গুল্মের আশ্রয় আছে—আর এত বড় জগতে আমার আশ্রয় নাই? তাহা ভাবিবেন না। আমি স্ত্রীলোক নহি যে, কেহ আমাকে আশ্রয় না দিলে আমি জীবন বা ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিব না। তবে আমায় অবিশ্বাস করিবেন না,—আমি অবিশ্বাসী নহি, কেবল দরিয়াবাজের আদেশে আপনার এখানে আসিয়াছি—নতুবা অবশ্যই আমি জানি যে, জগতে করুণ-কণ্ঠের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।"

বিজয়সিংহ, রবির অপূর্ব্ব সুন্দর, অপূর্ব্ব তেজোগর্ব্ব মাথান মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, যুবক লঘুচেতা বা অবিশ্বাসী নহে। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দরিয়াবাজ তোমাকে কি বলিয়াছিলেন?"

রবি। তিনি বলিলেন—"জগতে মানব কর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরুষকারে মিশ্রিত হইয়া, সেই কর্ম্মসূত্রেই মানুষকে ফলদান করিয়া থাকে,—তুমি শানদেশে গমন কর, সেখানে বিজয়সিংহ নামে এতদ্দেশের বিতাড়িত একব্যক্তি আছেন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিও—কোন ঘটনা দেখা দিবে, যাহাতে তোমার কর্ম্মক্ষেত্রের পথ প্রশস্ত হইবে।

বিজয়। ভাল,—তুমি কেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর নাই যে, বিজয়সিংহ যদি আমাকে অবিশ্বাস করিয়া আশ্রয় না দেয়।

রবি। তিনি এক অভিজ্ঞান দিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইহা দেখাইলেই—বিজয়সিংহ তোমায় বিশ্বাস করিবেন।

বিজয়। সে অভিজ্ঞান কি?

রবি। সোণারকণ্ঠী।

বিজয়। সোণারকণ্ঠী!—কোথায় আছে?

রবি। আমার নিকটে আছে।

বিজয়। দেখি।

রবীশ্বর অতি যত্ন-রক্ষিত সোণারকণ্ঠী বস্ত্রমধ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বিজয়সিংহ, তাহা উত্তমরূপে দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট আননে বলিলেন,—"দরিয়াবাজ কি নিজের নিকট হইতে ইহা তোমাকে দিয়াছেন?"

রবি। না।

বিজয়। কোথা হইতে দিলেন?

রবি। রাজপাটের অন্তঃপুরের দীঘির সোপানের নিম্নে প্রোথিত ছিল—আমাকে তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন।

বিজয়সিংহ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"দরিয়াবাজ! দরিয়াবাজ কে? যাহা হউক, তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ও রক্ষিত হইলে। আমার শিবিরমধ্যে বিশ্রাম করগে। সোণারকণ্ঠী আমার নিকটে থাকিল।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"আর একটী কথা আছে।"

বিজয়। আমি মণিপুর সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা এবং তোমার সমস্ত কথা অবসর মতে শুনিব। তুমি বোধ হয়, বুঝিতেছ, আমি এক্ষণে ভীষণ সমর সাগরে ভাসিতেছি।

রবি। আপনাদের যুদ্ধ সম্বন্ধেই কোন কথা আছে।

বিজয়। যুদ্ধ সম্বন্ধে?—যুদ্ধ সম্বন্ধে কি কথা আছে?

রবি। গতকল্য রাত্রে আমি বনপথে চলিয়া আসিতে সহসা লুসাই-সৈন্যের ছাউনি মধ্যে গিয়া পড়ি।

বিজয়। তারপর?

রবি। তার পর; প্রহরী আমাকে বন্দী করিয়া সেনাপতির নিকট লইয়া যায়।

বিজয়। তুমি তাহাদের সৈন্য-বলাদি দেখিয়া আসিয়াছ কি ?

রবি। আজ্ঞা হাঁ—উত্তম রূপেই দেখিয়া আসিয়াছি—সৈন্য-সংখ্যা বহুল। অস্ত্র-শস্ত্র, কামান-বন্দুক, রসদ-ভারবাহীও যথেষ্ট। কিন্তু যাহা আছে, বোধ হয়, বিভীষিকা দর্শনের জন্য—এবং সেই মত আপনাকে বলিব বলিয়া, তাহারা আমাকে একই স্থান ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারি পাঁচ বার দেখাইয়া, তবে ছাড়িয়া দিয়াছে।

বিজয়। আর কি সংবাদ আছে, বলিতেছিলে ?

রবি। সেনাপতি আপনাকে একখানা পত্র দিয়াছেন,—এবং যদি তাহার উত্তর দেন, তাহা তাঁহাকে দিয়া আসিব—এই সর্ত্তে আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বিজয়। কৈ পত্র দেখি।

রবীশ্বর, অঙ্গবস্ত্রের মধ্য হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া, বিজয়সিংহের হস্তে প্রদান করিলেন। আবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পত্র পাঠ করিয়া ঘৃণার হাসি হাসিয়া, বিজয়সিংহ বলিলেন,—"আমি কি এমনই বিশ্বাসঘাতক! এমনই অপদার্থ!" পত্র খানা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উহাতে কি লেখা ছিল, শুনিতে পাই কি ?"

বিজয়সিংহ হাসিয়া বলিলেন,—লুসাই সেনাপতি লিখিয়াছে, আমি যদি শানরাজের সেনাপতির কায ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের নিকট যাই, তাহারা আমাকে প্রচুর বৃত্তি ও একটা দেশের জমীদার করিয়া দেয়।"

রবি। কি ঘৃণা! যিনি বিশ্বাস করিয়া, সমস্ত সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন—যিনি সেনাপতির বিশ্বাস ও সতর্কতার উপর আপনার মান-সম্ভ্রম, রাজ্য-গৌরব—স্ত্রী-পুত্র ও নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত লইয়া বসিয়া আছেন— নিজ স্বার্থের জন্য তাঁহার সর্ব্বনাশ করা!

এমন ঘৃণিত জীবও কি জগতে আছে! ঐ পত্রের কোন উত্তর দিবেন কি ?

বিজয়। কেন ?

রবি। আমি সেনাপতির নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, যদি আপনি উত্তর দেন, আমিই তাঁহাকে দিয়া আসিব।

বিজয়। উত্তর দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই—তবে যদি তাহারা সন্ধি করিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমরাও তাহা করিতে পারি।

রবি। যদি বিবেচনা করেন—সেইরূপ লিখিয়া দিলে, আমি লইয়া যাইব।

বিজয়। তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই—লুসাইগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও আততায়ী।

রবি। সে জন্য ভয় করি না। অদৃষ্টই মানুষকে শুভ বা অশুভ ফল-দান করিয়া থাকে।

বিজয়সিংহ হাসিয়া, একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহাতে লিখিলেন, আপনার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। আমার শিরায় এক বিন্দু রক্ত থাকিতে আমি আমার প্রভুর অনিষ্ট করিতে পারিব না। এরূপ লেখা, আপনার মত বীরজনের কর্ত্তব্যই হয় নাই। যাহা হউক—উভয় রাজ্যের স্বার্থ বজায় রাখিয়া, আপনারা যদি সন্ধি করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমি তাহা করিয়া দিতে পারি।

কিন্তু, তখন রবীশ্বরকে যাইতে দিলেন না। স্নানাহার করিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বিজয়সিংহের পত্র লইয়া, রবীশ্বর লুসাইসেনাপতির নিকটে উপস্থিত হইলেন। লুসাইসেনাপতি পত্র পাঠ করিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বিজয়সিংহকে গালি দিলেন,—রবীশ্বরকে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রহরী আদেশমত কার্য্য করিল। রবীশ্বর বুঝিতে পারিলেন না যে, কি অপরাধে লুসাই-সেনাপতি শানসেনাপতিকে কটু বলিলেন;—কি অপরাধে তাঁহার কারাবাস আজ্ঞা হইল! যাহা হউক—তিনি সামরিক বস্ত্রাবাস-কারাগারে বন্দী হইলেন।

বন্দী রবীশ্বর, কারাগারে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, অদৃষ্টই মানুষকে শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকে। সেনাপতি বিজয়সিংহ আমাকে পূর্ব্বে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—তাঁহার কথা না শুনিয়া, এখানে আসিলাম কেন? অদৃষ্টই আমাকে এখানে আনিয়াছে, অদৃষ্টই আমাকে এরূপ ফল প্রদান করিতে বসিয়াছে,—জানি না,—অদৃষ্ট আবার আমাকে কোন্ পথে চালিত করে। অথবা, মৃত্যুই হয় ত আমার অদৃষ্ট লিপি। এইরূপ ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়া দশ দিন কাটিয়া গেল।

একদিন রাত্রি অনেক হইয়াছে, কারাগারে ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু রাত্রি অন্ধকারময়ী। কারাগারের জানালা গলাইয়া, রবীশ্বর সেই বন-পর্ব্বত-বিরাজিত নৈশ প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন;—রজনীর অন্ধকার, শ্যামল প্রকৃতির শ্যামল-সৌন্দর্য্য গ্রাস করিয়াছে! রবীশ্বর, চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন;—সে দিনের অন্ধকার যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা প্রকাশ করিতেছে। এত কালো, গভীর, মিশ্ মিশে অন্ধকার,

তিনি যেন কখনও দেখেন নাই! আকাশে তারা জ্বলিতেছে; চাঁদ নাই অন্ধকাররাশিই আধিপত্য করিতেছে! কেবল দূরে—অদূরে—অতিদূরে—অনতিদূরে ক্ষণে জাজ্বল্যমান, ক্ষণে নিষ্প্রভ, ক্ষণে জ্যোতির্ম্ময়, ক্ষণে জ্যোতিঃহীন তারকারাজি। এই নক্ষত্র-কিরীটিনী যামিনীর নৈশ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া, রবীশ্বর আগে কতই মোহিত হইতেন। আজি যে সে সকল ভাল লাগিতেছে না, বিদেশে বন্দী হইয়া, সৌন্দর্য্য-ভোগ-পিপাসা যেন দুঃখের অন্তরালে মিশিয়া গিয়াছে। রবীশ্বর, তথাপি সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া—সেই অন্ধকার দেখিতেছিলেন;

সহসা, তাহার পৃষ্ঠদেশে মনুষ্য-হস্ত-স্পর্শ অনুভূত হইল। চকিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তাহার পশ্চাতে এক মনুষ্যমূর্ত্তি।

রবীশ্বর, ভাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে বয়সে বালক। বোধ হয়, এখনও বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করে নাই। মুখখানি অত্যন্ত সুন্দর। রবীশ্বর বলিলেন;—"তুমি কে?"

সে বলিল;—"আমিও একজন বন্দী!"

রবি। আমার নিকট আসিলে কেন?

বন্দী। আমার ইচ্ছা পলায়ন করি।

রবি। বন্দী মাত্রেরই সে ইচ্ছা হয়—কিন্তু পথ কোথায়?

বন্দী। পথ আবিষ্কার করিয়াছি—আপনি যোগদান করিলে উভয়েই বাহির হইয়া যাইতে পারি।

রবি। কারাগারে আর অপর বন্দী আছে?

বন্দী। না। একজন ছিল—কল্য তাহাকে মরিতে দেখিয়াছি।

রবি। পথ কি প্রকার?

বন্দী তখন রবীশ্বরের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি বলিল, তাহা শুনিতে শুনিতে রবীশ্বরের মুখভঙ্গ

কখন বিস্মিত, কখন চকিত এবং কখন বা গম্ভীর হইতেছিল। শেষে কথা সমাপ্ত হইলে, বলিলেন—"যদি এমন সাহস করিতে পার, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যদি কোন প্রকার ভুলে, আমাদের পরামর্শ সিদ্ধ না হয়, তোমার উপায় ?"

বন্দী হাসিয়া বলিল,—"মৃত্যু! মরণের জন্য যখন বাঁধা রহিয়াছি, তখন সে জন্য ভয় কি ? তবে, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য !"

রবি। আমার মরণ সহজ, কিন্তু তোমার মরণের পূর্ব্বে পাতক সঞ্চয়ের সম্ভাবনা।

বন্দী। কিছু না। আপনি সে জন্য ভাবিবেন না,—আমার অঙ্গবস্ত্র-মধ্যে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সর্ব্বদাই লুক্কায়িত থাকে, এখনও আছে ; তেমন যদি হয়, তখনই তাহা বক্ষে বসাইয়া পাতকের দায় হইতে রক্ষা পাইব।

রবি। তুমি ধন্য ! কল্যই তাহা করা যাইবে।

বন্দী চলিয়া গেল। রবীশ্বর, তাহার বুদ্ধি-কৌশল ও অপূর্ব্ব উদ্যম দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন,—মনে মনে বলিলেন,—ইহাদের শক্তিতেই এখনও জগৎ-কার্য্য চালিত হইতেছে। পাপান্ধ জগতে ইহারাই স্পর্শমণি।

পরদিন, প্রভাতে উঠিয়া রবীশ্বর কারাগার মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহা সামরিক কারাগার,—বিপক্ষ-সৈন্যের মধ্যে যাহাদিগকে ধৃত করা হয়, কেবল মাত্র তাহারাই বন্দী অবস্থায় ইহার মধ্যে থাকে। এ কারাগারে বন্দিগণকে কোন কার্য্যই করিতে হয় না। বড় বড় লোহ-সিক প্রোথিত করিয়া বস্ত্রাচ্ছাদনে এই কারাগার ও কারাকক্ষ বিনির্ম্মিত, ইহার মধ্যে বন্দিগণের স্বাধীনতা আছে,—তাহারা যেখানে ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইতে পারে।

পায়চারী করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে রবীশ্বর, সেই কারাগারের অধ্যক্ষকে খুঁজিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দর্শন পাইয়া একটু নম্রস্বরে বলিলেন,—"মহাশয়, নমস্কার।"

বন্দীর নমস্কারের প্রতিনমস্কার না করিয়া একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া অধ্যক্ষ বলিলেন,—কি মহাশয়, আজিকার প্রত্যূষে বন্দি-জীবনে এত স্ফূর্ত্তি কেন?"

রবীশ্বর, মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"লুসাইসেনাপতি মহাশয় কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, শীঘ্রই আমার মুক্তির সম্ভাবনা। শানরাজার সহিত লুসাইরাজের সন্ধির কথা একরূপ পাকাপাকি হইয়াছে। দুই চারি দিনের মধ্যেই সন্ধিসর্ত্ত লেখাপড়া হইলেই যুদ্ধের অবসান হইবে—এবং আমরাও মুক্তি পাইব।"

কারাধ্যক্ষও একজন সৈনিক। তাঁহাকে সৈনিক প্রহরীও বলা যাইতে পারে। উদ্ধতস্বভাব যৌবনদৃপ্ত, অশিক্ষিত সৈনিক বলিল,—"যুদ্ধে হটিয়া বন্দী হইয়াছিলেন?"

রবি। না মহাশয়। সে অনেক কথা।

সৈনিক। কিরূপ?

রবি। আমাদের দেশের এক জন সৈনিকের একটী মেয়ের সাধ হইয়াছিল—সে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে সে তাহার পিতার নিকট কিছু কিছু শিক্ষাও পাইয়াছিল। এখন, তাহাকে আমি বড় ভালবাসি—সেই ভালবাসার ফলে আমাদের বিবাহের কথা হয়,—কিন্তু এই যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় বিবাহ স্থগিত থাকে,—তাহার পিতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন,—ঐ সুন্দরী যুবতী যুদ্ধে আসিবার জন্য আমাকে জিদ করিয়া ধরেন। তখন আমি যে সপ্তদশ সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে কায করি—তাহাকে পুরুষ সাজাইয়া, সেই সৈন্য মধ্যে লইয়া যুদ্ধ স্থলে আসি।

সৈনিক। তারপর?

রবি। সেদিনকার যুদ্ধে সে তোমাদের সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বন্দী হয়।

সৈনিক। কৈ, কারাগারে আসে নাই ত?

রবি। বন্দী হইলে কারাগারে আসে নাই, তবে কোথায় যাইবে?

সৈনিক। কৈ, আমি ত কোন স্ত্রীলোক দেখি নাই।

রবি। সে ত আর মেয়ে মানুষের বেশে আসে নি—পুরুষ সৈনিকের বেশেই বন্দী হইয়া আসিয়াছে।

সৈনিক। ও হো—ঐ বালক বন্দী না কি?

রবি। হ্যাঁ গো।

সৈনিক। তারপরে, তুমি আসিলে কি প্রকারে?

রবি। আমার প্রণয়িনীর জন্য মন অত্যন্ত উতলা হইল, সংসার শূন্য দেখিলাম।

সৈনিক। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে?

রবি। না স্ত্রী এখনও হয় নাই, হবে—এখন প্রণয়িনী বলিতে পারেন,—হাঁ, যে দিন আসিয়াছি, সেই দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। সেই যুবতী আপনার বড় প্রশংসা করেন,—বলেন, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

সৈনিক মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ গুম্ফে মোড়া দিয়া বলিলেন,—"তিনি তবে আমায় ভাল বাসেন।"

রবি। তিনি বড় আমুদে—আপনি যদি তাঁর সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়া দেখেন, বড়ই প্রীত হইবেন।

সৈনিকের হৃদপিণ্ডটা অতি দ্রুত স্পন্দিত হইল। প্রচণ্ড মরুভূমিতে প্রপার দর্শন! কঠোর রণস্থলে যুবতী কামিনার সহিত আমোদ-কৌতুক! তাহাও আবার যাচিয়া—সাধিয়া। মনটা বড় গর্ব্বান্বিত হইল—মুখে

হাসির হিল্লোল উঠিল। শজারু-কাঁটা বিনিন্দিত গুম্ফে যোড়া দিতে দিতে সৈনিক ভাবিল, না হইবে কেন ; আমার মত রূপ—আমার মত গুণ—কয়জনের আছে !

রবীশ্বর বলিলেন,—"তবে এখন যাই। অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছি।"

সৈনিক রবীশ্বরের গমনে বাধা দিয়া বলিলেন,—"না, না,—এইখানে আসিয়া বসুন না। আপনার সঙ্গে যে আমার ক্রমে ক্রমে—অতি অল্প সময়ের মধ্যে, ভারি বন্ধুত্ব হইয়া গেল,—দেখিতেছি।"

রবীশ্বর, মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—"আমি তাঁহার নিকটে আপনার যেরূপ প্রশংসা শুনিয়াছিলাম—পরিচয়ে তদপেক্ষাও প্রীত হইলাম।"

রবীশ্বর আসিয়া সৈনিকের পার্শ্বে বসিলেন। সৈনিক অতীব আদর সহকারে তাঁহাকে একটা আসন আনিয়া দিয়া বলিল—"হুঁ—আপনি বলিতেছিলেন, তিনি বড় আমুদে" ;—

রবীশ্বর বুঝিলেন, ঔষধের ক্রিয়ারম্ভ হইয়াছে। বলিলেন,—"হাঁ, হাঁ, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বলিতেছিলাম—আমি ইচ্ছা করিতেছি, আজ রাত্রে একত্রে একটু আমোদ প্রমোদ করা যাইবে।"

সৈনিকের স্বর্গলাভ হইল। নারীর নামে জগৎ মুগ্ধ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্রী নারীর রূপে জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার হয়,—নারীর কথায় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার হয়—নারীর অঙ্গুলী-হেলনে সংসার মহাপ্রলয়ের অতল গর্ভে চলিয়া যায়।

নারীর কথায় সৈনিকের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। সে মনে মনে মতলব আঁটিল—মেয়েটা যদি ভাল হয়, তবে একটা তরোয়ালের চোটে এই বেটার মাথাটা উড়াইয়া দিয়া তাহাকে আমিই উপভোগ করিব।

সহসা তাহার মনের মধ্যে আর একটা ভাবনার উদয় হইল,—সে

ভাবিল, "যদি এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, আর সেনাপতি যদি জানিতে পারেন, তবে আমাকে দণ্ড দিতে পারেন। তখন মনে মনে স্থির করিল, কারাগারের পশ্চাৎভাগের চাবিকাটি লইয়া যাইব,—সুবিধা রকম কার্য্য ঘটিলে, এই লোকটার মাথাটা উড়াইয়া দিয়া, মেয়ে মানুষটাকে লইয়া পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিব।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"তবে এখন আমি যাইব। যদি অনুগ্রহ হয়, সন্ধ্যার পর যাইবেন।"

ঈষদ্ধাস্য সহকারে ভদ্রতার সহিত সৈনিক বলিল "সুন্দরী যুবতীর আহ্বানে আমি নিশ্চয়ই যাইব। মেয়ে-মানুষের মান আমি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকি।"

রবীশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটু গমন করিয়া, আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সৈনিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আর একটা কথা।"

সৈনিক ব্যগ্রতার স্বরে বলিল, "কি বলুন না। আমার নিকটে কোন কথা বলিতে আপনার আর বাধা নাই—আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে।"

মৃদু হাসিয়া রবীশ্বর বলিলেন, "না মহাশয়, বন্ধুর সহিত কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব কেন? কথাটা কি জানেন—সুন্দরী যুবতী যদি পুরুষের বেশে থাকে তবে কখনই সে আনন্দদায়িনী হয় না। আপনি একটা স্ত্রীলোকের পোষাক পাঠাইয়া দিতে পারিবেন কি?"

সৈনিক। তা পারিব বৈ কি;—কোন এক সৈনিকের স্ত্রীর একটা পোষাক চাহিয়া আনিব।

রবীশ্বর। তা বৈ কি,—আবার আমাদের কৌতুকের পর আপনি যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন সে পোষাক লইয়া আসিবেন,—

তিনি সে পুরুষ সৈনিকের পোষাকই পারিবেন। কিন্তু খুব সাবধান, মহাশয়, যেন কথা আদৌ প্রকাশ না হয়।

সৈনিক হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি মেয়ে মানুষের কথা কোথাও প্রকাশ করি না।

রবীশ্বর, হাসিসে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিন আর যায় না, কারা-সৈনিক দুই হাত দিয়া ঠেলিয়াও সূর্য্যদেবকে অস্তাচলে পাঠাইতে পারিতেছেন না। তিনি অনেকক্ষণ হইল, স্ত্রীলোকের পোষাক সংগ্রহ করিয়া রবীশ্বরের নিকটে নিজেই গিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

বৈকাল হইতেই রবীশ্বরের নিকটে পোষাক পাইয়া অপর বন্দী তাহার পরিহিত পোষাক পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-পোষাক পরিধান করিল। শিরস্ত্রাণে লুক্কায়িত কুন্তলরাশি খুলিয়া আগুল্ফ বিলম্বিত করিয়া দিল—অধরে হাসির রেখা ফিরাইয়া আনিয়া কার্য্যোদ্ধারের জন্য প্রস্তুত হইল।

কথামতে পূর্ব্বেই রবীশ্বর বন্দীর নিকটে—বন্দিনী বলাই ভাল—বন্দিনীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে হাসিয়া বলিল,—"আসুন, প্রণয়ী মহাশয় আসুন। কেমন দেখাইতেছে,—বলুন দেখি ?"

রবীশ্বর হাসিয়া বলিলেন,—"এরূপে কার্য্যোদ্ধার হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পন্থাটা বড়ই কুটিল।"

যুবতী হাসিয়া বলিল,—"এ রূপে উদ্ধার হইতে মনে কিছু ঘৃণা হইতেছে, বুঝি ?"

রবি। নিশ্চয়ই।

রমণী। কেন ?

রবি। অন্য কোন দোষ নাই, মনে একটা কেমন হেয়তার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

তখন সন্ধ্যার কালো ছায়া প্রকৃতির মুখে আবৃত হইয়া আসিতেছিল। রমণী বলিল,—"আর অধিকক্ষণ বিলম্ব নাই। আপনি অস্ত্রগুলা সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া রাখুন।"

রবীশ্বর রমণী কথিত স্থানে গিয়া দেখেন, একখানি তরবারি, গরাদে কাটিবার দুইখানি উকা, দুইখানা ছোরা ও একটা বল্লম লুকান রহিয়াছে। রবীশ্বর সেগুলি লইয়া সুবিধামত স্থানে রাখিয়া, পুনরায় রমণী যে কক্ষে বসিয়া আছে, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমণী রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্ত ঠিক ?"

রবি। সমস্তই ঠিক আছে—এত সংগ্রহ করিলে কি প্রকারে ?

যুবতী। আমি আপনার দশ দিন আগে হইতে এখানে বন্দী অবস্থায় আছি—এত দিন কি নিশ্চিন্ত ছিলাম ?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই কারা-সৈনিক্ আসিয়া, রবীশ্বরের অনুসন্ধান লইলেন। রবীশ্বর, তাঁহাকে অতি সমাদরে আনিয়া যুবতীর নিকটে উপবেশন করাইলেন।

কারা-সৈনিকের আদেশে, আজি সে কারা-গৃহের আলোর বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল,—দীপালোকে সমস্ত গৃহখানা দপ্ দপ্ করিতেছিল। আর সেই উজ্জ্বল আলোক-তলে সুন্দরী যুবতীর উজ্জ্বল রূপরাশি অধিকতর ভাবে জ্বলিতেছিল। সৈনিক আসিবামাত্র, যুবতী আপনার প্রখর তীব্র ছটার উপরে প্রশান্ত মাধুরীর সাময়িক রঙ্ ফলাইয়া লইল। কারা-সৈনিক যুবতীর কমনীয় কান্তি তৃষিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন,—এবং দর্শন মাত্রেই রূপসীর চরণ-প্রান্তে হৃদয়, মন ও প্রাণ বাঁধা দিয়া, মন্ত্র-মুগ্ধের

মত সুখের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে রবীশ্বরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

যুবতী, তখন হাব ভাবে কথার ছলে বলিলেন,—"এই কারাগারে আপনার মত একটী বন্ধু লাভ করিয়া, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি—কিন্তু বড় দুঃখ রহিল যে, আপনার মত বন্ধুকে যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম না।"

সৈনিক-হৃদয়ে ঘন ঘন বিদ্যুদ্বিকাশ হইতেছিল। ঘন ঘন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া যুবতীর চরণ-তলে লুণ্ঠিত হইতে ছুটিতেছিল। কোকিল-কূজনে কথা কহিয়া, যুবতী নিস্তব্ধ হইল। কারা-সৈনিক বড় রকমের কয়েকটা রস-কথা বিন্যাস করিয়া যুবতীর কৃপা লাভের চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যে কথা গুলা বলিবেন, তাহা যেন, আড়্‌পাকাইয়া, জিদ করিয়া জিহ্বায় বাহির হইল না,—বহু কষ্টে দুই একটা গড়াইয়া, গড়াইয়া, বাহির হইল। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আমারই কর্ত্তব্য, আপনাদিগকে আদর-যত্ন করা—কেন না, আপনারা আমারই অধীনে আবদ্ধ। আর যদি এক আধটু সুরার প্রয়োজন হয় আনাইতে পারি।—কিন্তু তোমার ঐ রূপ; ও রূপ বুঝি উপভোগ না করিলে, মানব-জন্ম সার্থক হইবে না।

সময় উপস্থিত বুঝিয়া যুবতী বলিল,—"মহাশয়; চলুন না কেন, আমরা একটু বেড়াইয়া আসি।"

সৈনিক বিপদ গণিলেন। এ দিকে সামরিক কারাগারের কঠোর বিধি উল্লঙ্ঘন,—অপর দিকে এই সুন্দরী যুবতীর অনুরোধ! কোন্‌টা রক্ষা করিবেন,—সেই ভাবনায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল—শেষে রূপেরই জয় হইল। সৈনিক স্বীকার করিলেন। তখন যুবতী, রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমিও যাইবে না কি?"

সৈনিক বলিলেন,—"সকলে গেলে যদি একটা গোলযোগ হয়!"

রমণী বলিল,—"তবে না হয়, উনি থাকুন। চলুন, আমরা দুই জনে কারাগারের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া, ঐ পাহাড়ের দিকে একটু বেড়াইয়া আসি।"

সৈনিক আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। রবীশ্বর বলিলেন,—"আমি গেলে দোষ কি হইবে? একেলা বসিয়া থাকিব।"

যুবতী বলিল,—"তবে না হয় চল।"

ইঙ্গিত করিয়া সৈনিককে জানাইল,—"আমাদের ভ্রমণ-সুখে উনি কোন বাধা জন্মাইতে পারিবেন না।"

সৈনিক ভাবিলেন,—ভালই হইল। কারাগার মধ্যে উহাকে কাটিয়া ফেলিলে, একটা গোল হইতে পারিত—বাহিরে গিয়া দোটুক্রা করিয়া রাখিয়া আসিব; প্রভাতে প্রকাশ করিব—বন্দী পলাইয়া গিয়াছে।

তখন সৈনিক উঠিয়া পশ্চাদ্দিকের দ্বারের চাবি খুলিলেন—দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিন জনে সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অন্ধকার পথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। একটু যাইতেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—সেই অন্ধকারে পাহাড়শ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পার্শ্বে নিবিড় বনরাজি।

সৈনিক বলিলেন, এই স্থানেই বসা যাউক। যুবতী বলিল,—"কেন আরও একটু চলুন না।"

সৈনিক। সম্মুখে পাহাড়।

যুবতী। চলুন, পাহাড়ের উপরে উঠি—ঐ দেখুন অন্ধকারও দূর হইতেছে। ঐ দেখুন—কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র পূর্ব্বদিক্ হইতে উদিত হইতেছেন,—এ-সুখ-রজনী, ঐ পাহাড়ের উপরে—চাঁদের কিরণে, ফুলের সুবাসে,—বঞ্চিয়া আসিব।

সৈনিক-প্রবর, আর কোন কথা কহিলেন না। তিন জনে ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিলেন। তখন চাঁদ উঠিয়া পৃথিবীর অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, তাঁহার রজত-কিরণ-ধারায় যুবতীর সুন্দর মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

রবীশ্বর, সময় বুঝিয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদানে সৈনিককে আক্রমণ করিলেন। সৈনিক প্রমাদ গণিলেন,—উভয়ে অনেকক্ষণ বাহুযুদ্ধ হইল। শেষ কারাসৈনিককে এক লাথিতে ভূতলশায়ী করিয়া, রবীশ্বর তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

যুবতী হাসিয়া বলিল,—"কি গো ;. আমার প্রণয়-পিপাসু জনের এত দুর্গতি করিলে কেন?"

রবীশ্বর, হাসিয়া বলিলেন,—"প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া।"

তখন বন্দী কারা-সৈন্যের মুখের দিকে চাহিয়া, ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া যুবতী বলিল,—"ধিক্ তোমাকে! আর ধিক্ তোমার সেনাপতিকে! যে, ইন্দ্রিয় জয় করিতে শিখে নাই,—যে, কামিনীর প্রলোভনে ভুলিয়া নিজের দায়িত্ব—নিজের কর্ত্তব্য—প্রভুর আদেশ ভুলিয়া যায়, এমন নরাধমকেও কারারক্ষীর পদে নিযুক্ত করে! আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে,—এক্ষণে তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর।"

সৈনিক-প্রবর তখন বুঝিতে পারিলেন, তাহাকে ছলনা করিয়া বন্দিদ্বয় বাহির হইয়াছে। কিন্তু উপায় কি! তাঁহার হস্ত পদ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে। মনে মনে কেবল হতাশ্বাস গণিতে লাগিলেন,—আর কি প্রকারে জীবন রক্ষা করিয়া দেশে গিয়া স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

রবীশ্বর বলিলেন,—"বোধ হয়, সতী রমণীর রূপ-উপভোগের সাধ মিটিয়াছে? এখন আমাদের বলিয়া দাও—আমরা কোন্ পথ দিয়া

নিরাপদে শান-সৈন্যের ছাউনিতে গমন করিতে পারিব ;—তোমাকে হত্যা করিব না। এই স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইব। তৎপরে আমরা চলিয়া গেলে প্রভাতে এদিকে কোন লোক আসিলে, তাহার দ্বারা বন্ধনাদি মুক্ত হইতে পারিবে।"

যুবতী বলিল,—"আর আমরা না যাইতে যাইতেই যদি কেহ এদিকে আসিয়া পড়ে—আর উহাকে খুলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে ? ও লোক অতিশয় ভয়ানক। তার চেয়ে, ওকে কেটে ফেলে দাও।"

সৈনিক কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার মা হও। আমাকে কাটিও না। আমি তোমাদিগকে ধরাইয়া দিব না !"

রবি। আমরা কোন্ পথ দিয়া যাইতে পারিব ? মিথ্যা কথা বলিও না,—মিথ্যা বলিলে, একটী চোটে মাথা উড়াইয়া দিব।

সৈনিক। না বন্ধু ;—খুব শিখিয়াছি। এখন মাথা বাঁচাইয়া ঘরে যাইতে পারিলে বাঁচি।

রবি। সত্য করিয়া বল, কোন্ পথ দিয়া গেলে, নিরাপদে শান-সৈন্য-দলে মিলিত হইতে পারিব।

সৈনিক। আর কোন পথ নাই—এই পর্ব্বতের পশ্চিমে কেবলই পাহাড়। দশ দিন চলিয়া গেলেও পাহাড়ের শেষ হইবে না। দক্ষিণে লুসাইদেশ,—লুসাই অধিকার। আর পূর্ব্বোত্তরে লুসাই-সৈন্যের ছাউনি। তোমাদিগকে যাইতে হইলে,—লুসাই সৈন্যের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে,—অপর পথ আর নাই।

রবীশ্বর কি ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন,—"তোমার পোষাকটা আমায় দিতে হইবে।"

সৈনিক। পোষাক কেন বন্ধু ; তুমি এখন আমার জান লইলেই

রাখে কে? কিন্তু আমার যে হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছ, খুলিয়া না দিলে, পোষাক গা দিয়া গলিবে কি প্রকারে?

মৃদু হাসিয়া যুবতী বলিল,—"না, না, বাঁধন খুলিয়া দিও না। ও যে স্বভাবের লোক—আবার একটা গোলযোগ বাধাইবে। ওর দেহ হইতে মাথাটা উড়াইয়া দিয়া, পোষাকটা খুলিয়া লও।"

সৈনিক বলিলেন, "এ বাঘের চেয়ে বাঘিনী বেশী রাগালো দেখ্‌চি বাবা। বেশ পিরীত করিতে আসিয়াছিলাম—খুব প্রতিফল পাইলাম। দোহাই সৈনিক মহাশয়! তুমি আমার ধর্ম্ম বাবা,—বাবা! আমায় কাটিও না। আমার হাত পা খুলিয়া দাও—আমি পোষাক খুলিয়া দিতেছি। আমি গোলযোগ করি—দুই পলোয়ানে আমায় বাঁধিয়া ফেলিও—না হয়, তখন কাটিয়া ফেলিও। তোমরা ত ঘরে বাহিরে পলোয়ান?"

রবি। ও কথা বলিও না। উনি আমার স্ত্রী নহেন।

সৈনিক। হাঁ, হাঁ, ভুলিয়া যাইতেছিলাম, বন্ধু;—এত অত্যাচারে কি মনে থাকে—বাবা উনি তোমার ভাবি-সহধর্ম্মিনী। তা স্ত্রী বলিলেই বা দোষ কি? এমন সুন্দরী রমণীকে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে মনে একটা আনন্দই হইয়া থাকে।

রমণী, মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সেই আনন্দের ফলে, এই বন্ধন।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"বন্ধু; আজি হইতে শিক্ষালাভ করিও—আজি হইতে রূপের আকর্ষণে মজিও না।"

সৈনিক। খুব শিক্ষা হইয়াছে, বাবা! যতদিন বাঁচিব, মেয়ে মানুষকে বাঘের মত দেখিব।

রবি। তোমার স্ত্রীকে?

সৈনিক। বাঘের জাতি বলিয়া নমস্কার করিব। এখন সে কথা যাউক—বাঁধনটা খুলিয়া দাও,—আমি পোষাক খুলিয়া দেই, তোমরা

পলায়ন কর—তারপরে পরমায়ু থাকে—কাল সকালে কেহ এদিকে আসে—আর দয়া করিয়া, বাঁধন খুলিয়া দেয়—সৈন্য-দলে মিশিব বা লুসাই দেশে চলিয়া যাইব। আর পরমায়ু ফুরাইয়া থাকে, ভালুকের পেটে ঢুকিব। তোমরা স্ত্রী-পুরুষে স্বচ্ছন্দে দেশে গিয়া সুখে ঘর করিও।

রবি। আবার স্ত্রী-পুরুষ!

সৈনিক। ভুলিয়া যাইতেছিলাম—ধর্ম্মবাবা; তবে বলি কি,—তোমাদের সম্পর্কটা কি?

যুবতী হাসিয়া বলিল,—"উনি আমার পিতা।"

সৈনিক। আসল, না উপ?

যুবতী। এখনও তোমার দুর্ম্মতি যায় নাই?

সৈনিক। কেন, কি হইল? তুমি বলিলে—উনি তোমার পিতা—কিন্তু আসল পিতা কি উপপিতা, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম বৈ ত নয়! আসল বলিলে, একটা সন্দেহ দাঁড়ায় কি না,—বড় জোর তোমার চেয়ে উনি তিন চারি বৎসরের বড় হইতে পারেন।

যুবতী। উপপিতা সম্পর্ক আছে না কি?

সৈনিক। আছে কি না—তা বুঝিব কেমন করিয়া? এই আমার বন্ধুবর সকাল হইতে সমস্ত দিন বলিয়া আসিলেন, যুবতী আমার প্রণয়িনী—তাহাকে প্রাণ হইতে ভালবাসি—তাই, তাহাকে পুরুষ বেশে সঙ্গে রাখি। তাহাকে বিবাহ করিব,—কারাগারে তুমিও কত ঢঙ্গে, কত রঙ্গে, উহাকে প্রেমসম্ভাষণই করিলে,—চোখের সাম্‌নে তাও দেখিলাম! আর আমাকে বাঁধিয়াই উঁহাকে বলিলে,—বাবা! তাই বলিতেছিলাম—এ বাবা বোধ হয়, উপবাবা।

যুবতী। আমার ধর্ম্মবাবা।

সৈনিক। ধর্ম্ম যেন থাক্‌বে না গো।

যুবতী। তোমার মত পশু ত সকলে নহে।

সৈনিক। বাবাকে প্রণয়ী বলে, মেয়েকে প্রণয়িনী বলে, তারা খুব ধার্ম্মিক বটে! এখন যা করিতে হয়, করিয়া ফেল।—প্রভাত হইলে সৈন্যেরা এদিকে আসিবে। তারা যদি আমাদিগকে দেখিতে পায়—তোমাদেরও আর যাওয়া হইবে না—আমারও প্রাণ থাকিবে না। সামরিক নিয়মানুসারে বন্দীকে কারাগৃহের বাহির করা অপরাধে আমাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। আর তোমরা পলায়নের অপরাধে প্রাণ হারাবে।

তখন রবীশ্বর তাঁহার হস্ত-পদের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। যুবতী একটু অন্তরালে গেলে, রবীশ্বর ও সৈনিক পরস্পর বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পুনরায়, সৈনিককে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিয়া, যুবতীকে সঙ্গে লইয়া, রবীশ্বর লুসাই-সৈন্যের মধ্য দিয়া শান-সৈন্যগণের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। রবীশ্বরের পরিধানে লুসাই-সৈন্যের পোষাক এবং যুবতীর পরিধানে সৈনিক-রমণীর পোষাক দেখিয়া কেহ কিছুই বলিল না,—তাহারা নির্ব্বিঘ্নে লুসাইসৈন্যের ছাউনি উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ)*(ঃ০—

অতি প্রত্যূষেই শান ও লুসাই-সৈন্যের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল; উভয় দলের রণদামামা, তুরী, ভেরি ও শঙ্খনাদ হইল,—প্রলয়ের কল্লোলের মত সৈন্যের সিংহনাদ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত প্রভৃতিতে দিগন্ত ছাইয়া পড়িল। উভয় দলই অমিত উদ্যমে উভয় দলকে আক্রমণ করিল।

রবীশ্বর ও সেই যুবতী, পথ হারাইয়া তখনও শান-সৈন্যসহ মিলিত হইতে পারেন নাই।

রবীশ্বর, দূর হইতে এই প্রাভাতিক যুদ্ধ দর্শন করিয়া যুবতীকে বলিলেন,—"এক্ষণে আমাদের শান-সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার কোন উপায়ই নাই। কেন না, আমাদের লুসাই-সৈন্যের বেশ। যুদ্ধের সময় সম্মুখে পাইয়া শান-সৈন্যগণ আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে, বা তোপে উড়াইয়া দিবে। আবার লুসাই-সৈন্যের মধ্যে পড়িলেও তাহাদের সাঙ্কেতিক কথা বলিতে পারিব না, কাযেই তাহারাও কাটিয়া ফেলিবে।"

যুবতী। তবে এখন আমরা কোথায় যাইব ?

রবি। এখন আমরা ঐ পাশের পাহাড়ের তলে, বনের মধ্যে বসিয়া থাকিগে। তাহার পরে, যুদ্ধ স্থগিত হইলে, শানসৈন্যের সহিত মিলিত হইব।

যুবতী নীরব হইল। তাহার মুখের ভাবে যেন বোধ হইল, সে কি ভাবিতেছে। রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার সঙ্গে বনের মধ্যে যাইতে ভয় করিতেছে ?"

যুবতী। না,—ভয় কিসের ? আমার কাছে ত ছুরি আছে, সারা রাত্রি আপনার পিছু পিছু ঘুরিলাম—তাহাতে ভয় হইল না,—আর এখন ভয় করিবে ?

রবি। তবে কি ভাবিতেছ ?

যুবতী। শান-সৈন্যদলে আমার স্বামী আছেন ;—তাহা আপনাকে কালই বলিয়াছি।

রবি। তাহা ত শুনিয়াছি।

যুবতী। তিনি বড় গোঁয়ার—আপনার প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করেন।

আজিকার যুদ্ধ অতি ভীষণ রকমই আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে—আমি কাছে নাই, পাছে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয়।

দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, রবীশ্বর যুবতীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখে তদ্রূপ তাহার হৃদয়ভরা স্বামি-প্রেম দেখিতে পাইলেন। বলিলেন,—"ভগবান রক্ষা করিবেন। জীবকে জীবে রক্ষা করিতে পারে না—তুমি এখন চল, সৈন্যগণ এদিকে আসিয়া পড়িতে পারে।"

তখন, তাহারা পার্শ্বদেশস্থ পাহাড়শ্রেণীর বনান্তরালে প্রবেশ করিল।

সূর্য্যোদয়ে জগতের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে,—কিন্তু এই ঘনসন্নিবিষ্ট বনের মধ্যে সূর্য্যকর প্রবেশের অধিক সম্ভাবনা নাই,—কোথাও একটু পাতার উপরে, কোথাও লতার পুষ্পস্তবকে, কোথাও একটু উন্নতশীর্ষ পাদপগাত্রে সূর্য্যকর পতিত হইয়াছে। রবীশ্বর ও যুবতী একটা পত্র-বহুল বৃক্ষতলে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

রবীশ্বর বলিলেন,—"তুমি আমার মা; আমার নিকটে কোন প্রকার ভয় বা সঙ্কোচ করিও না। তোমার জীবনেতিহাস বোধ হয় নিতান্ত প্রহেলিকাময়,—তোমার কথার আভাসে আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি,—যদি বলিতে কোন আপত্তি না থাকে, আমার নিকটে তোমার জীবন কাহিনী বল। যদি আমার দ্বারা তোমার কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনা থাকে,—প্রাণ দিয়াও করিব। মা;—তোমার নাম কি?"

যুবতী বলিল, "আমার নাম,—নাম বলিব—পরিচয় বলিব—আপনি পিতা—পিতার সাক্ষাতে সব বলিব—কিন্তু অনেক দিন হইতে অভাগিনীর পরিচয় গোপনই ছিল—বোধ হয় গোপনই থাকিবে।"

যুবতীর নয়নে অশ্রু সঞ্চার হইল। অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মুছিয়া, পুনরপি যুবতী বলিল,—"আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে। বাবার আদরের আদরিণী মেয়ে—তাই সোহাগে আমার নাম রাখিয়াছিলেন,—সোহাগী। আমার

নাম 'সোহাগী'। অল্প বয়সে মাতার মৃত্যু হয়, তাই পিতার সোহাগ-বাহু-পাশে বড় হই। ক্রমে কাল-যৌবন অভাগিনীর দেহে সঞ্চারিত হইল. যৌবনের প্রারম্ভে কিশোর কাল—কিশোর কালে জগৎ সুন্দর, সংসারের কুটিলতা সুদুর-পরাহত।"

"আমার পিতার বাড়ী ছিল মণিপুরে। ঐ সময়ে শান দেশীয় এক ধনী মণিপুরে ব্যবসায় উপলক্ষে গমন করেন, এবং আমাদের বাড়ীর কাছে বাসা লয়েন। তাঁহার সহিত তাঁহার কিশোর-বয়স্ক এক পুত্র ছিল, তাহার নাম দুলালচাঁদ। দুলালচাঁদ মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসিত—তাঁহার রূপে আমি মুগ্ধ হইলাম,—প্রাণ ভরিয়া দুলালচাঁদকে ভালবাসিলাম। কিন্তু আমাদের এইরূপ আনুগত্য ও একত্র বসবাস দেখিয়া, পিতা চটিলেন। তিনি কোন মণিপুরীর সঙ্গেই আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক—শানযুবক আমাকে বিবাহ করিয়া যে দেশান্তরে লইয়া যায়—ইহা তাহার অভিপ্রেত নহে। তিনি আমাকে তাড়না করিলেন—দুলালচাঁদকে আমাদের বাড়ী আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। স্রোতের জল বাঁধ পাইলে আরও ফুলিয়া উঠে—আমাদের অনুরাগ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইল। আমি পলাইয়া দুলালচাঁদের সহিত গিয়া, এক সৈনিকের বাড়ীতে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। সেই সৈনিকের সহিত শানদেশীয় ধনীর অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তার পর, উভয়ের মিলনের ফলে আমার গর্ভ হয়,—দুলালচাঁদও তাহার পিতার অজ্ঞাতে এই বিবাহ করিয়াছিল,—সে শুনিয়া বড়ই ভাবিত হইল, কিন্তু তাহার পিতা এই সময় দেশে যাইবার উদ্যোগ করিলেন,—সে শুনিয়া বুঝি বাঁচিয়া গেল, আমাকে না বলিয়াই পিতার সহিত স্বদেশে চলিয়া গেল। আমার পিতা জানিতে পারিয়া, ক্রোধে ফুলিয়া উঠিলেন,—ব্যভিচারিণী বলিয়া কত গালাগালি দিলেন। আমি কাঁদিয়া—তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলাম, "আমি যথাবিধি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। পিতা, প্রমাণ চাহিলেন,

—কিন্তু প্রমাণ দিতে পারিলাম না,—সে সময় নাগারা মণিপুর দখল করিয়াছে,—মণিপুরেশ্বর বিতাড়িত হইয়াছেন,—যে সৈনিকের বাড়ী আমি বিবাহিতা হইয়াছিলাম—তিনিও সেখানে নাই। কোন্ পুরোহিতে আমার বিবাহের মন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, আমার তাহাও স্মরণ হয় না। প্রমাণাভাবে পিতা বড়ই তিরস্কার করিলেন। এই দুঃখে, এই অভিমানে পিতা আমার রুগ্ন-শয্যা গ্রহণ করিলেন,—এবং অল্প দিনের মধ্যেই আমার কৃতকর্ম্মের শাস্তিপ্রদান জন্য, আমাকে অকূলে ফেলিয়া তিনি পরলোক প্রস্থান করিলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যুবতী কাঁদিতে লাগিল। কান্না, একেবারে বালিকার ন্যায় হাপুস্ নয়নে।

রবীশ্বর বলিলেন,—"যদি বলিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে আর না হয়, এখন নাই বলিলে; সময়ে শুনিব।"

চক্ষু মুছিয়া সোহাগী বলিল,—"যখন বলিতে বসিয়াছি—অভাগিণীর দুঃখের কাহিনী অনুগ্রহ করিয়া শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন—তখন শুনুন; আর হয় ত বলা হইবে না—আর হয় ত আমার ধর্ম্মপিতার সাক্ষাৎই পাইব না।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহলই হইতেছে, তোমার কষ্ট হইবে বলিয়া নিষেধ করিতেছিলাম।"

সাশ্রুমুখী সোহাগী বলিতে লাগিল,—"পিতার মৃত্যুর পরে একটী পুত্র প্রসব করিয়াছিলাম—সোণারচাঁদও বুঝি কলঙ্কের ভয়ে, আঁতুরঘর হইতেই পলাইয়া গেল। তখন আমার জগৎ শূন্য, সংসার শূন্য, হৃদয় শূন্য,—তাই গোপনে একটা লোক ঠিক করিয়া, আমার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া—তাহাকে প্রচুর অর্থদানে বশীভূত করিয়া শানদেশে আমার স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, যদি তিনি আমায় গ্রহণ করিতে স্বীকার

করেন,—পায়ের তলায় স্থান দেন,—সুখী হইতে পারিব। কিন্তু অভাগীর অদৃষ্ট-দোষে তিনিও পায়ে ঠেলিলেন। প্রায় ছয়মাস পরে সেই লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তিনি বলিলেন, যদি বিবাহ হইবার প্রমাণ স্বরূপে—সেই সৈনিকপুরুষ ও পুরোহিত মহাশয় সাক্ষ্য দেন—তবে সোহাগীকে গ্রহণ করিতে পারি। নতুবা গ্রহণের ক্ষমতা নাই। কারণ একটা ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে—ক্ষত্রিয় সমাজ, তাহা হইলে আমার জাতি মারিবে! প্রমাণ দিবার ভার আমার উপরে অর্পিত হইল,—দোষটা যেন আমি একাই করিয়াছি। আর সমাজের খাতিরে অভাগিনীর মুখের দিকে একবারও চাহিলেন না,—হৃদয়ে একটু অভিমান হইল, কিন্তু স্বামী ত দেবতা—আরাধনায় প্রসন্ন হয়েন, অভিমানে ভয় কি! হৃদয় বড় উদ্বেলিত হইল,—মানবজীবন বৃথায় গেল, নারীজন্ম সার্থক হইল না—স্বামী-সেবায় বঞ্চিত রহিলাম। তিলার্দ্ধও মনে সুখ পাইতাম না—স্রোতে ভাসা তৃণের মত সংসারে ভাসিয়া বেড়াইতাম। এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিনও হৃদয়ে শান্তি আসিল না,—স্বামিসেবার জন্য—ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য—নারীজন্মের সার্থকতা-সাধনার জন্য—প্রাণের আকুল ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।"

"মণিপুরে, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর নামে একজন ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন,—ধর্ম্ম উপদেশ লইবার জন্য একদিন তাঁহার আলয়ে গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার চরণ-প্রান্তে সমস্ত কথা নিবেদন করিলাম। শেষে বলিলাম,—যাহাতে মানব জন্ম সার্থক করিতে পারি—এমন ধর্ম্ম-পথ আমাকে দেখাইয়া দিন।"

"তিনি অনেক শ্লোক আওড়াইলেন, অনেক গল্প-গুজব করিলেন—অনেক ঠাকুর দেবতার কথা বলিলেন। আমি সকল বুঝিতে পারিলাম না। ঠাকুর বলিলেন,—ধর্ম্ম বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা কাহারও একদিনে

হয় না। নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে কিছুদিন এ বিষয়ে আলোচনা করিলে, তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। অতএব যদি এ পথে আসিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কিছুদিন বৈকালে বৈকালে আসিও।"

"ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, সে দিনের মত বিদায় চাহিলাম। কমল নামে তাঁহার এক শিষ্যা সেখানে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন— আমি উঠিলাম দেখিয়া, তিনিও উঠিলেন। দরোজা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলিলেন,—"মাগী, কি বকর বকর শুনছিস—যদি হৃদয়ের শান্তি চাস্—যদি নারীজন্ম সার্থক করিতে চাস্—তবে স্বামি-দেবতা-দর্শন করিতে শান-তীর্থে গমন কর্।"

আমি বলিলাম,—"মা; তিনি যে আমাকে গ্রহণ করিবেন না।"

কমল বলিলেন,—"মর্ মাগী; দেবতায় আবার গ্রহণ করিয়া থাকেন কবে? সেবিকা, সেবা করিলেই শান্তি পায়।"

"আমার গুরূপদেশ হইল। বুঝিলাম, ইহাই শান্তির পথ। তিনি আমার গুরু মা। তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, সেই দিনই শান-দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। স্বামি-সন্দর্শন পাইলাম। কিন্তু সোহাগীকে চিনিতে পারিলে, যদি তাড়াইয়া দেন—যদি চরণের কাছে রাখিতে ভয় করেন, তাই 'রোসন' নাম ধারণ করিয়া, পুরুষ সাজিয়া স্বামীর ভৃত্য হইয়াছি।"

"আমার স্বামী দুলালচাঁদ শান-সৈন্যের দলে মিশিয়াছেন,—এই সময়ে লুসাইসমর আরম্ভ হয়। আমি তাঁহার সহিত—তাঁহার সেবা করিতে ভৃত্যরূপে এই সমরে আসিয়াছি। সে দিনকার ভয়াবহ যুদ্ধে আমাদের হার হয়। সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হয়, বিপক্ষের একটা গোলা আসিয়া আমার স্বামীর অশ্বের বক্ষ ভেদ করে—তিনি লাফাইয়া ভূমিতে পড়িলেন। আমি একটা অশ্বে তাঁহার পশ্চাতে ছিলাম—বিপক্ষেরা

ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া, আমি অশ্ব হইতে নামিয়া আমার অশ্বটা আমার স্বামীকে দিয়া বলিলাম, আপনি পলায়ন করুন। ঐ দেখুন, বিপক্ষেরা এই দিকে আসিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ?"

আমি বলিলাম—"আমি ভৃত্য, আমাকে ধরিবে না।"

"আমার স্বামী, সেই অশ্বে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। লুসাইগণ কিন্তু ভৃত্য বলিয়া আমাকে ছাড়িল না। বাঁধিয়া লইয়া গেল,—এবং সম্ভবতঃ লুসাইরাজের নিকট সংবাদ পঁহুছাইয়াছিল; একজন অতি বলবান্ যুদ্ধপটু সেনাধিনায়ককে ধরিয়া বন্দী করা হইয়াছে। তাহার পর, আর যাহা যাহা হইয়াছে—সমস্তই আপনি জানেন।"

সোহাগী, কথা সমাপ্ত করিয়া রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিল,—দেখিল, রবীশ্বরের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সোহাগী বলিল, "অভাগিনীর দুঃখে এ জগতে কাহারও চক্ষুতে জল আইসে নাই—আপনার কোমল প্রাণে ব্যথা দিলাম!"

রবীশ্বর বলিলেন, "তুমি আমার কন্যা,—যদি ভগবান্ দিন দেন, আর দুলালচাঁদ জীবিত থাকেন,—আমি তোমাকে তোমার স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। তোমার গুরুমার আদেশ সফল করিব।"

সোহাগী বলিল,—তাঁহার উপদেশ সার্থক হইয়াছে,—অতি শান্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামি-সেবা করিতে পারিয়াছি।"

তাহার পরে, রবীশ্বর বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ফল পাড়িয়া আনিলেন, —সেই ফলে আর প্রস্রবণের জলে, উভয়ে ক্ষুন্নিবারণ করিলেন। ক্রমে দিবাবসানের সহিত যুদ্ধাবসান হইতে দেখিয়া সোহাগীকে সঙ্গে লইয়া, রবীশ্বর শান-সৈন্যের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

তাঁহাদিগকে পথ খুঁজিয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। শান-সীমায় পঁহুছিবামাত্র, লুসাইসৈন্যের পরিচ্ছদধারী রবীশ্বরকে ও তৎসহধর্ম্মিণী

জ্ঞানে সোহাগীকে, শান-সৈন্য-প্রহরিগণ বাঁধিয়া লইয়া গেল। তাহারা উভয়কে সেনানিবাসে পঁহুছাইয়া দিলে, কারারক্ষিগণ তাহাদিগকে বিচারার্থ সেনাপতি বিজয়সিংহের নিকট সংবাদ দিল,—সেদিন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, বিজয়সিংহ বলিলেন, তাহাদিগের আগামী কল্য বিচার হইবে, - অদ্য কারাগারেই বন্দী অবস্থায় থাকুক। রবীশ্বর ও সোহাগী বন্দী হইয়া শান-সৈন্যকারাগারেই সে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পর দিবস যুদ্ধ স্থগিত ছিল,—বিজয়সিংহের নিকটে রবীশ্বর ও সোহাগীকে উপস্থিত করিলে, বিজয়সিংহ রবীশ্বরকে চিনিতে পারিয়া, তাহার বন্ধন মোচন করিতে আদেশ করিলেন। সোহাগীও বিমুক্তবন্ধন হইল। বিজয়সিংহ রবীশ্বরের নিকট ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সমস্তই বলিলেন। অবশেষে সোহাগীর বন্দী অবস্থায় সাহস ও কৌশল —আর পূর্ব্ব জীবনের সমস্ত ঘটনা ও স্বামী শান-সৈনিকের নিকট ভৃত্য অবস্থায় থাকিয়া সেবা করা প্রভৃতি সমস্তই বলিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময় বিজয়সিংহের শরীর-রক্ষক রূপে শানসৈনিক দুলালচাঁদ সেখানে উপস্থিত ছিল,—সে সোহাগীর হৃদয়ের প্রেম,—সাহস, ধৈর্য্য ও তাহার সেবাপরায়ণতা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইল। তাহার ইচ্ছা হইল, তখনই সোহাগীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করে,—কিন্তু তথাপি তখনও তাহার সমাজের ভয় বিদূরিত হয় নাই,—সমাজের ভয়ে, সেই চাঁদ পারা মুখ, জল ভরা চোখ, দেহ ভরা সৌন্দর্য্য তুলিয়া বুকে লইতে পারিতেছিল না।

সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কর্ম্মক্ষেত্রের ঘটনাচক্রের চরণে শত শত নমস্কার করিয়া বলিলেন,— "মণিপুরে যখন ঐ বিবাহ হয়, তখন আমি সেখানে সৈনিকের পদে

অধিষ্ঠিত ছিলাম। আমারই আশ্রয়ে ঐ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তার পরে রাজ্য-পরাজয়ের সহিত আমি এই দেশে চলিয়া আসি। শান-যুবক, সোহাগীকে যে অঙ্গুরীয়ক যৌতুকস্বরূপে দান করিয়াছিল—গোপনে বিবাহ হইয়াছিল, পাছে সোহাগীর পিতা অঙ্গুরীয়ক দেখিতে পায়—এই ভয়ে সোহাগী শান-যুবকের সাক্ষাতেই সেই অঙ্গুরীয়ক আমারই নিকট রাখিয়া দেয়। কি জানি সহসা যদি প্রয়োজন হয়, এই বিবেচনায় ঐ অঙ্গুরীয়ক আমি এ পর্য্যন্ত আমার বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে রাখিয়াছি, কারণ, আমার ভয়, পাছে ঐ অঙ্গুরীয়ক হারাইলে দুইটী নর-নারীর বিবাহ অভিজ্ঞান হারাইয়া যায়—এবং তাহাতে যদি তাহাদের ভবিষ্যৎ মিলন না হয়,—প্রত্যবায়ভাগী আমিই হইব।”

এই কথা বলিয়া তিনি অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন। তাহাতে দুলালচাঁদের নামাঙ্কিত ছিল।

সোহাগী পুনঃপুনঃ সেনাপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুলালচাঁদ ঝুঁকিয়া আসিয়া সেনাপতির চরণ ধরিয়া বলিল,—“ধর্ম্মাবতার! আমিই সেই শান যুবক দুলালচাঁদ!”

সেনাপতি বলিলেন,—“নিঃসন্দেহ চিত্তে তুমি তোমার ধর্ম্ম-পত্নীকে গ্রহণ কর। এমন সতী রমণী জগতে দুর্ল্লভ।”

দুলালচাঁদ বলিলেন,—“আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি আমার পত্নীকে গ্রহণ করিতে পারিয়া অশান্তি হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্তি হইলাম। আর সমাজের ভয় করি না, আপনি যখন সেই বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন—তখন আপনিই তাহার সাক্ষী। আমার মুখোজ্জ্বল হইবে, আমি আমার একান্তানুগতা পতিপরায়ণা পত্নী গ্রহণ করিলাম।”

রবীশ্বর বলিলেন, “সোহাগী,—যাঁহার উপদেশে স্বামিরত্ন লাভ

করিলে,—অশান্তি হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলে ;—ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা কর।"

সোহাগী হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া প্রণাম করিল। তাহার চোখভরা জল, মুখ ভরা হাসি, কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে বাল-তপনের উদয় হইল। সে আবেশে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে রবীশ্বর, বিজয়সিংহ ও স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। দুলালচাঁদ সেনাপতির অনুমতি লইয়া, সোহাগীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনার দশ বার দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পর বিজয়সিংহ ও রবীশ্বরে কথোপকথন হইতেছিল। উভয়ের মুখই স্থির-গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কথা,—মণিপুর, মণিপুরের রাজা পামহেবা, মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ, রায় রতনচাঁদ, কৃষ্ণানন্দঠাকুর, দরিয়াবাজ ও সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জ লইয়াই হইতেছিল। তাঁহাদের কথোপকথনে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। অবশেষে রবীশ্বর বলিলেন,—"অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু সৈন্যের অধিপতি করিয়া দিন,—আমি লুসাইগণের শিবিরাদির অবস্থা সমুদয় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—ঐ সৈন্য সমুদয় লইয়া তাহাদের শিবির আক্রমণ করিব। আপনি সম্মুখ সমরে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিবেন।"

রবীশ্বরের প্রস্তাবে, সেনাপতি বিজয়সিংহ স্বীকৃত হইলেন। এবং সেই রাত্রেই সে সমুদয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বেই, এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের ও দুইশত পদাতিক সেনার অধিনায়ক হইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া

করিলে,—অশান্তি হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলে ;—ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা কর।"

সোহাগী হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া প্রণাম করিল। তাহার চোখভরা জল, মুখ ভরা হাসি, কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে বাল-তপনের উদয় হইল। সে আবেগে, আনন্দে, উচ্ছ্বাসে রবীশ্বর, বিজয়সিংহ ও স্বামীর চরণে প্রণাম করিল। দুলালচাঁদ সেনাপতির অনুমতি লইয়া, সোহাগীর হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনার দশ বার দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার পর বিজয়সিংহ ও রবীশ্বরে কথোপকথন হইতেছিল। উভয়ের মুখই স্থির-গম্ভীর এবং চিন্তান্বিত। কথা,—মণিপুর, মণিপুরের রাজা পামহেবা, মন্ত্রী চিরঞ্জীব লক্ষ্মণ, রায় রতনচাঁদ, কৃষ্ণানন্দঠাকুর, দরিয়াবাজ ও সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জ লইয়াই হইতেছিল। তাঁহাদের কথোপকথনে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। অবশেষে রবীশ্বর বলিলেন,—“অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু সৈন্যের অধিপতি করিয়া দিন,—আমি লুসাইগণের শিবিরাদির অবস্থা সমুদয় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি,—ঐ সৈন্য সমুদয় লইয়া তাহাদের শিবির আক্রমণ করিব। আপনি সম্মুখ সমরে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিবেন।”

রবীশ্বরের প্রস্তাবে, সেনাপতি বিজয়সিংহ স্বীকৃত হইলেন। এবং সেই রাত্রেই সে সমুদয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

প্রভাত হইবার অনেক পূর্ব্বেই, এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের ও দুইশত পদাতিক সেনার অধিনায়ক হইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া

রবীশ্বর বহির্গত হইলেন। পথে যাইয়া, রবীশ্বর ঐ সমুদয় সৈন্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। রামশরণ পঞ্চাশ জন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, লুসাই-ছাউনির উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। থোবালসিংহ, একশত জন সৈন্য সমভিব্যাহারে ছাউনির পশ্চিম দ্বারে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া সেনানিবাস অভিমুখে চলিলেন। থাঙ্গালসিংহ, একশত সৈনিক সঙ্গে লইয়া রবীশ্বরের বিশেষ সহকারী-রূপে তাহার অনীকিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সঙ্গে লইয়া রবীশ্বর বক্র পথে বনভূমি উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল,—উষার আলো জগৎ ছাইল,—আর বিজয়-সিংহের সৈন্য ব্যূহ হইতে রণদামামার সহিত গভীর নির্ঘোষে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল। শত শত অশ্বারোহী, সাদী, নিসাদী, কামান, বন্দুক, শূল, ভল্লকী প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় লুসাই-সৈন্যের বিরুদ্ধে ছুটিল। লুসাইসৈন্যগণও নিরুদ্যমে ছিল না,—তাহারাও যথাবৎ অস্ত্রাদির মরণ-ক্রীড়া করিতে করিতে শানসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা সম্মুখস্থ পরিখা পার হইয়া যাইবামাত্র,—রবীশ্বরও সসৈন্যে পরিখা পার হইতে চেষ্টিত হইলেন, ওদিকে রামশরণ উত্তর দ্বারে কামানের গোলায় মৃত্যু ধ্বনির অশনি আহ্বান করিলেন।

কিন্তু চতুর লুসাই-সেনাগণ নিশ্চিন্ত বা অসাবধান ছিল না। উত্তর দ্বারে নিষ্কোষিত অসি হস্তে দুই শ্রেণীতে চল্লিশ জন সিপাহী পাহারা দিতেছিল। তাহারা রামশরণকে বাধা দিল,—কোষ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া মরণের অভিনয় আরম্ভ করিল। অপর দিকের সৈন্যগণকে ব্যস্ত রাখিবার জন্য থোবালসিংহ সে দিক্ হইতে কামান ছুড়িতে লাগিলেন।

লুসাই-কেল্লার মধ্যে বিকট চীৎকার ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। গাঙ্গালসিংহ নিজের সৈন্যগণকে বিস্তৃত ভাবে দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন।—উপর্য্যুপরি মেঘ-মন্দ্রস্বরে লুসাই-দুর্গ হইতে কামান ও বন্দুকের শব্দের সহিত গুলি চলিতে লাগিল।

রবীশ্বর সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ হটিয়া গেলেন,—পরিখাতীরের বাঁধের অন্তরালে শুইয়া পড়িয়া রবীশ্বরের সৈন্যগণ বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। এই সময় রামশরণ উত্তর দ্বারের পথ দিয়া এবং থোবালসিংহ পশ্চিম দ্বারের পথ দিয়া, লুসাই দুর্গে প্রবেশ করিল। অধিকাংশ সৈন্য লইয়া সেনাপতি বিজয় সিংহ চালিতসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইয়াছেন,—অবশিষ্ট দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া, বিপদ গণিয়া অন্তিম সাহসে গুলি চালাইতেছিল,—কিন্তু পশ্চাদ্দিকের সৈন্যগণের দ্বারা একান্ত আক্রান্ত হইয়া তাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল—এই অবসরে রবীশ্বর সিংহ-বিক্রমে পরিখা পার হইয়া সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন বেলা প্রহরাতীত হইয়া গিয়াছে।

অকস্মাৎ দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং ছাউনীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, সকলেই তাহাতে যোগ দিল। স্বপক্ষীয়গণের মৃতদেহের দুর্দ্দশা ও রমণীগণের উপরে বল-প্রকাশ-ভয়ে বিজিত হইলে যে দুরাবস্থা সম্ভব, তাহা উপলব্ধি করিয়া, লুসাইসৈন্যগণ বার বার ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। দুর্গমধ্যে ভীষণ রবে রণ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সমস্ত সৈনিকই যেন এক তানে, এক প্রাণে রণ-রঙ্গে মাতিয়া উঠিল। অস্ত্রের ঝনৎকার, শমনের দণ্ডের ন্যায় উভয় সৈন্যের মস্তকোপরি বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল। ধূলি-পটলে ও বারুদের ধূমে সূর্য্য-দেব অদৃশ্য-প্রায় হইলেন। এইরূপে প্রায় এক প্রহর যুদ্ধ করিয়া,

রবীশ্বরের অঙ্কে বিজয়লক্ষ্মী শায়িত হইলেন। বিজয়ের বিজয়-দুন্দুভি বাজাইয়া প্রধান প্রধান কয়েকজন সেনাধিনায়ককে বন্দী করিয়া এবং বহুধন ও রসদ লুঠিয়া লইয়া রবীশ্বর চলিয়া গেলেন। ওদিকে বিজয়-সিংহের সহিত সম্মুখ সংগ্রামেও লুসাইসেনাপতি বিপুল ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া সন্ধ্যার সময় মদমত্ত-করি-পদ-দলিত ছিন্ন ভিন্ন কমলকাননের ন্যায় যুদ্ধ-বিজিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই দিবসের পরাজয়েই লুসাইসৈন্যগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া প্রমাদ গণিল।

রবীশ্বরের এতাদৃশ সাহস ও রণ কৌশল দর্শনে বিজয়সিংহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তাহাকে যথোচিত আদরের সহিত সহস্র সেনাধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় পঞ্চদশ দিবস পরে, সেনাপতি বিজয়সিংহ শানাধি-পতির এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল,—

"লুসাই সমরের অবসান হইতে এখনও বোধ হয় অনেক দিন আছে, কাযেই আপনারও পুরীতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব আছে, সন্দেহ নাই। পুরীরক্ষণে যে সেনাধিনায়ক পাঁচশত সৈন্য লইয়া নগর-দুর্গে ছিলেন, সহসা উক্ত সেনাধিনায়কের মৃত্যু হওয়ায়—নগরী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত। অতএব, একজন বিশ্বাসী বলদৃপ্ত ও চতুর সেনাধিনায়ককে ঐ পদে অভিষিক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিবেন।"

পত্র পাইয়া, রবীশ্বরকে ডাকিয়া বিজয়সিংহ পত্র শুনাইয়া বলিলেন,— "তোমাকে আমি ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া, নগরে পাঠাইতে ইচ্ছা করি, ভরসা করি, তুমি ঐ পদে থাকিয়া আমার মানরক্ষা ও তোমার কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান হইবে।"

রবীশ্বর স্বীকৃত হইলেন, এবং কয়েকজন শরীর-রক্ষক ও পথপ্রদর্শকে পরিবৃত হইয়া সেই দিবসেই তিনি শানরাজধানীতে গমন করিলেন।

শান, প্রকৃতির শান্ত নিকুঞ্জ নিবাস। প্রকৃতির ও নগরীর শোভা দেখিয়া রবীশ্বর প্রীত হইলেন, এবং মহারাজা ও সমরসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদগ্রহণ করিলেন ও নগরের পথঘাট আদি এবং যে পথে সৈন্যাদি আসিয়া নগর আক্রমণ করিতে পারে, তাহার পরিদর্শন ও নূতন নূতন বন্দোবস্তাদি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তখনও লুসাই-সমরের অবসান হইল না। লুসাইগণ পরাস্ত, হইয়াও পরাজয় স্বীকার করিল না। তখন তাহারা অদৃষ্ট-সাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।



চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একবৎসর ধরিয়া বিজয়সিংহের বীর-ভুজ-বল-সন্নিধানে লুসাইগণ পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়া—অনেক বলক্ষয় করিয়া—অবশেষে শেষ-চেষ্টা করিবার জন্য, নূতন একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক কূটপন্থা অবলম্বন করিল।

স্বয়ং সেনাপতি সেই নব গঠিত সৈন্যদল লইয়া, অন্য পথ দিয়া পঙ্গের রাজধানী আক্রমণার্থ অতি সংগোপনে যাত্রা করিলেন। এদিকে যে সকল সৈন্য পূর্ব্ব ছাউনিতে থাকিল, তাহারা বিজয় সিংহকে বিব্রত রাখিবার জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া—সমস্ত দিবারাত্রি যুদ্ধ করিতে লাগিল।

পঙ্গের রাজধানী সুনীল-পত্র-পল্লব-শোভিত তরুরাজি ও শাখা-প্রশাখা প্রসারী, স্বজাতি-সহানুভূতি-পরায়ণ, আসঙ্গলিপ্সি ঘন বংশবন, পর্ব্বতমালা এবং নিবিড় বনরাজিতে পরিবেষ্টিত—রাজপ্রাসাদ, সৈন্যাগার, মন্ত্রী ও সেনাপতি, পদস্থ ও ধনী ব্যক্তিগণ প্রভৃতির আবাস-ভবন গুলিই

পাথরে প্রস্তুত প্রাসাদ—তদ্ভিন্ন অধিকাংশই কাঁচা-বাড়ী। নগরে প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষ লোকের বাস। নগরটী কৃত্রিম শোভায় তাদৃশ শোভাশালী বা সৌধ-কিরীট না হইলেও প্রাকৃতিক শোভার আস্পদ। এখানে গগন-ভেদা মন্দির-চূড়া নাই—বৃহদাকার চিম্‌নি সমূহও অন্তর্জ্বালার নিদর্শনরূপ দীর্ঘশ্বাসের উত্তপ্ত ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতেছে না। কেবল অনন্ত নীলাকাশের চন্দ্রাতপতলায়, ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুরাজি স্থির-গম্ভীর শোভা-সৌন্দর্য্যে সজ্জিত রহিয়াছে। জনতার কোলাহল বা শোকের হাহাকার দূর হইতে কিছুই শ্রুত হওয়া যায় না। বাহ্যিক কোন চিহ্নে বুঝিতে পারা যায় না যে, সেই বনপর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর আছে:—যে নগরে অর্দ্ধ লক্ষ মানব-মানবী বসতি করিয়া থাকে। অথচ সেই বৃক্ষরাজির অন্তরালেই শানাধিপতির রাজ-প্রাসাদ লুক্কায়িত রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের নিকটেই মহারাজার আত্মীয় ও সমাদৃতগণের বসতবাটী। প্রত্যেক বাটীরই চারিদিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ।

যখন লুসাই-সেনাপতি সৈন্য লইয়া পঙ্করাজধানী আক্রমণার্থ বক্রপথে, তাহার অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন,—তখন বিজয়সিংহ তাহা শুনিতে পাইলেন। বিজয়ী বিজয়সিংহ এই বার বিপদ গণিলেন।

রাজপুরী রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাকে সৈন্য লইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে সম্মুখের শত্রুসৈন্য তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত ও দলিত করিয়া ফেলিতে পারে। বিশেষতঃ যাহারা নগর আক্রমণ করিতে গিয়াছে—তাহারা সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবে—আর সম্মুখের সৈন্য তখন পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে: এরূপ ঘটিলে—সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে একেবারে আক্রমিত হইলে তাঁহাদের জয়াশা কিছুতেই থাকিবে না।

রাজপুরীতে কেবলমাত্র সৈন্য লইয়া রবীশ্বর পুরী-রক্ষা করিতে-

ছিলেন। বিজয়সিংহ ভাবিলেন, লুসাইগণের বীরাগ্নির নিকটে সেই কয়টী সৈন্য পতঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু আর ত কোন উপায় নাই—বিজয়সিংহ হতাশ গণিলেন। তবে হতাশে-উচ্ছ্বাসে উদ্যমে বিশেষ চেষ্টা করিয়া, সম্মুখের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মনের ইচ্ছা—যদি সম্মুখের শত্রুগণকে শীঘ্র দলিত করিতে পারেন—তবে নগররক্ষার্থ ফিরিতে পারিবেন। কিন্তু আশা কার্য্যে পরিণত হইল না। এক এক জন লুসাইসৈন্য পঞ্চাশ জনের বল ধারণপূর্ব্বক লড়িতে লাগিল।

এদিকে রাজপুরীতে রবীশ্বর পাঁচশত সৈন্য লইয়া,—তাহাদের অধিনায়ক-রূপে পুরী রক্ষা করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া লুসাই-সেনাপতি নগরের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অতর্কিত আক্রমণে রবীশ্বর একটুকুও বিচলিত হইলেন না। তবে যেখানে যেরূপে—যেখানে যে ভাবে সৈন্য রাখিলে, শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিবেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া—সৈন্য লইয়া কেবল তাহাই করিতে লাগিলেন। কথাটা শীঘ্রই নগর মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল। নগরবাসিগণ মহাভীত হইল। রাজাও সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

রাজা অত্যন্ত বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। যুদ্ধবিষয়ে তিনি পারদর্শী নহেন,—বিশেষতঃ বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত সে কার্য্যে এখন সাহসও নাই। এদিকে প্রায় সমস্ত সৈন্য লইয়া সেনাপতি লুসাই-সমরে লিপ্ত। এ অবস্থায় একজন বালক, পাঁচ শত সৈন্য লইয়া কি প্রকারে রাজধানী রক্ষা করিবে, কি প্রকারে তাঁহার স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ, ধন ও মান রক্ষা হইবে,—ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইলেন। অমাত্যগণকে লইয়া—সমর-সচিবগণকে লইয়া—পরামর্শ করিলেন,—উপায় স্থির করিবার জন্য জল্পনা কল্পনা করিলেন,—কিন্তু সকল

দিক্‌ই শূন্য! মহারাজা কাতর ও চিন্তিত হৃদয়ে অন্দর-মহলে গমন করিলেন।

স্বামীর মুখ ম্লান দেখিয়া, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে?"

রাজা, পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"লুসাইগণ নগরের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রাণী। কেন, আমাদের সেনাপতি কি পরাজিত হইয়াছেন?

রাজা। না, অন্যদিক্ হইতে অতর্কিতভাবে অনেকগুলি সৈন্য লইয়া লুসাইসেনাপতি নগর আক্রমণ করিয়াছে।

রাণী। উপায়?—

রাজা। উপায় ভগবান।

রাণী। নগরে শুনিয়াছি সৈন্য নাই—একটী বালক বলিলেই হয়,—যুবক, পাঁচশত সৈন্য লইয়া নগর রক্ষা করিতেছে! এ আক্রমণে কি প্রকারে রক্ষা পাওয়া যাইবে?

রাজা। ভগবান্ যাহা করেন,—তাহাই হইবে। বৃদ্ধ বয়সে হয় ত চক্ষুর উপরে তোমাদের দুর্দ্দশা ও নিজের সর্ব্বনাশ দেখিতে হইবে।

রাণী। এখন পলায়ন করিলে হয় না?

রাজা। সে উপায় নাই।

রাণী। কেন?

রাজা। তুমি বোধ হয় জান—নগরের চারিদিকে পাহাড়। পাহাড় অতিক্রম করা কঠিন। আর শুনিলাম, লুসাই সৈন্যগণ গ্রামের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ হইতেই আক্রমণ করিবে। যে কোন দিক্ দিয়া পলায়ন করিলেই তাহাদের হাতে পড়িবে।

রাণী। সে যুবক সেনাধিনায়ককে বর্ত্তমান বিপদ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলে, বা পুরীরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

রাজা। সে বলিল,—কোন ভয় নাই। ভগবান্ রক্ষা করিবেন।

রাণী। কিন্তু আমার মতে আমরা সাবধান হই—কতকগুলা ধনরত্ন সংগ্রহ করি। মলিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি—পুরীতে শত্রু প্রবেশ করিলে দাসীরূপে বাহির হইয়া যাইব।

তখন রাজা ও রাণী পরামর্শ করিয়া, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

রাণী নিজ দুহিতা চঞ্চলাকে ডাকিয়া নিকটে থাকিতে আদেশ করিলেন,—এবং সময় আসিলে পলায়ন করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিলেন। চঞ্চলা মৃদু হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

রাজা ও রাণীর এবম্বিধ ভাব ও কার্য্যাদির কথা পাঠ করিয়া আমাদের অনেক অম্লজীর্ণ রোগগ্রস্থ পাঠক পাঠিকা তাঁহাদিগকে ভীরুস্বভাব বলিয়া ভৎর্সনা করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহারথী বীরগণও বিপদে পড়িলে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। অবস্থা বুঝিয়া প্রাণরক্ষা করা, নিতান্তই সে ভীরুস্বভাবের কার্য্য, তাহা বলিয়া মনে হয় না। তবে আমরা মনে ভাবি—শত তরবারির মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, যে অকারণে প্রাণ বিসর্জ্জন না করিল, সে আবার বীর কিসের ? কিন্তু আমরা নিজেরা রিক্তহস্ত ফিরিঙ্গি শিশুর মুখ দেখিলে, ভয়ে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

নিন্দারই হউক আর সুখ্যাতিরই হউক—সু-উচ্চ-রাজ-প্রাসাদের মধ্যে বসিয়া সে দিবস রাত্রিতে ভয়ার্ত্ত রাজা ও রাণী যাহা করিয়াছিলেন—আমরা তাহাই লিখিলাম। পাঠক পাঠিকাগণ যেরূপেই হউক—তাঁহাদের চরিত্র সমালোচন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমারী চঞ্চলা এখন পূর্ণ-যুবতী ও সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। তেমন রূপ—তেমন সুঠাম গঠন—তেমন সুষমার প্রতিমা—মানব জগতে দুর্লভ। চঞ্চলাই বুঝি বিধি-সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের ললাম,—শেষ বিবর্ত্তন। তাহার নিরুপম লাবণ্য আভরণের আভরণভূত—প্রসাধনের প্রসাধনভূত; সে রূপ দেখিলে, বোধ হয় সকল মানব মানবী যে হাতে গঠিত—চঞ্চলা বুঝি সে হাতের নহে। ইহার স্রষ্টা হয় ত কান্তিপ্রদ চন্দ্রমা, মধুররস মদন কিম্বা কুসুমাকার বসন্ত। তাহার বর্ণ অরুণালোক-বিকসিত কমল-কোরকের ন্যায়,—লাবণ্য বাসন্তী-পূর্ণিমার জোৎস্নার ন্যায়—চাহনি চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণের ন্যায়। দেহ সুগোল জ্যোতিঃপূর্ণ—স্তনদ্বয় পীনোন্নত প্রবৃদ্ধ, কেশপাশ চমরীপুচ্ছমনোহারী।

চঞ্চলা, মাতার নিকট হইতে বাহির হইয়া, একেবারে প্রাসাদের ত্রিতলে উঠিয়া পড়িল। ত্রিতলের একটা কক্ষের দ্বার ভেজান ছিল, ঠেলিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

একখানি সুসজ্জিত পালঙ্কে শয়ন করিয়া, একটী পূর্ণযুবতী সুন্দরী রমণী নিদ্রা যাইতেছিল। গৃহস্থিত উজ্জ্বল দীপালোকে সেই ঘুমন্ত মুখের অনন্ত-সুষমা ফুটিয়া উঠিতেছিল,—চঞ্চলা তাহার গোলাপগণ্ডে একটী টীপ দিল।

যুবতীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল,—সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"রাজকুমারী।"

রাজকুমারী চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"নয় ত কি তোমর মনচোরা।"

নিদ্রোত্থিত যুবতীর নাম রমা। রমাও মৃদু হাসিয়া বলিল—"মনচোরে আসিবার পথ নাই।"

চঞ্চলা। (হাসিয়া) কেন ?

রমা। দ্বারে চাবি আঁটা।

চঞ্চলা। কবে কোন্ চোর আসিয়া চাবি খুলিয়া দিবে।

রমা। সে বড় সহজ নহে—না খুলিয়া দিলে, কেহ খুলিতে পারে না। তার সাক্ষী তুমি।

চঞ্চলা। আমি কিসে ?

রমা। কত দেশের কত রাজপুত্র তোমাকে বিবাহ করিতে আসিল —কত হাবে ভাবে—রূপে গুণে তোমাকে মজাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তুমি অটল। কাহাকেও তোমার পছন্দই হয় না। তবেই দেখ,— হৃদয় চুরি যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

চঞ্চলা। তা নহে সখি,—তা নহে।

রমা। তবে কি ?

চঞ্চলা। হৃদয়ের মধ্যে এক একজনের এক একটা রূপ দিয়ে গুণ দিয়ে গঠিত ছায়াচিত্র থাকে—বাহিরে তাহাকে দেখিতে পাইলেই মানুষের হৃদয়-কপাট খুলিয়া যায়।

রমা। তা এত রাজপুত্র, এত মন্ত্রীর পুত্র, এত বীরের পুত্র আসিল — তোমার প্রাণের ছবি কি কাহারও সহিত মিলিল না ?

চঞ্চলা। না, তার মধ্যে একটাও মানুষ নহে।

রমা। না, সব গরু। কেন ব্রহ্মদেশের মন্ত্রীর পুত্র ?

চঞ্চলা। ছিঃ—তাহার হাতের তরবারি শত্রুর হৃদয় কাঁপাইতে পারে না।

রমা। বঙ্গদেশের সুবেদারের ছেলে ?

চঞ্চলা। যে হাঁদাপেটা !

রমা। ঢাকার শান্তিরাম বর্দ্ধন ?

চঞ্চলা। লোকটা বীর বটে,—কিন্তু লেখা পড়া জানে না। পশু।

রমা। তবে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পুত্রকে কেন বিবাহ কর না?

চঞ্চলা। তিনি শাস্ত্র জানেন,—কিন্তু বিচার জানেন না,—কাব্য পড়িয়াছেন, কিন্তু কবিতার রস আস্বাদনে অপারগ।

রমা। তবে বল, সর্ব্বগুণে গুণাধার—সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সারভূত, বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মত একটী স্বামী তোমার চাই।

চঞ্চলা। (হাসিয়া) ততটা না হউক—সেইরূপ কতকটা আদর্শে গঠিত হওয়া চাই! স্বামিই ত আমাদের বৃন্দাবনচন্দ্র।

সহসা রমা চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"ও কি সখি?" চঞ্চলার মুখচন্দ্র-মায় যেন সন্ধ্যার একটু ক্ষীণ কালিমা অঙ্কিত হইল।

আবার—আবার দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া শব্দ হইল। রমা চকিত-চাহনিতে চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"ও কিসের শব্দ সখি?"

চঞ্চলা তাহার সৌন্দর্য্য-ভরা মুখ-খানা আঁধার করিয়া বলিল, "ও যুদ্ধের তোপধ্বনি।"

রমা বিস্মিত নেত্রে চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"যুদ্ধ! যুদ্ধ কি গো? সেনাপতি ত লুসাইদিগের সেই বহুদূরে যুদ্ধ করিতেছেন। এখানে আবার কি?

চঞ্চলা। গোপনে লুসাই-সেনাপতি নগর আক্রমণ করিয়াছে।

রমা। সর্ব্বনাশ! এখানে সেনাপতি নাই—সৈন্য নাই—কে রক্ষা করিবে?

চঞ্চলা। ভগবান্।

রমা। সৈন্যাদি কি এখানে কিছুই নাই?

চঞ্চলা। সবে পাঁচ শত মাত্র আছে।

রমা। সেনাপতি কে আছে?

চঞ্চলা। শুনিলাম—একটী নবীন যুবক। তাহার উপর পুরীর রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সেনাপতির সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে—সন্দেহ নাই। তবে যাহা ঘটিয়াছে—তাহার উপায় কি?

রমা। ও কি? নিকটেই যে মুহুর্ম্মুহু তোপধ্বনি হইতেছে—ও যে সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় অগণ্য শব্দ। এ ত পাঁচ শত লোকের কায নহে। তবে কি অধিক সংখ্যক সৈন্য নগরে আছে।

চঞ্চলা। না, বোধ হইতেছে, শত্রুসৈন্য নগরমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, উভয় দলেরই তোপধ্বনি হইতেছে।

রমা। তবেই সর্ব্বনাশ?

চঞ্চলা। কি সর্ব্বনাশ! তোমার আমার কি?

রমা। আমাদেরই বেশী ভয়।

চঞ্চলা। কেন, গায়ের গহনা কাড়িয়া লইবে নাকি?

রমা। রত্ন কাড়িয়া লইবে।

দৃপ্তা সিংহীর মত গ্রীবা বাঁকাইয়া চঞ্চলা বলিল,—"রত্ন! সতীত্ব-রত্ন? শত দানবী-শক্তি একত্রিত হইলেও সতীর নিকটে তাহা কাড়িয়া লইতে পারে না। প্রাণ দিলে সে রত্ন থাকে।' তবে প্রাণ লইয়া যাহারা ব্যস্ত, তাহারা সে দিকে গড়ায় বটে।

রমা। তবে এতলোক থাকিতে আমরাই বা নির্ভয় কেন।

চঞ্চলা। আমরা মরিলে ত আর কেহই কাঁদিবে না।

রমা। পোড়ার মুখ তোমার—মানুষ মরিলে বুঝি বৌ আর স্বামী এরাই কাঁদিয়া থাকে, মা-বাপ ভাই-বোন আর কেহই কাঁদে না।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া অতি ত্রস্ত ভাবে ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"রাজকুমারী, আমি আপনাকে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছি।"

চঞ্চলা। কেন ?

দাসী। রাণীমা আর মহারাজ আপনাকে খুঁজিতেছেন।

চঞ্চলা। কেন ?

দাসী। নগরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে।

চঞ্চলা। তা আমি কি করিব ;—আমি যদি মহারাজের কন্যা না হইয়া পুত্র হইতাম—তবে আজি তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিতাম।

দাসী। তা না গো—শীঘ্র আসুন।

চঞ্চলা। আমি গিয়া কি করিব ?

দাসী। তাঁহারা পুরী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন,—দাস-দাসী, লোকজন, আত্মীয়-স্বজন সকলেই পুরী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে—কেবল তাঁহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আপনি চলুন।

চঞ্চলা রমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি যাবে না ?"

রমা। না,—আমি মরিব। আমি মরিলেই যেন তুমি বাঁচ।

চঞ্চলা। এ বড় সুখের মরণ—শত্রু মারিতে মারিতে যদি মরা যায়,—তবে বড় সুখের মরণ হয়।

তাহারা সকলেই চমকিয়া উঠিল—প্রাসাদের পাদমূলে সৈন্যের কোলাহল, আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—প্রলয়ের মেঘগর্জ্জনের ন্যায় উত্থিত হইল। গৃহ হইতে বাহির হইয়া বারেণ্ডায় আসিয়া তাহারা দেখিল,—সত্যই প্রলয়ের কল্লোল তুলিয়া রাজ-প্রাসাদ ঘেরিয়া সৈন্য সমবেত হইয়াছে—উভয় দলের সৈন্যই সেখানে উপস্থিত হইয়াছে,—উভয় দলেই অদম্য উৎসাহে বাহুর আস্ফালন, বীরকণ্ঠের হুহুঙ্কার—মুহুর্মুহুঃ শঙ্খনাদ ও অস্ত্র সঞ্চালন করিতেছে। তবে লুসাই-সৈন্যের নিকটে শান-সৈন্য মুষ্টিমেয়।

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছিল,—কিন্তু অরুণোদয় হয় নাই,—কেবল পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে নব নলীন সম্পুটসম রশ্মি-চ্ছটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চঞ্চলা দাসীকে বলিল,—"আমাদের আর পলায়ন করিবার উপায় নাই, তুই শীঘ্র দেখিয়া আয়—বাবা ও মা কোথায় আছেন।"

কাঁপিতে কাঁপিতে দাসী চলিয়া গেল। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ও নির্নিমেষ নয়নে চঞ্চলা ও রমা উভয় দলের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। কখনও তাহারা শান-সৈন্যের একটু বিক্রম দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেছিল—আবার তৎপরেই—লুসাই-সৈন্যের দৃপ্তবহ্নিতে শানগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছিল।

সহসা রমা কাঁপিয়া উঠিল। চঞ্চলাও স্তব্ধশ্বাস চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"আর আশা নাই। এইবার সকলের শেষ—আমাদের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়াছে।"

আবার—আবার সমুদ্র-কল্লোল অতিক্রম করিয়া ভীম-ভৈরব রব উঠিল—"জয় শানাধিপতির জয়!"

রমা বলিল,—"ও কি সখি! সহসা আমাদের মহারাজের জয় উচ্চারিত হইল কেন?"

চঞ্চলা রমার গলা ধরিয়া টানিয়া লইয়া বলিল,—"ঐদিকে এস, ঐ দেখ,—দ্রোণাচার্য্যের চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া অভিমন্যুর ন্যায়—ঐ দেখ,—ঐ দেখ,—একটী যুবক যেন সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত রশ্মি বিকীর্ণ করিতে করিতে লুসাই-সৈন্য সাগরের মধ্য দিয়া—তাহাদিগকে দলিত, মথিত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন—ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ আবার একত্রিত ও দলবদ্ধ হইয়া জয় ঘোষণা করিল।"

রমা গর্ব্বিত ও বিস্মিত কণ্ঠে বলিল,—"সখি; দেখ—দেখ—ঐ

যুবক সৈনিকের বাহুতে কি ভীম পরাক্রম—উহার দুই হস্তে দুইখানি তরবারি যেন নারায়ণের সুদর্শন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে।”

উৎফুল্ল অথচ ভীতি-বিহ্বল আননে—সাশ্রু-নয়নে রমার মুখের দিকে চাহিয়া রাজকুমারী বলিল, “অত রক্তস্রোত—ওঃ! কি ভয়ানক? বালক যেমন কচু কাটিয়া থাকে—আমাদের নবীন-সৈনিক সেই প্রকারে লুসাই-সৈন্য কাটিয়া যাইতেছেন। সখি; এমন বীর কখনও দেখিয়াছ কি?”

রমা চমকিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—“ঐ সর্ব্বনাশ হইল,—না, না—কি বীর! কি বীর-বাহুর বিক্রম,—যে সৈন্য আমাদের নবীন-সৈনিকের উপরে ভীম অস্ত্র তুলিয়াছিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে বাম হস্তের অসি দ্বারা তাহার অস্ত্রের কোপ রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্তের অসি দ্বারা—মুহূর্ত্তে তাহার দেহটা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিল।”

চঞ্চলা। দেখ সখি,—চাহিয়া দেখ—মানুষের শরীর ত আর মৃণালের মত ঐ কোমল শরীর—এত আক্রমণে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে—সমস্ত মুখখানা ঘামিয়া উঠিয়াছে—সেই ঘামের উপরে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া কি সুন্দরই দেখাইতেছে!

এবার রমা হাসিল। এই ভীষণ বিপদের সময়েও রমার অধরে হাসি খেলিল! সে কিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল, “একবার ডাকিব? ডাকিয়া বলিব যে,—হে সৈনিকবর! তুমি আইস—আমাদের রাজকুমারী আঁচলে তোমার মুখের ঘাম মুছাইয়া দিবেন।”

ফুলধনুর মত ভ্রূ সঞ্চালন করিয়া রাজকুমারী বলিল,—“ঐ সৈনিক যেরূপ অদম্য পরাক্রমে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে—তাহাতে তাহা করা কর্ত্তব্য।”

রমা বলিল,—ঐ গেল! শত্রুসৈন্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে—ঐ, ঐ হারিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। ঐ আমাদের নবীন সৈনিক তাঁহার

সেনাদল লইয়া মেষপালের পশ্চাতে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধাবমান হইলেন।

চঞ্চলা বলিল,—"সখি ; তুমি একবার দেখিয়া আইস—আমার বাপ-মা কোথায় ? সে দাসী মাগী আর ফিরিল না।"

রমা দ্রুতপদে দ্বিতলাভিমুখে নামিয়া গেল। চঞ্চলা এক দৃষ্টে সৈন্যগণের পলায়ন,—মধ্যে দণ্ডায়মান—মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল। সহসা দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ হইতে অতি ভীষণ চীৎকারধ্বনি শুনিয়া, বিপদ ভাবিয়া চঞ্চলা যেমন ফিরিতেছে—অমনি এক ভীমকায় সৈনিক-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ব্যাধ-বাণ-ব্যথিতা কুরঙ্গীর ন্যায় চমকিয়া উঠিল।

সৈনিক পুরুষ বলিল,—"সুন্দরি! শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস। আমি তোমাকে বিপদে পতিত হইতে দিব না। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে,—এখনই শত জন তোমার উপরে বল-প্রকাশ করিবে। কিন্তু তুমি আইস—আমি তোমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিব—একা ভোগার্থে রাখিয়া দিব।"

নব কাদম্বিনীতে বজ্রের বিকাশ হইল। মাধুরী মরিয়া প্রলয়ের হলাহল ঢালিয়া—কুমারী সিংবাহিনী-রূপ ধরিল,—চঞ্চলা বলিল,—"সাবধান! আমার অঙ্গ স্পর্শ করিও না।"

সৈনিক। সুন্দরি ;—তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে কাহার না সাধ হয়,—বৃথা আস্ফালন—বৃথা ক্রন্দন—বৃথা মিনতি—তোমাদের পুরীর মধ্যে আমরা আসিয়াছি। তোমার পিতা-মাতাকে বন্দী করিয়াছি—নীচে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে,—আমি লুসাই-সেনাপতি! তুমি আমার সঙ্গে আইস।

চঞ্চলার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। বড় কষ্টে—বড় অভিমানের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, এই যে আমাদের

সৈন্যগণ জয় লাভ করিয়া, তোমাদের সৈন্যগণকে খেদাইয়া লইয়া যাইতেছে।”

সেনাধিপতি হাসিয়া বলিলেন,—“সুন্দরী; যুদ্ধের কৌশল তুমি কি জান? তুমি জান, প্রেমের কৌশল—অভিমানের কৌশল। সে কৌশলে আমাকে হারাইও। তোমাদের নবীন-সেনাধিনায়ক খুব বীর বটে! কিন্তু কখনও সেনাপতিত্ব করে নাই—শত্রুসংহার করিতে যেরূপ জানে,—শত্রুর কৌশলজাল ছিন্ন করিতে তেমন জানে না। তাহার ভীমতেজে অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া, কূটপন্থা অবলম্বন করিলাম—আমি কয়েক জন সৈন্য লইয়া দক্ষিণে সরিয়া পড়িলাম—অপর সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে করিতে হারিয়া গেল। তোমাদের সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল—আমরা পুর-প্রবেশ করিলাম। রাজাকে—রাজার ধনরত্নগুলিকে আর তোমাকে হস্তগত করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেই আমরা হারিয়াও জিতিব।”

চঞ্চলা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—“তুমি বীর—আমি অবলা, আমাকে কিছু বলিও না।”

সেনাপতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“তোমাকে কিছু বলিব না! কোলে বুকে রাখিব! আমার সঙ্গে চল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে আমি ধরিয়া লইয়া যাইব। এ বাসর ঘর নহে, শত্রুর গৃহ। এখানে দাঁড়াইয়া প্রেমের কথা—মানের কথা—আদর সোহাগের কথা হইতে পারে না।”

বৈশাখের বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ তরবারির জ্যোতিঃ একবার চঞ্চলার চক্ষু ঝলসিয়া সেনাপতির স্কন্ধদেশে পতিত হইল।

চঞ্চলা, ভীত-চকিত চাহনিতে চাহিয়া দেখিল, যে নবীন সৈনিক প্রাসাদ সম্মুখের রণস্থলে শত্রুদলন করিয়াছিলেন, ত্বরিত গতিতে তিনিই আসিয়া, তাঁহার ভীষণ তরবারির আঘাতে লুসাই-সেনাপতির মস্তক স্কন্ধ

হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। চঞ্চলা তাঁহাকে কি বলিতে যাইতে ছিল,—কিন্তু বলা হইল না। তিনি বিদ্যুতের মত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন—যাইবার সময় গৃহ-চৌকাঠে মস্তক লাগিয়া মাথার উষ্ণীষটা খসিয়া পড়িয়া গেল।

সে গৃহে সেনাপতির শব-দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল দেখিয়া, সৈনিকের উষ্ণীষটা অতি যত্নে কুড়াইয়া লইয়া চঞ্চলা গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

নবীন-সৈনিক রবীশ্বর, লুসাই-সৈন্যগণের গতিরোধার্থ প্রথমে কয়েক-জন-সৈন্য লইয়া পুরদ্বার রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। শেষে যখন জানিলেন, —অপর দিক্ দিয়া শত্রুগণ প্রাসাদ আক্রমণ করিতে আসিয়াছে এবং প্রাসাদ-সন্নিকটস্থ শান-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে,—তখন তিনি ভীমবিক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়া শত্রুদল মথিত ও বিতাড়িত করিয়া যাইতেছিলেন। সহসা দূত সংবাদ প্রদান করিল,—লুসাই-সেনাপতি কয়েকজন মাত্র সৈন্য লইয়া রাজপুরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন মাত্র সৈন্য লইয়া সিংহবিক্রমে পুরে প্রবেশ করিলেন; এবং লুসাই সৈন্যগণকে ধ্বংস করিয়া রাজা প্রভৃতির বন্ধন মোচন করিতেছেন, এমন সময় রমা কাঁদিয়া বলিল—"উপরে একজন সৈন্য গিয়াছে—সেখানে রাজকুমারী চঞ্চলা আছেন।"

রবীশ্বর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেখানে উপস্থিত হইয়া, সেনাপতিকে নিধন করিয়া, বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া, আবার শত্রুনিধনার্থ ছুটিয়া চলিয়া গেলেন; এবং অমিততেজে লুসাই-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া লুসাই-সৈন্যগণ হতাশ্বাস ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কতক হতাহত এবং কতক বা পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, পঙ্গের রাজধানী শত্রু-শূন্য

তইয়া হাসিয়া উঠিল। বিজয়ী সেনা লইয়া রবীশ্বর সিংহনাদ ছাড়িলেন।

রবীশ্বর সন্ধ্যার পর বিশ্রামান্তে নিজ আশ্রমে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোন্ শক্তিবলে এত লুসাই-সৈন্য বিধ্বংস ও বিপর্য্যস্ত হইল। কোন্ অমরীর অভিশাপ-নিশ্বাসে তাহাদের তেজশিখা নিবিয়া গেল। আমার কি শক্তি ছিল যে, আমি সে দানবী-শক্তিকে প্রতিরোধ করিয়া, এ পুরী রক্ষা করিতাম! সহসা যেন মলয়ের শ্বাস অতি মৃদু বহিয়া তাঁহার কাণের কাছে গাহিয়া গেল,—

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥
তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥

ঊর্দ্ধ-নত-যুক্ত করে আকাশের দিকে চাহিয়া, প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে, ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে রবীশ্বর প্রণাম করিলেন,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

রবীশ্বরের চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। কৌমুদী-বিভাত তারকা-খচিত আকাশের তলে তলে যেন কাহার চরণ-শব্দ সিঞ্চিত

হইতে লাগিল। কুসুম-পরাগ-ধূসর মলয়ের বাসে যেন কাহার মধুর কণ্ঠ শোনা যাইতে লাগিল, ভ্রমরস্পৃষ্ট-মুকুল-মধু-বাসে যেন কাহার অঙ্গের সুবাস পাওয়া যাইতে লাগিল। রবীশ্বর মুদিত নেত্রে তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ)*(ঃ০—

বিজয়সিংহ অচিরেই রবীশ্বরের যুদ্ধজয়ের কথা শ্রুত হইলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। এদিকে লুসাই-সৈন্যগণ তাহাদিগের এই পরাজয়ে ও সেনাপতির নিধন সংবাদ শ্রবণে একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। ছাউনি ভাঙ্গিয়া, লোকজন লইয়া, তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল। শত্রু পরাজিত ও বিতাড়িত দেখিয়া, বিজয়সিংহও সৈন্য লইয়া রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

শানেশ্বর এই বিজয়ব্যাপারে একেবারে আনন্দ-নীরে ভাসমান হইলেন,—তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সুখের খরস্রোত প্রবাহিত হইল,—সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। চারিদিকে ধ্বজ-পতাকা উড্ডীন হইল—স্তম্ভে স্তম্ভে ফুলমালা ঝুলিল—গীত-বাদ্য প্রভৃতিতে নগরী মুখরিত হইল। রাজাজ্ঞায় পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত এই মহা মহোৎসব চালিত হইবে।

শানাধিপতি এই উপলক্ষে বিজয়ী সেনাপতি বিজয়সিংহ ও সেনাধিনায়ক রবীশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিয়া, এক সান্ধ্য-ভোজের আয়োজন করিলেন। অমাত্যবর্গ, সুহৃদ্‌বর্গ ও ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রিত হইলেন।

সান্ধ্যভোজে নাচ, গান, কৌতুক, ক্রীড়া, সকলেরই আয়োজন ছিল।

রাজপ্রাসাদের নাট-মন্দিরে সভা হইয়াছে—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সমাসীন—মধ্যস্থলে শানরাজ, তাঁহার দক্ষিণে বিজয়ী সেনাপতি বিজয়সিংহ—তাঁহার দক্ষিণে সেনাধিনায়ক রবীশ্বর। সম্মুখে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ—পার্শ্বে অমাত্য-বর্গ, সুহৃদ্, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট। নাট-মন্দিরের দ্বিতলে, খোলা-বারেণ্ডায় প্রলম্বিত চিকের আবরণের মধ্যে রাজপুর-ললনাকুল ও নিমন্ত্রিতা যোষিৎগণ উপবিষ্টা আছেন।

পান-ভোজন ও নৃত্য-গীত সমাপ্ত হইলে, রাজা গম্ভীর ও ওজস্বিনী ভাষায় বলিতে লাগিলেন—"আমি লুসাইদিগের ভীষণতম সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া, আজি আপনাদিগকে লইয়া যে আনন্দোৎসব করিতেছি—ইহা আমার বিজয়ী সেনাপতি বিজয়সিংহের বাহুবলে সন্দেহ নাই।"

উপরের বারেণ্ডায় প্রলম্বিত চিকান্তরালে একখান বড় সুন্দর মুখ ভাসিতেছিল,—মহারাজের এই কথায় তাহার মুখে যেন একটু ঘৃণার রেখা অঙ্কিত হইল। সে মুখ রাজকুমারী চঞ্চলার। চঞ্চলা ভাবিতেছিল—"এই যুদ্ধে যদি কেহ প্রশংসাভাজন থাকেন—তবে সে রবীশ্বর।"

চঞ্চলার বাসনা পূর্ণ হইল। মহারাজের কথা সমাপ্ত না হইতেই বিজয়সিংহ অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ; অধীন এই যুদ্ধে যাহা করিয়াছে—তাহা লোকে যেমন করিয়া থাকে, তেমনই করিয়াছে—কিন্তু যদি অলৌকিক শক্তির বিকাশ করিয়া, কেহ শান-প্রদেশ রক্ষা করিয়া থাকে, তবে সে রবীশ্বর। রবীশ্বর এত বীর্য্য—এত শৌর্য্য—এত তীব্রোজ্জ্বল প্রতাপ প্রকাশ না করিলে, কখনই লুসাই-যুদ্ধ জয় হইত না। আর জয় হইলেও বৃথা জয় হইত—রাজপুরী, রাজ-শরীর বা রাজ-কুটম্বিনী-গণ রক্ষা পাইতেন না। রবীশ্বর তাহা রক্ষা করিয়াছে, রবীশ্বর লুসাই-সেনাপতিকে নিধন করিয়া—লুসাই-যুদ্ধ জয় করিয়াছে। অতএব এই যুদ্ধের জয়-প্রশংসা যদি কাহারও প্রাপ্য থাকে—তবে সে রবীশ্বরের।"

মহারাজ প্রীতি-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—"সেনাপতি! চিরপ্রথা আছে যে, সৈন্যগণ যুদ্ধ জয় করিলেও সেনাপতির জয় বলিয়াই ঘোষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লুসাই-মহাসমর রবীশ্বরই জয় করিয়াছে—কিন্তু তুমি সেনাপতি—তুমিই তাহার প্রশংসা-ভাজন। বিশেষতঃ তোমার দৃপ্ত বাহুবলেই পূর্ব্বে তাহারা পুনঃপুনঃ পরাজিত ও হীনবল হইয়াছিল; এক্ষণে তোমার বিনয়—তোমার পরার্থপরতা—তোমার স্বাধীন হৃদয়ের সাক্ষ্য বাক্য শুনিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম। এক্ষণে, এই বিজয় উপলক্ষে—গৌরবাত্মক তরবারি উপহার দিব। সেখানি কি রবীশ্বরই পাইবে!"

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"মহারাজ; লুসাই-সমর-বিজয়ী—লুসাই-সেনাপতিধ্বংসকারী—আপনার বন্ধন-মোচনকারী—আপনার রাজ-কুল-ললনার সম্মান-রক্ষাকারী রবীশ্বরই যুদ্ধজয়ে যথাযোগ্য তরবারি উপহার পাইবে। তাহাকেই উহা প্রদান করুন।"

এই সময় রাজাকে অভিবাদন করিয়া, রবীশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—স্ফটিকস্তম্ভস্থ আলোকমালায় তাঁহার সুন্দর মুখের দীপ্তি বিস্ফুরিত হইল,—প্রলম্বিত-চিকান্তরালের দুইটী নীল পদ্মবৎ চক্ষু স্থির হইয়া, সুধাকর-সুধা-পানাশায় চকোরের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া—কেবলি চাহিয়া থাকিল। সে চক্ষু দুইটী চঞ্চলার। রবীশ্বর বলিলেন,—"মহারাজ; আমি কিছুই করি নাই—আমার এমন শক্তি নাই, বা ছিল না যে, আমি সেই ভীষণ শক্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া, নগরী রক্ষা করিতে সমর্থ। যিনি দাবানল জ্বালিয়া, আবার জলধারায় তাহা নির্ব্বাণ করেন, যিনি নিদাঘের দাবদাহ প্রকাশ করিয়া, আবার আষাঢ়ের নবীন মেঘের তোয়ে শীতল করেন,—যিনি রজনীর গাঢ় অন্ধকারে জগৎ ঢাকিয়া আবার প্রভাত-তরুণ-তপনের আলোক-রশ্মিতে আলোকিত করেন,—যিনি মারিয়া আবার জীবন্ত করেন,

তিনিই আমাদিগকে বিপদে ফেলিয়া আবার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন,—আমি কে? জগতে যে কোন কার্য্যই হয়, তাহা তাঁহারই ইচ্ছায়। আমরা কখন কখন অবলম্বন মাত্র হইয়া দাঁড়াই। সুখ্যাতি বা অখ্যাতি—উপহার বা প্রহার—তাঁহারই প্রাপ্য—যিনি প্রধান। অতএব সেনাপতি মহাশয়ই আপনার প্রদত্ত গৌরবাত্মক উপহার তরবারি প্রাপ্ত হইবেন।"

সে স্বরে—সে বাক্-বিন্যাসে সভাস্থ সকলেই রবীশ্বরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিয়া রবীশ্বরকে কোল দিলেন।

রবীশ্বর ভূমি লুটাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, ইহা হইতে অধীনের অধিক পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা আর নাই।"

রাজা, বিজয়সিংহকে তরবারি উপহার দিয়া, নিজকণ্ঠ হইতে রত্নহার উন্মোচন করিয়া, রবীশ্বরের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন, এবং সেই সভাতেই রবীশ্বরকে সহকারী সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিলেন।

চঞ্চলা হাসিয়া রমার গালে একটা টীপ্ দিয়া বলিল,—"সখি; দেখিলে কেমন রূপ—কেমন গুণ—কেমন বীরত্ব।"

রমা হাসিয়া বলিল,—দেখা যাবে কত দূর গড়ায়।"

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"কি গড়াইবে?"

রমা। ধারা।

চঞ্চলা। কিসের ধারা?

রমা। কেন,—প্রেমের।

চঞ্চলা। সে গুড়ে বালি।

রমা। কেন?

চঞ্চলা। কাঁটার ভয়।

রমা। কি কাঁটা?

চঞ্চলা। সতীন-কাঁটা।

রমা। কে বলিল?

চঞ্চলা। আমি জানিয়াছি।

রমা। মুলাকাৎ হইয়াছিল নাকি?

চঞ্চলা। তোমার মুখে আগুন।

রমা। আর তোমার বুঝি হৃদয়ে?

এই সময়ে সভাভঙ্গ হইয়া গেল। আনন্দোৎসবের বিদায়ী সঙ্গীত গীত হইল,—সকলেই স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেলেন।

আকাশের জ্যোৎস্নায় মর্ত্ত্যের হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছে—যেন তরল রজত ধারায় বিশ্ব বিপ্লাবিত—দিকে দিকে প্রসূন-গন্ধ প্রবাহিত,—সেই সুবাস-জ্যোৎস্না-কিরণ-বিভাত প্রাসাদ-শীর্ষে চঞ্চলা ও রমায় কথা হইতেছিল। রমা বলিল,—"হাঁ, বাছিয়া বর মিলাইয়াছ ভাল।"

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"তুমি যে মুখ শুঁকিয়া চোর ধর।"

রমাও হাসিয়া বলিল,—"আমি ত আর মরদ নহি যে, তোমার হৃদয়ের ভাবটুকুও আমার নিকটে লুকাইবে।"

চঞ্চলা। তাহা নাই পারিলাম—কিন্তু একটা কথা শোন্।

রমা। কি—সখি?

চঞ্চলা। কত লোক সাধিল কাঁদিল—তাহাদের প্রতি চাহিলাম না—কাহাকেও বিবাহ করিলাম না—সকলকেই অবজ্ঞার হাসিতে হতাশ্বাস করিয়া ফিরাইলাম—এখন বুঝি সেই সকল অভিশাপ একত্র জমাট পাকাইয়া আমাকে সেইরূপেই—কাঁদায়।

রমা। কেন; কি হইয়াছে সখি?

চঞ্চলা। তিনি পরিণীত।

রমা। তিনি কিনি?

চঞ্চলা। আর ন্যাকামো করিও না।

রমা। (হাসিয়া) ন্যাকামো, আমার না তোমার?—নামটাই কেন একবার জপ করিয়া বলিয়া ফেল না।

চঞ্চলা। সে সখি;—সে নাম আমার জপমালা হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু কাঁদিয়াই বুঝি দিন কাটাইতে হইবে।

রমা। কেন সখি,—আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? বল কি হইয়াছে!

চঞ্চলা। বলিয়াছি ত, তিনি পরিণীত।

রমা। তাহাতে কি হয়? পুরুষ যদি পাঁচটা বিবাহই করে,—তবে মেয়ে মানুষের কি? ষোলশত গোপী—এক কৃষ্ণ।

চঞ্চলা। তা আমিও জানি—পুরুষ আশ্রয়,—প্রকৃতি আশ্রিতা। পুরুষ বৃক্ষ—রমণী লতা। পুরুষ পূজ্য—প্রকৃতি পূজক। আমরা পূজা করিয়া, ধ্যান করিয়া, ভালবাসিয়াই আনন্দ পাইব, আর তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আমার পূজা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

রমা। আবার ঐ কথা—ফের-ফের। আসল কথাটা বল না।

চঞ্চলা। তিনি যে সময় লুসাই-সেনাপতিকে সংহার করিয়া চলিয়া যান—সেই সময়ে তাঁহার মস্তকের উষ্ণীষ দরোজায় বাধিয়া খুলিয়া পড়িয়া যায়—অনবসরে তিনি আর তাহা কুড়াইয়া লইতে পারেন নাই। বিজয়ী বীরের উষ্ণীষ—আমি সযতনে কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলাম;—পরে দেখি, তাহাতে "কমল" এই নাম লেখা রহিয়াছে?

রমা। চূড়ায় বুঝি রাধার নামটী লেখা?

চঞ্চলা। দেখ সখি;—এত গভীর প্রেম! বিদেশে আসিয়াছেন—তার নামটী লিখিয়া মাথার উষ্ণীষে ধারণ করিয়াছেন। অতএব আমায় কখনই গ্রহণ করিবেন না,—গ্রহণ করিলে আমার আপত্তি নাই—আমি

সেবা করিয়া—পূজা করিয়া—ভালবাসিয়াই পরিতৃপ্ত হইতাম,—কিন্তু রবির ভালবাসা অতি গভীর। তিনি আমায় কখনই কমলের যন্ত্রণার জন্য লইবেন না।

রমা। উষ্ণীষে নাম দেখিয়াই যে, ক্ষেপ্‌লে দেখ্‌ছি। নামটা ত পুরুষেরও হইতে পারে!

চঞ্চলা। পুরুষের নাম মাথায় ধারণ করিয়া বহিয়া বেড়াইবেন কেন?

রমা। যে উষ্ণীষ প্রস্তুত করিয়াছিল—তাহার নাম হইতে পারে!

চঞ্চলা। মাথার যে জায়গায় নামটী পড়িয়াছি—সে জায়গায় প্রস্তুত-কারকের নাম দেওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ।

রমা। তবে আজি চল ঘুমাইগে,—কা'ল সঠিক সংবাদ আনা যাইবে।

চঞ্চলা। কি প্রকারে?

রমা। রাই ধৈর্য্য ধর—বৃন্দার ক্ষমতার উপর নির্ভর কর।

তখন রমা ও চঞ্চলা দুই সখীতে ছাদ হইতে নামিয়া বিশ্রামগৃহে গমন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

বৈকালে রৌদ্র বকুল-বীথিকার উপরে স্বর্ণবর্ণে খেলা করিতেছিল। সৈন্যাবাসের চারিদিকে রক্ত পরিচ্ছদ পরিধানে বড় বড় সঙ্গিন ঘাড়ে করিয়া, যে সকল প্রহরিগণ পাহারা দিতেছিল—তাহাদেরও মুখে সে করস্পর্শ হইতেছিল। সৈন্যগণ বিশ্রাম-সুখে কেহ পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল, কোথায়ও চারিপাঁচজন একত্র হইয়া, হাসি-গল্পের তরঙ্গ

ঢুলিতেছিল। কেহ কেহ বা এখনও খাটিয়ায় পড়িয়া অপরাহ্নিক নিদ্রা যাইতেছিল। দূরে অশ্বশালার অশ্বগুলি বাঁধিয়া সাহিসগণ তাহাদিগকে খাদ্যাদি প্রদান করিতেছিল। কোথায়ও বা কতকগুলিকে লইয়া শিক্ষকগণ শিক্ষাদান করিতেছিল,—অশ্বগুলি নাচিতেছিল,—দুলিতেছিল,—ঘুরিতেছিল,—ফিরিতেছিল।

এই সময় একটী ভিখারিণী, সেনানিবাসে প্রবেশ করিয়া, তাহার কোমল-কর-ধৃত খঞ্জনীতে টোকা দিতে দিতে রামায়ণ পাঠ-নিরত একজন বৃদ্ধ সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল,—"সহকারী-সেনাপতির আড্ডা কোন্‌টা ?"

বৃদ্ধ সৈনিক জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে ?"

ভিখারিণী। আমি ভিখারিণী।

সৈনিক। কি প্রয়োজন ?

ভিখারিণী। গান শুনাইয়া ভিক্ষা লইব।

সৈনিক। ঐ পাশের সুসজ্জিত বড় ঘর। কিন্তু বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

ভিখারিণী। অনুমতি কে দিবে ?

সৈনিক। তিনি।

ভিখারিণী। প্রবেশের অনুমতি আনিতে কি আমায় যাইতে হইবে ?

সৈনিক। তাও কি হয় ?

ভিখারিণী। তবে অনুমতিটা দয়া করিয়া, তুমি আনিয়া দাও।

সুন্দর মুখের অনুরোধ—বিশেষ সুন্দর-মুখধারিণী রমণীর অনুরোধ সৈনিক এড়াইতে পারিল না। সে রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিয়া সহকারী সেনাপতির নিকট গমন করিল, এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া, ভিখারিণীকে পথ দেখাইয়া দিয়া যাইবার আদেশ করিল।

ভিখারিণী খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া বাজাইতে বাজাইতে মৃদু মৃদু সুরে গান গাহিতে গাহিতে রবীশ্বরের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

রবীশ্বর তখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, উদারচেতা রবীশ্বর ভিখারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি চাহ?"

রক্তাধর-পল্লব কাঁপাইয়া ভিখারিণী বলিল, "গান শোনাইয়া ভিক্ষা চাহি।"

রবি। গান না শুনিয়াই যদি ভিক্ষার ব্যবস্থা হয়?

ভিখারিণী। অবস্থা বুঝিয়া তাহাতেও আপত্তি করি না,—কিন্তু স্থলবিশেষে আপত্তি আছে।

রবি। কোথায়?

ভিখারিণী। গুণগ্রাহীর কাছে। আবার আসিবার সম্ভাবনা থাকে।

রবি। তবে গাও।

ভিখারিণী সেই শ্বেত-শুভ্র-প্রস্তরের মেঝের উপরে—আপন স্বর্ণোজ্জ্বল দেহকান্তি লইয়া বসিয়া পড়িল এবং খঞ্জনী বাজাইয়া মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিল,—

রজত-পূর্ণিমা-নিশি হাসত দশ-দিশি
কাঁহা মেরা প্রাণের কানাই।
প্রণয়-সুবাস-ভরা, রমণী-মোহন করা,
কাঁহা মেরা পরাণ-চোরাই।
তারি তরে সারা নিশি, আছি এ নিকুঞ্জে বসি
ভয়-লাজ-মান বিলাই।
প্রভাত না হ'তে রাতি নিবিল প্রেমের বাতি
কাটাগুল আন ঘরাই।

গীত সমাপ্ত হইলে রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোথায় থাক, ভিখারিণী?"

ভিখারিণী তাহার রাঙ্গা অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটাইয়া বলিল,—"কেন, এক দিন যাবেন নাকি ?"

রবীশ্বর কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। এ রমণী কে,—যথার্থই কি ভিখারিণী ?—ভিখারিণীর হৃদয়ে এত সাহস সম্ভবে না—ভিখারিণীর অঙ্গে এত লাবণ্য থাকিতে পারে না। ভিখারিণীর কথায় এমন সরস ভাব থাকে না ! তাহার পরিচয় পাইবার জন্য রবীশ্বর কথা পাড়িতে লাগিলেন।

রবীশ্বর হাসিয়া বলিলেন,—"যাইবার প্রয়োজন নাই, তবে স্বর শুনিষ্ট !"

ভিখারিণী তাহার প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বলিল,—"তবে কি আসিতে হলেন ?"

রবি। তাও বলি না,—তুমি কে ? জানিতে চাহি।

ভিখারিণী। ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী।

রবি। মিছে কথা—তুমি ভিখারিণী নহ। ভিখারিণী সাজিয়াছ—কিন্তু আগুন ঢাকা থাকে না,—তোমার অধরকোণে হাসির রাশি বাঁধিয়া রহিয়াছে।

ভিখারিণী। ভিখারিণী কি হাসে না ?

রবি। হাসে—কিন্তু সে হাসিতে আর এ হাসিতে প্রভেদ বিস্তর। তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও।

ভিখারিণী। মিথ্যা বলি নাই—আমি ভিখারিণী, একটা মানুষ পাইলেই ভেক লই।

রবি। মানুষ কি খুঁজিয়া মিলিতেছে না ?

ভিখারিণী। কৈ মিলে ?

রবি। যত্নে রত্ন মিলিয়া থাকে—মানুষ মিলে না ?

ভিখারিণী। আপনি রাজি আছেন ?

রবি। না হয়, একটা জুটিয়ে দেব।

ভিখারিণী। আমিও তার প্রতিশোধ নেব।

রবি। তুমি কি জুটাইয়া দিবে ভিখারিণী?

ভিখারিণী। কেন, মানুষ।

রবি। কোথায় পাইবে?

ভিখারিণী। হাতে আছে।

রবি। কে?

ভিখারিণী। পিপাসা বুঝিয়া তবে জলদানের ব্যবস্থা।

রবি। কে লোকটাই বল না—তুমি নিজে নও ত?

ভিখারিণী। ভয় হইতেছে? পাছে, অন্ধকার রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠ—না?

রবি। তোমার হেঁয়ালি রেখে আসল কথা বল। আমার অধিক সময় নাই—আর না হয়, ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যাও।

ভিখারিণী। আপনার উষ্ণীষ আনিয়াছি।

রবি। আমার উষ্ণীষ? ওহো!—কৈ দেখি?

ভিখারিণী. রবীশ্বরের হস্তে উষ্ণীষ প্রদান করিল। রবীশ্বর উষ্ণীষ পাইয়া অতি আনন্দিত হইলেন। ঐ উষ্ণীষে কমলের নাম লেখা আছে—এই উষ্ণীষই বুঝি তাঁহাকে সংসারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। রবীশ্বর হাসিয়া বলিলেন, "আর পরিচয় গোপন করিতে পারিতেছ না—আমি তোমায় চিনিয়াছি, তুমি রাজকুমারীর সখী রমা।"

ভিখারিণী। আপনার অনুমান ভুল হইতে পারে না কি?

রবি। না।

ভিখারিণী। কেন?

রবি। আমি সে দিন পুরমধ্যে শত্রু নিবারণ করিতে গেলে, তুমই

বলিয়াছিলে—উপরে আমার সখী রাজকুমারী আছেন—সেখানে একজন সৈনিক গিয়াছে।

ভিখারিণী। সেই—ই—ত গোলযোগের গোড়া। কিন্তু অধীনীর নাম জানিলেন কি প্রকারে ?

রবি। সহকারী মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে—তিনি তোমায় ভালবাসেন—তোমার কথা সর্ব্বদাই আমাকে বলেন।

ভিখারিণী। তিনি আপনার সহিত সে কথা বলেন কেন ?

রবি। তিনি আমার,বন্ধু।

ভিখারিণী। আপনি তাঁহাকে কোন কথা বলেন ?

রবি। সে খোঁজ কেন ? এখন জিজ্ঞাসা করি—ভিখারিণী বেশ কেন ?

ভিখারিণী। রমা গর্ব্ভবতী।

রবি। পেটে কি আছে ?

ভিখারিণী। অনেক খবর,—পেটে ধরিতেছে না।

রবি। যমক হইবার সম্ভব।

ভিখারিণী। সেই-ই-ত ভয়।

রবি। কিসের ?

ভিখারিণী। ভাগের।

রবি। কাহার ভাগ—কিসের ভাগ ?

ভিখারিণী। প্রেমের—উষ্ণীষের অঙ্কিত নামে।

রবি। আসল কথা বল—তোমার কথার রূপকের জ্বালায় অস্থির।

ভিখারিণী। সেদিকেও যে রূপের জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি।

রবি। কে তিনি ?

ভিখারিণী। আমার সখী রাজকুমারী চঞ্চলা।

রবি। তিনি কি চাহেন ?

ভিখারিণী। আপনাকে। সেদিন আপনার বীর-বাহুর দৃপ্ত বল দর্শন করিয়া, আপনার সুচির-কৌমার্য্য দর্শন করিয়া, আপনার সুধামাখা কথা শ্রবণ করিয়া, চঞ্চলা আপনাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা তিনি আপনার চরণে মালা দেন,—আজীবন আপনার চরণ সেবা করেন।

রবি। রমা,—আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ নহি।

রমার মুখ ম্লান হইল,—বলিল, "সে অক্ষমতার কারণ কি, উষ্ণীষের অঙ্কিত নাম-ধারিণী কমল ?"

রবি। হাঁ।

রমা। পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে—তাহাতে দোষ কি ? মহারাজার একমাত্র কন্যা চঞ্চলা। এই বিস্তৃত রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী চঞ্চলা—সৌন্দর্য্যের সাররত্ন চঞ্চলা কেবল আপনার পূজা করিবে—তাহাতে আপনার আপত্তি কি ?

রবি। আমি কমলকে যদি পাই—তবেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইব—নতুবা নহে।

রমার মুখ আরও ম্লান হইল। সে তখন ভাবিল,—কমল এখনও অপরিণীতা অপ্রাপ্তা-প্রেমিকা—এ স্থলে কখনই—অন্যে আসক্তি হইবে না,—এখনও সমস্ত হৃদয় খানা সেই রূপেই সমাচ্ছন্ন। তাহারই ধ্যানে চিত্ত নিমগ্ন।

তখন ভিখারিণী-বেশধারিণী রমা রবীশ্বরের নিকটে বিদায় লইয়া অতি ক্ষুণ্ণ মনে রাজবাড়ী চলিয়া গেল।

যথা সময়ে রমা চঞ্চলার সহিত সমস্ত কথা বলিয়া, বলিল,—'সখি ! পথ পরিত্যাগ কর। এ পথ বন্ধুর—পিচ্ছিল—ও অগম্য !'

দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে—কথা শুনিয়া চঞ্চলা তদ্রূপ ঘামিয়া উঠিল। বহ্ন্যুত্তাপে নব-কদলী-পত্র যেরূপ বিশুষ্ক-বিকম্পিত হয়, রবীশ্বরের প্রেম-প্রতিহার ও অন্যাসক্তি শুনিয়া চঞ্চলাও তদ্রূপ হইল।

রমা বলিল,—"সখী, এখন কি করিবে?"

চঞ্চলা বলিল,—"নৃত্য।"

রমা বলিল,—"না, ভাই ফিরিয়া পড়।"

চঞ্চলা উত্তর করিল—"বিদ্যুৎ ছুটিয়াছে—রোধিতে আশা কর!"

রমা। তবে কি মরিবে?

চঞ্চলা। বালাই।

রমা। কি করিবে?

চঞ্চলা। তামাসা দেখিব।

রমা। কিসের তামাসা?

চঞ্চলা। রমণীর প্রাণের।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাগুক্ত ঘটনাবলীর পর, মর্ত্ত্য-জগতের স্তব্ধ নিশ্বাসের ভিতর দিয়া বর্ষার মেঘমন্দ্র, শরতের আবেগ সৌন্দর্য্য, হেমন্তের আবিল-আলস্য, শীতের কুহেলিকা বুকে করিয়া, আটাস মাস কোথায় কোন্ দেশে চলিয়া গিয়াছে। জগতে নবীন বসন্তের নবীন উচ্ছ্বাস মদিরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মলয় পবন প্রণয়িনীর সুরভি নিশ্বাসের মত আদরে, সোহাগে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। শানদেশস্থ পার্ব্বতীয় অশোক, বকুল, নাগকেশর প্রভৃতি বৃক্ষ পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়াছে। চ্যুত মুকুলিত হইয়া ভ্রমর-সংস্পর্শে কুলশরের মত শোভিতেছে।

কর্ণিকা ফুটিয়া বর্ণশোভায় বন আলো করিয়াছে,—হায়! সে নির্গন্ধ! পলাশ বালেন্দুবক্র অর্দ্ধ প্রস্ফুট লোহিত কুসুম ধারণ করিল;—যেন বসন্তলক্ষ্মী ভ্রমরের অঞ্জন-তিলক পরিয়া, অরুণ প্রবালরাগে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন। বনস্থল অনিল-চালিত পত্রের মর্ম্মর রবে মুখরিত হইল। কোকিল চ্যুত-মুকুল আস্বাদিয়া, মানিনীর মান টুটাইয়া মধুর কুহুরব করিয়া উঠিল। বসন্তের প্রথম সমাগমে প্রাণিজগতে এক স্বর্গীয় আনন্দ—স্বর্গীয় উচ্ছ্বাস—আর হৃদয়নিহিত কোন্ গুপ্ত সৌন্দর্য্য-পিপাসা জাগিয়া উঠিল। প্রাণ যাহাকে চায়—তাহাকে খোঁজ পড়িল। স্বর্গের ঐশ-জীবত্বের আবির্ভাব দেখিয়া—অবিদ্যা-সুন্দরীও মাজায় কাপড় বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন—দানবী-জীবত্বের বাসনা-সুন্দরী তাহার কাম-কটাক্ষ ঘুরাইয়া—হাসির লহরী-লীলা তুলিয়া জীবের আসক্তি ছুটাইবেন। জীব-শিব, শক্তি হারাইয়া জড় হইল,—জড়ের রাজ্যে, জড়ের আসঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল, অনুরাগে—আবেগে—সোহাগে মধুকর মধুকরীর সহিত একফুলে মধু পান করিল। মৃগ, শৃঙ্গ দিয়া আবেশে মুদিতনয়না মৃগীর গাত্র কণ্ডূয়ন করিল। করিণী পদ্মরাগ-সুরভি গণ্ডূষ জল করীর মুখে তুলিয়া দিল। চক্রবাক অর্দ্ধভুক্ত মৃণালে চক্রবাকীর আরাধনা করিল। রূপের বিপণীতে প্রেমের ক্রেতা দ্রাক্ষারস পানে উদ্ভ্রান্তলোচনা শ্রম-জললুলিতা সুন্দরীর দিবাবসানে মুখচুম্বন করিল। স্বামী স্বধর্ম্ম-নিরতা সংসারভারাভিনতা প্রিয়তমাকে বাহু বেষ্টিয়া আলিঙ্গন করিল। বাঞ্ছিত বিরহে অনেক নর নারী জীবত্বের সাধনা বৈফল্যে বিকল হৃদয়ে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নিশি জাগিয়া—চাঁদে চাহিয়া, সখী কাঁদাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু অবশ—অলস, তামসিক প্রাণ কতকটা নিশ্চিন্ত—কতকটা নিস্পন্দ।

রাজকুমারী চঞ্চলার প্রেমের ভিত্তি-স্থাপনের স্বচ্ছ শিলাতলের এই

নূতন বসন্ত! রাজকুমারীর আবেগ-উন্মাদনা একটু অধিক,—তবু রমণী! রমণী বুকে করিয়া মরণ পুষিতে জানে!

বসন্তের দিবস—দুই প্রহর বাজিয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্য-প্রতিমা চঞ্চলা সুচারু শয্যায় শয়ন করিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া তাহার প্রেমের দেবতার ধ্যান-নিমগ্না;—সেই ধ্যানে জড়ের রাজত্ব—জীবত্বের প্রথম ভিত্তির প্রভাত-সঙ্গীত। অলক্ষিতে রাজকুমারীর সখী রমা, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে সেই ধ্যাননিমগ্না সৌন্দর্য্য-প্রতিমার স্তব্ধ-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিল।

চঞ্চলার চক্ষু ফিরিতেছিল,—সহসা সখীর দিকে পড়িয়া লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল। মনে মনে ভাবিল, আমি যাহা ভাবিতেছি—সখী হয় ত তাহা বুঝিতে পারিয়াছে!

রমা বলিল,—"সখি, অমন করিয়া আর কতদিন ভাবিবে?"

চঞ্চলা শয্যায় উঠিয়া বসিল। সে কথা চাপা দিবার জন্য বলিল;—"তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে!"

রমা বলিল,—"ছিলাম কাযে। কিন্তু তোমায় দেখিয়া ভয় হইতেছে।"

চঞ্চলা। কেন, আমি কি ভূত হইয়াছি?

রমা। বাকি বড় নাই।

চঞ্চলা। গয়ায় পিণ্ড দাও না কেন,—উদ্ধার হইব।

রমা। পাদপদ্মের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি,—কিন্তু অচল,—অটল! এমন কঠিন মন কখনও দেখি নাই।

চঞ্চলা। কাহার কঠিন মন?

রমা। রবীশ্বরের।

চঞ্চলা। কঠিন না কোমল!

রমা। আহা—হাঃ! কি কোমল—বাতাস-ভরে ভেঙ্গে পড়ে।

চঞ্চলা। বাস্তবিকই তাই।

রমা। কিসে ?

চঞ্চলা। এত কোমল যে—সেই একখানি মুখের ভার সহিতেই ব্যস্ত। অন্য দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

রমা। তা বটে! কিন্তু একটা কথা বলিব ?

চঞ্চলা। হুকুম চাই ?

রমা। রবীশ্বর যখন তোমার হইবে না—তখন তাহাকে ভুলিয়া যাও। কত রাজপুত্রের হৃদয়, কত বীরের হৃদয়, কত ধনীর হৃদয় তোমার সৌন্দর্য্য কামনায় উন্মত্ত—তুমি একজন অজ্ঞাত কুল-শীল ব্যক্তির জন্য কাঁদিয়া—ভাবিয়া—জ্বলিয়া মরিতেছ ?

চঞ্চলা বলিল,—"তুমি কি রমণী নও ? তুমি কি রমণীহৃদয় জান না ? তোমার কি কিছুই মনে থাকে না ?"

রমা। কি মনে থাকিবে ?

চঞ্চলা। কুমারসম্ভবের শিবানুরক্তা পার্ব্বতীর প্রেমের কথা,—আমরা কি তাঁহার বংশসম্ভূতা নহি ? আমরা তাঁহার মত হৃদয় দৃঢ় করিতে পারিব না কেন ?

রমা মনে মনে বলিল,—রাজকুমারীর উপযুক্ত ভালবাসাই বাসিয়াছ বটে! রূপের উপযুক্ত—গুণের উপযুক্ত—ভালবাসাই বাসিয়াছ বটে,—যে ভালবাসা অতল সাগরের ন্যায় গম্ভীর—ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় অচল; তাহাই ত ভালবাসা! কিন্তু এ কি হইল ? যাহাকে ভালবাসিলে তাহাকে পাইলে না কেন ? এ কোন দেবতার অভিশাপ—তোমার হৃদয়ে এত প্রেম দিয়া বিধাতা কি তাহার আধার দিলেন না—এমত কেন ঘটিল! রমা মনে মনে বুঝিল, জগতে প্রত্যেক কার্য্যই কারণের ফল;—এই কারণ, কর্ম্মসূত্রের ঘটনা-পরম্পরা। অতএব রবীশ্বরের প্রতি

চঞ্চলার যে অনুরাগ হইয়াছে,—এ অনুরাগের জন্য চঞ্চলা দায়ী নহে,—দায়ী কর্ম্মসূত্রের ঘটনা-পরম্পরা!—রমার আয়ত নয়ন-যুগল ভরিয়া অশ্রুরাশির উচ্ছ্বাস উঠিল। সে আবেগস্পন্দিত হৃদয়ে বলিল,—"সখি, এত প্রেম কি বিফলে যাবে? এত ভালবাসা কি বায়ুতে মিশিবে!"

চঞ্চলার প্রেমরাগ-রঞ্জিত ফুল্লগণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। দৃঢ়-গম্ভীর-স্বরে বলিল,—"প্রেম হওয়াই দুর্ল্লভ—হইলে কি বৃথা যায়! সে আমার,—আমি তার।"

হতাশের মৃদু কম্পিত কণ্ঠে রমা বলিল,—"তুমি তার, কিন্তু সে কমলের।"

চঞ্চলা। সে আমার।

রমা। মহাদেব পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহাতে প্রেমের ছলনা;—প্রেমের আনন্দ। কিন্তু রবীশ্বর ত সে দিকেও নহেন।

চঞ্চলা। না হউন;—পার্ব্বতীও প্রথমে আমার মত নিরাশ্বাস হইয়াছিলেন। তোমার কি সে গল্পটা মনে নাই সখি!

রমা। কোন্ গল্প বল দেখি।

চঞ্চলা তাহার দীর্ঘায়ত চক্ষুর ভাস্বর চাহনি রমার মুখের উপর সুবিন্যস্ত করিয়া বলিতে লাগিল,—"উমা, হিমালয়ের দুহিতা, পিতা হিমালয় তাঁহাকে শিবের উদ্দেশে বরণ করিলেন;—উমাও হর-প্রেমাধীনা, পতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় সমাধি-যোগারূঢ় শিবের তপস্যার স্থানে উপনীত হইলেন। মোহন বেশ, সঙ্গে মদন ও বসন্ত;—দেহ-মাধুরী প্রকৃতির মাধুরীকে সহায় করিয়া দৈহিক উপায়ে কামের সাহায্যে শিবের মন ভুলাইতে আসিল। কিন্তু যোগিবর মহাদেব,—তাহাতে ভুলিলেন না;—কাম এক হুঙ্কারে ভস্মীভূত হইল, রতি নৈরাশে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল;—বসন্ত, মলয়-পবন লইয়া সে বন ছাড়িয়া পলাইল;-

উমা লজ্জাবতী,—শূন্য মনে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু হৃদয় ব্যাপী প্রেম, সে ত যাইবার নয়! উমা আধ্যাত্মিক উপায়ে তপস্যার সাহায্যে পতিলাভে উদ্যত হইলেন। কোমল শিরীষফুল পতত্রীর পদ সংস্পৃষ্ট হইল। উমা চন্দন-চর্চ্চিত হার ফেলিয়া বক্ষে বল্কল বাঁধিলেন; ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ-কলাপে জটা রচনা করিলেন; রত্ন-মেখলা খুলিয়া তৃণময় কাঞ্চী পরিধান করিলেন, কন্দুক-ক্রীড়া ভুলিয়া অক্ষসূত্র ধারণ করিলেন, মহার্ঘ্য বসন ত্যজিয়া জীর্ণ বল্কল ধারণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও মনোরথ সিদ্ধ হইল না। তখন দেহার্পণ করিয়া উৎকটতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনাহারে কেবল অযাচিত জল ও চন্দ্র-রশ্মি পান করিয়া জীবন ধারণ করিলেন। গ্রীষ্মের প্রখরতায় চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বর্ষার মেঘাড়ম্বরে বাতাহত ধারা-তাড়িত হইয়া বিদ্যুৎ উন্মেষ চকিতে শিলাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতের হিমানীতে, বর্ষার বৃষ্টি সহিয়া, হিমানিল-স্পৃষ্ট হইয়া আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া রহিলেন। মৃণাল-কোমল-সুখলালিত বর-অঙ্গ এইরূপে তপস্বীর অধিক তপঃ-ক্লেশ সহ্য করিলেন। শেষ মনোরথ সিদ্ধ হইল। হরগৌরী মিলিত হইল।"

রমা। তুমিও কি এইরূপ করিবে?

চঞ্চলা। প্রেম লাভ করিতে হইলে, এই পথই প্রশস্ত—তবে সামর্থ্যে কুলান চাই।

রমা। তাঁহারা দেব-দেবী—সবই সাজে। আরাধনায় তুষ্ট হইয়া শিব, উমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চঞ্চলা। মানবেও দেবত্ব দানবত্ব আছে। সাধনায় মানুষও উভয় শক্তি লাভ করিতে পারে।

রমা। ও কি সখী;—তোমার হাতে ও কি?

চঞ্চলা। একখানা কাগজ।

রমা। কাগজ একখানা,—তাহা দেখিয়াছি, এখনও চোখের মাথা খাই নি। ওতে আছে কি ?

চঞ্চলা। কিছু না—

রমা। তবে ওখানাকে অত যত্নে রাখা হইয়াছে কেন ?

চঞ্চলা। হাতে করিয়া রাখিয়াছি—যত্ন আবার কি ?

রমা। আমাকে ছলনা ?—বলিবে না ?

চঞ্চলা। একটা গান লেখা আছে।

রমা। কি গান !

চঞ্চলা। নাচ-গান।

রমা। আমি দেখ্‌বো।

চঞ্চলা। দোলের দিন দেখ—আবির মেখে, নেচে—গেয়ে।

রমা। না দেখাইলে আমি ত আর জোর করিয়া দেখিতে পারি না।—বোধ হয়, রবীশ্বরকে পত্র লেখা হইয়াছে—কিন্তু নিয়ে যাবে কে ? সে এই বৃন্দাদেবী ভিন্ন আর হইবার উপায় নাই !

চঞ্চলা। না,—সখি; পত্র নহে। তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আর কি করিব ! আমার হইবার তাঁহার এখনও বিলম্ব আছে।

রমা। তাহা হইলে তোমার আশা,—তিনি নিশ্চয়ই তোমার হইবেন।

চঞ্চলা। নিশ্চয়ই।

রমা। যৌবন বজায় থাক্‌তে তো ?

চঞ্চলা। যৌবনই যাক্—আর দেহই যাক্—ফল হবে।

রমা। ধন্য প্রেম ! কিন্তু ও কাগজে কি লেখা আছে আমায় বলিবে না ?

চঞ্চলা। বলিয়াছি ত ও একটা গান।

রমা। আমি দেখিব।

চঞ্চলা। গান কি দেখা যায়?

রমা। শোনা যায় ত—আমি শুনিব।

চঞ্চলা। এখনও সুর-সার ঠিক হয় নাই।

রমা। বুঝি প্রাণনাথকে ভাব—আর ঐ-ই কর।

চঞ্চলা। ভাবনা দিবা-রাত্রি।

রমা। এখনও ছলনা—গান বেঁধে বুঝি সুর করে? প্রাণের সুরে বাঁধে। গানটা গাও না।

চঞ্চলা। গাহিয়া কি হইবে?

রমা। রবীশ্বরের কমল ভেক লইয়া বৃন্দাবন যাইবে।

চঞ্চলা। বালাই—

রমা। কি বালাই?

চঞ্চলা। সে বৃন্দাবন যাইবে কেন?

রমা। ব্যথা পাইলে?

চঞ্চলা। রবীশ্বর ব্যথা পাইবে?

রমা। তুমি বুক পাতিয়া দিও! এখন গানটা গাও না।

চঞ্চলা কাগজ খানা খুলিয়া গাহিতে লাগিল—

আপনা ভুলিয়া সখা, তোমা ধনে ভালবাসি,
তাই কি, আমারে দেখি, হাস গো ঘৃণার হাসি?
বৃথা তব উপহাস বৃথা ব্যঙ্গ-বাক্যরাশি,
কালেতে ফুরা'য়ে যাবে, জান না কি হৃদিবাসি?
হের দেখ প্রজাপতি যেই শষ্পে বসে নিতি
আহরিয়া তারি বর্ণ, তারি বর্ণে যায় মিশি।

আমার সোহাগ-কুঞ্জে বসি বসি প্রেম ভুঞ্জে
ভুলে যাবে ঘৃণা-হাসি, আমার হইবে তুমি—
ঘৃণার নিজত্ব হরে চুমিয়া আদর ক'রে
জান না কি ভালবাসা ধরার পরশমণি!
আজি তুমি মন-সাধে হেসে নাও ঘৃণা-হাসি,
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা আপনি আসি।

রমা স্থির-ভাস্বর-বিস্ফারিত চাহনিতে চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সখি, তুমি প্রেমের প্রতিমা। তোমার প্রেম, আকাশের মত বিস্তৃত,—সাগরের মত গভীর। তবে দুঃখ যে, সে প্রেমের মিলন-গীতি গাহিতে পারিলাম না।"

চঞ্চলার অধরে মৃদু হাসির ক্ষীণরেখা দেখা দিল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ—অধরে ঈষৎ হাসির রেখা—এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য—চঞ্চলা বলিল,—"সে আশা আপাততঃ দূরে—এক্ষণে আমি সখীর মিলনে দুইটা গান গাহিতে পারিলেও একটু আনন্দিত হইতাম।"

রমা। প্রেমের কলসীতে আপাততঃ ঢাকনী দিয়া রাখা হইয়াছে।

চঞ্চলা। (হাসিয়া) কেন?

রমা। যত দিন সখীর বিবাহ না হইবে—প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ততদিন ওপথে যাইব না।

চঞ্চলা। সে কি সখি?

রমা। সে তাই।

চঞ্চলা। তোমার ভুল।

রমা। আমার ভুল!

চঞ্চলা। কেন?

রমা। কিসে সুখী হইব? বসন্তরাণী না আসিলে কোকিলবধূ কি কোকিলকে প্রেমের গাথা শুনাইতে পারে?

চঞ্চলা। আমি তোমায় অনুরোধ করিতেছি—তুমি বিবাহে অনুমতি দাও।

রমা। বর কে;—যম ত?

চঞ্চলা। বালাই—কেন সহকারি-সেনাপতি,—

রমা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"সহকারী সেনাপতি? এত সাধিয়া—এত কাঁদিয়া—এত যাচিয়া—তোমার এই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য ও প্রেমই গছান যাইতেছে না—আর আমার এই বর্ষার পচাপাতা কি তিনি নেবেন?

চঞ্চলা বড় অপ্রতিভ হইল। সে 'সহকারী মন্ত্রী' বলিতে. 'সহকারী সেনাপতি' বলিয়া ফেলিয়াছে। বলিল—"যদি গোপনে গোপনে আমায় ফাঁকি দিয়ে পিরীতের ফাঁদ পেতে থাক।"

রমা। সে ভয় নাই সখি, সে দিকে ভীষ্মদেব।

চঞ্চলা। গভীর প্রেম—গভীর হৃদয়। যাক্, তুমি সহকারী সেনাপতি না পাও—সহকারী মন্ত্রীকেই তবে বিবাহ করনা।

রমা। কেন, সহকারী একটা চাই-ই বুঝি?

চঞ্চলা। জীবনে একটা সহকারী চাই বৈ কি!

রমা। সহকারী মন্ত্রী নাকি আমাকে বিবাহ করিতে নারাজ।

চঞ্চলা। ও মা;—সে কি?

রমা। তিনি নাকি রাত্রি-জাগরণে ভীত।

চঞ্চলা। কেন?

রমা। রাত্রে নাকি চাঁদ ওঠে, মলয় বয়, কোকিল ডাকে—ফুলের গন্ধ বিলায়।

চঞ্চলা। সে সকলে আপাততঃ ভয় ঘটিয়াছে—আমার সখীর অসঙ্গ-সঙ্গায় তাহারা তাহার ভ্রম ধরাইতেছে, মিলিলে কোন ভয় থাকিবে না।

রমা। তবে উপদেশটা দিয়ে পাঠাইও। কিন্তু এখন না।

চঞ্চলা। কখন ?

রমা। বাসর জাগার পর।

চঞ্চলা। না ধেনুদানের পর।

রমা। বালাই !

চঞ্চলা। দোল কবে ?

রমা। আর দিন নাই—আগামী পরশু।

চঞ্চলা। সে দিন আমার একটা সাধ পুরাইবে ?

রমা। কি ?

চঞ্চলা। সে দিন রবীশ্বরের পায়ে আবির মাখাইব—তাঁহার সহিত আবির খেলা করিব।

রমা। সে আর কঠিন কি ? আমাদের দেশে উহাতে বাধা নাই।

চঞ্চলা। তা নাই বটে,—তবে তিনি এদিকে আসলে হয়।

রমা। আবির খেলার নিমন্ত্রণ করিব।

চঞ্চলা। তবে তাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—•:)*(:•—

রাজা ও রাণী সুসজ্জিত রত্ন-দীপিত হর্ম্ম্য-মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। রাণী বলিলেন,—"যুদ্ধস্থলে শত্রুগণ তোমার পদানত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই তোমার বিজয়কাহিনী ঘোষিত হইতেছে।

তোমার রাজ্য জুড়িয়া শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। এখন মেয়েটার একটা বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হও।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"আসল কথাটা বুঝি মেয়ের বিবাহ।"

রাণী। সেটা কি একটা কাযের নহে? মেয়ে ত আর ছোট নাই।

রাজা। বর ত অনেক আসিয়াছিল—কিন্তু মেয়ের যে পছন্দ হয় না।

রাণী। পছন্দ একটা হ'য়েছে।

রাজা। যদি জাতি, কুল ও মান-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হয়—আপত্তি নাই। কে সে পাত্র?

রাণী। আমাদের সহকারী সেনাপতি—রবীশ্বর।

রাজা। উত্তম পাত্র, সন্দেহ নাই। যদি উভয়ের পছন্দ হইয়া থাকে—আমার আপত্তি নাই, আমারও মনের মত জামাই হয়।

রাণী। উভয়ের মন হয় নাই।

রাজা। কাহার মন হয় নাই?

রাণী। রবীশ্বরের।

রাজা। কেন?

রাণী। দেশে না কি সে কাহাকে ভালবাসিয়াছিল—কিন্তু তাহার সহিত বিবাহ হয় নাই—তাহারই প্রণয়-ধ্যানে নিরত আছে। আর নাকি বিবাহ করিবে না।

রাজা। লোকটা একটু একগুঁয়ে বটে।

রাণী। কিন্তু প্রেমিক।

রাজা। যদি সে বিবাহ না করে,—তবে আমরা কি করিতে পারিব?

রাণী। মেয়ে কিন্তু একেবারে ডুবিয়াছে,—সে রবীশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।

রাজা। মরণের ফাঁস গলায় দিয়াছে। হতভাগা ছুঁড়ী—দুধ খাতুর

গুণ হইলেও দোষ হয়। মেয়ে মানুষ অধিক লেখা পড়া শিখিলেই জ্যাঠা হইয়া পড়ে।—যাক্, এ সকল খবর তোমায় কে দিল ?

রাণী। রমা।

রাজা। রমা কি বলে ?

রাণী। সে ঐ সকল কথাই বলে—আর কি বলিবে।

রাজা। রবীশ্বর কাহার নিকট ও সকল—বলিয়াছে।

রাণী। রমা নিজেই নাকি গিয়াছিল।

রাজা। তবে আর কি হইবে!

রাণী। আর একটা কথা।

রাজা। কি, বল।

রাণী। দোলের দিন,—চঞ্চলা রবীশ্বরের সহিত হোলি খেলিতে চায়—তোমার আপত্তি আছে কি ?

রাজা। তাহাতে আর আপত্তি কি ? এ পরামর্শ বুঝি তুমি আঁটিয়াছ। মেয়ের রূপ-গুণ-নাচ-নাচনা দেখিয়া যদি রবীশ্বর ভুলিয়া যায়। পরামর্শ মন্দ নহে,—চঞ্চলা রূপে রতি,—বিদ্যায় সরস্বতী,—গুণে লক্ষ্মী। রবীশ্বর যতই কেন কঠিন-হৃদয় হউক না—নিশ্চয়ই বাঁধা পড়িবে। চা'ল্ চালিয়াছ ভাল।

রাণী। না না,—আমি এ মতলব করি নাই। রমা আর চঞ্চলাই কত মতলব জানে। তারা মন্ত্রীরও কাণ কাটিতে পারে। রমা ঐ অনুমতি নেবার জন্যই আমাকে সকল বলিয়াছিল।

রাজা। ভাল—চঞ্চলা সখীগণকে লইয়া রবীশ্বরের সঙ্গে যেন হোলি খেলে।

পরদিন প্রভাতে দেবদোল হইয়া গেল। বৃন্দাবনের অনুকরণে মণিপুর ও শান প্রভৃতি দেশে হোলিখেলা হইয়া থাকে।

প্রভাতের কুসুম-পরাগ-ধূসর-মৃদু-মলয় সংস্পর্শে—বালারুণরাগ-রঞ্জিত নব-কিশলয়-দলের সুরভি নিশ্বাসে রাজধানীর নরনারী জাগিয়া উঠিয়া হোলি খেলিতে প্রবৃত্ত হইল। গৃহে-প্রাসাদে কুঞ্জ-কুটীরে রাস্তার দু'ধারে সর্ব্বত্রেই আবিরোৎসব—সর্বত্রই লালে লাল!

যুবক যুবতী, প্রৌঢ়া, বালক বালিকা সকলে মিলিয়া হোলি খেলিতেছে। হোলির গান গাইতেছে। তাহাদের চোখ মুখ মস্তক দেহ—সবই লালে লাল। অধরে উচ্ছ্বাসের হাসি—চরণে উদ্যমের গতি—হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম। তাহাদের নাচগানে পরিহিত পুষ্প-সুগন্ধে সমস্ত নগরী উচ্ছ্বসিত। তাহাদের দেখাদেখি কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীরাও হোলি গাইতেছে। সমীরণ ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে! কল্লোলিনী প্রেমের গান গাহিয়া নাচিতেছে। পথ-ঘাট-বাড়ী-ঘর-দুয়ার সব আবির জলে লোহিতের ছবি সাজিয়া বসিয়াছে।

মহারাজার আমন্ত্রণ অনুসারে বিজয়সিংহ, রবীশ্বর, মান্ত্রগণ, অমাত্যগণ প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া মহারাজের দোলমণ্ডপে হোলি খেলিতে সমাগত হইয়াছেন। রাজা, রাণী, রাজকুমারী চঞ্চলা, রাজকুমারীর সহচরী রমা, রাধা, নিরুপমা প্রভৃতি সকলেই হোলি খেলায় যোগ দিয়াছেন। সকলেই ক্রীড়ার উন্মাদনায় উন্মত্ত। দোলমণ্ডপ আবিরে লাল হইয়া গিয়াছে। হোলির তালের মধুর বাজনায় মণ্ডপ মুখরিত। সুন্দরীগণ অলঙ্কার শিঞ্জনে মধুরায়িত।

রমা, রবীশ্বরকে হোলি খেলিতে আহ্বান করিল;—দোল মণ্ডপের দ্বিতীয় পার্শ্বের খোলাকক্ষে ডাকিয়া লইল—চঞ্চলা তাহার মোহন সৌন্দর্য্য-বিকাশ করিয়া রবীশ্বরের কপালে একবিন্দু আবির প্রক্ষেপ করিল। রমা, রাধা, নিরুপমা প্রভৃতি তাহাদের কণ্ঠে সুতান তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে গাহিল,—

রমা। এখন কি করিবে বল দেখি?

চঞ্চলা। সারা জীবন ধ্যান করিব।

রমা। তিনি কি আর এদেশে ফিরিয়া আসিবেন না?

চঞ্চলা। সেদিন মা, বাবাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

রমা। তাহাতে মহারাজা কি বলিয়াছিলেন?

চঞ্চলা। তিনি বলিয়াছিলেন,—আসিতে পারে, বিজয়সিংহ সঙ্গে গিয়াছে

রমা। যদি না আসেন?

চঞ্চলা। বলিয়াছি ত—ধ্যান করিয়াই জীবন কাটাইব।

রমা। বড় দুঃখিত হইলাম।

উভয় সখীতে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় রাণী তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার পদ-শব্দ শ্রুত মাত্রেই সখীদ্বয় নিস্তব্ধ হইল। রাণী গৃহ-প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কি কথা হইতেছিল?"

চঞ্চলা শির নত করিল। রমা বলিল,—"সে একটা কথা।"

রাণী। শুনিতে পাই না?

রমা। না।

রাণী। কেন?

রমা। আপনি তাহার কি শুনিবেন?

রাণী। সেই রবীশ্বরের সম্বন্ধে বুঝি কথা হইতেছিল?

রমা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"হাঁ।"

তখন রাণী চঞ্চলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কেন, সেই অজ্ঞাতকুল-শীল ব্যক্তির জন্য অমন করিয়া মর? এই সে চলিয়া গিয়াছে —আর নাও আসিতে পারে! লুসাই নরপতি মহারাজকে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিয়া আমাদের

উত্থাপন করিলেন। রাজা বলিলেন, "আমার পুত্র সন্তান নাই, যে বিস্তৃত রাজ্য আছে—তাহাই যথেষ্ট। আর শোণিতপাত করিয়া, পরদেশ প্রাপ্তির। ইচ্ছা করি না।"

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"শাস্ত্রের আদেশ, কোন রাজা যদি অত্যাচারী হয়—প্রজাগণ কষ্ট পায়, তবে পার্শ্বস্থ রাজা সেই অত্যাচারী রাজাকে দমন করিয়া প্রজাগণকে সুখী করিবেন। ইহাও রাজগণের ধর্ম্ম।"

রাজা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার বীর হৃদয়ের যদি রণপিপাসা হইয়া থাকে, আমার আপত্তি নাই। তবে ধর্ম্মতঃ নীতিপন্থা সর্ব্বদাই—স্মরণীয়।"

ইহার কয়েক দিন পরেই রবীশ্বরকে সঙ্গে লইয়া, প্রচ্ছন্নবেশে বিজয়সিংহ মণিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রবীশ্বর যে দিন শান-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, মণিপুর যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধ্যার সময় সেকথা চঞ্চলা শুনিতে পাইল। সে হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রমাকে বলিল, "সখি; আমার গতি কি হবে?"

রমা ম্লানমুখে বলিল,—"তখনই বলিয়াছিলাম, না জানিয়া শুনিয়া প্রাণ দিও না।"

চঞ্চলা। না সখি,—আমি জানিয়া শুনিয়াই দিয়াছি। অপাত্রে প্রাণ অর্পণ করি নাই।

রমা। পাত্র ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বালকে চন্দ্র দেখিয়া ধরিয়া দিবার জন্য মাতার নিকট বায়না লয়,—তাহা কি তাহার অজ্ঞতার বিষয় নয়?

চঞ্চলা। অজ্ঞতাই হউক আর যাই হউক,—সে তার লোভে পাড়—যাই বলে।

বিজয়। আহা, হা, তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন।

রবি। আমি যে প্রার্থনা করিতেছিলাম—সে সম্বন্ধে কি আজ্ঞা করিলেন।

বিজয়। আরও দিন দশেক থাক,—আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।

রবি। আপনি কোথায় যাইবেন ?

বিজয়। মণিপুর।

রবি। কি উদ্দেশ্যে ?

বিজয়। মণিপুর আক্রমণ করিব।

রবি। তবে কি সসৈন্যে যাইতে হইবে ?

বিজয়। এখন না। মণিপুর প্রাকৃতিক পরিখা ও পর্ব্বতের দ্বারা অত্যন্ত সুরক্ষিত। ভিতর হইতে সাহায্য না করিলে, বাহির হইতে আক্রমণ করিলে,—সে চেষ্টায় লাভ হইবে না।

রবি। তবে কি প্রচ্ছন্নভাবে যাইতে হইবে ?

বিজয়। হাঁ—তোমায় আমায় প্রচ্ছন্নভাবেই যাইব।

রবি। আমাকে চিনিতে পারিলে ফাঁসি দিবে।

বিজয়। প্রচ্ছন্ন থাকিব।

রবি। মণিপুরের প্রজাগণ বর্ত্তমান মণিপুরেশ্বরের উপরে একান্ত বিরক্ত—বিশেষতঃ মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণের স্বেচ্ছাচারিতায় প্রজাগণ একেবারে মর্ম্মাহত। আমার বিশ্বাস, এই সময় উদ্যোগ করিলে—সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে।

বিজয়। এই কয়দিন অপেক্ষা কর—উভয়ে তথায় বসিয়া সেই সকল কার্য্যের উদ্যোগ করা যাইবে।

রবীশ্বর বিদায় হইলেন।

যথা সময়ে বিজয়সিংহ শানাধিপতির নিকট মণিপুর যাত্রার বিষয়

শান্তিতে ভাবিলেন—জগৎ কমলময়! বাহ্য প্রকৃতি কমলময়! তাঁহার হৃদয় কমলময়!—কমলের কাছে চঞ্চলা,—চঞ্চলার রূপ, হাব-ভাব কাতর কটাক্ষ সব ভাসিয়া গেল।

রবীশ্বর বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। কমলের জন্য যেন অন্তরটা বড়ই ব্যাকুলিত হইল। সেই বিতস্তা তীর—সেই নাগকেশর অশোক পারুল পরিবেষ্টিত রাজপথ—সেই কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাটী—সেই মণিপুরোপকণ্ঠ রাজপুর—সকল মনে পড়িল। মনে পড়িল,—সেখানে একবার গেলে হয় না।

রবীশ্বর ছাদ হইতে নামিয়া, একেবারে সেনাপতি বিজয়সিংহের আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি তখন সান্ধ্য-ভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া পুত্রকে কাছে বসাইয়া গল্পগুজব করিতেছিলেন। রবীশ্বরকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন,—"কি মনে করিয়া।"

রবি। অনেকগুলি কথা আছে।

বিজয়। ভাল কথা?

রবি। আজ্ঞা, হাঁ—ভাল বৈ কি।

বিজয়। কি?

রবি। মণিপুর যাইবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে—কিছুদিনের জন্য আমাকে একবার বিদায় দিতে হইবে।

বিজয়। মণিপুরের সমস্ত সংবাদ তুমি আমায় দিয়াছ। কিন্তু একটী খবর পাই নাই।

রবি। কি?

বিজয়। মণিপুরের রাজা কোথায় আছেন, সংবাদ রাখ?

রবি। আগে শুনিয়াছিলাম, তিনি ব্রহ্মদেশে আশ্রয় নিয়াছেন এবং সেখানে আছেন, এখন শুনিতেছি,—তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন।

নিশ্বাসের মত তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন একটা রুদ্ধ নিশ্বাসের [illegible] অনুভূত হইতেছিল।

রবীশ্বরের হৃদয়ের এই "কি যেন কি হইল" ভাব দেখিয়া আকাশের তলে বসিয়া চাঁদ হাসিতেছিলেন। পত্রকুঞ্জমাঝরে থাকিয়া, কোকিল-বধূ ব্যঙ্গ করিয়া আপন স্বর বিস্তার করিতেছিল। বুঝি কোকিলবধূ রবীশ্বরকে ডাকিয়া বলিতেছিল,—"রবীশ্বর! সৌন্দর্য্যের মোহ কাটাইতে জগৎগড়া। তুমি কোন্ ছার;—তাই সৌন্দর্য্যের আদর-আহ্বান পায়ে ঠেলিতে চাহ। রূপ যে জগৎকে বাঁধিবার জন্য সৃষ্ট। চঞ্চলার রূপ তোমার হৃদয় বাঁধিয়াছে।—ভাবনা কি,—সেরূপ ত তোমারই জন্য সৃজিত,—পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া, রূপের সাগরে ঝাঁপ দাও না কেন? জগতে কে কাহার! কমল তোমার কে?—কেন তাহার জন্য অত কাঁদিয়া মরিতেছ? চঞ্চলার আকুল বাসনা—অনন্ত প্রেম—কেন উপেক্ষা কর। কমল তোমার কে? দরিয়াবাজের কথা কি মনে নাই—কমলকে তুমি পত্নীভাবে পাইবে না। যখন পাইবে না, তখন আশা কেন, মোহ কেন? ভুলিয়া যাও—অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী অপূর্ব্ব-গুণময়ী চঞ্চলাকে বুকে টানিয়া লও।"

রবীশ্বর শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি কমলকে ভুলিবেন! কমলকে ভুলিবার সাধ্য তাঁহার নাই—কমল! কমল! কত দিন তোমায় দেখি নাই। তুমি আমার কোথায়!—আগুণ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রবীশ্বর দেখিলেন, কমল বিশ্ব-ব্যাপিয়া আছে। প্রকৃতি-পটে কমলের সুন্দর মূর্ত্তির সারাংশ অঙ্কিত। কোকিল-কূজনে কমলের কণ্ঠস্বর অনুকৃত। নদীর কলনাদী তরঙ্গে কমলের প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবাহিত। পর্ব্বতের উচ্চতার ও মহত্ভাবের সঙ্গে কমলের প্রেমের শ্রেষ্ঠভাব যেন বিজড়িত। রবীশ্বর কমলের সৌন্দর্য্য ভুলিয়া—চিত্ত-বিকারের উন্মাদনা

রমা। মজাইতে গিয়া মজিয়া আসিলে,—বাঁধিতে গিয়া বাঁধনে পড়িলে,—মারিতে গিয়া মরিয়া পড়িলে।

চঞ্চলা। বাঁধিতে চাহি না, মজাইতে চাহি না,—মারিতে চাহি না; আমি সেই চরণের তলে মজিয়া মরিয়া থাকিতে চাহি।

রমা। তবে চল—এখন স্নান করিবে চল।

চঞ্চলা। একটু পরে যাইব।

রমা। এখন কি করিবে?

চঞ্চলা। ধ্যান।

রমা। গোবিন্দদেবের?

চঞ্চলা। হাঁ—আমার হৃদয়-গোবিন্দের।

সেই সময় দোলমণ্ডপে গোবিন্দদেবের আধ্যাত্মিক পূজার বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। চারিদিকে জয় ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত ও উল্লসিত হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাসন্তী-শুক্লারজনী—প্রকৃতি প্রফুল্লমুখী। নৈশ-সমীরণ জ্যোৎস্নার রজতধারা মাখিয়া, প্রস্ফুট কুসুমের পরিমল মাখিয়া ধীর প্রবাহিত আনন্দ উন্মাদনায় জীবহৃদয় উন্মত্ত—এই মাত্র রাজবাড়ীর দোলমণ্ডপে গোবিন্দদেবের আরাত্রিক বাদ্য বাজিয়া গিয়াছে,—এই মাত্র নহবৎখানায় ইমনের মন মাতান স্বর বাজিয়া নিস্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে।

রবীশ্বর তাঁহার আবাসের ছাদের উপরে আলিশায় ঠেশান দিয়া বসিয়া, চাঁদের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। নবীন বসন্তের স্নিগ্ধ

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগতে বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে ;—মণিপুর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-পুত্তলি। এখানে সৌন্দর্য্য যেন বিধাতা চুনিয়া চুনিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এখানে মেঘ-গম্ভীর-মৃদঙ্গ-ধ্বনি-মুখর অভ্রভেদী মণিময় সচিত্র প্রাসাদ-মালার বিদ্যুৎবরণী ললিত ললনা বিহার করে; এখানে কালের শাসন না মানিয়া, ছয় ঋতু একত্র বিরাজ করে ;—তাই মণিপুরী গন্ধর্ব্ববধূ ফুলসাজে সাজিয়া, লোধ্রপরাগে মুখরাগ করিয়া, চূড়ায় মরুকুরুবক বাঁধিয়া, কুন্দকুসুমে কেশ গাঁথিয়া, কর্ণে শিরীষ ধরিয়া, সীমন্তে কদম্ব দোলাইয়া, হস্তে লীলাকমল লইয়া ফুলময়ী সাজে। এখানে তরু নিত্য পুষ্পিত হইয়া মধুমত্ত ভ্রমরে মুখরিত হয়; সরোবরে নিত্য নলিনী ফুটিয়া হংস-সমাকুল হয়,—ময়ূর নিত্য পুচ্ছ তুলিয়া কেকারব করে; প্রদোষে নিত্য জ্যোৎস্না ফুটিয়া অন্ধকার নাশ করে। তাই বর্ষার বিরল বিপ্লাবনে মণিপুর শোভান্বিত হইয়া উঠিল,—আমাদের দেশের বহুল বিপ্লাবনের মত তাই মানব-মানসে ভীতির সঞ্চার করিল না। বর্ষার হুঙ্কারের পরিবর্ত্তে—আকাশে তরল মেঘের তরল খেলা! মেঘ কোথাও নীলোৎপল-কান্তি ;—কোথাও

অঞ্জনকৃষ্ণ ;—কোথায়ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। মেঘ ধারাবর্ষী—জলভারে অবনত ;—মধুররবে মন্থর গমনে আকাশে ভাসিয়া চলিল। মেঘ ইন্দ্রধনু ধরিয়া, মৃদু পবনে বিধূত হইয়া, বিদ্যুদ্দামে মন হরণ করিয়া, বকুল, মালতী, কদম্ব, যূথিকা ফুটাইয়া কামিনীর কোমল অঙ্গ প্রসাধন করিল।

বর্ষার বৈকালে কৃষ্ণানন্দঠাকুর তাঁহার আশ্রমের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন। তাঁহার প্রশান্ত দেহ-ভাব, প্রশান্ত মুখভাব, প্রশান্ত চক্ষুর প্রশান্তভাব। তিনি শান্ত, দান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ। তিনি বিরাগী, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্যে শুষ্ক কঠোরতা নাই। তিনি সহৃদয়, জীব ও জড় জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার চিত্তের সংপ্রসারণ। তরু-লতা তাঁহার যত্নের বস্তু ;—পশু-পক্ষী তাঁহার স্নেহের পুঞ্জ ;—নর-নারী তাঁহার ভালবাসার পদার্থ। তিনি সংসারত্যাগী হইয়াও ঘোর সংসারী—যোগী হইয়াও অপূর্ব্ব ভোগী। তাঁহার দৃষ্টি মোক্ষাভিমুখে,—কিন্তু মর্ত্ত্যের মোক্ষও তাঁহার সুখ-সর্গের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্ম-সম্বন্ধ,—কিন্তু জগতের সকলেই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, ইহকাল এবং পরকাল, পুরুষ এবং প্রকৃতি, মোহ এবং বৈরাগ্য, চিন্তা এবং হৃদয়, শান্তি এবং তেজ—একত্রে জড়াইয়া, একত্রে মাখাইয়া সকল লইয়াই আছেন। তাঁহার চরিত্র অদ্ভুত—কেহই কিছু বুঝিতে পারে না। তবে এই সমুদয়ে মিশ্রিত উদাসীন থাকিয়াও—তাঁহার চরিত্র তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহা তরল নহে,—গাঢ়। শীতল জল জমিয়া যেরূপ শীতলতা-ঘন তুষার হয়, কৃষ্ণানন্দঠাকুরের চরিত্রও সেইরূপ অধ্যাত্মতা-ঘন,—আধ্যাত্মিকতাময়। বন্যার পঙ্কিল জল যেমন তুষারশালী গিরি চূড়া স্পর্শ করিতে পারে না,—কর্ম্মের বাসনা বা আসক্তি-পঙ্ক তদ্রূপ ঐ মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

কৃষ্ণানন্দ বর্ষার বৈকালে বসিয়া বর্ষার জল-নিষেক-নিরতা কোন

মহাশক্তির কথা ভাবিতেছিলেন,—এমন সময় বৃষ্টিবিন্দু মাথার চুলে, কুন্দরক্তারবিন্দ মুখে, গাত্রের বস্ত্রে মাখিয়া কমল সেই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

রবীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সেই-শেষ বিদায়ের প্রভাত-নিশার পরে প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—কমলের দেহশ্রী—অঙ্গ-সৌকুমার্য্যও একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে পাঁচ বৎসর আগে কমলকে দেখিয়াছিল—এত দিন না দেখিয়া হঠাৎ আসিয়া দেখিলে, শীঘ্র সে কমলকে চিনিয়া উঠিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন কেবল পাঁচ বৎসর কালোত্তীর্ণতা হেতু নহে ;—ইহা তাহার পাঁচ বৎসরের যোগ-সাধনার ফল। আগে কমল সংসার-পালনকর্ত্রী লক্ষ্মীরূপা নারী ছিল,—এখন চিদ্‌ঘন বিকাশিনী, অধ্যাত্ম-রসাস্বাদিনী জগদ্ধাত্রীরূপা যোগিনী হইয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভিজিতে ভিজিতে কেন মা ?"

কমল কাপড়ে মস্তক ও মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"বর্ষার দিনে একা বসিয়া বসিয়া মনটা খারাপ হইল, তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি।"

কৃষ্ণা। এখনও সেই মন খারাপ—এ মন খারাপ কি জীবনে যাইবে না। এই যে পাঁচ বৎসর অনাহারে, অল্পাহারে, সংযমাহারে,—বর্ষায় ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া, শিশিরে মজিয়া, কষ্ট সহিষ্ণুতা অভ্যাস এবং ইন্দ্রিয় দমন করিলে,—এই যে পাঁচ বৎসর ধরিয়া, যম, নিয়ম, আসন ও ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির অভ্যাস করিলে,—এখনও কি সেই মন খারাপ! তবে ও পাপ যাইবে কিসে ?

কমল হাসিয়া বলিল,—"না মরিলে আর যাইতেছে না।"

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বিরক্তি-স্বরে বলিলেন,—"এই কি তোমার শাস্ত্রপাঠ ও তপস্যার ফল! মানুষ দেহত্যাগ করিলেই কি তাহার স্বভাব যায়!"

কমল। কিসে যায়?

কৃষ্ণা। এখনও ঐ প্রশ্ন--ইহা ত অনেক দিন হইল, বুঝাইয়াছি।

কমল। সমস্ত শুনিয়াছি—কতক কতক বুঝিয়াছিও ঠাকুর, কিন্তু সে আকর্ষণ—সে স্বভাব যায় না কেন? সে মুখস্মৃতি সে অনুরাগ—সে রূপ-মত্ততা দূর হয় না কেন?—এত কঠোরতা অবলম্বন করিলাম, এত সংযম সাধন করিলাম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য ব্যায়ামাদি করিয়া দেহব্যথা করিলাম—কিন্তু কৈ ঠাকুর, ভুলিতে পারিলাম না কেন?

কৃষ্ণা। রম্য রূপ দেখিয়া, মধুর শব্দ শুনিয়া জীব যে উৎকণ্ঠিত হয়, তাহার কারণ সংস্কার-রূপে বদ্ধ-মূল জন্মান্তর প্রণয়ের অজ্ঞান পূর্ব্ব-স্মৃতি।

কমল। যদি তাহাই হইল, তবে জীবের দোষ হইল কি প্রকারে?

কৃষ্ণা। কিন্তু পুরুষকার কি নাই? পুরুষকারের বলে—জ্ঞানের আলোক-সাহায্যে—যোগবিদ্যার শক্তিপ্রভাবে সেই প্রণয়-স্মৃতি মুছিয়া মহাপ্রেমের দিকে চিন্তাকে প্রধাবিত করানই মানুষের কর্ত্তব্য।

কমল। কথাটা বলিতে ও শুনিতে যেমন সহজ—কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে।

কৃষ্ণা। প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ হইলে সহজ হয়।

কমল। জ্ঞানলাভের যত প্রকার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, সাধ্যমতে তাহাতে ক্রটী করি নাই। তবু—সেই মুখখানির সৌন্দর্য্য হৃদয় পট হইতে মুছিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—চিত্তকে স্থির করিতে হইলে প্রসাধনের প্রয়োজন।

কমল। যখন যেরূপে চলিতে,—যেরূপে যাহা অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। তবে একটা কথা কি জানেন,—

কৃষ্ণা। কি বল!

কমল। আমি তাহাকে ভুলিতে ইচ্ছা করিলেও আমার কষ্ট হয়। সুখ-সুপ্ত সোহাগ-পুষ্ট সন্তানকে শ্মশানে পাঠাইতে হইলে, জননীর প্রাণ যেরূপ আকুলিত হয়—মানস-পট-হইতে রবির ছবি মুছিয়া ফেলিতে আমারও তদ্রূপ কষ্ট হয়।

কৃষ্ণা। কিন্তু রবিই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে!

কমল। উদ্দেশ্য কি?

কৃষ্ণা। উদ্দেশ্য কি?—তাহাই বুঝাইতে হইবে? এত দিন শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞানানুশীলনের কি ইহাই পরিণতি?

কমল। ঐত আমার সর্ব্বনাশ;—রবির কথা মনে হইলে, সব ভুলিয়া যাই। কথাটা ভুলিয়াই বলিয়াছি,—ক্ষমা করিবেন। তবে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এ সাধন-বৈফল্যে কি করিয়া বাঁচিতে পারি?

কৃষ্ণা। সেই যে, গুপ্তবিদ্যাটীর কথা তোমায় বলিয়াছিলাম—মনে আছে কি?

কমল। হাঁ,—আছে। কিন্তু আপনি তাহার শিক্ষা প্রণালী যেরূপ ভাবে দিয়াছেন, তাহা না করিয়া আমি যদি—প্রাণায়ামের উপায়ে করি! শাস্ত্রগ্রন্থে পড়িয়াছি,—"বায়ুসাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, জ্যোতির স্পন্দন স্থির করিতে হয়। তার পরে ধ্যান ধারণাদির দ্বারা আজ্ঞাচক্রের শেষে পিঙ্গলাবর্ত্তে তুলিতে হয়—ক্রমে ঊর্দ্ধে"—

কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর কমলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"উহাও একটা প্রকৃষ্ট পন্থা বটে। কিন্তু বড় জটিল—বড় কঠোর। তাই কর্ম্মী বা যোগিগণ—আমি তোমাকে যে সরল গুপ্তপথের কথা বলিয়া দিয়াছি,—সেই পথেই যাইয়া থাকেন,—এ পথ অতি সহজ।"

কমল। আমি সাধ্য মতে সাধনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সে রূপ ভুলিতে পারিব না। সে পিপাসা আমার যাইবে না। গেলেও বুঝি,

আমার সুখ হইবে না। আমি মনে ভাবি কি—নির্জ্জলা মোক্ষেও আমার সুখ নাই,—সুখ, সেই রূপের ধ্যানে আছে।

কৃষ্ণা। কমল,—বুঝিলাম,—কর্ম্মেরই জয়! এত চেষ্টা করিয়াও তোমার জন্মান্তরীয় পিপাসা ঘুচাইতে পারিলাম না। তুমি কি এত চেষ্টাতেও বুঝিতে পার নাই যে, রূপে জগৎ ভরা—রূপের সাগরে আমরা ভাসিয়া চলিয়াছি—রূপের আরাব-ঝঙ্কারে আমরা মজিয়া রহিয়াছি! রূপ নাই কোথায়? কোথায় খুঁজিলে তোমার প্রণয়-গঠিত মূর্ত্তিরও শতোজ্জল মূর্ত্তি দেখিতে না পাইবে? ঐ শোন—প্রাণের কাণে শোন, জগৎ বহিয়া রূপের গান হইতেছে। ঐ শোন, কোন্ স্বর্গযন্ত্রী বীণাযন্ত্রে দিব্য রাগিণী তুলিয়া রূপের সঙ্গীত গাহিতেছে;—আর আমরা আকাশের তলে বসিয়া, সেই অমৃত নিস্যন্দিনী সঙ্গীত ধারায় অভিষিক্ত হইতেছি। প্রাণের কাণে যে না এ আরাব-উচ্ছ্বাস অনুভূত করিয়াছে—আমার মনে হয়, তাহার প্রাণ এখনও জড়ত্ব পরিহারে সমর্থ হয় নাই,—এইরূপ সঙ্গীতের কণামাত্র লইয়াই ত জগতের সৌন্দর্য্যস্থাপিত। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ রূপ-সঙ্গীতধারা সমান উল্লসিত প্রবাহে, রঙ্গে ভঙ্গে, তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে;—বিরাম নাই, অবসাদ নাই, গতি-ভঙ্গ নাই। বলা বাহুল্য এই রূপ-সঙ্গীতের রেশ লইয়া জড়-সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য রসাস্বাদনে যদি পরিতৃপ্ত হইতে চাও—তবে ঐ সৌন্দর্য্য-সঙ্গীত শুনিবার—বুঝিবার চেষ্টা কর। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের যে বাঁশীরব—যাহাতে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কুলবধূ কুল ত্যজিয়া আসিত, যাহা কাণের ভিতর দিয়া, মরমে প্রবেশ করিয়া আকুলিত করিত,—বোধ হয় সে বাঁশী এই সুরে বাঁধা।

কমল। আপনিই বলিলেন,—সেই সৌন্দর্য্য-সাগরের একাবিন্দু লহরী লইয়া—সেই সুরের একটু রেশ লইয়া মানব সৌন্দর্য্য। আমি তাহাই আস্বাদন করিতে চাই। আমার হৃদয় এতটুকু—আমি তত মহ

রে উপলব্ধি করিতে পারিব কি করিয়া? আমি সাকার—নিরাকারে উপলব্ধি হইবে কি করিয়া? আমি শান্ত রমণী—অশান্ত সৌন্দর্য্যভাব উপলব্ধি আমার হইতে পারে না।

কৃষ্ণা। পুরুষকারের অমরী শক্তিতেও কর্ম্ম-সূত্র ছাড়িয়া অন্যপ্রকারে বরণ করিতে সমর্থ হয় না। তবে হয় কি,—না, সেই তত্ত্ব বজায় রাখিয়া, রঙ্গে, গঠনে, উজ্জ্বলতায় উন্নত করিতে পারে। অথবা পঙ্কিল জল রাশিতে মজাইয়া অধোন্নত করিতে পারে।

কমল। তার পর?

কৃষ্ণা। তার পর জন্ম-জন্ম ঘুরিয়া ফিরিয়া, পুড়িয়া পচিয়া অন্য পদার্থে উন্নতি বা অধঃপতিত হইয়া থাকে।

কমল। ভাল, আমার তাহাই হউক। অত কঠোরতায় আমাকে আর না ফেলিয়া, যাহাতে আমি রবীশ্বরের স্থূল-সৌন্দর্য্য না পাইয়াও উপভোগ করিতে পারি,—জলে, স্থলে, মরুদ্ব্যোমে যাহাতে রবীশ্বরকে দেখিয়া আনন্দিত হইতে পারি, তাহাই আমাকে শিক্ষা দিন। আমার নারীজন্ম সার্থক হউক—শান্ত হইয়া শরীরী ভগবানের ভজনা করি। রবীশ্বর আমার ভগবান্।

কৃষ্ণা। দেখ,—তাহাতেও নিষ্ঠার প্রয়োজন। তুমি যে পথে যাইবে এখন সেই পথেই যাইতে পার। তুমি জড়-যোগের সাধনায় জয়লাভ করিয়াছ,—এক্ষণে অধ্যাত্ম যোগাবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছ—সেই পথে যাইতে পারিবে। কর্ম্মসূত্র সংহার করা দুঃসাধ্য, অতএব ইচ্ছামত পথেই চালিত হও।

কমল। হাঁ—সেই পথই আমাকে দেখাইয়া দিন।

কৃষ্ণা। বলিয়াছি ত নিষ্ঠা।

কমল। নিষ্ঠা হয় কিসে?

কৃষ্ণা। চিত্ত-বৃত্তি নিরোধে।

কমল। চিত্ত নিরোধ হয় কিসে ?

কৃষ্ণা। যোগে।

কমল। যোগে যদি চিত্তের একাগ্রতা জন্মে—তবে আমারও যোগ-সিদ্ধি লাভ হইয়াছে,—কেন না, আমার চিত্তের একাগ্রচিন্তা রবীশ্বরের রূপ !

কৃষ্ণা। উহা এখনও সেই চোখে লাগা রূপজ-মোহ। মোহ ঘুচিতেও অধিকক্ষণ লাগে না।

কমল। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণা। তোমার হৃদয়ে এখনও যে সৌন্দর্য্য-পিপাসা আছে,—তাহ মোহ। মোহ ছুটিয়া যাইতে অধিকক্ষণ লাগে না। আজি তুমি রবীশ্বরের ধ্যানপরায়ণা—কা'ল আবার সে মোহ কাটিয়া, অন্যের সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ হইয়া, রবীশ্বরের জড় দেহ নিজহস্তে বলি দিতেও অপারগ হও না। যোগ-সিদ্ধ একাগ্রতা বিনষ্ট হয় না,—সে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে জড়ীয় কোন আকর্ষণেই আর ফিরে না। যদি রবীশ্বরের রূপধ্যানেই কাটাইতে চাহ—তাহা হইলেও অভ্যাস-যোগের দ্বারা চিত্ত স্থির কর। নরনারীর প্রকৃত দাম্পত্যের সংসার সাধনাও এই অভ্যাস যোগের অন্যতর দৃশ্যপটাবলী !

কমল। সে দিকে যে যাইতে দিবেন না। কিন্তু দিলে মানবজন্ম সার্থক হইত।

কৃষ্ণা। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ও বাসনা অন্যরূপ—আমি তোমাকে তাহা দেখাইব।

কমল। দেখাইব—অনেক দিন হইতে বলিতেছেন, দেখান না ত।

কৃষ্ণা। সময় না হইলে কিছুই হয় না। এই সাধনাটা অভ্যাস করিয়া ফেল,—সময় হইলে আমি দেখাইব।

কমল। আপনি যোগবলে সমস্তই জানিতে ও দেখিতে পান,—রবীশ্বর কি আর দেশে আসিবেন না?

কৃষ্ণা। সে কথা তোমায় বলিব না—বলিয়াছি,—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? যখন এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে—তখন আমি সব দেখাইব, সব বলিব—সমস্ত জানিবে।

কমলা। সে আর কত দিনের কথা?

কৃষ্ণা। উপদেশ দিয়াছি—সাধনা সাফল্যের হাত তোমার।

"তবে এখন বিদায় হই। গোবিন্দজীর সান্ধ্য ভোজনের উদ্‌যোগ করিগে"—এই কথা বলিয়া কমল গর্ব্বিতা করিণীর মত চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল।

কমল চলিয়া গেলে, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের মুখে ঈষৎ হাসির রশ্মি বিকীর্ণ হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"হায়! কামনার আগুন নিভাইবার শান্তিজল জগতে নাই। এই আত্মাটী আজি কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, রবীশ্বরের আত্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জন্ম-জন্মান্তরীয় প্রবলাকর্ষণে প্রাণের অনেক নিকটে করিয়া লইয়াছে—কিন্তু একটু ভুলে—একটু ফেরে এজন্মেও সাধনা-বৈফল্য থাকিয়া গেল। কিন্তু পুরুষকারের প্রতিঘর্ষণে এই মিলন—এই উভয় আত্মার মিলন,—ভালরূপেই সাধিত হইল। কমলের সাধনার বলে,—কমলের আকর্ষণে রবীশ্বরকেও ঊর্দ্ধ জগতে টানিয়া লইয়া লৌহ-চুম্বকের মত মিলিত হইবে। দয়াময়! তোমার প্রহেলিকা তুমিই বোঝ—আমরা তৃণাদপি সুনীচ—আমরা কেমন করিয়া তোমার এই কোটি-সূর্য্যবিভাসিত অনন্তবহ্নি-ঝলসিত অনন্ত সমীর-বাহিত—অনন্ত চন্দ্র-তারকাসেবিত জগৎরহস্য বুঝিতে সমর্থ হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মণিপুর,—রাত্রি অনেক হইয়াছে, কিন্তু পান্থশালাগুলির মধ্যস্থ আলোকশিখা সকল আরও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। কেননা, এই সময়েই পান্থশালার কার্য্য অধিক পরমাণে চলিয়া থাকে। চাঁদসড়কস্থ রত্নাকরঠাকুরের পান্থশালাতেও আলো জ্বলিতেছিল—তাহার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। পান্থশালার দ্বার দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়েই আবদ্ধ হয় না।

এই সময়ে একটী লোক মূল্যবান্ পোষাক পরিহিত হইয়া, অশ্বারোহণে চাঁদসড়কস্থ রত্নাকরঠাকুরের পান্থনিবাসে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখের কক্ষে কতকগুলি বিদেশী পথিক আহারাদি করিয়া স্ব স্ব দেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে। সেখান হইতে হর্ষোৎফুল্ল আননে দ্বিতীয় কক্ষে গমন করিলেন, এবং সেখানে কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে গীতবাদ্যে নিরত দেখিয়া তৃতীয় কক্ষে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন,—কয়েক জন রাজসৈন্য সেখানে বসিয়া পণ রাখিয়া পাশাখেলা করিতেছেন।

নিমকচাঁদ নামক একজন সৈনিক এই পাশা খেলায় অনেকগুলি মুদ্রা জিতিয়া, বড়ই উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিধানে সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ পরিচ্ছদ;—মুখে বিজয়ের মৃদুহাসি। সম্মুখস্থ অপর কয়েকজন সৈনিক খেলায় হারিয়া,—পণে সকল অর্থ হারাইয়া, পরাজয়ে ম্লানমুখ হইয়া—বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত ক্ষীণ হাসি হাসিতেছিল। নিমকচাঁদ তাহাদিগকে পুনরায় খেলিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছিল; কিন্তু তাহাদিগের নিকট আর অর্থ না থাকায়, তাহারা খেলিতে অস্বীকার করিতেছিল। বিজয়ী নিমকচাঁদ

বলিল,—"এস, তোমরা খেলিতে আরম্ভ কর। রামশরণ, ভয় পাইতেছ কেন?"

রামশরণ ম্লানমুখে বলিল,—"না ভাই; আমি আর খেলিব না। আজিকার খেলাতে একেবারেই আমার পড়তা ফিরিল না। যে তিনশত টাকা আনিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই তুমি জিতিয়া লইয়াছ।"

নিমক। তোমার টাকার অভাব কি? আমার নিকট দলিল দাও—আমি তোমাকে টাকা ধার দিতেছি।

রাম। না, ভাই! আমি আজ আর খেলিব না।

নিমক। কেন, ভয় করিতেছ নাকি! খেল না,—তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ।

রাম। না,—আজ কুপড়তা পড়িয়াছে, আমি খেলিব না।

নিমক। তোমরা আর কেহ খেলিবে? এই দেখ, আমার নিকটে অনেক টাকা আছে,—কেহ খেলিয়া জিতিতে পারিলে আমার এ সমুদয়ই লইতে পার।

সকলেই খেলিতে অস্বীকার করিল। সেদিনকার খেলায় নিমকচাঁদ সকলকেই হারাইয়া দিয়া, সকলের আনীত সমুদয় অর্থই জিতিয়া লইয়াছে।

নিমকচাঁদ মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"তবে কি এ কটা টাকা লইয়া আর এত রাত্রি থাকিতে চলিয়া যাইতে হইবে। কাহারই খেলিতে সাহস হইল না—কেহই খেলিবে না?"

আগন্তুক বলিয়া উঠিলেন,—"আমি খেলিব।"

সকলেরই চক্ষু তাঁহার উপর পতিত হইল,—তিনি ঘুরিয়া আসিয়া নিমকচাঁদের সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করিলেন, এবং অঙ্গাবরণী মধ্য হইতে এক মুষ্টি সুবর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া, পার্শ্বদিকে থাক দিয়া

রাখিয়া বলিলেন—"দুইটী সুবর্ণ মুদ্রা পণ রাখিলাম, খেলিতে আরম্ভ করুন।"

উভয়ের খেলা হইল,—আগন্তুকেরই জয় লাভ হইল। পুনরায় দশটী করিয়া মুদ্রা পণ রাখিয়া খেলা হইল।—এবারেও পথিকের জয়।

ক্রমে পণের টাকার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রত্যেকবারেই আগন্তুক জিতিয়া টাকা লইতে লাগিলেন। সমবেত লোকমণ্ডলী ঝুঁকিয়া আসিয়া খেলার নিকটে মুখ বাড়াইয়া দিল,—এই খেলার শেষ পর্য্যন্ত কাহার জয় হয়, দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়াছিল। প্রায় এক প্রহর কাল ক্রীড়া হইল,—ইহার সকল বাজিগুলি আগন্তুক পথিক জিতিয়া লইলেন,—নিমকচাঁদ কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িলেন।

তখন বিজিত পথিক বলিলেন,—"মহাশয়, আর খেলিবেন কি ?"

নিমকচাঁদ অতিশয় ম্লানমুখে বলিলেন,—"আর কি পণ রাখিয়া খেলিব ? আমার নিকটে আর এক কড়া কড়িও নাই।"

তৎপরে তাঁহার পার্শ্বস্থ সৈনিক বন্ধুগণকে বলিলেন,—"তোমরা যদি আমাকে কেহ টাকা ধার দিতে পার—আমি আর একবার খেলিয়া ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।"

তচ্ছ্রবণে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মাপ কর,—ভাই! আমরা যাহা আনিয়াছিলাম, তাহা সমস্তই তুমি জিতিয়া লইয়াছিলে,—আর আমরা কোথায় পাইব ?"

মৃদুহাস্য সহকারে পথিক বলিলেন,—"ধার! ভাল, প্রতিভূ-পত্র লিখিয়া দিন। আমিই ধার দিব।"

তখনই লিখনোপযোগী দ্রব্যাদি আসিল। নিমকচাঁদ প্রতিভূ-পত্র লিখিয়া দিয়া পথিকের নিকটে সহস্রমুদ্রা কর্জ্জ করিলেন, এবং সমবেত

ভদ্রগণ স্বাক্ষর করিয়া, তাহাতে সাক্ষী হইলেন। পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল,—ক্রমে ক্রমে সমস্ত টাকাগুলি পথিকের নিকটে হারিয়া, নিমকচাঁদ হতাশের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আর খেলা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, অনেকেই আগন্তুকের ক্রীড়াবিষয়িণী প্রতিভার প্রশংসা করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। পান্থনিবাসে ভদ্রলোকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা,—তদ্দেশীয় রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া, পশ্চিম-দেশীয় পোষাক-পরিহিত ভদ্রলোকটীর পরিচয় কেহই জিজ্ঞাসা করিল না, কিন্তু তাহার বিষয়ে অনেকরূপ আলোচনা করিতে করিতে সকলে চলিয়া গেল। কেবল হৃতসর্ব্বস্ব নিমকচাঁদ পান্থনিবাস পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না,—তাঁহার হৃদয়ে অর্থনাশের, অধিকন্তু সহস্র মুদ্রা ঋণের কথা উদিত হওয়ায় বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অনুতাপের তপ্তনিশ্বাস ঘন ঘন পতিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করিতে লাগিল।

আগন্তুক তখনও সেই স্থলে বসিয়াছিলেন, নিমকচাঁদের অবস্থা দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। মুখের হাসি মুখে চাপিয়া বলিলেন, —"দেখুন আমি বিদেশী, আমি কল্য নাগাইত বৈকালে,—মণিপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইব—ইচ্ছা করিতেছি। আপনার ঋণের টাকাগুলি আগামী কল্য নাগাইত মধ্যাহ্নের মধ্যে আমাকে পরিশোধ করিয়া দিবেন।"

ম্লানমুখে নিমকচাঁদ বলিলেন,—"না, মহাশয়, আগামী কল্য মধ্যাহ্নে টাকা দিবার আমার উপায় নাই।"

চমক-চকিতভাবে পথিক বলিলেন, "সে কি, মহাশয়! আপনি যদি জিতিতেন তবে কি আমায় টাকা না দিলে ছাড়িয়া দিতেন?"

নিমক। নিশ্চয় ছাড়িয়া দিতাম না,—তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া, আপনার সুবিধা মতে টাকা আদায় করিতাম।

পথিক। তাহা হইলে আপনি ভদ্রতার কার্য্য করিতেন,—সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ভদ্র ব্যবহার করিবার সুযোগ ও সুবিধা আমার নাই। কেন না—আমি বিদেশী, আপনার নিকট ঐ সামান্য কয়টী টাকা আদায় করিবার জন্য কিছু আমি এখানে বাসা ভাড়া দিয়া—খরচপত্র করিয়া থাকিতে পারিব না।

নিমক। কি করিব বলুন ;মহাশয় ,—আমার একটী পয়সারও সংস্থাপন নাই। আমি মাসে মাসে যে টাকা পাই—তাহা আমার খরচে কুলায় না। সংস্থাপন হইবে কি করিয়া বলুন।

পথিক। আপনি কি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন?

নিমক। আমি সহকারী সেনাপতি।

পথিক। কি আশ্চর্য্য। আপনি মণিপুর রাজ্যের সহকারী সেনাপতি। আপনি অর্থের কাঙ্গাল! আপনার মাসিক বেতনই ত প্রচুর—তারপর যুদ্ধজয়ে লুণ্ঠন আছে।

কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বে পান্থনিবাসের অধিস্বামী রত্নাকরঠাকুর তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—নির্ব্বাক্ হইয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এবারে তিনি কথা কহিলেন,—বলিলেন,—"মহাশয় ; সহকারী সেনাপতি-মহাশয়ের মত লোক এদেশে আর কে আছে? ওর মোটা নজর কত! মদ, মেয়ে-মানুষ—আর বন্ধুবান্ধবগণকে খাওয়াইতেই উহার বেতনে কুলায় না। তারপরে ঐ এক খেলার রোগ আছে,—তাহাতেও কিছু যায় বৈ কি!"

পথিক মনে মনে বলিলেন, এমন রাজ্যের এমন সহকারী সেনাপতি না হইলে মানাইবে কেন! তিনি মনে মনে আরও ভাবিলেন,—পামহেবা যে শক্তি লইয়া মণিপুর বিজয় করিয়াছিলেন,—বিলাসের বিশাল উরসে তাহা ঢালিয়া দিয়া, এখন এই সকল ইন্দ্রিয়দাস ও অসচ্চরিত্র কর্ম্মচারা

লইয়াই তিনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া আছেন। সামান্য একটু সামরিক ঝটিকাতেই তাঁহার আসন টলিয়া যাইবে!

পথিককে ভাবান্বিত দেখিয়া নিমকচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, আমি সহকারী সেনাপতি—এই কথা শুনিয়া লোকটা হয় ত চমকিয়া উঠিয়াছে—ভীত হইয়াছে—তাহাতেই মনে মনে কি ভাবিতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে আর টাকার জন্য তাগাদা করিবে না।

কিন্তু নিমকচাঁদের অনুমান ঠিক হইল না। পথিক বলিলেন,—"তাই ত মহাশয়; আপনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—আপনি যদি সহজে আমার টাকা মিটাইয়া না দেন,—তবে দেখিতেছি, এই সামান্য টাকার জন্য আমাকে আবার সাত জায়গায় ঘুরিতে হইবে।"

নিমকচাঁদ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"কেন, সাত জায়গায় ঘুরিতে হইবে কেন?"

পথিক। আপনাদের নামে নালিশ করিতে হইলে,—সেনাপতির অনুমতি চাই—তারপর সাধারণ বিচারালয়ে নালিশ হইবে না,—হয় মন্ত্রীর কাছে, না হয়—রাজার কাছে, এই সামান্যের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে, প্রমাণ দিতে হইবে। বিশেষতঃ কখন কি জন্য টাকা লইয়াছিলেন, তাহাও বলিতে হইবে।

নিমক। আপনি দেখিতেছি, আমার চাকুরীটুকুরও মাথা খাইতে পারেন!

পথিক। হাঁ,—নালিশ-ফরিদ করিতে হইলে, অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইবে যে দ্যূতক্রীড়ার সময় আপনি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন।

নিমক। সামরিক কর্ম্মচারিগণের দ্যূতক্রীড়া করা নিষিদ্ধ—এবং তাহা প্রকাশ পাইলে কর্ম্মচ্যুতি হয়। দেখুন মহাশয়? একজন ভদ্র-

লোকের উপর এই সামান্য টাকার জন্য জুলুম করা আপনার কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমার হাতে হইলেই মিটাইয়া দিব।

পথিক। আমি যে কাযের জন্য আসিয়াছি,—যদি তাহাতে সুবিধা না হয়, তবে আমি ঐ সামান্য টাকার জন্য মণিপুরে বসিয়া থাকিব কি প্রকারে!

নিমক। আর যদি সে কাযে সুবিধা হয়,—তাহা হইলে কি করিবেন?

পথিক। প্রায় দুই তিন মাস এখানে থাকিব।

নিমক। তাহা হইলে আমার নিকট পাওনা-টাকাটা ঐ সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া লইতে পারিবেন?

পথিক। হাঁ তা,—পারিব।

নিমক। আপনার কি কায মহাশয়? যদি তাহাতে আমার কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি—কেন না, আপনার কাযের সুবিধা হইলে, আমারও সুবিধা হইতে পারিবে। নতুবা চারিদিক্ দিয়া আমার সর্ব্বনাশ! আমার পূর্ব্বকার অনেক দেনা আছে—কোন মহাজনের নিকট যে, সহসা আর টাকা ধার পাইব, তাহারও উপায় নাই। নতুবা ধার করিয়াই না হয়, আপনার দেনা মিটাইয়া দিতাম।

পথিক। আপনার বদান্যতা ও সরল ব্যবহারে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। ভাল, বিষয়-কর্ম্মের আলোচনা কল্যই করা যাইবে। আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমার কাযের সাহায্য করেন তখন, না হয়, ঐ টাকাটা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে। আর আপনার নিকট খেলায় জিতিয়া দশটাকা পাইলেই যে, আমি বড়লোক হইব, তাহাও নহে!

নিমক। আপনি অতি ভদ্রব্যক্তি। তা মহাশয়; যখন আমাদের এতদূর আলাপ-পরিচয় হইল, তখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি,—আপনার নিবাস কোন্ দেশে! *পোষাক দেখিয়া ত বৃন্দাবনের ঐ দেশে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আপনি সুন্দর ভাবেই মণিপুরী ভাষা বলিতে পারেন। বোধ হয়, পূর্ব্বেও অনেকবার এ দেশে আসিয়ছেন।

পথিক। না মহাশয়, আমি মণিপুরে অনেকবার আসি নাই। বহুকাল পূর্ব্বে একবার মাত্র আসিয়াছিলাম,—কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে মণিপুর আর নাই—একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তখন মণিপুরে মণিপুরের রাজবংশীয়েরাই রাজা ছিলেন। এখন অন্য রাজা হইয়াছেন,—সব পরিবর্ত্তন, সব স্বতন্ত্র প্রকারের হইয়াছে!

নিমক। তবে আপনি এই রাজা ও রাজ্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন?

পথিক। না মহাশয়;—আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানি না। দেশে থাকিয়া যতদূর শুনিতে পাই,—তবে শোনা কথা—অবশ্য সকল সত্য নাও হইতে পারে।

নিমক। সে বিষয়ে যাহা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি আপনাকে শুনাইব। আপনার নিবাসটী কোথায় বলিলেন না।

পথিক। হাঁ হাঁ, আপনি যখন আমার বন্ধু, তখন আপনাকে আমার অবক্তব্য আর কিছুই নাই। দেখুন,—বহুকাল একত্র থাকিলেও হয় ত বন্ধুত্ব হয় না—আবার দেখামাত্রই বন্ধুত্ব হইয়া যায়। মনের মিল কি না!

নিমক। হাঁ—তা বটে! আপনার নিবাস?

পথিক। আমার নিবাস আপনার অবক্তব্য নাই। আমার নিবাস—বৃন্দাবনের নিকটে মথুরা জেলায়।

নিমক। কোন্ গ্রামে?

পথিক। গ্রামের নাম বলিলে চিনিতে পারিবেন কি?

নিমক। বৃন্দাবনের নিকটে অনেক স্থানের নাম শুনিয়াছি।

পথিক। মথুরা জেলার শতদ্রু।

নিমক। শতদ্রু! না, ও নাম কখন শুনি নাই।

পথিক। অনেক দূরে কি না! আপনি বোধ হয় আমাদের দেশে কখন যান নাই।

নিমক। না, মহাশয় আপনাদের দেশে কখন যাই নাই। একবার বেড়াইতে যাইব ইচ্ছা আছে,—শুনিয়াছি বৃন্দাবনের সুন্দরী গোপবালারা বড় প্রেমিকা।

পথিক। খুব—খুব! আপনার মত সুন্দর ও রসিক পুরুষ পাইলে তাহারা রাস-লীলার অভিনয় করে।

নিমক। মহাশয়; ঠাট্টা করিলেন?

পথিক। তাও কি হইতে পারে—আমার বন্ধুর সহিত আমি ঠাট্টা করিতে পারি! আমি প্রকৃত কথাই বলিয়াছি।

নিমক। প্রকৃত?

পথিক। প্রকৃত নয় ত কি?

নিমক। তবে একবার নিশ্চয় যাব।

পথিক। যাবেন বৈ—কি।

নিমক। মহাশয়ের নামটী কি?

পথিক। আমার নাম—আমার নাম কিষণজি।

নিমক। ঐ ত দোষ! আপনাদের দেশের নামগুলা বড় খারাপ কিষণজি!

পথিক। খারাপ বৈ কি! ঐ খারাপ নামগুলার জ্বালাতেই ত

আমরা সভ্যসমাজে মুখ দেখাইতে পারি না। কেমন সুন্দর—নাম দেখ দেখি ; নিমক—চাঁ—দ !

নিমক। আমি যে ঐ সুন্দর নামের অধিকারী, তাহা বোধ হয় মহাশয় জানিতে পারিয়াছেন।

পথিক। হাঁ—তাহা জানিয়াছি বৈ কি।

এই সময় পান্থস্বামী বলিলেন,—"রাত্রি আর অধিক নাই, আপনারা শয়ন করিবেন কি ?"

পথিক বলিলেন,—"বন্ধু ; অনেক দূর হইতে আসিয়াছি—পথশ্রান্তে কিছু ক্লান্ত আছি। যদি অনুমতি দেন, এক্ষণে একটু নিদ্রার জন্য শয়নকক্ষে যাইতে পারি।"

নিমক। হাঁ—হাঁ ; সচ্ছন্দে। আমিও বাসায় যাই। আপনার সহিত কখন, কোন্ স্থানে আবার সাক্ষাৎ হইবে ?

পথিক। যদি অবসর থাকে, কল্য প্রত্যুষেই এই স্থানে আসিবেন। আপনার টাকা সম্বন্ধে ঐ সময়ে বিবেচনা করিব।

নিমক। কোন্ টাকা ?

পথিক। যে টাকা খেলায় জিতিয়া লইয়াছি।

নিমক। লইয়াছেন, না,—প্রতিভূ-পত্র লেখাইয়া লইয়াছেন।

পথিক। উভয়ই।

নিমক। আপনি অতি উদার-চরিত্রের লোক।

পথিক। আপনিও কম নহেন।

তখন উভয়ে অভিবাদন প্রত্যভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। পথে যাইতে যাইতে নিমকচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"লোকটার চেহারা খুব রকমসই বটে ! নজরও খুব বড় ! লোকটার ভাব কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। সকল কথাই যেন ছলনার আবরণে আবৃত ! উহার

অভিপ্রায় কি,—কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। কিন্তু যাইবে কোথায়? নিশ্চয়ই উহার কার্য্যের সন্ধান লইতে পারিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যামিনীর শেষ যামে নিদ্রাগত হইলেও, ঊষার আলো জগতে বিকীর্ণ না হইতে হইতেই, নিমকচাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহার মুখখানা অতি বিবর্ণ হইয়াছে—চক্ষুদ্বয় শুষ্ক ও কঠোরভাবে পূর্ণ। মাদকসেবন, রাত্রিজাগরণ, ক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ায়, তাঁহার চিত্তে এক আগুণ জ্বলিয়া গিয়াছে। আজি কি হাতে করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন,—স্ত্রী কন্যাদিগকে সেবন করাইবেন, এমন সংস্থান তাঁহার নাই। বাজারে তাঁহার পসারপ্রতিপত্তি একেবারেই নাই—তাঁহাকে একটী পয়সার দ্রব্যও ধারে বিক্রয় করে না। কেন না, একবার লইতে পারিলে, আর কাহাকেও তিনি "উপুড়হস্ত" করেন না। পদগৌরবে কেহ কড়া কথা বলিয়াও আদায় করিয়া লইতে পারে না। সামরিক কর্ম্মচারিগণের নামে মোকদ্দমা করা অতীব কষ্টকর বলিয়া, সে দিকে কেহ যাইতে পারে না,—তাঁহাকে কেহ এক পয়সার জিনিষও ধার দেয় না। কাযেই সমস্ত অর্থ দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া এখন প্রাত্যহিক বাজার খরচের ভাবনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য দেখিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া, নৈশ-বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক একটা অশ্বারোহণে রত্নাকরঠাকুরের পান্থনিবাসে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া রত্নাকরঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিষণজি কোথায়?"

রত্নাকর। প্রত্যুষে উঠিয়া ভ্রমণার্থ বাহির হইয়াছেন। আকাশে সূর্য্যোদয় হইতেছে—বোধ হয়, এখনই ফিরিয়া আসিবেন।

নিমকচাঁদ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক, পান্থনিবাসের বিস্তৃত অলিন্দায় রত্নাকরঠাকুরের নিকটে গিয়া, একখানা বেত্রাসনে উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়া রত্নাকরঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিষণজি লোকটা কেমন বলিয়া বোধ হইতেছে?"

রত্নাকর ঠাকুর ঔদাস্য-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"একদিনের—এক দিনেরও নহে—এক রাত্রের আলাপে, তা কি বুঝা যায় যে, লোকটা কেমন! তবে চা'ল-চলন, কথাবার্ত্তা যে উঁচুদরের. তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হাতে একটা হীরার আংটী আছে দেখিয়াছেন—তার দাম অনেক! তবে লোকটা যেন বড় চালাক।"

আসনখানি রত্নাকরঠাকুরের আসনের দিকে আর একটু সরাইয়া আনিয়া, ঔৎসুক-ব্যঞ্জক স্বরে নিমকচাঁদ বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছ। উহার কথাবার্ত্তার ভাবে বোঝা যায়, লোকটা যেন বড়ই চাপা! যে কাযের জন্য আসিয়াছে—হয় ত তাহা আমাদিগকেও নাও বলিতে পারে! না বলে বলুক—ক্ষতি কি! ভাল, তারপরে আপনার সহিত আর কোন কথাবার্ত্তা হইল?"

রত্নাকর। কোন্ সম্বন্ধে?

নিমক। যে কোন সম্বন্ধেই হউক।

রত্নাকর। না,—কৈ এমন কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই।

নিমক। কতদিন থাকিবে, তাহা কিছু বলিয়াছে?

রত্নাকর। না তাহা কিছু বলেন নাই,—তবে সকালে উঠিয়া যখন বেড়াইতে বাহির হন, তখন আমাকে বলিলেন,—আমার একটী ভৃত্যের প্রয়োজন। যদি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন, বড়ই বাধিত হই।

কথাটী শুনিয়া নিমকচাঁদের রোম-বিরল ভ্রূ দুইখানি একটু কুঞ্চিত হইল। বোধ হইল যেন, তাঁহার কি একটা ঈপ্সিত কার্য্যের সুপন্থা পাইবার উপায় হইল। কিন্তু সে সম্বন্ধে নিমকচাঁদ আর কোন কথাই বলিলেন না।

পূর্ব্ব গগনে লোহিত কিরণে সূর্য্যোদয় হওয়ায়, প্রভাত-ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া কিষণজি এই সময় আসিয়া পান্থনিবাসে উপস্থিত হইলেন, এবং অলিন্দায় নিমকচাঁদকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন,—"মহাশয় আসিয়াছেন। আপনাদের অনুগ্রহে বাধিত হইলাম।"

নিমক। আপনি মহাশয় লোক,—আপনার সহিত সাক্ষাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়। যতদিন এখানে থাকিবেন,—দেখাসাক্ষাৎ করিব বৈ কি!

রত্নাকরঠাকুর কিষণজিকে নিজের আসনখানি ছাড়িয়া দিয়া, উঠিয়া গেলেন। কিষণজি তথায় উপবেশন করিলেন। নিমকচাঁদ বলিলেন, —"হাঁ, যে কথা অদ্য সকালে বলিবেন বলিয়াছিলেন,—তাহা শুনিতে পাইব কি?"

কিষণজি। কোন্ কথা?

নিমক। আপনি এখানে কি কাযের মনন করিয়া আসিয়াছেন।

কিষণ। সময় হইলে সে কথা আপনাকে বলিব,—আর আপনার টাকা সম্বন্ধীয় যে সামান্য কথা আছে, তাহার মীমাংসা পরে করা যাইবে, —দুই বন্ধুতে এখন কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজব করা যাউক।

নিমকচাঁদের হৃদয় অর্থচিন্তার উদ্বেগের দারুণ বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছিল! কিন্তু কিষণজির দয়ার উপরে, সে অর্থপ্রাপ্তির উপায় নির্ভর করিতেছে,—সুতরাং তাঁহারই অভিপ্রায় মতে চলিতে হইবে "টাকা সম্বন্ধীয় সামান্য কথা,"—কিষণজির এই কথায় নিমকচাঁদ কতকটা আশস্তও হইলেন—কেন না, এই কথায় তিনি বুঝিতে

পারিলেন,—কিষণজি সে সামান্য টাকা—নিমকচাঁদকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তখন আরও আনুগত্য ও ভদ্রতার ভাব দেখাইয়া, নিমকচাঁদ বলিলেন,—আপনি কোন্ বিষয়ে গল্প করিতে চাহেন? এদেশের যুবতীদের সম্বন্ধে কি? "আমাদের দেশের যুবতীগণ উত্তম গান গাহিতে পারে। নাচিতেও ইহারা সুদক্ষা।"

মৃদু হাসিয়া, কিষণজি বলিলেন,—"আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।"

নিমকচাঁদও গর্ব্বোচ্ছ্বাসের একটু ক্ষীণহাসি হাসিয়া বলিলেন,—"কিসে জানিলেন?"

কিষণ। জানিয়াছি।

নিমক। তবু?—শুনিতে পাই না।

কিষণ। আমি কোন্ সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব,—আমার হৃদয়ের মধ্যে কি গোপনভাব আছে, আপনি অমনি খপ করিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিলেন।

নিমক। মহাশয়;—আমরা ত আর বোকা নই। পুরুষ মানুষ, যুবতী স্ত্রীলোকদিগের গল্প শুনিতে যেমন ভালবাসে,—জগতে তেমন আর কি ভালবাসে!

কিষণ। হাঁ—আপনার—আমার মত লোকে খুব ভালবাসে বটে! আমরা নিত্য নিত্য নূতন নূতন কামিনী-কাঞ্চনের আশা করিয়া থাকি, কিন্তু অনেক পুরুষ নাই কি, যাহারা নিজের বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক মাত্রকেই মায়ের মত দর্শন করিয়া থাকে।

নিমক। তাদের কি আপনি যথার্থ পুরুষ মানুষ ভাবেন? যে পুরুষ সন্ধ্যার সময় একটা নূতন মেয়ে মানুষ—দুই পিয়ালা আসবের যোগাড় করিতে না পারিল, তাঁহার বাঁচাই বৃথা!

কিষণ। নিশ্চয়ই ত! এই ত আমার বন্ধুর মত কথা! আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে আজীবনের বন্ধুত্ব হইল।

নিমক। তাহা ত হইল,—কিন্তু, আপনি যখন কথা কহেন,—তখন তামাসা করিতেছেন কি, সত্য বলিতেছেন—তাহা বুঝা দায়!

কিষণ। মহাশয়; আপনি মনে কিছু করিবেন না। আমার কথার ভাব-ভঙ্গীই কতকটা ঐরূপ। কথাগুলা ত ঠিক—তবে বলিবার দোষে, স্বরের গোলযোগে—অন্যপ্রকার শুনায়, সে কিছু মনে করিবেন না, বন্ধু! যদি পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে,—আজি সন্ধ্যার সময় পাঁচ পিয়ালা মদ,—আর দুইটা মেয়ে-মানুষ লইয়া আমায় ডাকিয়া দেখিবেন।

নিমক। সে ত আনন্দের কথা;—কিন্তু আজি আর সে সুখ হইল না বন্ধু!

কিষণ। কেন?

নিমক। আজি রাজ-পাটে এক সান্ধ্যভোজ হইবে;—সেখানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও তাঁহাদের স্ত্রী-কন্যা প্রভৃতি আসিবেন। নৃত্য-গীতাদিও হইবে।

কিষণ। আপনি কি নিমন্ত্রিত হইয়াছেন!

নিমক। হাঁ,—আমিও সেখানে যাইব। কিন্তু বড় ভাবনায় পড়িয়াছি।

কিষণ। কি ভাবনা বন্ধু?

নিমক। আজি আমার হাতে একটা পয়সাও নাই। সেখানে যাইতে হইলে কিছু শুধু হাতে যাওয়া হইবে না। অন্ততঃ দুই এক শত টাকা সঙ্গে থাকা—কর্ত্তব্য।

কিষণ। তা ত ঠিক্! তবে এই সামান্য টাকার জন্য কি আমার বন্ধুর কায বন্ধ হইতে পারে?

নিমক। আপনি অতি সৎ লোক।

কিষণ। ভাল, আপনাদের মন্ত্রী নাকি সৌখিন লোক!

নিমক। ভারি সৌখীন।

কিষণ। রাজা?

নিমক। রাজা যেন একটী তেজঃপূর্ণ উজ্জ্বল গ্রহ—আর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বহুসংখ্যক সুন্দরী-রমণী, উপগ্রহের ন্যায় অবিরত তাঁহার চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিষণ। মন্ত্রীমহাশয়ের একটী রক্ষিতা আছেন,—তাঁহার নাম রাণী চন্দ্রা। চন্দ্রা নাকি অত্যন্ত সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী?

নিমক। সে সকল গিয়াছে, সে চাঁদে গ্রহণ লাগিয়াছে, সে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে।

কিষণ। আমার বন্ধুর যেন স্ত্রীলোকের নামে কবিত্বের ভাব উথলিয়া উঠিল।

নিমক। অনেকে আমাকে ভাবুক এবং কবিও বলে।

কিষণ। আমিও একটু একটু লক্ষণ—দেখিতেছি। হাঁ—চন্দ্রার সৌন্দর্য্যে গ্রহণ লাগিয়াছে বলিতেছিলেন,—কেন, তাঁহার কি হইয়াছে?

নিমক। সে অনেক কথা। আর এক দিন বলিব। এক্ষণে বেলা হইয়া উঠিল,—আমার কথাটা আগেই হউক। আজি রাজ বাড়ী-নিমন্ত্রণ— সকাল সকাল সমস্ত উদ্‌যোগ করিতে হইবে।

কিষণ। এই যে বলিতেছিলেন,—আপনার হাতে একটীও পয়সা নাই - সেখানে যাইতে হইলে দুই তিন শত টাকার প্রয়োজন! তাই আজি যখন হাতে টাকা নাই, তখন না হয়, নাই গেলেন।

নিমক। ওঃ, সর্ব্বনাশ! না গেলে কি হয়! রাজপ্রসাদ লাভ করিতে হইলে, এরূপ নিমন্ত্রণে যাইতে হয় বৈ কি? এই

স্বপ্নে অনেক বড় বড় ঘরের সুন্দরী মেয়েদের নাচগান শোনা যায়।

কিষণ। কিন্তু টাকা।

নিমক। আমার বন্ধুর ভরসা করি।

কিষণ। ভাল,—আগে রাণী চন্দ্রার কথাটা শুনিয়া, তারপরে আপনার টাকার বিষয় শুনিতেছি। চন্দ্রার কি হইয়াছে, মহাশয়?

নিমক। বেলা অধিক হইয়া উঠিল,—সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রায় রতনচাঁদ নামে এক ধনী ব্যক্তি মণিপুরের উপকণ্ঠস্থিত রাজপুরে বাস করেন। তাঁর ভাইপোর নাম রবীশ্বর;—রবীশ্বর গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়া, দীর্ঘকারাদণ্ডের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কিছুদিন পরে রায় রতনচাঁদের অনুরোধেই হউক, আর যে কারণেই হউক, রাণী চন্দ্রা কারাগার মধ্যে গমন করেন,—উদ্দেশ্য রবীশ্বরকে মুক্ত করিয়া দিবেন। তৎপরে কে যে, তাঁহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল,—বলা যায় না। তিনি তাহা বলিলেনও না। মন্ত্রী তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, ঐ সংবাদ পাইয়া কারাগার হইতে আনাইয়া বহুপ্রকার চিকিৎসা করাইলেন, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে জীবন পাইলেন; কিন্তু বুকের সে ক্ষত একেবারে গেল না। একটু লাগিয়াই আছে,—কোন প্রকার শোক, ভয় বা উদ্বেগ হইলেই সেই ক্ষতমুখ দ্বারা রক্তধারা নির্গত হয়। আরও সেই অবধি তিনি কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না—কত যে আমুদে লোক ছিলেন, একেবারে পরিবর্ত্তন! কেবল মন্ত্রী মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া এই ভিক্ষা লইয়াছেন—দিনান্তে একবার মন্ত্রীমহাশয় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা দিয়া আসিবেন।

কিষণ। মন্ত্রী মহাশয়—চন্দ্রার প্রার্থনা অনুসারে প্রত্যহ, তাঁহার বাড়ীতে এখন যান ?

নিমক। আপনিও যেমন। ফুল শুকাইয়া গিয়াছে—মধুশূন্য হইয়াছে. ভ্রমরার আনাগোনা কি এখনও থাকে ? তবে বড় কাঁদাকাটা করিতে করিতে লোক পাঠাইতে পাঠাইতে এক দিন যদি যান।

কিষণ। কারাগারে রাণী চন্দ্রার বক্ষে ছুরি বসাইয়া রবীশ্বর পলায়ন করিলে, চন্দ্রা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন ?

নিমক। মৃতবৎ হইয়াছিলেন ?

কিষণ। তার পরে ?

নিমক। তার পরে কারারক্ষী তাহা জানিতে পারিয়া কারাধ্যক্ষকে জানায়,—কারাধ্যক্ষ রাণী চন্দ্রার পোষাক পরিচ্ছদ ও রাজ-নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া তখনই মন্ত্রীমহাশয়কে সংবাদ দেয়। মন্ত্রীমহাশয় চন্দ্রাকে চিনিয়া চিকিৎসা করান।

কিষণ। হাঁ—আপনি যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ লিপি প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কি বলিতে চাহিতেছিলেন ?

নিমক। সে সম্বন্ধে আমি, আর কি বলিব ? আপনি দয়া করিয়া যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই হইবে। আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছে। বন্ধুর মত কায করুন !

কিষণ। তবে তিন মাসেই না হয় টাকাটা দিবেন! আপনার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছে,—কি করিয়া আপনার মনে কষ্ট দিয়া আদায় করি।

নিমক। আর আমার নগদ টাকা ?

কিষণ। কোন্ নগদ টাকা ?

নিমক। যে টাকা আপনি দ্যূতে জিতিয়া লইয়াছিলেন ?

কিষণ। ওহো! তা সে টাকা আমার বাক্সে উঠিয়াছে।

নিমক। আমাকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

কিষণ। আমি! আমি আপনাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলাম?

নিমক। স্পষ্টতঃ নহে, তবে সেই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন।

কিষণ। আমি ত পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমার কথার ভঙ্গীতে কোন অর্থ করিবেন না। স্বরের ভঙ্গীটা আমার ঠিক না।

নিমক। কিন্তু আপনি দয়া না করিলে, আমার মান-সম্ভ্রম থাকে না।

কিষণ। আপনি বোধ হয়, প্রায় প্রত্যহই এই খেলা খেলিয়া থাকেন?

নিমক। প্রত্যহ নহে—মধ্যে মধ্যে খেলিয়া থাকি।

কিষণ। যাহাদের অর্থ জিতিয়া লয়েন,—তাহাদিগের অভাব বুঝিয়া, কখনও কোন দিন এক পয়সা কাহাকেও ফিরিয়া দিয়াছেন কি?

নিমক। কৈ, মনে পড়ে না।

কিষণ। তবে আজি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন কেন? স্মরণ রাখিবেন, এ জগতে আমি যে ব্যবহার—যে আচরণ—কখনও কোন দিন কাহারও সহিত করি নাই, তাহা কখনও পাওয়া যায় না।

নিমক। বেলা অনেক হইয়াছে।

কিষণ। হাঁ—আপনিও—যান—আমি স্নানাদি করিগে।

নিমক। টাকা।

কিষণ। আপনি বড় বিপদেই ফেলিলেন। যাক্, আপনি যদি এক কায করিতে পারেন, তবে আপনাকে আমি আপনার ঋণের প্রতিভূ স্বরূপ যে লিপি পাইয়াছি, তাহা এবং যে নগদ টাকা জিতিয়া লইয়াছি, তাহার অর্দ্ধেক আপনাকে ফিরাইয়া

দিতে পারি। যদি আপনি আমাকে তদ্বিনিয়মে একটা জিনিষ দেন।

নিমক। কি বলুন,—থাকিলে নিশ্চয়ই দিব।

কিষণ। আপনি বলিয়াছিলেন, রাজ বাড়ীতে আজি সান্ধ্যভোজ হইবে, আমার বড় সাধ, আমি তাহা একবার দেখিব—কখনও দেখি নাই। যদি একখানি "প্রবেশ-পত্র" আমাকে দিতে পারেন—তবে আমি উহা দিব।

নিমক। সে অতি দুর্ঘট ব্যাপার!

কিষণ। আপনি মনে করিলে সহজেই দিতে পারেন।

নিমক। না, মহাশয়;—সহজে দিতে পারি না। যাঁহাদের নিমন্ত্রণ হয়, কেবল তাঁহারাই সে "প্রবেশ-পত্র" একখানি করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিষণ। স্মরণ রাখিবেন, তাহার একখানি না পাইলে আমি আপনাকে প্রতিভূ-লিপি বা জিত-ধনের অর্দ্ধাংশ কখনই প্রত্যর্পণ করিব না।

নিমক। তবে প্রবেশ-লিপি সংগ্রহের উপায় দেখি।

কিষণ। আমি আপনার অপেক্ষায় এই স্থানে থাকিব—অন্য কোথাও যাইব না।

নিমক। এখন ঋণ-স্বরূপ দশটী মুদ্রা আমাকে প্রদান করিতে পারেন?

বিনা বাক্য-ব্যয়ে কিষণজি তাহার অঙ্গাবরণীর মধ্যে হাত দিয়া দশটী টাকা তুলিয়া নিমকচাঁদের হাতে দিলেন। নিমকচাঁদ তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই রাজবাড়ীর নহবৎখানায় ঝিঁঝিট রাগিণীর আলাপচারি আরম্ভ হইল। নাট্যশালায় শতচন্দ্রবিনিন্দিত কিরণরাশি বিকীর্ণ করিয়া সহস্র দীপ জ্বলিল। পত্র-পুষ্প-সুজজ্জীকৃত স্তম্ভগাত্রে সোণার স্তবকে মতির মাল্য সে কিরণে ঝলসিয়া উঠিল। সুপাতিত মাদুরের উপরে গালিচা; গালিচার উপরে মখমলের আস্তরণ। চারিদিকে কিংখাপের আবরণে মুক্তার ঝালর-শোভিত উপাধান-শ্রেণী। মধ্যস্থলে স্বর্ণ-মখমলের রাজ-বিছানা। এই ফরাসের দক্ষিণের প্রকোষ্ঠে খাদ্যাদির আয়োজন।

আজি রাজপথে হুলস্থূল,—প্রহরিগণ, সৈন্যগণ সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ী ঘোড়া ও পাল্কী আসিয়া রাজবাড়ীর নাট্য শালার দরোজার সম্মুখে দাঁড়াইতেছে—নিমন্ত্রিত নরনারীগণ তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া, নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছেন। স্বয়ং রাজা গরীব-নেওয়াজ পুরুষগণকে এবং পাটরাণী নিমন্ত্রিতগণকে, আদরে-আহ্বানে যথাস্থানে উপবেশন করাইতেছেন। প্রায় দুইদণ্ড পরে একজন পরিচারক আসিয়া অবনত-মস্তকে জানাইল,—"পাঁচশত প্রবেশ লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি। আর বাকি নাই।"

মহারাজের ইঙ্গিতে তূর্য্যধ্বনি হইল। তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।

প্রথানুসারে প্রথমে রাণী ও রাজকন্যাদিগের নৃত্যগীত হইয়া গেল। তৎপরে রাজান্তঃপুরবাসিনী-গণের নৃত্য হইয়া গেলে—ভদ্র-কুল-ললনাগণের নৃত্যগীত হইতে লাগিল।

এই সময় রাজা বাহীর-নেওয়াজ পার্শ্বস্থ নিমকচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি হে, তোমার মেয়ে আসেন নাই?"

অভিবাদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, নিমকচাঁদ বলিলেন,—আজ্ঞা, হাঁ,—সে আমারই পার্শ্বে বসিয়া আছে।

রাজা। আমি শুনিয়াছি—তোমার কন্যা নৃত্যগীতে অদ্বিতীয়া হইয়াছেন, নিজেই অনেকগুলি নূতন সুরে গান বাঁধিয়াছেন,—এবং নূতন রকমের নাচের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিমক। যাহা শুনিয়াছেন—সকলই সত্য।

রাজা। তবে তিনি নৃত্যগীতে যোগ দিতেছেন না কেন? তাঁহার শরীর ভাল আছে ত?

নিমক। আজ্ঞা, হাঁ।

রাজা। তিনি নৃত্য-গীত করিতেছেন না কেন?

নিমক। এই মাত্র সে তাহার জননীর নিকটে বলিতেছিল—"বাজনা ভাল হইতেছে না। আমি যে সকল নূতন প্রকারের নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছি—তাহার বাদ্য বাজন, বর্ত্তমান বাদকের কার্য্য নহে।"

রাজা। ভাল, তাঁহাকে আরম্ভ করিতে বলুন। না হয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অপর কেহ বাজাইবেন।

এইরূপ সভায় ব্যবসাদার সঙ্গীতজ্ঞ কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ভদ্র লোক ও ভদ্র মহিলাগণই নৃত্যগীত ও বাদ্য করিতেন।

মণিপুর গন্ধর্ব্বদেশ,—সঙ্গীতের জন্য ইহা চির-প্রসিদ্ধ।— নৃত্যগীত ও বাদ্যকেই সঙ্গীত বলে। সৌভাগ্য-স্বাধীনতার সময়কার কথা ছাড়িয়া দিলেও মণিপুরের আদম-সুমারিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, মণিপুর রাজ্যে প্রায় ছয় হাজার সঙ্গীত-ব্যবসায়ী আছে। অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ একুশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ছয় হাজার সঙ্গীত-

ব্যবসায়ী! তাহা হইলে প্রতি সাঁইত্রিশ জনে এক জন করিয়া ব্যবসায়ী গায়ক। এতদ্ভিন্ন সখের গায়ক গায়িকা ঘরে ঘরে। আর যখন সমুন্নত সৌভাগ্যশালী মণিপুর—তখন সে দেশে সঙ্গীতের কি প্রকার চর্চ্চা ছিল, তাহা ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে।

যাহারা নৃত্য করিতেছিল, তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল। নিমকচাঁদের যুবতী কন্যা ফুলরাণী নৃত্য করিতে উঠিল। ফুলরাণী যথার্থই ফুলরাণী! তাহার পরীর মত চেহারা—পুষ্প-ভারাবনত লতার মত দেহ-সৌকুমার্য্য।

ফুলরাণী উঠিয়া যখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া দণ্ডায়মান হইল,—তখন দর্শক মাত্রেই স্থির-চক্ষুতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! ফুলরাণী গাহিতে গাহিতে নাচিতে আরম্ভ করিল।—কিন্তু সে নূতন ধরণের তালে বাদক বাজাইতে পারিল না। রাজা তদ্দণ্ডেই আর একজন ভদ্রলোককে বাজাইতে অনুমতি করিলেন। রাজা যাঁহাকে অনুমতি করিলেন, তিনি একজন বিখ্যাত বাদক বলিয়া পরিচিত; কিন্তু সুর শুনিয়া তখনও তিনি তাহার তাল ঠিক করিতে পারেন নাই,—রাজাজ্ঞা অস্বীকার করিবারও উপায় নাই। ভদ্রলোকটী বাদ্য যন্ত্র গ্রহণ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ ভাবে বাজাইলে, ফুলরাণী সুরের সার্থকতা ও নৃত্যের সাফল্য দেখাইতে পারিত,—এ বাজনায় তাহা হইল না। বাদক কোন প্রকারে লয়টী ঠিক করিয়া বাজাইতেছিলেন। কাযেই ফুলরাণী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমি পুরাতন ধরণেই গীত নৃত্য করি, এরূপ ধরণের বাদক এখানে কেহ নাই।"

সেই সভায় কিষণজিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহারাজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি রাজানুমতি হয়, আমি ঐরূপ রণের বাদ্য বাজাইতে পারি।"

ফুলরাণীর নূতন ধরণের নৃত্য দেখিতে সকলেই উৎসুক ছিলেন।

মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উৎসাহের সহিত বলিলেন,—"বেশ, বেশ—আপনি তবে বাজান।"

কিষণজি উঠিয়া গিয়া, বাদিত্র লইয়াই বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বাজনায় যেন বোলের তরঙ্গলীলা বহিয়া যাইতে লাগিল। গায়িকা ও বাদকের অত্যন্ত মিল হইল—ফুলরাণী বহু কৌশলে বহুভাবে নৃত্যগীত করিয়া সককের মনোরঞ্জন করিল।

এইরূপ উত্তম বাদ্য করাতে সকলেরই দৃষ্টি কিষণজির উপরে পতিত হইল। কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারিল না। এরূপ স্থলে নামধামাদি জিজ্ঞাসারও প্রথা নাই। কিন্তু লোকটা একেবারেই সকলের অপরিচিত—পরস্পর পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিষণজির পরিচয় জানিতে পারিল না।

অতঃপর সভাভঙ্গ হইয়া গেলে সকলেই চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ, সেনাপতি, সহকারীসেনাপতি প্রভৃতি তখনও সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। উৎসবের দ্রব্যাদি ও লোকজনের বন্দোবস্ত জন্য তাঁহারা এখনও উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সকলেই চলিয়া গিয়াছে—রাজাও রাণীদিগের সহিত অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিয়াছেন।

মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ বলিলেন,—"নিমকচাঁদ, যে লোকটী তোমার কন্যার সঙ্গে বাজাইল—ও লোকটীকে কি তুমি চেন?"

নিমক। না,—ভালরূপ চিনি না। তবে এই পর্য্যন্ত জানি—লোকটা বলে, উহার বাড়ী পশ্চিমদেশে মথুরা জেলায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

মন্ত্রী। তোমার বিশ্বাস হয় না কেন?

নিমক। লোকটা ভারি ধড়িবাজ—আর সকল কাযেই খুব পারদর্শী।

মন্ত্রী। মথুরা জেলার লোকের কি অমন হয় না ?

নিমক। দেখি নাই ত। আরও লোকটাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, একপ্রকারে তাহার উত্তর করিয়া যায়,—কিন্তু স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, লোকটা মিথ্যা কথা বলিতেছে।

মন্ত্রী। উহার নাম কি ?

নিমক। বলে ত কিষণজি।

মন্ত্রী। কি জাতি ?

নিমক। বলে না,—বলে আমি একজন পর্য্যটক। কিন্তু পর্য্যটক বলিয়া বোধ হয় না। কোন গুপ্তচর বলিয়াই বোধ হয়।

মন্ত্রী। কিসে ?

নিমক। লোকটা যে একজন যোদ্ধা—আর অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

মন্ত্রী। কি প্রকারে বুঝিতে পারিলে ?

নিমক। উহার উভয় হাতের তেলোয়,—তরবারি ও বন্ধুক ধরিয়া ধরিয়া কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

মন্ত্রী। তবে একটু বিশেষ সতর্ক হইয়া, উহার গতিবিধি দর্শন কর। এবং যাহাতে শীঘ্রই উহার প্রকৃত পরিচয় অবগতি হইতে পার—তাহার চেষ্টা কর।

নিমক। আমি তাহার একটা উপায়ও করিয়াছি।

মন্ত্রী। কি করিয়াছ ?

নিমক। আমার সেই ধূর্ত্ত চাকর 'আইয়া-পারল'কে জানেন ত ?

মন্ত্রী। জানি, সে ভারি চালাক বটে! তাহাকে দিয়া কি করিয়াছ ?

নিমক। সে দিন কোন একটা কার্য্যে ভাল করিয়া ঐ লোকটীর সন্ধান জন্যই চাঁদসড়কের রত্নাকরঠাকুরের পান্থনিবাসে যাই—সেখানে

য়া শুনিলাম, ঐ ব্যক্তি রত্নাকরঠাকুরের নিকট একটী চাকরের বলিতেছে—আমি ভাবিলাম, বড় সুবিধাই হইল। কেননা, আইয়া-পারল'কে এই সময় উহার ভৃত্যের কাযে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলে, সে উহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে—সমুদয় কার্য্য দেখিতে হবে—আর আমি তাহার মুখে সমস্তই শুনিতে পাইব।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমানের মত কৌশল করিয়াছ। ঐ লোকটা বুঝি করঠাকুরের পান্থনিবাসে থাকে?

নিমক। হাঁ।

মন্ত্রী। 'আইয়া-পারল'কে এখন রাখিলে হয়।

নিমক। রাখিলে হয় কি,—তাহাকে রাখিয়াছে। সে আমার শিক্ষা পাইয়া উহাকে গিয়া বলে—আপনার নাকি একটি চাকরের প্রয়োজন আছে—বর্ত্তমানে আমার চাকুরী গিয়াছে—যদি আমাকে রাখেন, গরীব প্রতিপালিত হইতে পারে। তাহার চাকরের প্রয়োজন —তাহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে 'আইয়া-পারল'কে ভৃত্যরূপে রাখিয়াছে।

এদিকে উৎসবের দ্রব্যাদি ভাণ্ডারজাত হইয়া গেল। এবং রাস্তাদি লোকশূন্য হইয়াছে দেখিয়া, মন্ত্রী প্রভৃতিও স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে দিন উৎসব হইল,—সেই দিন গভীর নিশীথকালে এক জন অশ্বারোহী আসিয়া চাঁদসড়কস্থ রত্নাকরঠাকুরের পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া কিষণজি কোথায় আছেন, জিজ্ঞাসা করিল।

রত্নাকরঠাকুর বলিলেন,—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বোধ

হয়, এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি একটু আগে রাজবাড়ীর উৎসব দেখিয়া আসিয়াছেন—এই মাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন। বোধ হয় উঠিবেন না।

আগন্তুক বলিল,—"একজন অপরিচিত অশ্বারোহী আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী, এই কথা বলিলেই তিনি উঠিবেন। আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

রত্নাকর, কিষণজির শয়ন কক্ষের দ্বারে গিয়া দেখিলেন, তখনও তিনি জাগ্রত আছেন। অশ্বারোহী সৈনিকের কথা বলিয়া রত্নাকর ফিরিয়া আসিতেছিলেন,—কিষণজি বলিলেন,—"অশ্বারোহীকে আমার এখানে ডাকিয়া আনুন।"

রত্নাকর অশ্বারোহীকে ডাকিয়া সে কথা বলিলেন, এবং অশ্বারোহীকে কিষণজির নিকট পাঠাইয়া দিয়া তিনি আপন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

অশ্বারোহী গৃহমধ্যে আসিলে, কিষণজি তাহাকে নিজশয্যার উপরে, বসাইয়া উভয়ে অতি ঘন সন্নিবিষ্টরূপে থাকিয়া, অতি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিলেন। শেষ অশ্বারোহী বাহির হইয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক নগরের বাহির হইয়া গেলেন।

কিষণজির চক্ষুতে নিদ্রা নাই। বিনিদ্র-রজনীর দীর্ঘকাল শয্যার উপরে বসিয়াই অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত কালে একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—কিন্তু পান্থনিবাসের দাসদাসীগণের কলরবে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল,—তিনি উঠিয়া বসিলেন। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—বেলা বোধ হয় চারি দণ্ড হইয়াছে।

তখন তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া, ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি নয়াসড়ক চেন?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞা আমার বাড়ী এই স্থানে, আমি এখানকার সব যায়গা চিনি।"

তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া কিষণজি নয়াসড়ক অভিমুখে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই নয়াসড়কে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই স্থানের দুলালী পটোহীর বাড়ী যাইব।"

ভৃত্য বলিল,—"হাঁ, তিনি একজন বাড়ীওআলী। তাঁহার বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা থাকিবার জন্য বাড়ীভাড়া পায়।"

কিষণ। তুমি তাহার বাড়ী চেন ?

ভৃত্য। আজ্ঞা চিনি,—সম্মুখের ঐ লালরঙ্গের বাড়ী তাঁহার।

"তবে তুমি আমার জন্য এই স্থানে অপেক্ষা করিও।" ভৃত্যকে এই কথা বলিয়া, কিষণজি সেই বাড়ীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে উপস্থিত হইতেই দুলালী পটোহীর সাক্ষাৎ পাইলেন। পটোহীর বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—দৈহিক স্থূলতা কিঞ্চিৎ অর্থ থাকার পরিচয় দিতেছে, এবং চক্ষুর কঠোর দৃষ্টি অর্থাগমের উপায় করিবার বুদ্ধি থাকার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কিষণজি তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—"গত পরশ্ব আপনার বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বাসা লইয়াছেন ?"

দুলালী পটোহী বলিলেন,—"হাঁ, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসায় বলিয়াছেন, —তাঁহার নাম হতভাগী। কিন্তু বিশ্বাস হয় নাই।"

কিষণজি। কেন ?

দুলালী। বাপ-মায়ে যখন নাম রাখে,—তখন কিছু অমন নাম রাখে না। বোধ হয়, দুঃখকষ্টের জীবন বলিয়া তিনি আপনাকে ঐ নামেই অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

কিষণ। না, তাঁহার নামও উহা হইতে পারে,—তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়,—তাই মাতা উহাকে হতভাগী বলিয়া ডাকিতেন।

দুলালী। হইবে।

কিষণ। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব,—আপনি একবার তাঁহাকে সংবাদ দিন।

দুলালী চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনাকে উপরে আসিতে বলিলেন।"

বিনা বাক্যব্যয়ে কিষণজি উপরে উঠিলেন। উপরে একটা কক্ষের মেঝেয় এক খানা কম্বলের উপরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি বসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অনুমান করিয়া বলা কঠিন,—এখনও দৈহিক লাবণ্য ফল্গুনদীর জলের ন্যায় সে দেহে অন্তঃশীলা বহিতেছে। কিন্তু দুর্ভাবনা—দুর্ঘটনা—দুশ্চিন্তায় তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু কোটরে নামিয়াছে—রবিকর-বিশুষ্ক নলিনীদলের মত তাঁহার গাত্রবর্ণে কালিমার দাগ লাগিয়াছে।

কিষণজিকে দেখিয়া রমণীর বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠ আরও বসিয়া গেল। দুই চক্ষু বহিয়া শতধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিষণজি বলিলেন,—"মা! এখন কাঁদিও না। যাহা অদৃষ্টে ছিল, সকলই ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার আত্মা, আততায়ীর রক্তঃশোণিতের তর্পণ প্রার্থনা করিতেছে,—আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছি; স্বহস্তে দুরাত্মার বক্ষঃরক্ত বাহির করিয়া বন্ধুর তর্পণ করিব।"

এইবার রমণী কথা কহিলেন। যেন বহুকালের মরিচা ধরা বীণার তারে শোকসঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠিল।

অশ্রুমুখী রমণী বলিলেন,—তুমি আমার স্বামীর প্রিয়তম বন্ধু। তাঁহার জন্য অনেক করিয়াছ—আত্মজীবনেও লক্ষ্য কর নাই, কিন্তু কর্ম্মসূত্রের মহান্ বৈফল্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার নাই।"

কিষণজিরও চক্ষুকোণে জল দেখা দিল। তিনি বলিলেন,—"কি করিব মা। সকলই আমাদের অদৃষ্ট।"

রমণী অঞ্চলাগ্রে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"বিজয়সিংহ; তোমার বন্ধু, আমার হৃদয়েশ্বর—মণিপুরের রাজাধিরাজ অভাগীকে সঙ্গে লইয়া, কত বনে জঙ্গলে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হয়েন। সেখানে কিছু দিন কষ্টে কালাতিপাত করিয়া, তারপর হতভাগীকে কাঁদাইয়া, প্রাণের ভাই জয়সিংহকে কাঁদাইয়া অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন।"

কিষণজি শান-সেনাপতি বিজয়সিংহ,—রমণী পূর্ব্ব. মণিপুরাধিপতির বিধবা রাণী—তাহা বোধ হয়, আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিষণজি করতলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"যুবরাজ জয়সিংহ এখন কোথায়।"

রাণী। তিনিও আসিয়াছেন—তোমার প্রেরিত রবীশ্বরের সঙ্গে আমি ও তিনি উভয়েই আসিয়াছি। তিনি সৈন্যদিগের সহিত সীমান্তে আছেন। দেখ, বিজয়সিংহ; রবীশ্বরের মত ছেলে আমি দেখি নাই। আমাদিগকে আসিবার সময় যে কত যত্নই করিয়াছে,—তাহা বলা যায় না। ও ছেলেটী কে?

বিজয়। এস্থলে ঐ বিষয়ে অধিক কথা বলা, আমাদের কর্ত্তব্য নহে,—সময়ে সকলই প্রকাশ পাইবে।

রাণী। কিন্তু উহার চক্ষুর নীচেকার জটুল চিহ্নটী দেখিয়া আমার মনে এক পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে।

বিজয়। রবীশ্বর কা'ল রাত্রে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এবং আপনাদের সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই চিহ্ন ও দলিল গুলি কোথায় রাখিয়াছেন?

রাণী। আমার সঙ্গেই আছে।

বিজয়। ওগুলি সত্বরেই প্রয়োজন হইবে। উহা না দেখিলে মণিপুরী প্রজারা আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবে না।

রাণী। এই সমস্ত দলিল-পত্র ও চিহ্ন গুলি তুমি লইয়া যাও, বিজয়সিংহ। এই স্থানটী ভাল নহে।

বিজয়। আমি অদ্য লইয়া যাইব না। সম্ভবতঃ আগামী কল্য ঐ দলিলাদি শুদ্ধ আপনাকে লইয়া, আমি সামন্তগণের নিকটে যাইতে পারিব। আপনি খুব সাবধানে থাকিবেন। সঙ্গে খরচের মত অর্থ আছে ত?

রাণী। হাঁ—তা আছে।

"তবে প্রণাম,—বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া বিজয়সিংহ—আমরা এখন কিষণজি বলিয়া পরিচয় দিব—কিষণজি বিদায় হইলেন, ও যেখানে ভৃত্য দাঁড়াইয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন,—এবং তাহার সহিত নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চাঁদসড়ক অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময় ভৃত্য "আইয়া-পারল" আসিয়া সহকারী-সেনাপতি নিমকচাঁদের বাটীতে উপস্থিত হইল। নিমকচাঁদ তাহাকে একটা নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া, চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন, আ'জ কোন খবর জানিতে পারিয়াছিস্ কি?"

আইয়া। হাঁ, একটা ছোট খাট রকমের খবর আছে,—তাই বলিতেই আপনার নিকট আসিয়াছি।

নিমক। কি খবর বল্।

আইয়া। আ'জ সকালে উঠিয়া কিষণজি আমাকে নওয়াসড়কের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে বলিলেন।

নিমক। তুই সেখানে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলি?

আইয়া। হাঁ, লইয়া গিয়াছিলাম।

নিমক। সেখানে গিয়া, কিষণজি কোথায় গিয়াছিল?

আইয়া। আমাকে দুলালীর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দেখাইয়া দিলে—তিনি সেই বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন।

নিমক। তুই তাঁহার সঙ্গে দুলালীর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলি কি?

আইয়া। না, আমাকে পথেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।

নিমক। আচ্ছা, তবে তুই এখন যা। খুব সাবধানে থাক্‌বি—কোন বিষয় সন্ধান নিচ্ছিস্—কিষণজি এমন ভাব যেন ঘুণাক্ষরেও না জানিতে পারে। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার হইয়া সকল বিষয় সন্ধান রাখ্‌বি, আর যখন যাহা সন্ধান পাবি—সেইদিন রাত্রে ছুটীর সময় আমাকে আসিয়া বলিয়া যাবি।

আইয়া-পারল চলিয়া গেল। নিমকচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—লোকটাকে জব্দ করিয়া তবে ছাড়িতে হইবে। ভারি ধূর্ত্ত—ভারি ধরিবাজ! উহাকে দেখিলেই যেন বোধ হয়,—সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্ব কার্য্যেই ও প্রভুত্ব করিতে পারে। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে—কোন ষড়যন্ত্রের কাযে কিষণজি লিপ্ত আছে। ভগবানের ইচ্ছায় যদি তাহাই হয়—আর উহাকে আমি ধরাইয়া দিতে পারি—তাহা হইলেই আমি পুরস্কার পাইব। আর সরকার বাহাদুরের কাছে ভারি একটা প্রতিপত্তিও হইবে।

এই ভাবিয়া চিন্তিয়া শয়নে স্বপনে সে নিশা অতিবাহিত করিয়া পরদিন বেলা চারিদণ্ড অতীত না হইতেই নিমকচাঁদ দুলালীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দুলালীকে বাহিরে ডাকাইয়া লইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গতকল্য সকালে তোমার বাড়ীতে পশ্চিমদেশীয় একজন লোক আসিয়াছিল ?"

দুলালী বলিল,—"হাঁ, আসিয়াছিলেন।"

নিমক। যদি আমার নিকট সত্য কথা বল,—আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। আর যদি মিথ্যা কথা বল, তাহার জন্য শাস্তিও পাইবে।

দুলালী। কেন গো,—কোন হেঙ্গাম-হুজ্জুত ত হয় নাই ?

নিমক। না,—সে সকল কিছুই নহে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব—তাহার যথার্থ উত্তর দিও। এই নাও—দুইটা টাকা নাও।

দুলালী হস্ত প্রসারণ করিয়া টাকা দুইটী লইয়া বলিল,—"টাকা কেন, আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, অথবা যাহা সত্য, তাহা কেন বলিব না। আপনি ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে কি জানিতে চাহেন ?"

নিমক। ঐ ব্যক্তি তোমার বাড়ীতে কি জন্য আসিয়াছিল ?

দুলালী। আজি চারিদিন হইল, আমার বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে—ঐ ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া গিয়াছেন।

নিমক। স্ত্রীলোকটীর বয়স কত ?

দুলালী। বয়স চল্লিশ বৎসর হইতে পারে,—কি তার কমও হইতে পারে। বড় রোগা—বয়স ঠিক করা কঠিন।

নিমক। যাক্—সেই স্ত্রীলোকের সহিত ঐ পুরুষটীর যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল,—তাহা তুমি শুনিয়াছিলে কি ?

দুলালী। না। আমি তাহা শুনি নাই। তাহারা বড় ছোট ছোট করিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল। বিশেষতঃ আমার ত তাহাদের কথা শুনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে পাশের ঘর হইতে

বাহির হইয়া, যখন তাহাদের ঘরের কাছ দিয়া নীচে নামিয়া যাইতে-ছিলাম—তখন কয়েকটী কথামাত্র আমার কাণে গিয়াছিল।

নিমক। সে কথা কয়টী কি—তাহা আমাকে বল।

দুলালী। কেন, সে কথা শুনিয়া আপনি কি করিবেন?

নিমক। আমি একটী কাযেই অবশ্যই ঘুরিতেছি—কথা গুলা বল, তোমাকে বিশেষরূপে পুরস্কৃতা করিব।

দুলালী। সে কথা কয়টীতে বিশেষ কোন অর্থই বুঝিতে পারা যায় না।

নিমক। তুমি না বুঝিতে পার, কিন্তু আমার অনুসন্ধেয় বিষয় সম্বন্ধে হইলে, আমি সহজেই বুঝিতে পারিব।

দুলালী। স্ত্রীলোকটী কি কথা বলিয়াছিল—তাহা শুনিতে পাই নাই—কারণ, আমি বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহাদের বলা শেষ হইয়া গিয়াছিল,—পুরুষটী বলিল, "মা; দলিলগুলা ও অভিজ্ঞান-চিহ্নগুলা খুব সাবধানে রাখিও। আমি সামন্তসর্দ্দারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই তোমাকে লইয়া যাইব।"

নিমক। নাম টাম কিছু শুনিয়াছিলে?

দুলালী। হাঁ—হাঁ, পুরুষটীকে ঐ রমণী একবার বলিয়াছিল,—বিজয়সিংহ, তুমি আমার স্বামীর পরম বন্ধু—

নিমক। তারপর? তারপর?

দুলালী। তারপর আর বিশেষ কোন কথাই শুনিতে পাই নাই।

নিমক। তোমাকে আমি যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়াইয়া দিব। এক্ষণে, আমি যে তোমার কাছে আসিয়াছিলাম—বা এই সকল বিষয় তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহা যেন সেই স্ত্রীলোক বা অপর কোন ব্যক্তি জানিতে না পারে।

। আপনি যখন নিষেধ করিয়া দিলেন, তখন একথা আর কেহই জানিতে পারিবে না।

আরও দুইটী রৌপ্যমুদ্রা দুলালীর হস্তে প্রদান করিয়া নিমকচাঁদ অতি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

তথা হইতে নিমকচাঁদ একেবারে চিরঞ্জীব বর্ম্মণের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী মহাশয় নিমকচাঁদকে দেখিয়া বলিলেন,—"খবর কি।"

নিমকচাঁদ যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া বলিলেন,—"বিশেষ খবর আছে। একটু গোপনে বলিব।"

নিমকচাঁদকে লইয়া মন্ত্রী মহাশয় পাশের ঘরে উঠিয়া গেলেন। বলিলেন,—"বোধ হয় সেই কিষণজির সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাইয়া থাকিবে ?"

নিমক। আজ্ঞা হাঁ,—আপনি যথার্থই অনুমান করিয়াছেন,—আমি কিষণজির বিষয়ই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।

মন্ত্রী। কিষণজির সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ—বল।

নিমক। আমি আমার নিয়োজিত সুচতুর ভৃত্যের নিকট সন্ধান পাইয়া, নওয়া সড়কে দুলালীর বাড়ীতে গমন করিলাম,—সেখানে গিয়া দুলালীর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, তাহার বাড়ীতে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছে, বিজয়সিংহ তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল।

মন্ত্রী। বিজয়সিংহ কে ? তুমি ত কিষণজির কথা বলিতেছিলে।

নিমক। দুলালীর মুখে শুনিলাম—সেই রমণী কিষণজিকে বিজয়সিংহ বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছে,—ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, কিষণজির আসল নাম—বিজয়সিংহ; কিষণজি কৃত্রিম নাম।

মন্ত্রী। বিজয়সিংহ! কোন্ বিজয়সিংহ ? যে বিজয়সিংহ পূর্ব্ব-

রাজার বন্ধু ছিল—যে কারাগার হইতে পলাইয়া যায়, সে নয় ত? শুনিয়াছি—সে নাকি শানদেশের সেনাপতি হইয়াছে, এবং লুসাই-সমরে অদ্বিতীয় কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে।

নিমক। আমার বোধ হয়, এ সেই। আরও শুনুন।

মন্ত্রী। বল, বল। ক্রমেই আমার সন্দেহ হইতেছে। সে যদি কোন কু-মতলবে মণিপুরে প্রবেশ করিয়া থাকে,—তাহা হইলে ব্যাপার বড় সহজ হইবে না। যাক্‌,—তাহার পর, আর কি জানিতে পারিয়াছ?

নিমক। দুলালীর মুখে শুনিলাম—যে রমণীর সহিত কিষণজি—এখন কিষণজিই বলি—যে রমণীর সহিত কিষণজি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, সেই রমণী বলিয়াছিল—আমার নিকট যে সকল দলিলপত্র ও অভিজ্ঞান আছে, তাহা তুমি লইয়া যাও। তাহাতে কিষণজি উত্তর করিয়াছিল—আমি সামন্ত সর্দ্দারগণের সহিত সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিয়া আসিয়া, ঐ সকল জিনিষের সহিত আপনাকেও তথায় লইয়া যাইব।

মন্ত্রী। ব্যাপার বড় গুরুতরই বোধ হইতেছে,—ঐ রমণী মৃত রাজার স্ত্রী হইতে পারে। নিমকচাঁদ;—তুমি বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর কর্ম্মচারী। তুমি এই জটিল-রহস্যের অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছ,—তুমি যাও, শীঘ্র যাও—যাহাতে ঐ দলিলগুলি হস্তগত করিতে পার, তাহার চেষ্টা করগে। ঐ দলিলে আমাদের রাজার ক্ষতি হইতে পারে,—তৎপরে যদি যথার্থই সে মৃত রাজার পত্নী হয়—আর তাহার নিকট সমস্ত দলিল থাকে, তবে সেই দলিলের মধ্যে আমার একখানা এরূপ দলিল আছে—যাহাতে আমার মহানিষ্ট সাধিত হইতে পারে। —যাও নিমকচাঁদ; সত্বর যাও—যে কোন উপায়েই হউক, দলিলগুলা হস্তগত করিতেই হইবে। দলিলগুলা লইতে পারিলে, তখন তাহা

পড়িয়া দেখা যাইবে—যদি রাণী হয়, আর ঐ ব্যক্তি বিজয়সিংহ হয় তবে বিজয়সিংহকে নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপরাধে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান যাইবে।

নিমক। স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া, এখানে আনিলে হয় না? স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া, খানাতল্লাসি দ্বারা উহার কাগজ পত্রাদি সমস্ত আনিলেই চলিতে পারে।

মন্ত্রী। না, সে পথে যাওয়া হইবে না। মণিপুরের সামন্তগণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হইয়া আছে,—তাহাদের হৃদয়ে রাজভক্তির লেশমাত্রও নাই। এই ব্যাপার লইয়া, একটা গোলযোগ বাধিতে পারে। অতএব তুমি ছলের দ্বারা ঐ দলিলগুলি হস্তগত করিতে চেষ্টা কর। তার জন্য যত টাকার দরকার হয়, লইয়া যাও।

নিমক। হাঁ—কিছু টাকার প্রয়োজন বটে।

মন্ত্রী। চল, তোমায় টাকা দেই গে,—খুব সাবধানে; তুমি চলিয়া যাও।

নিমক। অব্যাজে পুলিশের দ্বারায় কিষণজিকে গ্রেপ্তার করাইয়া কারারুদ্ধ করুন। তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিলে, কাযের অনেক সুবিধা হইবে।

মন্ত্রী। সে বিষয়ে আর বিলম্ব হইবে না।

তখন নিমকচাঁদ মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিয়া, বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী মহাশয় পুলিশের বড় কর্ত্তাকে আদেশ লিপি পাঠাইলেন,—"চাঁদসড়কের রত্নাকর ঠাকুরের পান্থনিবাসে মথুরা-জেলা নিবাসী কিষণজিকে অগোপে,—পত্র পাওয়া মাত্র বন্দী করিয়া কারাগারে রাখিবে। তাহার নামে অতি গুরুতর অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে। বিচারকালে সমস্তই প্রকাশ পাইবে।"

পুলিশের কর্ত্তা মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই সদল বলে চাঁদসড়ক অভিমুখে ছুটিলেন।

কিষণজি তখন স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া, ভোজনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন,—অনেকগুলি পুলিশ-পদাতিক লইয়া, পুলিশের বড় কর্ত্তা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বুঝিলেন,—কোন প্রকারে তাঁহার পরিচয় বোধ হয়, কেহ জানিতে পারিয়াছে।

কিষণজি প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনাদের কি মহাশয়!"

পুলিশ। আপনার নাম কি কিষণজি?

কিষণ। হাঁ—কেন?

পুলিশ। আপনার নিবাস কোথায়?

কিষণ। মথুরা জেলার কোন পল্লীগ্রামে।

পুলিশ। রাজাদেশে আপনি বন্দী।

কিষণ। ভাল—কিন্তু অপরাধ কি?

পুলিশ। অপরাধ গুরুতর—বিচারকালে অবগত হইতে পারিবেন।

কিষণ। ভালই—তাহাই হইবে।

তখন পুলিশ কিষণজির দুইহস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া কারাগার অভিমুখে চলিয়া গেল। দর্শকগণ সকলেই বলিল,—"কি সর্ব্বনাশ!"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাজপথে অধিক লোকের গমনাগমন নাই,—এই সময় সহকারী-সেনাপতি নিমকচাঁদ অতি দ্রুতপদে

চলিয়া নওয়াসড়কে দুলালীর বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া কি একটা চিন্তা করিলেন,—অবশেষে দরোজার নিকটে গিয়া দুলালীকে ডাক দিলেন।

দুলালী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমকচাঁদ মৃদু স্বরে তাহার নিকট কি বলিয়া দশটী রজতমুদ্রা প্রদান করিলেন। দুলালী টাকা কয়টী আচলের অগ্রভাগে উত্তম রূপে বন্ধন করিয়া, উপরে চলিয়া গেল। নিমকচাঁদ দরোজার নিকটেই দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

যে কক্ষে নৈশোৎসবের প্রভাতী কুসুমের ন্যায় দলিতা ও ম্লান-বিশুষ্কা রাণী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই কক্ষের দ্বারে গিয়া, দুলালী তাহাকে ডাকিল।

রাণী তখন "বৃন্দাবনলীলামৃত" পাঠ করিতেছিলেন। দুলালীর ডাকে যুক্ত দরোজা মুক্ত করিয়া বলিলেন,—"কি বলিতেছ?"

দুলালী। সে দিন যে ব্যক্তি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ পোষাক-পরা এক ব্যক্তি আজি আবার আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে,—বলিতেছে বিশেষ প্রয়োজন। এখনই দেখা করিবে।

রাণী। তিনিই কি?

দুলালী। ঠিক ঠাওর করিতে পারিলাম না। আমি ত আর সে দিন তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। তবে পোষাকটা সেইরূপ বটে।

রাণী। উপরে ডাকিয়া আন।

দুলালী চলিয়া গেল এবং অচিরাৎ নিমকচাঁদকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, রাণীর নিকটে পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

নিমকচাঁদকে রাণী ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নিমকচাঁদ বলিল,—"বিজয়সিংহ আমায় আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

রাণী। কেন?

নিমক। সামন্ত-সর্দ্দারগণ আগে দলিল ও অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিয়াছেন, সেই জন্য বিজয়সিংহ বলিয়া দিলেন—সে গুলি আপনার নিকট হইতে লইয়া যাইতে।

রাণী একটু চিন্তা করিলেন;—চিন্তা গাঢ়। সেই স্তিমিত-ম্লান সৌন্দর্য্যমাখা মুখখানিতে প্রতিভা ফুটিয়া ফুটিয়া নিবিয়া গেল। রাণী বলিলেন,—"তিনি কোন পত্রাদি দিয়াছেন কি?"

নিমক। না। পত্র এখন দিতে পারিবেন না। কারণ, তাঁহার নাম সহি করিয়া পত্র লিখিবার উপায় নাই।

রাণী। কিন্তু, তিনি কি বুঝিতে পারেন নাই—আমি যাহার তাহার হাতে সে সকল দিতে পারিব না।

নিমক। ততটা বোধ হয়, মনে করেন নাই। কিন্তু ঐ গুলি এখন না পাইলে কাযের বিশেষ ক্ষতি হইবে।

রাণী। কিন্তু কি করিব, তাঁহার কোন অভিজ্ঞান না পাইলে, ঐগুলি দেওয়া কি আমার কর্ত্তব্য?

নিমক। সে বিবেচনা আপনি করুন। তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন—আমি আসিয়াছি—যাহা বলিয়াছেন, বলিয়াছি। যদি ইচ্ছা হয়, আমার হাতে সে গুলি দিতে পারেন—না দেন, তাঁহাকে গিয়া তাহা জানাইব।

রাণী। দেখ, সে গুলি আমার এখানেও নাই। বিজয়সিংহ চলিয়া গেলে, আমি সে গুলি একটী বিশ্বস্ত লোকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছি—এ যায়গা ত নিরাপদ নহে। তুমি তাঁহার নিকট হইতে কোন

অভিজ্ঞান লইয়া আসিলেই, তোমাকে তাহা দেখান হইতে আনিয়া দিব।

নিমক। আমি তাঁহার স্বাক্ষর সম্বলিত পত্র চাহিয়াছিলাম, তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন,—বলিলেন, আমি নাম সহি করিয়া পত্র দিব না। কি জানি, কোথা দিয়া কি প্রকাশ পাইবে। তাঁহার অন্য কি অভিজ্ঞান আনিলে, আপনি প্রত্যয় করিতে পারিবেন?

রাণী। তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন,—তাহাই দিবেন। আমি আর সে সম্বন্ধে কি বলিয়া দিব?

নিমক। তাঁহার আঙ্গুলে যে হীরার আংটি আছে, আপনি তাহা দেখিয়াছেন কি?

রাণী। হাঁ, দেখিয়াছি।

নিমক। সেইটী আনিলে আপনি বোধ হয়, দলিলাদি আমায় বা অন্য যে কোন লোক আসুক, তাহার হাতে দিতে পারিবেন?

রাণী। হাঁ—তাহা পারিব। তুমি যেন তোমার হাতে সে গুলি এখনই না দেওয়াতে, তোমাকে অবিশ্বাস করিলাম, ভাবিয়া রাগ করিও না, মনে ভাবিয়া দেখ, আমি কর্ত্তব্য কাযই করিলাম,—বিশেষতঃ সে গুলি এখন আমার এখানে নাই।

নিমক। আপনি ভাল কাযই করিলেন,—এমনও ত হইতে পারে, যে অন্যলোকে জানিতে পারিয়া ছলনা করিয়া লইতে আসিয়াছে।

রাণী। আচ্ছা,—অভিজ্ঞান লইয়াই আসিও।

নিমকচাঁদ বিদায় হইলেন। নিম্নের তলে দুলালীর সাক্ষাৎ পাইয়া, তাহার হস্তে আরও দুইটী রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন,—শীঘ্রই তোমার হাতে, তোমার পুরস্কারস্বরূপে অনেকগুলি সুবর্ণমুদ্রা দিতে পারিব।"

দুলালী মুচ্‌কী হাসিয়া কৃতজ্ঞতার সুর চড়াইয়া বলিল,—"আমি আপনাদের খাইয়া মানুষ। তা কতদূর কি হল ?"

নিমক। আচ্ছা,—তুমি ঐ রমণীকে এই বাড়ী হইতে অন্যত্র বাহির হইতে দেখ কি ?

দুলালী। একবারও না।

নিমক। উহার নিকট কোন কাগজপত্র থাকিতে দেখিয়াছ কি ?

দুলালী। আপনি আসিবার দণ্ডচারেক আগে উঁহাকে কতক গুলি কাগজ বিছাইয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। বোধ হইল,—সেগুলি পড়িয়া পড়িয়া কি মিলাইতেছিল।

"খবরদার, কোন কথা যেন প্রকাশ না হয়।"—এই কথা বলিয়া নিমকচাঁদ রাস্তায় নামিয়া চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন,—মাগীটা কি সুচতুরা। কিছুতেই আমার নিকট দলিলগুলি দিল না। দুলালী বলিল, আমি যাইবার কিছুক্ষণ আগেই সে দলিল দেখিয়াছে—অথচ ঐ স্ত্রীলোকটী বলিল, তাহার কোন বিশ্বস্ত লোকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছে। দুলালী বলিল, ও এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোথাও যায় নাই। কিষণজি—বিজয়সিংহের হাতের আংটী কি করিয়া আনিতে পারিব! তাহা না আনিতে পারিলেও দলিলগুলা হস্তগত করা হইবে না। ভাল—এক কায করা যাক্ না কেন,—পুলিশ ডাকিয়া উহার ঘর হইতে সেগুলি বাহির করিয়া লই না কেন! আমাদিগের অনুরোধ বা কার্য্যে বাধা দিতে কে সাহসী হইবে? সহসা তাঁহার মনে পড়িল, মন্ত্রী মহাশয় সেরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি অতি দ্রুতপদে মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নিমকচাঁদকে দ্রুত আসিতে দেখিয়াই মন্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন, নিশ্চয়ই দলিলাদি সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে। নিমক আসিয়া পঁহুছিবামাত্র

মন্ত্রী মহাশয় তাহাকে লইয়া নিভৃত স্থলে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া উভয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল।

মন্ত্রী বলিলেন,—"কি হইল ?"

নিমকচাঁদ রক্তমুখে বলিল,—"ঠিক, - ঠিক্—কিষণজি—বিজয়সিংহ।"

মন্ত্রী। কোন্ বিজয়সিংহ ?

নিমক। বোধ হয়—সেই শানদেশের সেনাপতি বিজয়সিংহ।

মন্ত্রী। এখনও বোধ হয় !

নিমক। ঐ সম্বন্ধে আমি কোন কথাই পাড়ি নাই। মাগীটা ভারি চতুরা। কি জানি, কোন কথায় যদি ধরা পড়িয়া যাই।

মন্ত্রী। তা বুদ্ধিমানের কাযই করিয়াছ। দলিলের কি ?

নিমক। দলিল তাহার কাছে আছে।

মন্ত্রী। পাইলে না ?

নিমক। না। আমি বলিলাম—বিজয়সিংহ দলিল লইতে আমাকে পাঠাইয়াছে। কিন্তু সে, বিজয়সিংহের পত্র বা অভিজ্ঞান চাহিল। আমি দিতে না পারায়, কাযেই দলিলাদিও পাইলাম না। মাগীটা এমনই চালাক—যদি বল প্রকাশই করি, এই ভয়ে ঘরে দলিল থাকিতেও বলিল,—তাহা এখানে নাই ত, নিরাপদ স্থান নহে বলিয়া, সেগুলি কোন বিশ্বস্ত লোকের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছি।

মন্ত্রী। তবেই গোল হইয়া গিয়াছে।

নিমক। কেন ?

মন্ত্রী। তুমি আসিলে তখনই সে দলিল সে স্থানান্তর করিয়াছে। তাহার মনে অবশ্যই ভয় হইয়াছে। সেই সময় পুলিশ ডাকিয়া জোর করিয়া আনিলেই পারিতে।

নিমক। গোল হইবে বলিয়া, আপনার নিষেধ ছিল।

মন্ত্রী। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা কি না।

নিমক। এখন যাইব?

মন্ত্রী। এখন আর পাইবে না। তুমি বাহির হইবামাত্র সে দলিলগুলি নিশ্চয়ই স্থানান্তরিত করিয়াছে। দলিলগুলার জন্য আমার বড় উদ্বেগ হইয়াছে। বিশেষতঃ দলিলগুলা পাইলে তবে উহাদের ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নিমক। এক্ষণে দলিলপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় আছে।

মন্ত্রী। কি?

নিমক। কিষণজির হাতের হীরার আংটি লইয়া যাইতে পারিলে তবে দলিল পাওয়া যাইবে।

মন্ত্রী। কিষণজি বন্দী হইয়া কারাগারে আসিয়াছে।

নিমক। (সহাস্যে) কিষণজি বন্দী হইয়াছে? ভালই হইয়াছে—এক্ষণে স্বচ্ছন্দেই হীরার আংটি লাভ করা যাইতে পারিবে।

মন্ত্রী। কি করিয়া?

নিমক। পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের বিষদন্তও লওয়া যায়।

মন্ত্রী। না, না,—যতক্ষণ তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া না যাইতেছে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন প্রকার বল প্রকাশ করা যাইবে না। কিষণজি যদি যথার্থ ই বিজয়সিংহ না হইয়া—পশ্চিমদেশীয় বা বঙ্গদেশীয় লোক হয়, তবে বাদসাহের কর্ত্তা সন্ধি অনুসারে তাহার উপরে অকারণ-অত্যাচার হইলে, তাহার বিষফল ভোগ করিতে হইবে।

নিমক। ভাল, কৌশল;—কৌশলে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মন্ত্রী। কিন্তু অবিলম্বে—বিলম্ব হইলে বা ঐ চতুরা রমণী বিজয়-সিংহের জেলের কথা শুনিলে, আর কিছুতেই দলিল বাহির করিবে

না। দেখ, নিমকচাঁদ ; যদি তুমি ঐ দলিল গুলি আনিয়া আমাকে দিতে পার—আমি তোমাকে বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।

নিমক। অধীনের চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটী হইবে না।

মন্ত্রী। এইবারে তোমার বুদ্ধি ও কৌশলের উপর আমি নির্ভর করিয়া থাকিব—যদি কার্য্যের সুশৃঙ্খলা করিতে পার, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বড় লোক করিয়া দিব।

নিমক। আপনি ইচ্ছা করিলে, পথের ভিখারীকে লক্ষপতি করিতে পারেন। এক্ষণে আমার একটী প্রার্থনা।

মন্ত্রী। কি বল ?

নিমক। অনুগ্রহ করিয়া আপনার সহী ও মোহরযুক্ত একখানি আদেশলিপি কারাধ্যক্ষের নামে আমার হাতে দিন। ঐ আদেশপত্রে লিখিয়া দিন, তিনি যেন কিষণজির উপরে বিশেষ কঠোর দৃষ্টি রাখেন,—আর আমার নামে লিখিয়া দিন,—সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদ কিষণজির সম্বন্ধে যখন যাহা করিতে বলিবে—তখনই তাহা করিবে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবে না। কিষণজির উপরে ইহার অক্ষুণ্ণ প্রভুত্ব থাকিবে—ইনি কিষণজিকে যখন যেভাবে রাখিতে বলিবেন, তখনই সেই ভাবে রাখিবে। কদাচ যেন তাহার অন্যথা না হয়।

মন্ত্রী। এরূপ পত্র লইয়া তুমি কি করিবে ?

নিমক। আমি কিষণজির নিকটে ঐ অঙ্গুরীয়ক লইবার চেষ্টা করিব

মন্ত্রী অধিক আর কিছু চিন্তা না করিয়া, ঐরূপ একখানি পত্র লেখাইয়া, তাহাতে সহী ও মোহর অঙ্কিত করিয়া নিমকচাঁদের হস্তে প্রদান করিলেন। নিমকচাঁদ বিদায় হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মণিপুরের সুবৃহৎ কারাদুর্গমধ্যে বিজয়সিংহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। দুর্গদ্বার দৃঢ় ও শত শত প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত।

শরতের মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্র, ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তপ্ত শ্বাস বহাইয়া দিতেছে। শ্যামা ডাকিয়া ডাকিয়া মরজগতে শরতের আগমন ঘোষণা করিতেছে।

বন্দী বিজয়সিংহ একখানা টুলের উপরে বসিয়া শরতের মেঘ-বিমুক্ত দ্বিপ্রহরের স্বচ্ছ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মুখভাব অত্যন্ত গম্ভীর। চক্ষু-তারা স্থির—বিস্ফারিত। পায়ের লৌহ-শৃঙ্খল পদচালনায় এক এক বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া শব্দ করিতেছিল।

এমন সময় জেল-দারোগা কৈফাসিং ধীরে ধীরে আসিয়া, বিজয়-সিংহের নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৈফাসিং আগে মণিপুরী সৈন্যদলে একজন সেনা ছিলেন,—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। দয়া ধর্ম্ম কাহাকে বলে, কৈফাসিং তাহা জানেন না;—চেহারা অত্যন্ত কঠোর-কর্কশ। ইনি কাহারও নিকটে উপঢৌকন গ্রহণ করেন না। আবশ্যকীয় কথা ভিন্ন বাজে কথায় কর্ণপাত করেন না।

কৈফাসিং বলিলেন,—"মহাশয় কেমন আছেন?"

বিজয়সিংহ মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মন্দ নহে।"

অস্বাভাবিক উত্তরে, ঐ কথাকে ব্যঙ্গ ভাবিয়াই জেলদারোগা কৈফাসিং বলিলেন,—"দেখ চোর ডাকাত গুলা কারাগারের কঠোর শাসনের মধ্যে আসিয়াও তাহার উদ্ধত স্বভাব পরিবর্ত্তন করে না।"

গম্ভীর মুখে বিজয়সিংহ বলিলেন,—"কোন্ আদর্শে তাহাদের স্বভাবের

পরিবর্ত্তন হইবে? দয়া, মায়া, সন্নীতি, প্রেম-ভক্তি তাহারা কাহাদের নিকটে শিক্ষা করিবে? এখানকার প্রভু ও আদর্শ ত তোমরা!"

জেলদারোগার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বলিলেন,—"তুমি বন্দী, তাহা স্মরণ আছে?"

বিজয়। পায়ে এত গুলা লোহার শিকল জড়ান থাকিতেও তাহা ভুলিয়া যাইব।

জেল-দা। কাহার সহিত কথা কহিতেছ, তাহা বুঝিতেছ?

বিজয়। মণিপুর জেলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত।

জেল-দা। তুমি আমাকে অপমানের কথা বলিয়াছ।

বিজয়। দু ঘা চাবুক বসাইয়া দাও আমি ত এখন বন্দী—মারিতে কে বাধা দিবে?

জেল-দা। তোমাকে একটু সংবাদ বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার ব্যবহারে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি।

বিজয়। আমার দুর্ভাগ্য।

জেল-দা। খবরটা শুনিতে প্রস্তুত আছ?

বিজয়। চাবুক লাগাইলে পিঠ পাতিয়া দিতে প্রস্তুত আছি, খবর শোনা ত ভাল কথা!

জেল-দা। একটী ভদ্রলোক গোপনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

বিজয়। তুমি হয় ত কি শুনিতে কি শুনিয়াছ। কোন কক্ষে হয় ত কোন রমণী আবদ্ধা আছে—ঐ ভদ্রলোক হয় ত তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।

জেল-দা। না,—আমার ভুল হয় নাই। সেই ভদ্রলোক আমাকে অনেক টাকা ঘুস দিয়াছে।

বিজয়। তোমার সুপ্রভাত! লোকটা কে?

জেল-দা। আমি চিনি না!

বিজয়। একবারেই না!

জেল-দা। না।

বিজয়। আমি একথা শুনি না—তুমি দেশের কাহাকে না চেন?

জেল-দা। তিনি নাম বলিতে বারণ করিয়াছিলেন বলিয়া নাম করি নাই—সহকারী-সেনাপতি—নিমকচাঁদ।

নিমকচাঁদ নাম শুনিয়া বিজয়সিংহ মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত সে যথার্থই বন্ধুর কায করিতেছে। সে আমার জন্য হয় ত কোন প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছে! লোকটা অন্য বিষয়ে যেমনই হউক, এ বিষয়েতে অতি ভদ্র দেখিতে পাইতেছি।

বিজয়সিংহ নিমকচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকার করিলেন।

জেলদারোগা চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিমকচাঁদ আসিয়া বিজয়সিংহের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

নিমকচাঁদ মুখখানা অত্যন্ত ভার করিয়া, চক্ষু দুইটী স্থির করিয়া, বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বন্ধু; তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, তোমাকে একেবারে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছে?"

বিজয়সিংহের গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর হইল। নিমকচাঁদের বন্ধুত্ব ও অমায়িকতা স্মরণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"বিদেশে আপনার মত বন্ধু অতি অল্পই মিলিয়া থাকে,—সে জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করি। যাক্ সে কথা,—কিন্তু কি জন্য এবং কেন যে আমি বন্দী হইয়াছি, তাহা আমিও এখনও জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ বিচারের দিন সমস্তই প্রকাশ পাইবে। আপনি কি কিছু শুনিতে পান নাই?"

নিমক। না, বন্ধু?—আমি সে সম্বন্ধে কিছুই শুনি নাই। কেবল আপনার বন্দী হইবার কথাই শুনিয়াছি। আর থাকিতে পারিলাম না,—যাহাতে কারাগার-মধ্যে আপনার কোন প্রকার কষ্ট না হয়,—কঠোর-হৃদয় কারাধ্যক্ষ যাহাতে আপনার উপরে নির্দ্দয় ব্যবহার না করে,—তজ্জন্য অনেক অর্থব্যয় করিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আর কারাধ্যক্ষকেও বশীভূত করিয়াছি।

বিজয়। আপনার ঋণ অপরিশোধ্য।

নিমক। একটা কায করিতে হইবে।

বিজয়। কি কায?

নিমক। আমাদের বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতি পরিষ্কার নহে,—অত্যন্ত জটিল ও বক্র। জানি না, আপনি কোন্ জটিল রহস্যের চক্র-জালে পতিত হইয়াছেন। তবে আমি বিশেষ যত্নে সেই চক্র-জাল বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিব। আপনার সহিত আমার যে, এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে,—তাহা বর্ত্তমানে কাহাকেও জানিতে দেওয়া হইবে না। আমার প্রেরিত কোন লোক আসিয়া, আপনাকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবে,—তাহা অকপটে তাহার নিকট বলিয়া দিবেন। আমি প্রাণপণে আপনার কার্য্য করিব।

বিজয়। কিন্তু আপনার লোক আসিতে আসিতে শত্রুপক্ষ যদি তাহা অবগত হইয়া, আপনার লোকের ভাণ করিয়া আসিয়া, ছলনা দ্বারা আমার কোন কথা জানিয়া যায়।

নিমক। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, ঠিক অনুমান করিয়াছেন। তাহার এক উপায় আছে।

বিজয়। কি?

নিমক। আমার হাতের এই মূল্যবান্ আংটিটী আপনি রাখুন—

আপনার কোন প্রয়োজন হইলে, এই আংটিটী দিয়া লোক পাঠাইবেন; আমি তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপনার কথা ইহা স্থির করিতে পারিব।

বিজয়। ভাল,—তাহাই হউক। আপনিও আমার হাতের একটা আংটি লইয়া যান।

নিমক। হাঁ,—তাহা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য ঐ উজ্জ্বল হীরা বসান আংটিটী দিন।

বিজয়। অন্য একটা লইয়া যান—ওটী ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত। আমার বিবাহের যৌতুক।

নিমক। যাহা অভিজ্ঞান থাকিবে—তাহা অনন্তসাধারণ হওয়া প্রয়োজন।

বিজয়। কিন্তু বিবাহের যৌতুক বলিয়া ওটী দিতে মনে যেন দ্বিধা হইতেছে।

নিমক। বন্ধু? আমার নিকট কোন প্রকার দ্বিধা করিও না।

বিজয়সিংহ ভাবিলেন, এরূপ হিতৈষী বন্ধুর প্রার্থিতবস্তু—সামান্য একটী অঙ্গুরী—উহার হাতে না দিলে, নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। বিজয়সিংহ নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া নিমকচাঁদের হস্তে প্রদান করিলেন।

আরও নানা কথা,—নানা ছল করিয়া বিজয়সিংহকে বন্ধুত্ব ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিমকচাঁদ বিদায় হইলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজয়সিংহ বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

নিমকচাঁদ আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কোন দিকে চাহিলেন না—অশমিত নিশ্বাসে অতি দ্রুতপদে একেবারে নওয়াসড়কে দুলালী-পটোহীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। দরজায় দাঁড়াইয়া দুলালীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আমি সেই স্ত্রীলোকটীর সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

দুলালী উপরে চলিয়া গেল, এবং সত্বরেই আসিয়া সংবাদ দিল,—"হাঁ, আপনি উপরে আসুন।"

নিমকচাঁদ উপরে উঠিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

নিমক। দলিলগুলি আনাইয়া রাখিয়াছেন কি ? এখনই সেগুলির বিশেষ প্রয়োজন। আমি তাঁহার হাতের হীরকাঙ্গুরী আনিয়াছি।

রাণী। দেখি ?

নিমকচাঁদ অঙ্গুরী দেখাইলেন। রাণী আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পার্শ্বের বাক্স খুলিয়া, একতাড়া দলিল ও তিন খানি মুদ্রা এবং একটী অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দিলেন।

নিমকচাঁদ স্পন্দিত-হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে নিমকচাঁদ ভাবিলেন, এগুলি লইয়া এখন কোথায় যাই! যদি একেবারে—এখনই গিয়া ইহা মন্ত্রী মহাশয়ের হস্তে প্রদান করি,—আর তিনি যদি আমাকে এক পয়সাও না দেন,—মন্ত্রী, লোকটা কিছু সহজ নহে। বিশেষতঃ এ দলিলগুলি কিসের—ইহাতে কি আছে—এই দলিল ও অভিজ্ঞানগুলির বলে, আমার কতদূর ও ও কিপ্রকার স্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে,—এগুলি মন্ত্রীমহাশয়ের কতদূর প্রয়োজনীয়—এগুলির দাবিতে তাঁহার নিকটে কত অর্থ আদায় করা সম্ভব—সেগুলি বিচার না করিয়া, কখনই তাঁহাকে অর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে।—এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিমকচাঁদ মন্ত্রী মহাশয়ের নিকটে না গিয়া ঐ সমস্ত লইয়া নিজের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

একটা নিভৃত গৃহ মধ্যে বসিয়া, নিমকচাঁদ দলিলগুলি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক খানি পাঠ করিতে করিতে তিনি চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। সকলগুলি রাজ-পরিবারের দলিল,—সকলগুলিই

রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপারের কাগজপত্র। তৎপরে মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণের লিখিত তিন খানি পত্র দেখিতে পাইয়া, নিমকচাঁদ শিহরিয়া উঠিলেন। ঐ তিন খানি পত্র চিরঞ্জীব বর্ম্মণ ব্রহ্মদেশের রাজাকে পর পর লিখিয়াছে,—বর্ত্তমান মণিপুরাধিপতি গরীব-নেওয়াজের বিরুদ্ধে ব্রহ্মরাজকে উত্তেজনা করিয়া যুদ্ধার্থে আহ্বান করা হইয়াছে। আরও একখানি দলিল পাওয়া গেল,—সে অনেক দিনের; কাগজখানা জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—মণিপুরের পূর্ব্ব রাজার বিরুদ্ধে চিরঞ্জীব-বর্ম্মণ, যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়া নাগা ও ব্রহ্ম-বাসিগণকে উত্তেজনা করিয়া,—যুদ্ধার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহাই লেখা ছিল। আর মুদ্রা ও অঙ্গুরীয়কগুলিতে রাজকীয় চিহ্ন দেখিতে পাইলেন মাত্র,—কিন্তু নিমকচাঁদ তাহার কোন অর্থগ্রহণ করিতে পারিলেন না। যাহাহউক, নিমকচাঁদ বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—আর আমায় পায় কে? ইচ্ছা করিলে, এই দলিলের বলে আমি মন্ত্রীকে এখনই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে নিজে মন্ত্রী হইতে পারি। আর বিজয়সিংহ যে ষড়যন্ত্রকারী গুপ্তচর—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মাগী বোধ হইতেছে,—পূর্ব্ব রাজার একটা রাণী। নতুবা এ' সকল হস্তগত করিল কি প্রকারে? যাহা হউক, এ সমুদয়ই আমার সুখের জন্য ভগবান একত্রে—একস্থানে মিলাইয়া দিয়াছেন।

নিমকচাঁদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল! দলিলগুলি অতি যত্নে একটা লৌহ-সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া, বেশ-বিন্যাসে মনঃসংযোগ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া বেশ-বিন্যাসাদি করিয়া, আমোদ-উপভোগ জন্য পান্থশালাভিমুখে গমন করিলেন—এমন স্ফূর্ত্তির দিনে, এমন আনন্দের দিনে, এমন ভাগ্য পরিবর্ত্তনের দিনে যদি দুই এক কলসী মদ্য না উড়িল,—সুন্দরী রমণীগণের নৃত্য-গীত দর্শন করা না হইল,—তবে আর হইল কি?

চাঁদসড়কের রত্নাকরঠাকুরের পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া, নিমকচাঁদ বলিলেন,—"ঠাকুর ; আজি একটু ভাল করিয়া আমোদ করিতে হইবে।"

রত্না। বেশ,—আজি আমার সৌভাগ্য !

নিমক। ভাল আসরের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

রত্না। আমাকে যেমন বলিবেন, তেমনই করিয়া দিব।

নিমক। এয়ারের দল, আজি এখনও আসে নাই কেন ?

রত্না। কেবল হেমচাঁদসিংহ আসিয়াছেন ?

নিমক। কৈ, সে কোথায় গেল ?

রত্না। ঠিক সন্ধ্যার সময় একজন ভদ্র পথিক এখানে আসিয়া, ঐ পাশের কক্ষে আশ্রয় লইয়াছেন। হেমচাঁদসিংহ তাঁহারই সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

নিমক। ভদ্র পথিক ?—কে আবার ভদ্র পথিক ? এই স্থানে ডাক দাও না। খোলা প্রাণে আলাপ করা যাক্।

এই সময়ে আরও চারি পাঁচ জন ভদ্রলোক আসিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া, নিমকচাঁদ অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আরে, এস হে ; তোমরা এত বিলম্বে আইস কেন ? এতক্ষণ যে, তুশো রগড় হয়ে যেত ?"

আগন্তুকগণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কায কর্ম্ম সারিয়া তবে ত আসিতে হয়। বাবা, তোমার মত ত আর হাওয়া খাওয়ার চাকুরী নহে।

নিমকচাঁদ হাঁসিয়া বলিলেন,—"আমার চাকুরী হাওয়া খাওয়ারই বটে ! রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল গুপ্ত ও কঠোর কায আমাকে দেখিতে হয়, তোমরা হ'লে পারই না। আর যখন লড়াই বাঁধে—তখন ত জানের খবর !"

রত্নাকরঠাকুর তাঁহাদের অনুজ্ঞামতে সেখানে উত্তম মদ্য ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফল মূল প্রদান করিবার জন্য পারচারকগণকে আদেশ করিলেন। তাহারা আজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

রত্নাকরঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া নিমকচাঁদ বলিলেন—"কৈ, হেমা বেটা কোথায় গেল?—বিদেশীর সনে এত প্রেম,—বাবা, "প্রেম কর না বিদেশীর সনে।" ডাক তাকে। "না হয়, বিদেশী পথিককেও সঙ্গে করে আস্তে বল।"

রত্নাকরের প্রমুখাৎ নিমকচাঁদের আহ্বান শ্রুত হইয়া, হেমচাঁদসিংহ পথিককে বলিলেন,—চলুন না মহাশয়! ওখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়াছেন,—তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিবেন।"

পথিক হেমচাঁদের সহিত সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, যেখানে নিমকচাঁদ প্রভৃতি সুস্বাদু-ফল মূল ও পাত্র মধ্যস্থ বারুণী লইয়া বসিয়া পূর্ব্ব রাগের অভিনয় করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতির উপভোগের পূর্ব্বে একটা উচ্ছ্বাস জন্মিয়া থাকে—আর মত্ততায়, বারুণী-সেবনের পূর্ব্বে তাহারও একটা মত্ততা জন্মিয়া থাকে। একটা পূর্ব্বরাগের উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে।

পথিকের সুপুষ্ট সুগোল দেহ, সুন্দর বর্ণ, সুন্দর মুখভাব দর্শন করিয়া তথা-সন্নিবেশিত ব্যক্তিবর্গ ভাবিলেন, লোকটা ভদ্র এবং ধনীর সন্তান হইতে পারে, এবং দেহের ভাব দেখিয়া বোধ হয়, লোকটা খুব বারও বটে!

নিমকচাঁদ পথিকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"মহাশয়ের নিবাস?"

পথিক। বঙ্গদেশ।

নিমক। মদ-টদ খাওয়া হয় ত?

পথিক। না, মহাশয় ;—আমি মদ খাই না।

নিমক। বাঙ্গালী মাত্রেই জুয়াচোর। যে মদ খায় না—সেই জুয়াচোর।

নিমকচাঁদের এরূপ অভদ্র কথাতে হেমচাঁদ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"মদ না খাইলেই কি জুয়াচোর হয়?"

নিমক। নিশ্চয় হয়.—সে হয়, তার বাপ হয়।

হেম। ভদ্রলোকের সহিত প্রথম আলাপে তোমার ওরূপ ভাবে কথা বলা উচিত হয় নাই।

নিমক। কে ভদ্র,—কে অভদ্র, তাহা জানিব কেমন করিয়া বাবা? এই যে, সে দিন কিষণজি একজন মস্ত ভদ্রলোক সাজিয়া,—এই পান্থ-নিবাসে আসিয়াছিল। এখন বেটা জেলে,—জেলে পচিতেছে। আর এই ভদ্রলোক, কাল যে ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া, গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইবেন না, তাহাই বা কে বলিতে পারে! বাবা;—যেরূপ চোখের চাহনি দেখ্‌চি—ও ডাকাত না হইয়া কিছুতেই যায় না!

হেমচাঁদ এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ পথিকের মুখের দিকে চাহিলেন। ভাবিলেন, যুবক বীরপুরুষ—এখনই ইহার প্রতিশোধ লইবেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, পথিক সেরূপ কিছু না করিয়া, অঙ্গাবরণীর মধ্য হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কি লিখিয়া রাখিলেন। তখন সকলে মনে করিলেন, বিদেশ বলিয়া পথিক রাগ সহ্য করিয়া গেলেন।

হেমচাঁদ, নিমকচাঁদকে বলিলেন,—"থাক্ ভাই; উনি ভদ্রলোক, উঁহাকে আর অপমানের কথা বলিও না! তাহাতে আমাদেরই অভদ্রতা প্রকাশ পায়;—কারণ, বিদেশী ভদ্রলোককে সম্মান ও যত্ন করাই ভদ্রলোকের কায! আমরা মদ্যপানে আমোদ করি।"

অপর একজন নিমকচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিষণজির কি হইল ভাই ?"

নিমকচাঁদ গম্ভীর মুখে বলিলেন,—"সে গুহ্য কথা। এখন শুনিতে পাইবে না। তবে তুমি বন্ধুলোক—যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তখন এই পর্য্যন্ত এখন শুনিয়া রাখ যে—সে বেটা নচ্ছার—পাজী, ষড়যন্ত্রকারী দস্যু ! সত্বরেই তাহার ফাঁসি হইবে। আমরা তাহার আসল নামাদি সমস্তই জানিয়াছি।"

হেমচাঁদ বলিল,—"ভাই, তোমার হাতে যে, ঐ হীরার আংটীটা দেখিতেছি—উহা কিষণজির হাতে দেখিয়াছিলাম না ?"

নিমক। নিশ্চয়ই। এই আংটীটা লইতে আমাকে কত ছলনা, কত ভাল মানুষী যে করিতে হইয়াছিল—সেই দস্যুর সহিত বন্ধুর ভাণ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তারপর বাবা, আমাদের কাছে চালাকী, কার্য্য হাসিল করিয়া লইলাম।

হেম। কেন, ঐ আংটীতে কি হইল ?

নিমক। ইহা দ্বারা যাহা হইয়াছে—তাহাতে মণিপুর রাজ্যে একটী ওতপ্রোত হইয়া যাইবে। এই আংটীর দ্বারা যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি—তদ্দ্বারা আমি ইচ্ছা করিলে, মন্ত্রীকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইতে পারি—রাজসিংহাসন টলাইতে পারি।

পথিকের মুখ শুষ্ক হইল। বুকের ভিতর পড়িয়া হৃদ্পিণ্ডটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া পড়িল।

হেম। একটু আভাসে শুনিতে পাই না ?

নিমক। বাবা ;—সে অতি ভয়ানক কথা। তবে নিশ্চয় জানিও, তোমাদের বন্ধু নিমকচাঁদ যে সে লোক নহেন। শীঘ্রই তোমাদের বন্ধু একজন অতি গণ্যমান্য লোক হইবেন।

হেম। তবে মদ খাওয়া যাক্।

নিমক। এই পথিক পশুটা—যে নেশা ভাঙ্ না করে, সে পশু বই আর কি! এটা কি নিরামিষ্যি হইয়া এই স্থানে বসিয়া থাকিবে?

হেমচাঁদ প্রভৃতি সকলেই পথিকের দিকে চাহিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন,—এবার কখনই পথিক সহ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা সকলে দেখিলেন, পথিক সেই কাগজ খানায় আবার কি লিখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তখন তাঁহারা ভাবিলেন,—লোকটা নিতান্ত কাপুরুষ। নতুবা কোন ব্যক্তিই এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারে না।

নিমকচাঁদকে সম্বোধন করিয়া সকলেই বলিলেন, "ভাই; লোকটা নিতান্ত গো বেচারা; কেন আর উহাকে অপমান কর। এস, আমরা মদ খাই—উনি বসিয়া থাকেন—থাকুন।"

নিমক। অমন কাপুরুষ, মণিপুরের সহকারী সেনাপতির আসনে বসিয়া থাকিলে অপমান হয়।

পথিক সেই কাগজ খানিতে এবারও কি লিখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কাগজ খানি হেমচাঁদের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই কাগজ খানি আপনারা রাখুন, এখন পড়িবেন না। সময় হইলে পড়িয়া দেখিবেন।"

তৎপরে রোষ-কষায়িতলোচনে নিমকচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মূঢ়! ভদ্রতা কাহাকে বলে, তাহা কিছুমাত্র শিক্ষা কর নাই। জুয়াচুরি ও প্রতারণা করিয়া যে কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছ, অচিরেই তাহার প্রতিফল পাইবে। এক্ষণে আমাকে যে কথা বলিয়াছ, তাহার শান্তির জন্য, আমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

নিমকচাঁদ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি, বাবা,—কাহার সহিত কথা কহিতেছ—ভাবিয়া দেখলে না। এ ত নিদ্রাগত গৃহস্থ

নহে যে, তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া, একটা খোঁচা মারিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিবে ?"

পথিক ঘূর্ণিতলোচনে বলিলেন,—"আমি তোমাকে চিনি তুমি মনিপুরের অকর্ম্মণ্য সেনাদলের রিপুদাস ও অকর্ম্মণ্য এবং নগণ্য একজন সেনাপতি। আর সেই পদ চিরঞ্জীববর্ম্মণকে সুন্দরী স্ত্রীলোক যোগাইয়াই লাভ করিয়াছ।"

নিমকচাঁদ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"বিদেশী কুকুর ; আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

পথিক। তাহাই হউক—এই স্থান ও এই ভদ্র লোকগণ বিচারক হউন।

যে স্থান সুরাপানের মত্ততাময় আনন্দোপভোগের জন্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল,—যে স্থান সুন্দরী বার-বিলাসিনীগণের লোধ্ররাগ-রঞ্জিত, নূপুরসিঞ্জিত চরণের ধূলায় পবিত্রীকৃত ও কোমল কণ্ঠস্বরের মধুরায়িত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল,—সেই স্থানে দুইটী বীরপুরুষ দুইখানি তরবারি হস্তে করিয়া, বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। গৃহস্বামী প্রমোদশয্যা তুলিয়া লইয়া গেলেন। সাক্ষী ও বিচারস্বরূপে ভদ্রলোকগণ দণ্ডায়মান থাকিল।

নিমকচাঁদ ও পথিক, তরবারি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খেলিতে লাগিলেন। প্রজ্জ্বলিত উজ্জ্বল আলোকে তীক্ষ্ণধার তরবারি দুইখানি ঝলসিয়া উঠিতে লাগিল। নিমকচাঁদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি কৌশলপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া, নিমকচাঁদের বাম হস্তে তরবারির আঘাত করিলেন,—কিন্তু সে আঘাত সাংঘাতিক হইল না। ভুজঙ্গের অঙ্গে অল্পাঘাত হইলে, সে যেমন ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠে, নিমকচাঁদও তদ্রূপ গর্জ্জিয়া উঠিয়া পথিককে আক্রমণ করিল,—কিন্তু পথিক অবহেলায়

তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য রণ-কৌশলে নিমকচাঁদের বাম স্কন্ধে পুনরায় আর একটী ক্ষুদ্র আঘাত করিলেন। এই সময় পথিক যুদ্ধ-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, দর্শকবৃন্দকে স্পষ্ট দেখাইলেন যে, তিনি নিমকচাঁদকে আরও তিন চারিটী আঘাত করিতে পারিতেন;—এমন কি ইচ্ছা করিলে, নিমকচাঁদকে সেই সময়ে তাঁহার ক্ষুরধার তরবারিতে বলি দিতেও পারিতেন, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিয়াই, তাহা করিলেন না। নিমকচাঁদের বাম হস্ত দিয়া দরদরিত ধারে রক্তধারা বহিতেছে,—এবং তিনি পথিককে একটী আঘাতও করিতে পারিতেছেন্ না, এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত অভিমান হইল,—সেই অভিমানের আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া, তিনি আপন শক্তি সমস্ত সঞ্চয় করিয়া,—ক্রোধোজ্জ্বলিত হইয়া পথিকের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব শিক্ষার বলে বিদ্যুদ্বেগে নিমকচাঁদের সে উদ্যম ব্যর্থ করিয়া বীর পথিক, বিদ্যুদ্বেগে নিজ তরবারি ঘুরাইয়া, অসাধারণ দক্ষতা ও অসামান্য বাহুবল প্রদর্শন করিয়া, নিমকচাঁদের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিলেন। ঝন্ ঝন্ করিয়া নিমকচাঁদের দক্ষিণ হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল, এবং স্বয়ং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া একজন দর্শকের বাহুপরি পতিত হইলেন। পথিক বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা তরবারি মুছিয়া কোষমধ্যে রাখিয়া দিলেন। নিমকচাঁদের জন্য তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক আনান হইল। চিকিৎসক আসিয়া, ক্ষতমুখে ঔষধ দিয়া রক্তস্রাব রহিত করিলেন ও নিমকচাঁদকে অনেক খানি মদ্যপান করাইয়া শয্যাগ্রহণ করান হইল।

সমবেত ভদ্রলোকগণ পথিককে একবাক্যে বলিলেন,—"মহাশয়; আপনি ইচ্ছা করিলে সহজেই নিমকচাঁদকে সাংঘাতিক আঘাত করিতে পারিতেন।"

পথিক মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"আমি যে কাগজ খানি

লিখিয়া, পূর্ব্বে আপনাদের নিকটে দিয়াছিলাম—সে খানা পাঠ করিয়া দেখুন"।

হেমচাঁদ সে কাগজখানা বাহির করিয়া বড় বড় করিয়া পাঠ করিলেন, —"আমাকে নিমকচাঁদ যে সকল অপমানের কথা বলিয়াছে, আমি সামান্য প্রকারে তাহার প্রতিশোধ লইব। নরহত্যা আমার অভিপ্রেত নহে। প্রথম অপমানের শাস্তিস্বরূপ আমি উহার বাম হস্তে আঘাত করিব।—দ্বিতীয় অপমানের জন্য আমি উহার বাম স্কন্ধে আঘাত করিব। —তৃতীয় অপমানের জন্য উহার দক্ষিণ হস্তে জোরে একটী আঘাত করিব। কিন্তু প্রাণে মারিব না।"

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রতিদ্বন্দ্বীকে যাহা করিবেন, তাহা লিখিয়া রাখিয়া সেইরূপ করা—কি অদ্ভুত ও অলৌকিক শক্তির কার্য্য! পথিকের বীরত্ব দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

পথিক, পান্থশালার অধিস্বামীর নিকট, ফল ও জল চাহিয়া লইয়া, তাহা সেবন করিয়া তাহার হস্তে একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতঃ তথা হইতে চলিয়া গেলেন। পান্থশালার সমুদয় লোকই সে দিন পথিকের বীরত্বের অদ্ভুত শক্তির বিষয়ই আন্দোলন-আলোচনা ও গল্প করিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পান্থশালা হইতে বহির্গত হইয়া, নৈশ অন্ধকারের নিস্তব্ধ পথ বহিয়া, পথিক নওয়া-সড়কের দুলালী পটোহীর বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাত্রি অনেক হওয়ায়, তখন দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পথিক উচ্চৈঃস্বরে গৃহাধিস্বামিনীর নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ডাকা-ডাকির পর, একজন পরিচারিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল,—"কাহাকে খুঁজিতেছ?"

পথিক। তোমাদের বাড়ী যে স্ত্রীলোকটী আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পরি। তাঁহার বেশভূষা সামান্য—কিন্তু এত লোকের সঙ্গেও তাঁহার আলাপ পরিচয়। লোকের যেন গাঁদি লেগেছে।

পথিক। তুমি অনুমতি লইয়া আইস।

পরিচারিকা চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আসুন, মহাশয়; উপরে আসুন।"

পথিক উপরে উঠিয়া যে গৃহে রাণী বাস করিতেছিলেন, তাহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী তখনও নিদ্রা যান নাই—শয্যা গ্রহণও করেন নাই। তুলসীর মালা লইয়া ইষ্টনাম জপ করিতেছিলেন। গৃহস্থিত ক্ষীণ আলোক—তাঁহার সেই বৈধব্য-বিক্লিষ্ট ম্লান সৌন্দর্য্য সমস্ত গৃহখানিতে ছড়াইয়া দিতেছিল।

পথিককে দেখিয়া রাণী চমকিয়া উঠিলেন। পথিক, চমকাইবার কারণ বুঝিয়া, গৃহার্গল ভেজাইয়া দিয়া, মুখপ্রলম্বিত কৃত্রিম দাড়ি ও মস্তকের কৃত্রিম লম্বা চুল বিছানার উপরে রাখিয়া বলিলেন—"মা দলিলগুলি কি হইল?"

রাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এই কথাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রতারকের প্রবঞ্চনায় তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। বলিলেন,—"রবীশ্বর! তোমার কথার ভাবে, আমার বোধ হইতেছে, আমি জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া দলিলগুলি হারাইয়াছি।"

পথিক, রবীশ্বর। অতি পরিচিত সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদ কৃত্রিম দাড়িগোঁফ ও মস্তকের লম্বা চুলের জন্যই—রবীশ্বরকে চিনিতে

পারে নাই! রবীশ্বর বলিলেন,—"হাঁ মা; তাহাই হইয়াছে? আপনি প্রতারক নিমকচাঁদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া,—দলিলগুলি তাহাকেই অর্পণ করিয়াছেন।"

অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টে রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, রাণী বলিলেন,—"বোধ হয়, দলিলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশা-ভরসাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে!"

রবি। দলিলগুলি হারাইয়া যাওয়াতে অনেক সুবিধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আশা কি যাইতে পারে? তরবারির দ্বারা আমরা মণিপুর লইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু আপাততঃ তাহাতেও এক অন্তরায় ঘটিয়াছে।

রাণী। আবার কি হইয়াছে?

রবি। সেনাপতি বিজয়সিংহ বন্দী হইয়াছেন।

রাণী। কোথায় বন্দী হইয়াছেন?

রবি। মণিপুরের কারাগারে।

রাণী। কেন?

রবি। শুনিলাম, গুপ্তষড়যন্ত্রকারী ও বিদ্রোহী বলিয়া। নিমকচাঁদ বলিতেছিল, সেই নর্ত্তক কিষণজি নামধারী বিজয়সিংহের নিকটে ঐ আংটী ছলনা করিয়া লইয়া আইসে। আর কোন কথা সে বলিল না—দলিল লইয়া যাওয়ার কথাও বলে নাই—তবে সে যে সকল কথা বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল,—তাহাতে স্পষ্টতই সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

রাণী অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় ভাস্বর—স্থির। তাহা হইতে যেন অগ্নি বর্ষণ হইয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আমার উপর বিধাতা

নিশ্চয়ই বাম। তোমরা যদি পাপগ্রহ-স্বরূপিণী এ হতভাগিনীকে সঙ্গে লইয়া এদেশে না আসিতে, নিশ্চয়ই সফলমনোরথ হইতে পারিতে।

রবি। মা ;—আপনি বৃথা কষ্ট করিবেন না। মানুষ কাযের জন্য যত্ন করে—চেষ্টা করে ; সেইটুকু মানুষের পুরুষকার। কিন্তু অদৃষ্ট বা কর্ম্মসূত্র তাহাতে বাধা দিতে পারে, বা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আর এক রকমে গঠিয়া লইয়া অদৃষ্টশক্তি আপনার পথে চালিত করিতে পারে। অতএব মানুষের পুরুষকারের পথে বাধা পড়িলে, মানুষের কর্ত্তব্য—তাহাতে বিচলিত বা শোকান্বিত না হওয়া। কেন না,—মানুষ কাযের পথে যাইতে পারে—কিন্তু সাধন-সিদ্ধি-ক্ষমতা অদৃষ্ট-শক্তির।

রাণী। তোমরা পুরুষ মানুষ—হৃদয়কে বুঝাইতে পার। আমরা রমণী—আমরা অত বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু আমরা যত সহিতে পারি, এত বুঝি দেবতায়ও পারেন না—দানবেও পারে না। পাষাণ-হৃদয়েও বুঝি এত তাপ সহ্য হয় না। আমিই তাহার সাক্ষী রবীশ্বর।

রবি। রাজরাণী হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্ম-সূত্রের আবর্ত্তন-চক্রে কখনও সুখে, কখনও দুঃখে পতিত হইয়া থাকে—তজ্জন্য দুঃখ করিবেন না।

রাণী। দেখ, রবীশ্বর ;—আমার নিজের দুঃখ-কষ্টের জন্যই যে, আমি কেবল শোক করিতেছি—আমার বৈধব্য-যন্ত্রণার জন্যই যে কেবল আমি অশ্রু পরিত্যাগ করিতেছি—আমি রাজরাণী হইয়া পথের ভিখারিণী হইয়াছি—বলিয়াই যে, কাঁদিতেছি—তাহা ভাবিও না। আমার দুঃখ—আমার শোক—আমার জ্বালা যে, কতদূর প্রসারিত—কতদূর হৃদয়-ব্যাপী, তাহা তোমাকে কি বলিব ?

রবি। মা ; জ্বালা ক্ষুদ্র ও লঘু সকলই সমান। কর্ম্মই কর্ম্মের সংসাধক ও প্রয়োজক। চিত্ত স্থির করিয়া কেবল কর্ম্ম করিতে হয়।

রাণী। তাহাও বুঝি রবীশ্বর, কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি কি হইল। কোন্ মানবের প্রাণে ধৈর্য্য থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা নরনারায়ণ অর্জ্জুনের বংশ এত দিনে লোপ পাইল। মহারাজা বভ্রুবাহনের বংশধরগণ বিস্মৃতির অতীত কাহিনীর মধ্যে নিমজ্জিত হইলেন। হায় রবীশ্বর!—হতভাগিনীর অদৃষ্ট-দেবতার অপ্রসন্নতা জন্য আমাকেই তাহা দেখিয়া যাইতে হইল।

রবি। কেন মা;—এখনও ত যুবরাজ জয়সিংহ জীবিত আছেন।

রাণী। জীবিত আছেন,—কিন্তু ভরসা কোথায়? বহুদিন পরে, সেনাপতি বিজয়সিংহ ও তোমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া—তোমাদের বীরবাহুর আশ্রয় পাইয়া ভাবিয়াছিলাম—জয়সিংহ আবার পুণ্যাত্মা অর্জ্জুনতনয়ের বংশধর—সেই পবিত্র সিংহাসনে বসিতে পাইবেন—আমি অন্ততঃ তাহা দেখিয়াও হৃদয়ে শান্তির ধারা ঢালিতে পারিব।

রবি। এখনও ত সে আশা যায় নাই, মা!

রাণী। অন্ততঃ সুদূর-পরাহত হইয়াছে। আরও এক কথা—

রবি। কি কথা, মা?

রাণী। যেরূপ যোগাড় তোমরা করিয়াছিলে, ইহাতে অতি সহজে মণিপুরের পুনরুত্থান করা যাইত। কেন না, দলিলগুলি ও অভিজ্ঞানাদি দেখাইলে, মণিপুরী প্রজারা সকলে না হউক, অধিকাংশই আমাদিগের দিকে হইত। অন্তর্বিদ্রোহ ও বহির্বিদ্রোহ হইলে, সহজেই রাজ্য দখল করিতে পারা যাইত। যুবরাজ জয়সিংহের আসনপ্রাপ্তির খুব সম্ভাবনা থাকিত।

রবি। এই বাধা জন্য না হয়, কিছু দিন সময়ই গত হইবে। কিন্তু সিংহাসন প্রাপ্তির অসম্ভাবনা নাই।

রাণী। সেই ভয়ই ত আমার অধিক! রবীশ্বর; তুমি বিবেচক।

জীবন-মরণ দু'দণ্ডের খেলা। জয়সিংহের যদি ভাল মন্দ কিছু হয়— তবে মণিপুর রাজবংশ নির্ব্বংশ।

রবি। আপনার বুঝি গর্ভজ সন্তান আদি কিছুই নাই।

রাণী। না, বাবা ;—হতভাগিনী জন্মবন্ধ্যা।

রবি। যুবরাজের সন্তান আদি কিছুই হয় নাই ?

রাণী। দুর্ভাগ্যের কথা কেন শুধাইতেছ ? মণিপুর হইতে আমরা যখন বিতাড়িত হই, সেই বৎসর বসন্ত রোগে যুবরাজের স্ত্রী, দুই পুত্র ও একটী কন্যা মারা পড়ে।

রবি। মণিপুরেশ্বরেরা বুঝি দুই সহোদর ছিলেন ?

রাণী। না,—তিন সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ গম্ভীরসিংহ, অত্যন্ত বীর এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে শত্রুগণ মণিপুরের সীমানায় পাদ-স্পর্শ করিতে পারিত না,—রাজ্য যুড়িয়া শান্তি, আর ধর্ম্মের প্রস্রবণ প্রবাহিত ছিল। সুখের বাসন্তীপূর্ণিমায় কেতুগ্রহের সঞ্চার হইল। মহারাজা গম্ভীরসিংহ মহাতীর্থ বৃন্দাবনধাম দর্শন করিবার জন্য, স্ত্রী ও একটি দুই বৎসরের পুত্র লইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমার স্বামী যুবরাজ ছিলেন, মহারাজার অনুপস্থিতি কালের জন্য তিনিই রাজ্য শাসন ও রক্ষণের ভার পাইলেন।

রবি। তার পরে মহারাজা গম্ভীরসিংহ কি আর ফিরিয়া আইসেন নাই ?

রাণী। না, বাবা ;—কাল-গ্রহ-কেতু মণিপুরের সুখের পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমরা শ্রুত হইলাম—মণিপুরের পূর্ণচন্দ্র মহারাজা গম্ভীরসিংহ সপরিবারে বঙ্গদেশের ধলেশ্বরী নদীতে নৌকা ডুবি হইয়া মারা পড়িয়াছেন।

রবি। সেখানে লোক পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া হইয়াছিল ?

রাণী। আমার স্বামী অনেক লোকজন লইয়া নিজে গিয়াছিলেন—সন্ধান লইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু-কথা মিথ্যা হয় না। অনেক দিন পরে আমার স্বামী জ্যেষ্ঠের মৃত্যুজনিত শোকে অশ্রু সাথী করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। মণিপুরের চিরপ্রথা অনুসারে যুবরাজই রাজা হইলেন। আমার স্বামী রাজা এবং আমি রাণী হইলাম। কনিষ্ঠ জয়সিংহ যুবরাজ হইলেন।

রবি। তারপর বুঝি, নাগাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছিল?

রাণী। যদি বিশ্বাসঘাতক চিরঞ্জীববর্ম্মণ নাগাদিগের সহিত ষড়যন্ত্র না করিত,—যদি ঘরের গুপ্ত খবর চিরঞ্জীব না পাইত, তবে কি ক্ষত্রিয় সন্তানের সিংহাসনে নাগার পদধূলি পড়িত?

রবি। সে কি সংবাদ, মা?

রাণী। সেই সময় আমার স্বামীর বাত হইয়াছিল,—তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না। দুরাত্মা চিরঞ্জীব সেই সংবাদ নাগাদিগকে দেয়। আমার নিকটে যে দলিল ছিল, তাহাতেই উহা আছে।

রবি। ভাল, রাজাই যেন পীড়িত,—সেনাপতি বা সৈন্যগণ এত দুর্ব্বল হইল কেন? নামমাত্র যুদ্ধ করিয়া, কি প্রকারে নাগাগণ এতবড় ক্ষত্রিয়রাজ্যটা গ্রহণ করিল?

রাণী। বাবা; সে সকল কথা আর তুলিও না। মনে হইলে বুক ফাটিয়া চুরমার হইয়া যায়!

রবি। যদি বলিতে কষ্ট হয়, বলিয়া কায নাই। অতীতের কাহিনী শুনিয়া, এখন আর লাভ নাই—কেবল আপনার কুসুম-কোমল-প্রাণে যন্ত্রণা দেওয়া।

রাণী। তুমি যখন শুনিতে চাহিতেছ, আমি বলিতেছি—শোন বাবা;—আমি প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি চীরজীবী হও—

রণজয়ী হও—বাহুবলে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন কর। দানবী শক্তি দূর করিয়া, দৈবীশক্তির প্রতিষ্ঠা কর। এ সকল অতীত কাহিনী শুনিলে, তোমরা যোদ্ধা—তোমাদের উপকার ও শিক্ষা হইতে পারে।

রবি। মা;—আপনি মণিপুর-রাজ-কুল-লক্ষ্মী, আপনার আশীর্ব্বাদই আমার উন্নতির সহায় হইবে। কি বলিতেছিলেন বলুন?

রাণী। রাণী চন্দ্রা—হতভাগিনী চন্দ্রার নাম শুনিয়াছ কি?

রবি। আজ্ঞা, সে পাপীয়সীর নাম শুনিয়াছি।

রাণী। সে রাজ-বংশ-সম্ভূত একজন ভদ্রলোকের কন্যা। কিন্তু স্বর্গেও দৈত্যের জন্ম হয়। ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক হৃদয়ে কামনা বা আসক্তিরও উদ্ভব হইয়া থাকে,—রাজবংশে ঐ অসচ্চরিত্রা কামিনীর জন্ম হইয়াছিল। শূর্পণখার জন্য যেমন রাবণ-বংশ ধ্বংস হইয়াছিল, চন্দ্রার জন্যও তদ্রূপ মণিপুরের রাজবংশ ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। কুলকন্যার পাতকেই কুল ধ্বংস হয়।

রবি। চন্দ্রা কি করিয়াছিল মা?

রাণী। চন্দ্রার সহিত চিরঞ্জীবের অবৈধ প্রণয় হয়। চন্দ্রা চিরদিনই কুটিলা! তাহার রূপও তদ্রূপ তীব্র—পুরুষের হৃদয়ে পঁহুছিয়া বড়ই জ্বালা প্রদান করিত। আমার স্বামীও বুঝি তাহার রূপের আলোয় পতঙ্গ হইয়াছিলেন! কিন্তু চিরঞ্জীব তাহাকে লইয়া পরামর্শ করিল, যদি নাগারা যুদ্ধে জয়ী হয়, আমি নিশ্চয়ই মন্ত্রী, আর তুমি রাণী হইবে। পাপীয়সীর পাপ হৃদয়, প্রলোভনে নাচিয়া উঠিল, সে মহারাজের গৃহ হইতে তাঁহার নামের মোহর ও একখানি তরবারি চুরি করিয়া লইয়া গিয়া চিরঞ্জীবকে প্রদান করিল।

রবি। তাহাতে কি হইয়াছিল মা? ঘটনাগুলি যেন প্রহেলিকাময়। একটী শুনিলে, আর একটী না শুনিয়া থাকিতে পারা যায় না।

রাণী। মহারাজার তখন অসুখ—তথাপিও উহার অনুসন্ধান করিলেন, না পাইয়া ভাবিলেন, অন্য কোথাও বোধ হয় রাখিয়া থাকিবেন। ওদিকে নাগারা এক দিন রাত্রে আসিয়া নগরে পড়িল—চারিদিক হইতে কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—রণকল্লোলের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে সমস্ত মণিপুররাজ্য কাঁপিয়া উঠিল। আমাদের পক্ষীয় সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল,—কিন্তু তোপখানা বন্ধ। সেনাপতি তোপখানায় বারুদ, গোলাগুলি ও অস্ত্র আনিতে গিয়া পাইলেন না। চিরঞ্জীববর্ম্মণ মহারাজের রাজতরবারি ও মোহরাঙ্কিত আদেশপত্র লইয়া তোপখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে কিছুতেই কাহাকেও তোপখানায় যাইতে দিল না। মহারাজার তরবারি ও আদেশের বিরুদ্ধে কে কথা কহিতে পারে! অস্ত্রাদি না পাইয়া সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইল—কতক পলায়ন করিল, কতক দাঁড়াইয়া মরিল,—কতক বা আহত হইয়া চীৎকার করিল। মহারাজের কর্ণে সে কথা পঁহুছিল, তিনি ডুলি করিয়া তোপখানার দিকে যাইতেছিলেন,—কিন্তু তখন আমাদের সৈন্যগণ পলাইয়াছে,—নাগাসৈন্য পুরী প্রবেশ করিয়াছে? সেই ডুলিতে উঠিয়া মহারাজ জন্মের মত মণিপুর ও সিংহাসন আদি পরিত্যাগ করিয়া বিদায় হইলেন। জয়সিংহ এবং হতভাগিনী আমি—আমরাও তাঁহার অনুগামী হইলাম।

রবীশ্বরের চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। শরীরের শিরাগুলার মধ্য দিয়া তড়িদ্বেগে রক্তধারা বহিয়া গেল,—দন্তে দন্তে নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন,—চিরঞ্জীববর্ম্মণ আর চন্দ্রা হইতেই মণিপুরবংশের এত অনিষ্ট! —উহারাই অধোন্নতির একমাত্র কারণ!

রাণী বলিতে লাগিলেন,—"আমার স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ গম্ভীরসিংহের সেই যে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রটীর কথা তোমাকে

বলিলাম—ঐ পুত্রটীর জন্মকোষ্ঠী ও জন্মযৌতুক মুদ্রা, একটা রৌপ্য-কৌটায় আবৃত করিয়া, আমার স্বামী তাঁহার গৃহে রাখিয়াছিলেন। ঐ কৌটাটী অতি সুন্দর ও কারুকার্য্যসম্পন্ন। কৌটার সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গুচ্ছ—সেই ফুলগুচ্ছের মধ্যে মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। কৌটাটী এত মহা-কৌশলে নির্ম্মিত, যে তাহা কেমন করিয়া খুলিতে হয়, না দেখাইয়া দিলে, কেহই তাহা খুলিতে পারে না। আমার স্বামী, তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট উহার খুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলেন,—আমি আবার আমার স্বামীর নিকট শিখিয়াছিলাম।"

রবি। ঐ কৌটার কথা কেন কহিতেছেন?

রাণী। ঐ কৌটাটীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চন্দ্রা যে দিন মোহর ও তরবারি চুরি করে—সেই দিন সেই সঙ্গে উহাও চুরি করিয়া লইয়া যায়।

রবি। উহাও যে চন্দ্রা লইয়াছে—কি করিয়া জানিলেন?

রাণী। আমরা পলাইয়া যাইবার সময়—মহারাজা আমাকে পথে যাইতে যাইতে বলিয়াছিলেন।

রবি। চন্দ্রা বোধ হয়, ঐ কৌটাটী নষ্ট করিয়া থাকিবে?

রাণী। চন্দ্রা বরাবরই খুব সৌখীন—সে সৌন্দর্য্যময় কৌটাটী বোধ হয়, নষ্ট করে নাই।

রবি। থাকিলেও তাহাতে আর প্রয়োজন কি?

রাণী। আমার বংশধরের—আমার সন্তানের জন্মকোষ্ঠী তাহাতে আছে। কলঙ্কিনীর পাপ-হস্ত-স্পর্শে তাহা অপবিত্র হইতেছে, যদি উদ্ধার হয়, আমি তাহা একবার দেখিয়া মণিপুরের রাজবংশের চিরাগত প্রথানুসারে উহার সদগতি করিব।—কিন্তু সকল আশাই আমার বিফল হইল!

রবি। মা;—গত বিষয়ের জন্য আর শোক করিবেন না। এক্ষণে আমার সহিত আপনাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইতেছে।

রাণী। কেন ?

রবি। হতভাগ্যগণ ঐ দলিলাদি দেখিয়া, আপনাকে মণিপুরের মহারাণী বলিয়া জানিলে আপনাকেও ধরিতে পারে।

রাণী। আমাকে কোথায় যাইতে হইবে ?

রবি। অন্য কোন বাড়ীতে আপনাকে রাখিয়া যাইব।

তখন দুলালীকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য ভাড়া মিটাইয়া রবীশ্বর রাণীকে সঙ্গে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

নীরব নিস্তব্ধ নির্জ্জন গৃহে নৈশ-বাতাসে প্রজ্বলিত প্রদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। একখানা পালঙ্কের উপরে—নৈশোৎসবের প্রভাতী মালার মত মর্ম্মদলিতা রাণী চন্দ্রা সেই শয্যার উপরে শয়ন করিয়াছিল।

চন্দ্রার সেই পূর্ণোজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি নিবিয়া আসিয়াছে। সফরী সদৃশ চঞ্চল ও নৃত্যশীল নয়ন-কটাক্ষ স্থির হইয়াছে। চরণ-চুম্বিত চারু-শ্যাম-কুন্তলের ভার, অযত্নে উলু-খড়ের মত হইয়াছে। মদনোন্মাদ—হলাহল-কলসী-তুল্য ফুল্ল-বিম্ব-রক্তাধরে কালিমার রেখা পড়িয়াছে। বাসনা-বিতাড়িত উচ্ছ্বসিত অদম্য পিপাসাময় প্রাণে এখন আশা-ভঙ্গ, জীর্ণ দীর্ণ অতীতের স্মৃতির জ্বালা অহর্নিশি জাগিয়া দংশিয়া বিকল করিতেছে।

চন্দ্রা, আর সে চন্দ্রা নাই। আগেকার চন্দ্রা বিলাস-তরঙ্গে প্রফুল্ল হিল্লোল-পরাগ-সম্ভূত সৌন্দর্য্যময়ী ছিল,—এখন সান্ধ্য সরোজের বিষন্নতা ও শীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। চন্দ্রা উপাধানে মস্তক রাখিয়া ভাবিতেছে,—

হায়! কি করিয়াছিলাম! আমি বাল-বিধবা. কেন বিধবার ব্রত অবলম্বন করি নাই! কেন ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায় এ পাপের পথে—নরকের পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম! রূপ—রূপেই ত আমাকে খাইয়াছে। রূপের গরবেই ত আমার বিলাসের উচ্ছ্বাস-বাসনা! জানি না, বিধাতা হতভাগিনীকে এত রূপ দিয়া কেন সৃজন করিয়াছিলেন। রূপ দিলেন যদি, রূপের গৌরব দিলেন কেন? আমি যে রূপের গৌরবে, সমস্ত জগৎটাকে তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র দেখিয়াছি—কিন্তু আজি! কোথায় সে রূপ? সেই রূপের অহঙ্কারে তখন ভাবি নাই যে, জগতে সকলেই চিরঞ্জীববর্ম্মণ নহে। তখন ভাবিতাম,—আমার রূপের আগুনে জগতের সকলেই পতঙ্গরূপে প্রবেশ করিতে আকুলিত। শেষে একজন যুবক আমাকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছে। আমি যে কামনার বুকে তাহাকে তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম,—সে আমার সে বুকে অবহেলায় বিষম ছুরিকা আঘাত করিয়া গিয়াছে! সেই-ই আমার শিক্ষা-দীক্ষার গুরু। সেই আমায় শিখাইয়া গিয়াছে, রূপে সকলে মজে না। সকলেই রূপের পতঙ্গ নহে। আরও শিখাইয়া দিয়া গিয়াছে—রূপ বড় অস্থায়ী; একটি বিস্ফোটকে রক্ত-পুঁজে পরিণত হয়। যে বক্ষের উন্নত গর্ব্বে ধরাকে সরা দেখিতাম,—সেই বক্ষে এখন দুষ্ট ব্রণ হইয়াছে। যাহার আকুল-আকর্ষণে আগে মানব, মরিয়া মুগ্ধ হইত—এখন সেই বুকের দুষ্ট ক্ষতের দিকে তাকাইয়া সকলে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করে। এই ত মানুষের রূপের বড়াই! এই রূপ-গৌরবে কাহাকেও ভালবাসি নাই—ভালবাসার জন্য কত জন উন্মাদের হাসি কান্না লইয়া, তাহার হৃদয়ের সমস্ত শোণিত আমার চরণতলে ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমি চকিতেও চাহিয়া দেখি নাই। আমি রূপের ফাঁদে ফেলিয়া, ফাঁকি দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

চন্দ্রা ভাবিতে লাগিল, চিরঞ্জীববর্ম্মণ আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে—আমার জন্য সে সকল ভুলিয়াছিল। স্ত্রী-পুত্রের কথা মনে করিত না,—আমি তাঁহাকেও এক বিন্দু স্নেহ করিতাম না। তাহার সহিতও কেবল ছলনা; আর বাঁধন লইয়া লুকো-চুরি খেলিতাম! কিন্তু এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছি। এখন পলে পলে—দণ্ডে দণ্ডে বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছি। রূপ গেলে কি ভালবাসা জন্মে? আদর গেলে কি আকর্ষণ আসে? সোহাগে কি সোহাগ আসে না? ফুরাইলে তবেই কি উদ্ভব হয়? ভগবান্ জানেন,—আর সেই দেবদেবীরাই জানেন,—যাঁহারা একে মজিয়া, একে লইয়া প্রণয়দেবতার আরাধনা করিতেছেন! আমি পাপীয়সী, পুণ্যময় প্রেমের কথা ভাবিতে গেলাম কেন? কিন্তু চিরঞ্জীববর্ম্মণের উপরে এখন যে, এত আকুল-আকর্ষণ, ইহাকে কি প্রেম বলা যায় না? এখন প্রেম কিসের? রূপের উচ্ছ্বাস নাই,—যৌবনের উচ্ছ্বাস নাই,—দেহের ললিতলাবণ্য মাধুরী নাই,—তবে আবার ভালবাসা কি লইয়া? বসন্ত গিয়াছে—বর্ষার দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, এখন আবার কোকিলের ডাক কেন?—কে জানে কেন! কিন্তু আমার প্রাণের নিভৃত-নিকুঞ্জ হইতে প্রেমের কোকিল, সর্ব্বদাই পঞ্চমে গাহিতেছে,—চিরঞ্জীব!—এস, চিরঞ্জীব! তোমায় আগে ফাঁকি দিয়াছি—এখন তাহার প্রতিশোধ লও। তুমিও ফাঁকি দিয়া মুখের কথায় বল, চন্দ্রা,—তোমায় ভালবাসি।

চন্দ্রা, হৃদয়ের যাতনায় এ পাশ ও পাশ করিয়া, এইরূপে জ্বলিয়া জ্বলিয়া দগ্ধ হইতেছে। এমন সময় দাসী, বৃদ্ধা সুবার মা আসিয়া বলিল,—"একজন সন্ন্যাসী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

চন্দ্রা, অন্যমনস্কা ছিল,—ভাবনায় নিমগ্ন ছিল,—অতীত কাহিনীর

মর্ম্মজ্বালায় জ্বলিতেছিল। সে দাসীর কথা শুনিতে পাইল না। দাসী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার কথার উত্তর পাইল না,—তখন সে, বুঝিতে পারিল, চন্দ্রা তাহার কথা শুনিতে পায় নাই। এখন প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে। দাসী পুনরপি চন্দ্রাকে ডাকিয়া বলিল,—"একজন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া, দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

চন্দ্রা, দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সন্ন্যাসী? আমার সহিত সন্ন্যাসী দর্শন করিতে চাহেন? কেন? কি জন্য? বোধ হয়, প্রকৃত সন্ন্যাসী না হইতে পারেন। প্রকৃত সন্ন্যাসী আমার মত মহাপাতকীর মুখদর্শন করিবেন কেন? এ নরকে আসিবেন কেন? যাহা হউক, ডাকিয়া আন্!"

দাসী সন্ন্যাসীকে পঁহুছাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রা প্রণাম করিয়া, উজ্জ্বল দীপালোকে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর; মুখের দাড়ী ভাল মানায় নাই। কপাল, চাও, নাসিকা ও চক্ষুর জ্যোতিঃ স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে—এ দাড়ী, এ গোঁফ কৃত্রিম। তোমার বয়সের সঙ্গে কি অত বড় দাড়ী গোঁফের সম্ভাব হইতে পারে?"

সন্ন্যাসী ঠাকুর কোপকষায়িত লোচনে চন্দ্রার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি এখনও পুণ্যের পথে আইস নাই? এখনও সন্ন্যাসীর—মহত্ত্বের উপরে উপহাস বর্ষণ! চন্দ্রা,—এখনও পরকালের ভাবনা ভাবিতেছ না?"

চন্দ্রা হাসিয়া বলিল,—"গলা চাপিয়া কথা কহিতেছ কেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর? দেখ,—আজীবন ছলনা ও চাতুরী লইয়া কাটাইয়াছি; কাযেই উহাতে বিশেষ পরিপক্ক হইয়াছি। তোমার মত কোমল-কণ্ঠ কতবার

পরিবর্ত্তন করিয়া কথা কহিয়া লোক ঠকাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তুমি যেই হও—কিজন্য আসিয়াছ বল ?

কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—"তুমি যখন আমাকে ভণ্ড মনে করিতেছ, তখন আমি কিছু বলিতে চাহি না"।

চন্দ্রা। ভণ্ড না ভাবিতে পারি,—কিন্তু সন্ন্যাসীর সাজটা যে, বয়সের মত হয় নাই—ইহা নিশ্চয়। যে সাজাইয়াছে, তাহার এই বিষয়ের জ্ঞান এখনও ভাল হয় নাই। যাক্ সে কথা,—এখন বক্তব্য কি ?

সন্ন্যাসী। না। আর কিছু বক্তব্য নাই। আমি চলিলাম।

চন্দ্রা। রাগ করিও না। মনে মনে বুঝিয়া দেখ—আমি অপরাধী কি না !

সন্ন্যাসী। আমার সহিত প্রবঞ্চনা ছাড়।

চন্দ্রা। প্রবঞ্চনা ! প্রবঞ্চনা আমি করিতেছি কি, তুমি করিতেছ ? আমি যে হতভাগিনী চন্দ্রা—সেই হতভাগিনী চন্দ্রাই আছি। কিন্তু তুমি হয় ত রামা বেহারার ছেলে সন্ন্যাসী হইয়াছ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর মনে মনে চন্দ্রার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি ভাল জ্যোতিষ গণিতে জানি।"

চন্দ্রা। কিন্তু আমার আর তাহাতে প্রয়োজন নাই। তবে একটা বিষয় গণাইয়া দেখাইতে পারিলে হইত।

সন্ন্যাসী। কি ?

চন্দ্রা। মরিয়া কোথায় জন্মিব ?

সন্ন্যাসী। তাহা গণিয়া বলা যায় না।

চন্দ্রা। তবে কি বলা যায় ?

সন্ন্যাসী। ইহ জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের ঘটনা

চন্দ্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আপন করতল বিন্যস্ত করিয়া বলিল, "তবে গণ ত ঠাকুর?"

সন্ন্যাসী। কি গণিব?

চন্দ্রা। তোমার যাহা খুসী।

সন্ন্যাসী। তোমার নাম চন্দ্রা।

চন্দ্রা। তুমি যে খুব গণৎকার,—এই এক কথাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল! এ কথাটা মণিপুর সহরে প্রায় কেহই জানে না।

সন্ন্যাসী। ভদ্রলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তুমি জান না।

চন্দ্রা। তুমিও গণিতে জান না।

সন্ন্যাসী। নিশ্চয় জানি।

চন্দ্রা। তবেই কি ঐ প্রমাণ?

সন্ন্যাসী। আমাকে ক্রমে ক্রমে ত বলিতে হইবে?

চন্দ্রা। ভাল, বল।

সন্ন্যাসী। তোমার রাজবংশে জন্ম হয়।

চন্দ্রা। তাহা এ দেশের সকলেই জানে।

সন্ন্যাসী। তুমি বালবিধবা।

চন্দ্রা। (হাসিয়া) এইবার অতি গুহ্য কথা বলিয়াছ। রাবণের মৃত্যুশর বিষয়ে গণনাতেও এত বাহাদুরী ছিল না।

সন্ন্যাসী। খুব গুপ্ত কথা একটা আগেই গণিয়া বলি।

চন্দ্রা। আমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ, এই কথা ত?

সন্ন্যাসী। একটু স্থির হও, গণিতে দাও।

চন্দ্রা। ভাল, গণিয়াই দেখ।

সন্ন্যাসী। উঃ!—

চন্দ্রা। কি ও ঠাকুর? হাতখানা বড় গরম নাকি?

সন্ন্যাসী। ব্যঙ্গ করিও না। সন্ন্যাসী মোহন্তের সহিত ঠাট্টা-তামাসা করিতে নাই।

চন্দ্রা। সে ধারণা হইলে কখনই করিতাম না। এক্ষণে হয় গণিয়া বল—আর না হয় স্পষ্টই বল, কি অভিলাষে আগমন হইয়াছে।

সন্ন্যাসী। তোমায় একটী গুপ্ত কথা বলিব?

চন্দ্রা। বল না ঠাকুর?

সন্ন্যাসী। তুমি মহারাজা বলদেবসিংহের গুপ্তপ্রণয়িনী ছিলে?

চন্দ্রা। আর তুমি বোধ হয়, তখন তাঁহার বালভৃত্য ছিলে?

সন্ন্যাসী। তাঁহাদের পলায়নের পূর্ব্বে তুমি তাঁহার মোহর, তরবারি ও একটা রৌপ্যকৌটা চুরি করিয়া আনিয়াছিলে?

চন্দ্রা। বলদেবসিংহ মরিয়া গিয়াছেন—আর বাঁচিলেও তোমার চেয়ে তাঁহার বয়স অনেক অধিক,—নতুবা আমি ভাবিতাম, ছদ্মবেশধারী তুমি বলদেবসিংহ আসিয়াছ। চক্ষুর চাহনি কতকটা তোমার তাঁহারই মত।

সন্ন্যাসী। তুমি রায় রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধারের জন্য মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণের অঙ্গুলী হইতে মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া কারাগারে গমন করিয়াছিলে।

চন্দ্রা। সে কথা তোমায় কে বলিল?

সন্ন্যাসী। আমি গণিয়া ঐ সকল জানিতে পারিতেছি।

চন্দ্রা। আচ্ছা বল দেখি, আমি রাজবাড়ী হইতে যে রৌপ্য কৌটাটী আনিয়াছিলাম,—তাহার গঠন কিরূপ?

সন্ন্যাসী। তাহার সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পস্তবক, মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সে কৌটা খুলিবার সঙ্কেত না জানা থাকিলে কেহ তাহা খুলিতে পারে না।

চন্দ্রা। ভাল, বল দেখি সেই কৌটাটী এখন কোথায় আছে ?

সন্ন্যাসী। রেখাটা কাটা হইয়া গিয়াছে। তোমার কাছেও থাকিতে পারে—অন্যের কাছেও থাকিতে পারে।

চন্দ্রা। অতি চমৎকার গণিয়াছ ! কিছু পুরস্কার দিব।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা বল দেখি—সেটী কোথায় আছে ?

চন্দ্রা। বলিব কেন ?

সন্ন্যাসী। তোমায় একটা ঔষধ দিব।

চন্দ্রা। বুঝিয়াছি—সেই কৌটাটীরই প্রয়োজন। তা' তাহা আমার নিকটে থাকিলে তোমায় দিতে পারিতাম। আমি সেটা একজনকে দিয়াছি।

সন্ন্যাসী। কাহাকে দিয়াছ ?

চন্দ্রা। কৃষ্ণানন্দঠাকুরের শিষ্যা কমলেশ্বরীকে। আমি এখন মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া, ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া এই দগ্ধ হৃদয়ে শান্তির জন্য চেষ্টা করিতেছি।

সন্ন্যাসী। এত জিনিষ থাকিতে সেই কৌটাটীই তাহাকে দিলে কেন ?

চন্দ্রা। রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি আছে বলিয়া।

সন্ন্যাসী। তিনি সেটাকে কি করিয়াছেন ;—বলিতে পার ?

চন্দ্রা। বিতস্তার জলে ফেলিয়া দিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। কেন ?

চন্দ্রা। সন্ন্যাসী চুরি করিবে বলিয়া।

সন্ন্যাসী। তবে বোধ হয়, তাহা তাঁহারই নিকটে আছে।

চন্দ্রা। থাকিতে পারে—কিন্তু তুমি কে বল ?

সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী।

চন্দ্রা। মিছে কথা—তুমি পূর্ব্ব রাজাদের কেহ হইবে। সেই কোঁটায় বোধ হয়, তোমাদের কোন দলিলাদি থাকিতে পারে।

সন্ন্যাসী। মিছে কথা! আমি রাজাদের কেহ নহি।

সন্ন্যাসীঠাকুর তাহার হাত দেখিতেছিলেন ও কথা কহিতেছিলেন। স্বভাবচঞ্চলা চন্দ্রা এই সময় মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি ধরিয়া টান দিল,—কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ খসিয়া চন্দ্রার হাতে গেল। ব্যথিত ভুজঙ্গীর মত দূরে সরিয়া গিয়া, উন্নত গ্রীবা বাঁকাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"রবীশ্বর;—তুমি রবীশ্বর!"

কি একটা বৈদ্যুতিক মোহ চন্দ্রার বুকে বড় বল প্রকাশ করিল। বক্ষঃস্থলের ক্ষত দিয়া প্রবল বেগে রক্তধারা বহিল,—চন্দ্রা মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যার উপরে ঢলিয়া পড়িয়া গেল। রবীশ্বর অতি দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে উপস্থিত হইলেন এবং হন হন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অন্ধকার পথ,—তখন পথে জন-মানবের সাড়া শব্দ নাই। রাত্রি বোধ হয়, দুই প্রহর হইয়া থাকিবে। সন্ধ্যার তারকা মধ্যগগনে উঠিয়া পড়িয়াছে।

কিয়দ্দূর যাইতেই রবীশ্বর শুনিতে পাইলেন, পথ-পার্শ্বস্থ অট্টালিকার একটা কক্ষ হইতে রমণী কণ্ঠে গীত হইতেছে। গায়িকা সুকণ্ঠী। যে সুরে গীত হইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও মনোহারী। গানটীও ভাবে ভাষায় চিত্তাকর্ষক। রবীশ্বরও একটু দাঁড়াইয়া গানটী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইলেন। ঠিক এই সময় দক্ষিণ দিয়া পাহারাওয়ালা হাঁকিয়া আসিতেছিল। পাছে তাঁহাকে দেখিয়া কোন প্রকার সন্দেহ করে ভাবিয়া, রবীশ্বর রাজপথের পার্শ্বস্থিত একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন।

রবীশ্বর শুনিতে পাইলেন,—এই অট্টালিকার নিকটে আসিয়া একজন পাহারাওয়ালা, যে হাঁকিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বলিল,—"যায়গাটায় একটু ভাল করিয়া হাঁকিয়া যাইবে!"

রবীশ্বর বুঝিলেন, যে হাঁকিতেছে—সে নূতন কায শিক্ষা করিতেছে। আর তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য পুরাতন লোক একজন সঙ্গে আছে।

যে হাঁকিতেছিল সে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই যায়গায় ভাল করিয়া হাঁকিয়া যাইতে হইবে কেন?"

সাক্ষী সে বলিল,—"এই বাড়ীটা সহকারী সেনাপতি নিমক চাঁদের। যেখানে শক্ত—সেই খানেই ভক্ত হইয়া কায করিতে হয়।"

তাহারা চলিয়া গেল। রবীশ্বর সেই বৃক্ষের আড়ালে—স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি ভাবিলেন। শেষ মনে মনে বলিলেন,—"নারায়ণ যা করেন।"

তখনও সেই নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই সুমধুর কণ্ঠে গীত হইতেছিল। রবীশ্বর বস্ত্রাদি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত করিয়া সেই অট্টালিকা অভিমুখে গমন করিলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—কোথাও জনমানব নাই। তাঁহার ইচ্ছা,—তিনি একবার নিমকচাঁদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি সে বাড়ীতে লুকায়িতভাবে থাকিয়া শুনিবার চেষ্টা করেন—দলিলগুলি নিমকচাঁদ কোথায় রাখিয়াছেন; যদি নৈশ-কথোপকথনে কোন প্রকারে সে কথার কেহ আলোচনা করে,—তবে তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে পারে। আশা মরীচিকা,—আশা মঙ্গলের সাফল্য সহোদরা!

রবীশ্বর বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সুযোগ ও সুবিধা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইলেন, বাটীর মধ্য হইতে একটী আম্র বৃক্ষ, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার শাখা-বাহুকে

বাহিরে প্রলম্বিত করিয়া দিয়াছে। রবীশ্বরের সুযোগ হইল,—লম্ফদানে সেই শাখাগ্র ধরিয়া, তদবলম্বনে সেই বৃক্ষে উঠিয়া প্রাচীর গলাইয়া বাটীর মধ্যে নামিয়া পড়িলেন।

অন্ধকারের ভিতর দিয়া যে দিকে গান হইতেছিল,—রবীশ্বর পা টিপিয়া টিপিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহের অর্গল উন্মুক্ত। নৈশ-সমীরণে গৃহস্থিত উজ্জ্বলদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। গায়িকা নিমকচাঁদের কন্যা ফুলরাণী! ফুলরাণীর দেহে যৌবন—কণ্ঠে সুস্বর। ফুলরাণী সঙ্গীতশাস্ত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞা। তাই নিশি জাগিয়া, নাদ-সাগরে ডুবিয়া নূতন সুরের সৃষ্টি করিতেছিল। কি একটা আবশ্যক জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, উপরের তাকে কি খুঁজিতেছিল।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, নৈতিকমার্গ দূরে রাখিয়া,—রবীশ্বর, মুক্তদ্বারে পদার্পণ করিলেন। ফুলরাণী, মনুষ্যের পদ-শব্দে চমকিয়া উঠিল।

ফুলরাণী চকিত বিস্মিত চাহনিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল,—বস্তুতঃই দ্বারে একজন পুরুষের মূর্ত্তি। দৃঢ়স্বরে ফুলরাণী বলিল,—"কে তুমি? মরণের কোটাল ঢলিয়া পড়িতেছ? জান না কি, এখানে মরণে-মদনে অভিনয়!"

রবীশ্বর বলিলেন,—"আপনার কোন ভয় নাই। আমি ভদ্রলোক। একটী বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আপনার আশ্রিত হইয়াছি। বিশেষ বিপন্ন বলিয়াই, নীতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, রাত্রিকালে, সংগোপনে চোরের মত একজন ভদ্র কুলকামিনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমার মা!"

মিষ্ট কথায় জগৎ বশীভূত। ফুলরাণী বলিল,—"কে তুমি, কিসের জন্য আসিয়াছ?"

রবি। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিব না, যদি অনুমতি করেন,—ভিতরে যাইয়া বলি।

ফুল। মনে কোন কু অভিসন্ধি নাই ত?

রবি। আপনাকে মা বলিয়াছি—পুত্রের নিকটে মায়ের কোন ভয় থাকিতে পারে না।

ফুল। তোমার কথায় ত তোমাকে ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে,—আচ্ছা আসিতে পার।

রবীশ্বর গৃহ-মধ্যে গমন করিলেন। ফুলরাণী দুরে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বলিতেছ?"

রবি। আমরা বিদেশী—

ফুল। মিছে কথা; আমি তোমাকে এখন চিনিয়াছি। তুমি জমীদার রায় রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র—রবীশ্বর। তুমি রাণী চন্দ্রার বুকে ছোরা চালাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলে।

রবি। সে কথা যদি আমি অস্বীকার করি।

ফুল। অস্বীকার করিলে ভাবিব তুমি মিথ্যাবাদী।

রবি। তবে আমি রবীশ্বর। কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি।

ফুল। তোমার চরিত্রের খুব সুনাম আছে। যদি তোমায় সাহায্য করিবার শক্তি আমার থাকে, আমি তাহা করিব।

রবি। আমার একজন বিদেশী বন্ধু কারাগারে বন্দী হইয়াছেন।

ফুল। কে সে, কিষণজি কি?

রবি। হাঁ। তুমি জানিলে কি প্রকারে?

ফুল। আমার বাপ তাঁহাকে জেলে দিয়াছেন, আর আমি জানি না! তিনিও তোমার মত জুয়াচোর।

রবি। কিসে ?

ফুল। তিনিও আপনাকে বিদেশী পথিক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন।

রবি। তবে তিনি কি ?

ফুল। তিনি আমার হৃদয়ের—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ফুলরাণী চমকিয়া উঠিল। তাহার বুকের সমস্ত রক্তটা একত্র হইয়া ছুটিয়া গিয়া হৃদ্‌পিণ্ডটা কাঁপাইয়া দিল। সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া গেল। দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল,—বসিয়া পড়িল। তাহার রক্তাভ মুখমণ্ডল আরও রক্তবর্ণ হইয়া নৈশ শীতলতার মধ্যেও ঘামিয়া উঠিল। রবীশ্বর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া এবং তৎপরে তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"আমার নিকটে মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, তুমি অত লজ্জিতা কেন হইতেছ ? আমি বুঝিয়াছি, তুমি কিষণজিকে ভাল বাসিয়াছ। তাঁহার কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া, উহা বলিয়া ফেলিয়াছ। সে জন্য লজ্জা করিও না। আমি তাঁহার স্নেহের কনিষ্ঠ সহোদরের মত। আমার কাছে প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া কোন ভয় করিও না। আরও আমি তোমাকে এই ভরসা দিতেছি যে, যদি তিনি উদ্ধার হইতে পারেন—যদি আমাদের বিপদ কাটিয়া যায়,—তবে তিনি যাহাতে তোমাকে বিবাহ করেন, আমি তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিব।"

অর্থশূন্য চাহনিতে ফুলরাণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রবীশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তৎপরে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"মহাশয়, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি—বলিব, তিনি মণিপুরের বিদ্রোহী বিজয়সিংহ,—তাহা না বলিয়া আমার হৃদয়ের অতি গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যখন ব্যক্ত হইয়াছে, তখন আর উপায় কি,—তবে একথা কাহাকেও বলিবেন না। তাঁহাকেও বলিবেন না।

রবি। মিলনের পক্ষে চেষ্টা করিব।

ফুল। আশা নাই।

রবি। কেন?

ফুল। আমার পিতা ও মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা, বিজয়সিংহের ফাঁসি হয়।

রবি। কর্ম্মসূত্রের ঘটনাচক্রে কি দাঁড়াইবে, কিছুই বলা যায় না। আপনি তাঁহাকে কোথায় দেখিয়াছিলেন? কোথায় আপনাদের এই প্রেম-সঞ্চারের এত অবসর হইয়াছিল?

ফুল। একদিন রাজবাড়ী সান্ধ্য-ভোজে আমি নৃত্য করিয়াছিলাম—তিনি বাজাইয়াছিলেন। অমন বাজনা আমি কখনও শুনি নাই।

রবি। যে যেগুণ বিশিষ্ট, তৎ-গুণবিশিষ্ট আর একটি পাইলেই মিলনের আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু বিজয়সিংহ কেবল সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শী নহেন। উনি কাব্যে কালিদাস, শাস্ত্রে বৃহস্পতি,—যুদ্ধে অর্জ্জুন।

ফুল। আপনাদের কতকগুলি দলিল আমার পিতা লইয়া আসিয়াছিলেন।

রবি। তুমি এখন আমাদের একান্ত হিতৈষিণী, ভরসা করি, দলিলগুলির সন্ধান তুমি লইবে।

ফুল। সেই জন্যই বুঝি এখানে আগমন?

রবি। হাঁ।

ফুল। আমার মুখ দিয়া যদি ঐ কথা বাহির না হইত,—কোন সাহসে আমায় বলিতে?

রবি। কর্ম্মসূত্রের আশা লইয়াই মানব ঘুরিয়া থাকে,—যেখানে কর্ম্মসূত্র যেরূপ ফল দেখায়, তাহাই ঘটিয়া থাকে।

ফুল। আমি সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টায় আছি ও থাকিব। তবে

বাবা বড় সাবধানে উহা রাখিয়াছেন। আমার নিকটে একটী সত্য করিতে হইবে।

রবি। কি বল।

ফুল। ঐ দলিল গোপন করিলে, বাবার যদি বর্ত্তমানে কোন অনিষ্ট না হয়, আমি যদি নিশ্চয় এখন বুঝিতে পারি,—আর যদি সুবিধা ও সুযোগ পাই, তবে দলিলগুলি সরাইবার চেষ্টা করিব।

রবি। তাঁহার কি অনিষ্ট হইবে?

ফুল। মন্ত্রী মহাশয় জানিয়াছেন, বাবা দলিল আনিয়াছেন,—না দিলে যদি তিনি বাবার অনিষ্ট করেন। ফলতঃ আমি সে বিষয়ে যাহা ভাল বুঝি, তাহা করিবার চেষ্টাতেই থাকিব। কিন্তু—

রবি। কিন্তু কি?

ফুল। তোমরা যে উদ্দেশ্যে মণিপুরে আগমন করিয়াছ—সে দলিলগুলি পাঠে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। বাবার মুখে শুনিয়াছি —মৃত মহারাজা বলদেবসিংহের মহিষীও আসিয়াছেন। ঘটনাচক্রের কথা কিছুই বলা যায় না—যদিই তোমরা রাজ্যলাভ করিতে পার, আমার নিকট সত্য কর, আমার বাবাকে কিছু বলিবে না; কারণ, তিনি এখন তোমাদের অনেক প্রকার অনিষ্ট করিতেছেন।

রবি। আমি সে বিষয়ে বিজয়সিংহকে অনুরোধ করিব।

ফুল। প্রতিজ্ঞা কর—সময় হইলে এ বিষয়ের জন্য তুমি প্রাণের সহিত অনুরোধ করিবে?

রবি। প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রাণের সহিত অনুরোধ করিব।

ফুল। তবে বিদায় হও।

রবি। কবে দেখা করিব?

ফুল। যদি কাগজগুলা সংগ্রহ করিতে পারি, তোমাকে সংবাদ দিব।

রবি। আমার দেখা কোথায় পাইবে?

ফুল। তুমি কোথায় থাক?

রবি। দূর সীমান্তে।

ফুল। সে ত এখান হইতে পাঁচ ক্রোশেরও উপর। তবে কি করিয়া জানাইব?

রবি। আমি একজন দূতকে চাঁদসড়কের রত্নাকরঠাকুরের পান্থ-নিবাসে রাখিয়া দিব। তাহার নিকট "কর্ম্মফল" এই কথা শুনিতে পাইলে, দলিল পাইলে, "সিদ্ধ" এই কথাটী বলিয়া দিবে।

ফুল। সেই ভাল। তুমি এখন বিদায় হও।

রবীশ্বর বিদায় হইলেন। প্রাচীরের গায়ে গা ঘেসিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া একেবারে সেই আম্রবৃক্ষে গিয়া উঠিলেন। এবং প্রাচীর গলাইয়া বাহিরের রাস্তায় লাফাইয়া পড়িলেন।

রবীশ্বর সেখান হইতে একেবারে নগরপ্রান্তে চলিয়া গেলেন। বনের মধ্যে অশ্ব লইয়া এক ব্যক্তি অপেক্ষা করিতেছিল। রবীশ্বরকে দেখিয়া সে উঠিয়া অশ্ব লইয়া উপস্থিত করিল। অশ্বারোহণে রবীশ্বর পূর্ব্বাভি-মুখের রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দজির সন্ধ্যারতি সমাপনপূর্ব্বক, কৃষ্ণানন্দঠাকুর প্রাঙ্গণতলে, তুলসীমঞ্চের নিকটে একখানা মৃগচর্ম্মের উপরে বসিয়া শিষ্যা কমলের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ বলিলেন,—হাঁ, তখন কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?

কমল। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, মানুষ যদি স্থিরচিত্ত হইতে না

পারিয়া, সাধন-পথের পথিক হইতে না পারে, তবে তৎপক্ষে ব্যাঘাত স্বরূপ অবিদ্যার সৃষ্টি হইল কেন ?

কৃষ্ণা। এ প্রশ্ন হইতেই পারে না। পূর্ণিমার রজত-ধার-জ্যোৎস্নার জ্যোতিঃ মলিন করিয়া দেয় বলিয়া, অন্ধকার সৃষ্ট হইল কেন ;—এ প্রশ্ন করাও যাহা—আর তোমার ঐ প্রশ্নও তাহাই। তবে তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি,—পুরুষকার বা কর্ম্মফল জগতে থাকিলে, অবিদ্যারও প্রয়োজন। নতুবা বিচার হইবে কি করিয়া ? তুলনাতেই ত ভালমন্দ !

কমল। কি উপায়ে মানুষ সহজে চিত্ত নিরোধ করিতে পারে ?

কৃষ্ণা। অভ্যাসে। অভ্যাসযোগ দ্বারা মানুষ চিত্ত নিরোধ করিতে সমর্থ হয়। তুমি ত গীতা পড়িয়াছ। গীতা পাঠের সময় এ সকল কথা অনেক দিন শুনিয়াছ। সেইরূপ প্রকারে কায করিতেও উপদিষ্ট হইয়াছ।

কমল। আপনার আদেশমতেই কায করিয়াছি—শাস্ত্রজ্ঞানে নহে। পর কথা,—দরিয়াবাজের আদেশে পূর্ব্বে আপনার দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও আমাদ্বারা গৃহের ঝাঁট দেওয়া, পাটকরা, বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া লইতেন, ইহার কারণ কি ? এখন বোধ হয়, সে কথা আমাকে বলিবেন !

কৃষ্ণা। তোমাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। যে কর্ম্ম করিতে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে,—তাহার গুণ তাহার শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, অতএব কর্ম্ম করিয়াই কর্ম্মের ক্ষয় করিতে হয়।

কমল। আমি কি বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া প্রভৃতি কায করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ?

কৃষ্ণা। তাহা নহে। কায সকলই—স্ব স্ব গুণোক্ত ভাবব্যূহ।

স্ত্রীলোক মাত্রেই সংসার-ধর্ম্ম সংসাধন করিতে জন্মগ্রহণ করে—সংসারের কায করিয়াই তাহার কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয়। তাই তোমাকে প্রথমে কায করিতে দিয়াছিলাম। তাহার পরে যম নিয়ম প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ব্রহ্মচর্য্য শিখাইয়াছি—এখন তুমি যোগিনী হইয়াছ। এখন একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ডাক।

কমল। ভগবান্‌কে ডাকিতে গেলেই রবীশ্বরকে ডাকিয়া ফেলি। ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে গেলেই রবীশ্বরের মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। ফলে ফুলে, পত্রে কুঞ্জে, পাহাড়ে ঝরণায়, আলোকে আঁধারে সর্ব্বত্রই আমি রবীশ্বরকে দেখিয়া থাকি। আমার চিত্তের যদি একাগ্রতা জন্মিয়া থাকে, তবে সে রবীশ্বরের উপরে।

কৃষ্ণা। জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল। যাহা হউক, যোগভ্রষ্ট হইলেও ফল আছে। আগামী জন্মে কৃষ্ণভক্তি পাইবে।

কমল। আচ্ছা, ঠাকুর;—অনেক দিন পর্য্যন্ত আর আপনার বন্ধু দরিয়াবাজ এদিকে আইসেন নাই কেন?

কৃষ্ণা। তিনি আর আমাদের এ জগতে নাই।

কমল। আহা; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে!

কৃষ্ণা। তুমি যে অর্থে মৃত্যু শব্দ ব্যবহার করিতেছ, তাহা তাঁহার অনেক দিন হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমানে আমাদিগকে যে অবস্থায় দেখা দিতেন, তাহা তাঁহার আভাসিক তনু।

কমল। ওমা; সে কি?—তিনি মানুষ নহেন ভূত?

কৃষ্ণা। হাঁ—স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ বাহির হইলে, প্রচলিত কথায় তাহাকে ভূতই বলে বৈ কি। ভূত মানে গত, তাহা তুমি ত জান।

কমল। ভূত আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিত—কতদিন আমার গায়েও হাত দিয়াছেন।

কৃষ্ণা। এখনও তোমার আত্মিকে ভয় আছে নাকি ?

কমল। ভয় নাই—বিস্ময় আছে।

কৃষ্ণা। কিরূপ বিস্ময় !

কমল। তিনি ত ঠিক মানুষের মতই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ আদি করিয়া বেড়াইতেন।

কৃষ্ণা। বিদেহিগণ ইচ্ছা করিলে তাহা পারেন। মনুষ্যের আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন তিনি দূর স্থানে থাকিয়াও এই জগতের সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন। যাহারা দেহ ত্যাগ করিয়া দ্রষ্টব্যে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মরিয়া যান নাই—অথবা আকাশে মিলিয়া যান নাই। তাঁহারা আত্মিকতনু ধারণ করিয়া, নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল-নিয়মিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন ; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, আত্মকৃত অথবা অন্যদীয় কর্ম্মের আকর্ষণে,—কখনও বা উচ্চতর ভাবের অনুশাসনে—পৃথিবীতে আসিয়া, মনুষ্যের সংবাদ লইতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা জড়-জগতে যে প্রকার জীবিত ছিলেন, অধ্যাত্মজগতে থাকিয়াও, ঠিক সেই আকৃতি, সেই প্রকৃতি, সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই অভিজ্ঞতা লইয়া সেই প্রকারেই জীবিত আছেন ; এবং সেখানে, শরীর ও মনে উচ্চতর শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া, জীব-হৃদয়ের উপর কার্য্য করিবার জন্য অধিকতর সুবিধা পাইতেছেন।

কমল। তাহা হইলে আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-ভালবাসার আকর্ষণে উর্দ্ধজগতে গিয়াও মানুষ এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন ?

কৃষ্ণা। নিশ্চয়ই। মা, আপনার দুধের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধধামে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি যে শিশুর সুকোমল স্নেহময় আকর্ষণ এড়াইতে পারিতেছেন না ; তিনি তাই, মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে আসিয়া, আপনার প্রাণধনকে অলক্ষিতভাবে সান্ত্বনা দান করেন এবং

কখনও বা তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া, আপনার উপস্থিতির পরিচয় দেন। পুত্র, মাতাকে সান্ত্বনা দিতে, পিতা কন্যাকে শোক হইতে ত্রাণ করিতে বা দুঃখ দুর্দ্দশায় আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া থাকেন। জগতে ইহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। *

কমল। দরিয়াবাজ সম্বন্ধেও এমনই একটা কোন আকর্ষণ ছিল কি?

কৃষ্ণা। নিশ্চয়ই।

কমল। কাহার? আপনার না, আমার?

কৃষ্ণা। রবীশ্বরের। আর যাহা, তাহা পরে জানিতে পারিবে।

কমল। দরিয়াবাজ রবীশ্বরের কে?

কৃষ্ণা। দরিয়াবাজ উহার পার্থিব নাম নহে। বর্ত্তমানের বিদেহী আত্মার আত্মগোপন-জন্য ঐ অদ্ভুত নামের সৃষ্টি। দরিয়াবাজ রবীশ্বরের পিতা।

কমল চমকিয়া উঠিল। তাহার প্রফুল্ল গোলাপের মত লোহিতানন আরও লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"ওঃ!—এ হতভাগিনীর সংস্পর্শে তাঁহার স্নেহের পুত্রের পার্থিব-জীবনে কষ্ট হইবে বলিয়া, তাই তিনি আমাকে অমন করিয়া নিষেধ করিয়া বেড়াইতেন। ভাল,—এখনও ত আমাদের সে আশা যায় নাই,—তিনি আর আসেন না কেন?"

কৃষ্ণা। এতদ্ভিন্ন পার্থিব আকর্ষণের তাহার আরও একটী প্রবল আকর্ষণ ছিল,—তাহা মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

কমল। সে কি?

কৃষ্ণা। সোণারকণ্ঠী।

---

* এতৎ সম্বন্ধীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি অবগত হইতে হইলে ও সমস্ত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত "জন্মান্তর-রহস্য" পাঠ কর। সাধ্যমতে তাহাতে এ সকল সঙ্কলন করিয়াছি।

কমল। ওঃ! কি আশ্চর্য্য! ভাল ঠাকুর; রাজবাড়ীর বান্ধাঘাটে রবীশ্বরের পিতার সোণারকণ্ঠী ও ধনরত্নশুদ্ধ পেটিকা কি করিয়া প্রোথিত হইল? আর সোণারকণ্ঠীতেই বা কি আকর্ষণ ছিল?

কৃষ্ণা। সে কথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই পরে সমস্তই শুনিতে পাইবে।

কমল। রবীশ্বর কি আবার এদেশে আসিতে পারিবেন?

কৃষ্ণা। কর্ম্মসূত্রে যেমন ঘটিবে, তেমনই হইবে। হয় ত আসিবে না, নয় ত আসিবে—আবার হয় ত এদেশে আসিয়াছে।

কমল। সে ত সহজ কথা—অমন কথা আমিও বলিতে পারি। আপনারা যোগবলে সমস্তই জানিতে পারেন,—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

কৃষ্ণা। যোগবলে অতীত ঘটনাই ভাল জানা যায়। মানবভাগ্যের কর্ম্মসূত্রের ভবিষ্যৎও দেখা যায়। কিন্তু পুরুষকারে কর্ম্মসূত্রকে একটু নূতন করিয়া গঠিয়া লয়—অনেক সময় সেটা ঠিক দেখা যায় না।

কমল। আপনাদের "যোগনিদ্রা" বলিয়া একটা বিদ্যা আছে, সেটা আমাকে শিখাইবেন?

কৃষ্ণা। তাহা শিখিয়া কি তুমি বুজরুকি বা বাজি করিয়া বেড়াইবে?

কমল। তাহাতে অতীত ঘটনা সকলই জানা যায়—জন্মজন্মান্তরের ব্যাপার সমস্তই বুঝা যায়।

কৃষ্ণা। তুমি যাহা শিখিতেছ,—তাহাতেই তাহা উত্তমরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিবে।

কমল। আপনার সেই গুপ্তবিদ্যা?

কৃষ্ণা। হাঁ।

কমল। সে ত যেমন যেমন বলিয়া দিয়াছেন, সমস্তই করিয়াছি—

যেরূপ যেরূপ হইবে ও দেখিতে পাইবে বলিয়াছিলেন—তাহা সমস্তই হইয়াছে। বাকি এখন কূটস্থ।

কৃষ্ণা। কূটস্থ গুরু-কৃপা না হইলে হয় না।

কমল। সে কি?

কৃষ্ণা। স্রোতোমুখী নদীতে একটা বাঁধ থাকিলে, তাহা কাটিয়া না দিলে, যেমন সে জল চলিয়া যাইতে পারে না,—তেমন ঐ গুপ্তবিদ্যার অন্তর্গত দেহে একটা বাঁধ আছে—জীবাত্মাকে সাধক ষট্‌চক্রের উপরে তুলিতে পারিলে, কোন সিদ্ধ-গুরু সেই বাঁধটুকু ভাঙ্গিয়া না দিলে কূটস্থ হইবার উপায় নাই।

কমল। আপনি কেন তবে আমার সে বাঁধ কাটিয়া দেন নাই? আমায় তবে শুধু শুধু খাটাইতেছেন?

কৃষ্ণা। কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। সম্ভবতঃ আগামী পূর্ণিমার দিন, তোমার জীবাত্মাকে কূটস্থ করাইব। তখন তুমি জড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে;—ইহলোক, পরলোক—জন্মান্তর, জন্মান্তরীয় ব্যাপার সমস্তই দর্শন করিতে পারিবে।

কমল। কূটস্থ হইতে জীবাত্মাকে আবার স্বস্থানে চালিত করিলেও ত, সে সকল কথা মনে থাকিবে?

কৃষ্ণা। মনে থাকিবে না কেন? নিশ্চয় মনে থাকিবে।

কমল। দরিয়াবাজ তবে আর আসিবেন না?

কৃষ্ণা। নাও আসিতে পারেন। নিজ পুত্রকে সোণারকণ্ঠী ও গুপ্তধন দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার আকর্ষণ ফুরাইয়া গিয়াছে।

কমল। কি আশ্চর্য্য! আমরা মড়া মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, ঝগড়া-কোন্দল করিয়াছি। তাহাতেই তিনি কোন্ পথ দিয়া আসিতেন, কোথায় যাইতেন—তাহার কিছুই ঠিক পাওয়া যাইত না। মনে মনে

কোন কথা ভাবিলেও, তিনি জানিতে পারিতেন। আমি ভাবিতাম, আপনারা যোগী—যোগবলদ্বারা সমস্তই বিদিত হইতে পারেন।

কৃষ্ণা। এক্ষণে তুমি কি করিবে?

কমল। বলেন, উঠিয়া গিয়া শয়ন করি।

কৃষ্ণা। সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

কমল। তবে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তাহাই বলুন।

কৃষ্ণা। এখন তুমি কোন্ পথে যাইবে? বিবাহ করিয়া সংসার করিবে—না,—যোগাবলম্বনে ভগবচ্চিন্তায় কালাতিপাত করিবে?

কমল। একথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কেন ঠাকুর?

কৃষ্ণা। মানবজীবনের একটা আশ্রম অবলম্বন প্রয়োজন।

কমল। কেন, যেমন বনবিহারিণী আছি, তেমনই থাকি না কেন? স্বাধীন প্রাণে আপনার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া দিনাতিপাত করি না কেন? যেমন বনের ফুল তুলিয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছি, তাহাই করি না কেন?

কৃষ্ণা। মর্ত্ত্যধাম কর্ম্মভূমি,—এখানে কর্ম্ম করিতে হয়।

কমল। যদি যোগাবলম্বনে ভগবচ্চিন্তায় দিনাতিবাহিত করি, তবে কর্ম্ম করা হইল কোথায়?

কৃষ্ণা। যোগাভ্যাসে চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া ভগবচ্চিন্তাতেও কর্ম্ম করা হয়।

কমল। কর্ম্ম কাহাকে বলে?

কৃষ্ণা। যাহা করা যায়, তাহাকেই কর্ম্ম বলে। সেই কর্ম্ম সৎ ও অসৎ আছে।

কমল। সৎ, অসৎ উভয় কর্ম্মই ত বন্ধনের হেতুভূত?

কৃষ্ণা। ভগবানের কর্ম্ম—আমি কে? আমি যাহা করি, সমস্তই

তাঁহার অভ্যাসের বলে, এই ভাবে কার্য্য করিলে, সে কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত হয় না।

কমল। ভগবানের কার্য্য—আমি কে? ইহাতে ত জীব ও শিবে পৃথক রহিল। আমিও কি তিনি নহি?

কৃষ্ণা। তিনি ও আমি এক বটে—কিন্তু জীব ও শিবে একত্ব হইলেও উপাধি উপহিত হইয়া জীব-শিবে পৃথক্ হইয়াছে। জীবত্বের ধ্বংস হইলে, অর্থাৎ উপাধি বিরহিত হইলে, তবে সে ভাব আইসে। সে অনেক দিনের কথা,—বহুজন্মের তপস্যার ফল। মানবের তখন জীবন্মুক্তাবস্থা।

কমল। আমি যদি বলি, আমি বিবাহ করিয়া সংসার পাতাইব।

কৃষ্ণা। তাহাও করিতে পার।

কমল। তবে এতকাল ধরিয়া শাস্ত্রপাঠ করিলাম,—এত কাল ধরিয়া যোগ অভ্যাস করিলাম—এসকল কঠোর সাধনার ফলে কি এখন সংসার করিয়া, বাসন মাজিব, ঘর ঝাঁট দিব—সন্তান প্রসব ও পালন করিব,—স্বামীর সেবা করিব,—তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিব। তাঁহার গালি খাইয়া—সম্ভব হইলে প্রহারও খাইয়া—তবে সংসার করিব। এই কি এত শিক্ষার ফল?

কৃষ্ণা। সংসারই ধর্ম্ম সাধনের প্রকৃত উপায়। সংসার আশ্রমই যোগীর বিচরণস্থল। সংসারই ভগবানের সোণার সিংহাসন। স্ত্রীলোকের পক্ষে সংসার যেমন কর্ম্মক্ষেত্র, এমন আর কোথাও নাই। রমণী যদি একান্ত মনে—অনাসক্ত ভাবে সংসার প্রতিপালন করে, তবে তাহাতেই তাহার সাধন চতুষ্টয় সমাপ্ত হয়। স্বামীসেবা, সান্ত জীবের সান্ত ভগবানের উপাসনা,—তাই স্ত্রী জাতির স্বামী দেবতা। এখানে রমণী—মহাপ্রেমিকা রাধা। সতীত্বের বিমল কিরণে ও কর্ম্মের আচরণে

স্বামীর সহায়তা করা স্ত্রী জাতির পরম ধর্ম্ম,—রমণী এখানে সাবিত্রী-রূপা। আর গণেশ-জননী-রূপে সন্তান পালন করিয়া রমণী মাতৃরূপিণী স্বধা,—সন্তান প্রসব করিয়া, সৃষ্টিকারিণী স্বাহা। নিজাঙ্গের সত্ত্বদানে সন্তানের দেহ বৃদ্ধি করিয়া রমণী মহাবীজ-স্বরূপিণী দশভুজা দুর্গা—রমণী—স্বামীর আত্মীয়স্বজন,—পিতামাতা প্রভৃতির সেবা করিয়া বধূরূপা জগদ্ধাত্রী. রমণীর সংসারই প্রকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র; সংসারযোগাশ্রমে রমণী পরম যোগিনী।

কমল। তবে কি আমায় এই পথেই যাইতে বলেন?

কৃষ্ণা। পারিলে, মন্দ নহে।

কমল। জগৎ যুড়িয়া স্ত্রীলোকে সংসার করে,—পতিপুত্র লইয়া,—আত্মীয়-স্বজন লইয়া ঘর-সংসার করে,—আর আমিই পারিব না!

কৃষ্ণা। সকলেই কি সংসারে আসিয়া নরত্বের উদ্দেশ্য বুঝিয়া কার্য্য করে! তাহা হইলে, কামনার বহ্নি দিবানিশি এরূপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া মানবকে পুড়াইত না। তাহা হইলে জগতে পাপের তাপ, দুঃখ দারিদ্র্য রোগ-শোক থাকিত না। জগৎ হইতে দুঃখের অন্ধকার অন্তর্হিত হইত,—সুখের বিমল সোণার কিরণ ছড়াইয়া পড়িত। আসা-যাওয়া, আকর্ষণ বিকর্ষণ দুর হইত। সকল রমণীই যদি যথার্থ রমণীর মত সংসার করিত,—পাপের প্রলোভন, ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ, জড়ের বিকর্ষন প্রভৃতিতে মজিয়া না পড়িত. তবে এ মর-সংসারও স্বর্গের মত কেবল সুখ—আর কেবল আনন্দে পূর্ণ হইত!

কমল। আমি ত একটু শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি—আমি সেরূপ ভাবেই সংসার করিতে পারিব।

কৃষ্ণা। শাস্ত্র পাঠে কর্ম্ম হয় না। জ্ঞানেই কেবল চিত্তশুদ্ধি হয় না।

কমল। কিসে হয়?

কৃষ্ণা। যোগে।

কমল। আমি ত তাহার অভ্যাসও করিয়াছি।

কৃষ্ণা। হাঁ, তাহা করিয়াছ বটে—পুরুষকারে যতদূর উন্নতি করিতে পারা যায়, তাহা তুমি করিয়াছ,—কিন্তু তোমার জন্মান্তরীয় কামনার সূক্ষ্মাদৃষ্ট তোমাকে সর্ব্বোন্নতির পথে যাইতে দিতেছে না। অদৃষ্ট বড় শক্তিশালী।

কমল। অদৃষ্টের নাশ হয় কিসে ?

কৃষ্ণা। কর্ম্মে।

কমল। সে কি কর্ম্ম ?

কৃষ্ণা। চিত্তশুদ্ধি।

কমল। আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কৃষ্ণা। কেন ?

কমল। যদি যোগাবলম্বনে চিত্তশুদ্ধি করিলেই অদৃষ্টের নাশ হয়, তবে আমার হইবে না কেন ? আমি ত তাহা করিয়াছি।

কৃষ্ণা। স্বর্ণ যেমন পুনঃ পুনঃ পুড়িয়া তাহার মলিনত্ব নাশ করে—তদ্রূপ জীব পার্থিব মরণে মরিয়া অদৃষ্ট নাশ করে। পর জীবনের কামনা ও আসক্তি লইয়া, ইহজীবনের ভিত্তি সংস্থিত। বনিয়াদ যায় না,—বনিয়াদ গেলেই গৃহ পড়িয়া যায়,—তখন আবার বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মফলের বনিয়াদ লইয়া নূতন জীবনের গৃহ নির্ম্মাণ হইয়া থাকে। ইহজীবনে তুমি যে কর্ম্ম করিতেছ, তদ্দ্বারা পরজন্মে তোমার প্রভূত উন্নতি হইবে—তুমি প্রকৃত যোগিনীর পদবীলাভ করিলে।

কমল। এ সারাটী জীবন লইয়া আমি কি তবে এই রূপেই থাকিব ? এই যে, একটু আগে বলিলেন—একটা পথ অবলম্বন করা চাই।

কৃষ্ণা। তা, চাই না ! কেবল শিক্ষা করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায় না। কায করিলেই ফল হয়।

কমল। তবে ক্ষেত্র দেখাইয়া দিন।

কৃষ্ণা। তোমার চিত্ত যে দিকে যাইবে—তুমি সেই দিকে যাইতে পার। কারণ, এখন তুমি শিক্ষিতা।

কমল। সংসারের পথে গেলে কি হয়?

কৃষ্ণা। বোধ হইতেছে, সে পথে গিয়া তুমি আসক্তির আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাইবে না। বোধ হয়, আরও জড়াইয়া পড়িবে।

কমল। কেন?

কৃষ্ণা। রবীশ্বর ভিন্ন অন্যকে বিবাহ করিয়া—সেই স্বামীকে সমস্ত হৃদয়ের আশা, বাসনা, প্রবৃত্তি ও সৌন্দর্য্য লইয়া পূজা করিতে পারিবে?

কমল। না।

কৃষ্ণা। কেন?

কমল। হৃদয়টা সমস্তই রবীশ্বরময় হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণা। তবেই দেখ,—সে পথ তোমার রুদ্ধ। যোগিনী হইয়া যোগসাধন করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

কমল। যোগিনীহৃদয়েও ত সে রূপ থাকিবে।

কৃষ্ণা। যাহা অতিক্রম্য নহে—তাহার জন্য ভাবিয়া কি হইবে? এ জন্মের যোগের ফলে—কামনা ও আসক্তির বলে উর্দ্ধরাজ্যে রবীশ্বরকে পাইবে। উভয়ে পরজন্মে উন্নত প্রণালীর প্রেম লইয়া আবির্ভূত হইবে—সেই প্রেমের সাধনে এক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

কমল। ঠাকুর;—এমন পথ বুঝি আমার পক্ষে আর নাই। আমি এই পথেই যাইব। রবীশ্বরকে না পাইলে আমি সংসারে কেন, স্বর্গেও যাইতে চাহি না। রবীশ্বর আমার সমস্ত হৃদয়খানা অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণা। আমরা তোমাকে যেরূপ যত্নে শিক্ষা দান করিয়াছি—তুমি

অভ্যাসের দ্বারায় যোগমার্গে যেরূপভাবে উন্নত পদবী লইয়াছ,—এক পূর্ব্বজন্মের ঐ প্রবলাকর্ষণেই কেবল ভগবানে নিষ্ঠা হইল না। যে ঐকান্তিকতা ভগবানে হইলে কৃতার্থ হইতে,—সেই ঐকান্তিকতা রবীশ্বরে হইল।

কমল। কেন, এমন হইল ঠাকুর?

কৃষ্ণা। পূর্ব্বজন্মের বাসনা বলে।

কমল। সে কিরূপ বাসনা ঠাকুর? আপনি ত যোগনিদ্রায়* আবেশ করাইয়া, মানবগণকে তাহার জন্মজন্মান্তরের কথা—জন্মজন্মান্তরের সমস্ত ব্যাপার দর্শন করাইতে পারেন। আমাকে একদিন সেইরূপ যোগনিদ্রায় আবিষ্ট করিয়া দেখাইবেন,—পূর্ব্বজন্মে রবীশ্বর আমার কে ছিল,—আমিই বা কি ছিলাম, কেনই বা রবীশ্বরের উপরে আমার এই ঐকান্তিক আকর্ষণ!

কৃষ্ণা। যোগনিদ্রায় যাহা জানা যায়, তাহা হইতেও জীবাত্মা কূটস্থ হইয়া অধিক—এবং সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ফল-কথা, জড় হইতে কোন প্রকার চৈতন্যের বিচ্ছিন্নতা ঘটিলেই সমস্ত ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যোগনিদ্রায়—নিদ্রিত অবস্থায় নিদ্রা স্বপনের মত দেখা যায়। কূটস্থ জাগরণ—জাগিয়া দেখার মত দেখা যায়।

কমল। তবে আগামী পূর্ণিমায় আপনার প্রসাদাৎ কূটস্থ হইয়াই সমস্ত দেখিব।

---

* বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই যোগনিদ্রাকেই Hipnosis বলিয়া থাকেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কমল, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের নিকট হইতে উঠিয়া, বাটীর পশ্চাদ্ভাগস্থিত উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানভ্রমণ কমলের অভ্যাসগত একটা রোগ। বুঝি, স্বাধীনা বনবিহঙ্গিনীর বনই ভাল লাগে। বুঝি, হতাশ-প্রণয়ের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে বনই উপযোগী। বুঝি, অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসার শান্তির জন্য বনই প্রশস্ত।

কমল, উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া —বিকশিত কুসুমে কুসুমে রূপের তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া দেখিয়া, অবশেষে একটা পাষাণবেদিকার উপরে উপবেশন করিল।

বৃক্ষবহুল উদ্যানের লতায়-পাতায় ফলে-ফুলে চাঁদের কিরণ পতিত হইয়াছে—যেন জ্যোৎস্নার বন্যায় সব ভাসিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। কামিনী-কুঞ্জ হইতে পরাগ-ধূসর ভ্রমর উড়িয়া যোজন-গন্ধার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তমালডালের নব শাখাগ্রে বসিয়া কোকিলবধূ বঁধুর প্রতি চাহিয়া—চাহিয়া চাহিয়া কেবলই চাহিয়া—পঞ্চমের সাধাসুরে কোন অব্যক্ত রাগিণীর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছে। মলয়-মাতাল টলিয়া টলিয়া ফুলের বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

কমল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, জগতে কোথাও ত প্রেমে বৈফল্য নাই,—তবে আমার থাকিবে কেন? কোথায় চাঁদ,—কোথায় পৃথিবী—তবু কিরণস্পর্শে এত আনন্দ! আমার হৃদয়ই সে দূরপ্রণয়ের কিরণ-ধারায় উচ্ছলিয়া উঠিবে না কেন? কেন আমি নিরানন্দে থাকিব! তবে মিলনের এ আকর্ষণ কেন? রবীশ্বরের জন্য—আমার জন্মজন্মান্তরের কামনা,—কিন্তু জন্মান্তরই কি এই অপূর্ণ

আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণ সাধ লইয়াই এইরূপ ছুটাছুটি করিতেছি ? রবীশ্বরের প্রেম প্রাণে মাখাইয়া আমার কি এমনই ছুটাছুটি—এমনই দৌড়াদৌড়ি ! হোক্—হোক—আমি তাঁহাকে নাই পাইলাম—তাঁহার এই মধুর প্রেম ত আমার হৃদয়ে আছে। শুধু প্রণয়েই আমার সুখ।

কমল, ভাবিল—তাঁহাকে না পাইলাম ক্ষতি কি ; তাঁহার প্রেম লইয়া জীবনটা কাটাইয়া দিব। কিন্তু তিনি কোথায় ? ঠাকুর সর্ব্বদর্শী, যোগবলে সমস্তই জানিতে পারেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, কিছুই বলেন না। যোগ গুহ্যশাস্ত্র—বোধ হয় যে, সেইজন্য যোগ-দর্শনীয় বিষয় কাহাকেও বলিতে নাই। যা থাকুক,—রবীশ্বর কোথায়—কেমন আছেন, এ সংবাদটী আমি কেমন করিয়া পাই। সেই বিদায়—এমনই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর শেষ যামে—সেই শেষ বিদায় ! আর দেখা পাইলাম না—দেখা না পাই ক্ষতি নাই। কিন্তু কেমন আছেন—সে কথাটীও কি শুনিতে পাইব না। তাঁহার কুশলেই আমার কুশল—তিনি আছেন, তাই আমি আছি। শুধু এ জন্মে নহে—ঠাকুরের মুখে শুনিলাম, জন্মজন্মান্তর—কত জন্ম জন্ম ধরিয়া, রবি আছে,—তাই আমি আছি। তবে একটা সংবাদ পাই না কেন ?

কমল নিস্তব্ধ হইল। তাহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু দুইটী স্থির হইল। উদাস সমীর হেলিতে দুলিতে আসিয়া কমলের কপাল-পতিত চুলগুলি দুলাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। জ্যোৎস্নাময় সুন্দর মুখ প্লাবিত ছিল। অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া ভাবিয়া কমল দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, একটা গান গাহিল। ভাবিতে ভাবিতে প্রাণের কাণের কাছে বুঝি, সুরের রেস উঠিয়াছিল—সেই সুরের তরঙ্গহিল্লোলে জ্যোৎস্না কাঁপিয়া [illegible] ফুলেরা শিহরিল—কোকিলবধূ কোকিলের মুখে মুখ দিয়া প্রেম-

সুধা পান করিল। উদাসিনী—যোগিনী কমল পদ্মাসন করিয়া বসিয়াছিল। সে গাহিল,—

না আসিলে—না ছুঁইলে, ক্ষতি কি তাহায়।
না হ'ল না হোক দেখা, তোমায় আমায়।
মরণের পর পারে
মিলনের-উপকূলে
চির-পরিচিত রূপে মিলিব দোঁহায়।

সব গ্রহ ঘুরে ঘুরে,
অবশেষে সুরপুরে
যখন মিলিব গিয়ে তোমায় আমায়,—
বসিব বেদিকা-তলে,
বাঁধিব বাহুতে গলে,
চুমি চুমি নেহারিব কেবল তোমায়।

এ মিথ্যা জীবন ছাই,—
না আসিলে ক্ষতি নাই,
তোমারি ধেয়ানে রব এ কটা' নিশায়,
কাটীবে এ কটা' দিন তোমারি আশায়।

গান সমাপ্ত হইলে, আরও অনেকক্ষণ কমল সেখানে বসিয়া, মুদিতনেত্রে স্তব্ধশ্বাসে কি চিন্তা করিয়াছিল। সে অনেকক্ষণ—বোধ হয়, চারিদণ্ড ধরিয়া বায়ুনিরোধ করিয়া কি ভাবিয়াছিল,—বোধ হয়, রবীশ্বরের রূপ। ক্রমে কমলের মুখ প্রসন্ন হইল,—ম্লান অধরে হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। বুঝি অন্তর্জ্জগতের স্বচ্ছ দর্শনে বাঞ্ছিত রূপ দেখিয়া কমল বিকশিত হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙ্গিল,—কমল দীর্ঘ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—এই রূপই সুন্দর। আর লোকালয়ে থাকিব না। আগামী পূর্ণিমার দিন ঠাকুরের নিকট কূটস্থ হইবার উপায় শিক্ষা করিয়া,—কোন নির্জ্জন পর্ব্বতে চলিয়া যাইব। সেখানে গিয়া দিবানিশি ধ্যান-ধারণায় রবীশ্বরের রূপ লইয়া থাকিব।

সমীরণ-চ্যুত একটী শুষ্ক-শীর্ণ পত্র আসিয়া, কমলের মস্তকে পতিত হইল। কমল চমকিয়া উঠিয়া, মাথায় হাত দিয়া দেখিল, —একটী শুষ্ক পত্র! ভয় দূর হইল,—কিন্তু জড়ত্বে হৃদয় অধিকার করিল। কমল ভাবিল.—না, এত শীঘ্র যাইব না। রবীশ্বরকে না বলিয়া যাওয়া হইবে না। রবীশ্বর আমাকে বড় ভালবাসে—যদি সে মণিপুরে আসিয়া আমায় না দেখিতে পাইয়া কষ্ট পায়! আমি যাইব না—কোথায়ও যাইতে পারিব না।

সহসা কমল দেখিতে পাইল,—অদূরে মাধবী-কুঞ্জের অন্তরাল হইতে একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলের প্রাণে একটা অজানা আশার বাতাস প্রবাহিত হইল। সে ভাবিল,—আর এক দিন এমনই মধু যামিনীতে, ঐ মাধবী-কুঞ্জের পথে রবীশ্বর আসিয়াছিল। সে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিল,—যে মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল,—সে কমলের দিকে আসিতে লাগিল। সহসা পার্শ্বের কামিনী-ফুলের ডাল নড়িয়া উঠিল,—কমল সে দিকে চাহিয়া দেখিল আর একটী মনুষ্য মূর্ত্তি। অতর্কিত ভাবে, চঞ্চল গতিতে সেই দুইজন মনুষ্য দুইদিক দিয়া আসিয়া কমলকে চাপিয়া ধরিয়া, একখানা বস্ত্রের দ্বারা তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। কমল মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। উভয়ে ধরিয়া লইয়া উদ্যানের বাহির করিল,—রাস্তায় একখানা শিবিকা অপেক্ষা করিতেছিল,—ভীমকায় পুরুষ দুইজন তাহার মধ্যে মূর্চ্ছিতা কমলকে পূরিয়া দিল। বাহকেরা শিবিকা তুলিয়া নিঃশব্দে অথচ অতি দ্রুতগতিতে শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল।

যে মনুষ্য দুইজন এই কার্য্য সম্পন্ন করিল, তাহারাও সে পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ বহিয়া গিয়া একটা মদের দোকানে প্রবেশ করিল। উভয়ে সেখানে বসিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল দুই চারি পাত্র উদরস্থ হইতেই তাহাদের প্রাণে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল। তাহারা পরস্পর তখন ঐ কৃতকার্য্যের বাহাদুরিত্বের গল্প করিতে লাগিল। একজন বলিল, —"ঢাল্, বাবা ;—আরও মদ ঢাল্। আজ মদের শ্রাদ্ধ হবে বাবা !"

দ্বিতীয়। খা না শালা,—কত খেতে পারিস্,—খা না। আজ তোকে মদে ডুবোবো। রোজ্‌গার ত কম নয়—দুজনে দুশো টাকা। না হয়, দশ টাকা মদেই যাবে।

প্রথম। দশ টাকার মদ দুজনে—তা আর খেতে হয় না রে, খেতে হয় না।

দ্বিতীয়। তবে যে ভারি ওস্তাদি কোচ্ছিস্—ঢাল্ ঢাল্ তোরে ফাঁষিয়ে দিচ্ছি ?

প্রথম। আর একটু নেশা জমে উঠ্‌বে তো ? দে, দে ;—ও পাত্রটা আমায় দে।

দ্বিতীয়। এই নে শালা,—খা।

প্রথম। তুইও খা।

দ্বিতীয়। খাব বৈ কি ! দেখ শালা ;—কি মেয়ে মানুষটা। যেন মাখনের দলা। আমার বাবাও কখন অমন মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয় নি। গায়ে হাত দিতেই গাটা যেন শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগলো।

প্রথম। তাইতে বুঝি শালা, ওর রগে অমনি ঘুসিটা মাল্লি !

দ্বিতীয়। ঘুসি না চালালে কি অজ্ঞান হোত ! ওর গায়ে জোর কম নয়। অমনি কোরে ঘুসিটা না লাগালে, আমাদের দুজনাকে হারিয়ে দিয়ে, মুখের বাঁধন খুলে চ'লে যেত।

প্রথম। আচ্ছা, রতনচাঁদ ওকে নিয়ে গিয়ে কি কোর্ব্বে ?

দ্বিতীয়। কেটে আল্‌তা পর্‌বে।

প্রথম। রতনচাঁদ কি মেয়ে মানুষ ?

দ্বিতীয়। মেয়ে মানুষ কি মেয়ে মানুষের আল্‌তা পরে ?

প্রথম। তবে যে বোল্লি।

দ্বিতীয়। তোর শালা কাব্যরসে দখল নেই !

প্রথম। আ—গব্যরসে আছে।

দ্বিতীয়। এমন মেয়ে মানুষ কি কোর্‌বে ? ভোগে লাগাবে।

প্রথম। যাগ্‌গে—আমাদের দু'শ টাকায় অনেক দিন মদ গাঁজা চল্‌বে।

দ্বিতীয়। মাগীর জন্য কি সোজা কষ্ট পেয়েছি—আজ দশ দিন ধ'রে ঐ বাগানে ব'সে রাত জাগ্‌ছি। শালীর বেটী শালী এতদিনের মধ্যে একবার বাগানের মাটি দলালে না। আজ !

প্রথম। তা বোল্‌তে! যাক্‌, মদ খা। ও কথায় আর দরকার নেই। কি জানি বাবা,—কে শুন্‌তে পাবে। মদের আড্ডায় আবার পুলিশের লোক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। শেষে শুন্‌তে পেয়ে আবার ফ্যাঁসাদে ফেল্‌বে।

দ্বিতীয়। তোর পুলিশের মাথায় মারি ডাবের কাটি। পুলিশ ত শক্তের ভক্ত। টাকার গোলাম। আমরা যার কায কোরেছি—তার নাম শুন্‌লে পুলিশ সেলাম কোরে পেছিয়ে যাবে। বল ত ঘরের মেয়েমানুষটাও এনে দেবে।

প্রথম। তাকে দিতে পারে,—কিন্তু আমরা গরীব,—আমাদের নিয়ে টানাটানি কোরবে। তাদের যত মর্দ্দানি গরীবের উপর।

দ্বিতীয়। তা বটে, কিন্তু রতনচাঁদের একটা হাঁকুনিতে পুলিশ চিৎ হবে।

প্রথম। অত ফ্যাঁসাদে কাজ কি—তুই মদ দে, আর সেই গানটা গা।

তখন দুইজনে আরও পাত্র কয়েক মদ খাইয়া, মদ-মত্ত আঁখি ঘুরাইয়া, মাথা নাড়িয়া, দেহ দুলাইয়া, ভয়-জড়িত স্বরে গাহিতে লাগিল,—

ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ আরো মদ ঢাল্,
পেটেতে রয়েছে এখনো খাল্।
বিভোর হইব মুদিব চোখ্
হয় যদি বমি—তা' একবার হোক্,
পড়ি যদি রাস্তায় ঘুমাব সুখে,
কুকুরে না হয় মুতিবে মুখে
চৌকিদারে ধরে যদি বাড়ী যাব কাল্,
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ আরো মদ ঢাল্।
কবিরাজ শালা বলে ব্যামো হয় মদে,
মদ খেলে গিন্নী, চুল ছেঁড়ে—কাঁদে
পুরুৎ বেটা এসে কত শাস্তর্ পড়ে,
মা বেটী কত কাঁদে দুটী হাত ধ'রে,
তাই কি ওরে ভাই ছেড়ে দেব হাল্ ?
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ আরো মদ ঢাল্।
টাকা যদি না যোটে বিষয়-আশয় বেচ্‌বো,
শেষে যদি না কুলোয় চুরি বিদ্যে ধোর্‌বো,
ছেলেপুলে কি খাবে তাই যদি বলিস্,
সবি মায়া—সবি মোহ—মিছে কেন ভুলিস্।
সন্ধ্যাকালে মদ মেরে দুনিয়া দেখি লাল্,
ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ আরো মদ ঢাল্—
পেটেতে রয়েছে এখনো খাল্।

মদ্যপানানন্তর উভয়ে বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়া গেল। কে কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। বাড়ী-ঘর-দুয়ার তাহাদের যে তেমন আছে তাহাও নহে। জগতের পাপশক্তি বৃদ্ধি করণ জন্যই বুঝি তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বুঝি, পুণ্যের ধারে পাপের পূর্ণমূর্ত্তি দেখাইবার জন্য তাহাদের সৃষ্টি—অথবা জগতে দেব ও দানব লইয়াই কার্য্য!

দ্বিতীয় গুণ্ডা চলিয়া যাইতে যাইতে দেখিল,—রাজপথের পার্শ্বের গলি পথ দিয়া একটী যুবতী স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাবৃত করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। গুণ্ডা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। স্ত্রীলোকটীর পশ্চাদনুসরণে তাহার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন কি,—তাহা সে-ই জানে।

স্ত্রীলোকটী বরাবর গিয়া একটী বাড়ীর দরোজায় আঘাত করিল। একজন পুরুষ আসিয়া দরোজা খুলিয়া দিয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি, এত রাত্রে কি জন্য?"

স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল,—"আমার নাম বলিলে চিনিতে পারিবে না। কবিরাজ মহাশয় কোথায়?"

যে দরোজা খুলিয়া দিয়াছিল, সে কবিরাজ মহাশয়ের ভৃত্য। এ বাড়ী কবিরাজ মহাশয়ের। ভৃত্য বলিল,—"তিনি শয়ন করিয়া আছেন,—তোমার খবর কি?"

স্ত্রী। আমার স্বামীর বড় ব্যায়ারাম—আমার আর কেহ নাই যে, এখানে আসে, তাই নিজেই আসিয়াছি। কবিরাজ মহাশয়কে আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।

ভৃত্য। তুমি একটু দাঁড়াও—আমি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।

স্ত্রীলোকটী দরোজায় দাঁড়াইয়া থাকিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"তাঁহার শরীর অসুস্থ আছে, আজি যাইতে পারিবেন না।"

স্ত্রীলোকটী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিল,—"আমার স্বামীর অসুখ বড় কঠিন, কা'ল গেলে তিনি বাঁচিবেন না।"

ভৃত্য বলিল,—"এ রাত্রে তিনি কিছুতেই যাইতে পারিবেন না।"

স্ত্রী। আমি তাঁহার দর্শনীর টাকা আনিয়াছি।

ভৃত্য। তাহা হইলেও যাইবেন না।

তখন স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে যে পথে আসিয়াছিল,—সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

দূরে দাঁড়াইয়া দুরাত্মা দ্বিতীয় গুণ্ডা, স্ত্রীলোকটী যখন ভৃত্যের সহিত কথা কহে, তখন তাহাকে দেখিয়াছিল,—দেখিয়াছিল, অনিন্দ্যসুন্দরমুখী। সে মুখ দেখিয়া পাপাত্মার পাপ-হৃদয় চমকিয়া উঠিল। সে নরক হৃদয়ে কামনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যুবতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর যাইয়া যেখানে মনুষ্যাবাস শূন্য হইল,—সেই স্থানে একটা বড় রকমের বাগান, সেই বাগানের অদূরে যখন যুবতী পঁহুছিল, তখন পাপাত্মা যুবতীর পশ্চাদ্ভাগের কাপড় ধরিয়া টান দিয়া বলিল,—"কে তুমি মেয়ে মানুষ?"

যুবতী চমকিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় ভয়ে বিচলিত হইল। চমকে চাহিয়া দেখিল, একটী পুরুষ।

যুবতী কাতর চাহনিতে চাহিয়া করুণস্বরে বলিল,—"কে তুমি? আমার বড় বিপদ, গৃহে আমার স্বামী বাঁচে না।"

ভ্রুকুটী করিয়া পাপাত্মা বলিল—"জানে দেও মেয়েমানুষ; তোমার রূপ আছে, রূপের হাট খুলো—স্বামী যুটবার ভাবনা কি?"

যুবতী বুঝিল, কাতরতার কায নহে। সে তখন সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিল,—"পাপাত্মা! সাবধান!"

পাপাত্মা ভঙ্গীস্বরে বলিল,—"কি বাহ্ ভয় দেখাচ্চ। তা ছাড়চি না—বাবা!"

যুবতী চীৎকার করিয়া উঠিল। পাপাত্মা তখন লাথি মারিয়া যুবতীকে ফেলিয়া দিল। তথাপি যুবতী চীৎকারে বিরত হইল না—তখন পাপাত্মা কোমর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া, যুবতীর বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল।

যুবতী আকুলস্বরে স্বামীর উদ্দেশে বলিল,—"প্রাণতম, আর দেখা হইল না। তোমার ব্যায়ারামের সময় সেবা করিতে পারিলাম না!"

হতভাগ্য গুণ্ডা তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। যুবতী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে মহানিদ্রায় অভিভূত হইল। মণিপুরে এইরূপ অভিনয় তখন সর্ব্বত্র। সর্ব্বত্রই চোর, ডাকাত, গুণ্ডার উপদ্রব! এইরূপ অরাজকতায় তখন মণিপুর অবসন্ন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সংসার-সাগরে ভাসমানা বনবিহঙ্গিনী কমলকে পাইয়া অতিমাত্র আনন্দিত হৃদয়ে রায় রতনচাঁদ তাহাকে একটা গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, তৎপরদিবসই মণিপুরের মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।—উদ্দেশ্য, এই ব্যাপার লইয়া যদি একটা গোলযোগ বা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন একমাত্র ভরসাস্থল, মন্ত্রী-মহাশয়। কাযেই এখন একবার তাঁহাকে বলিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিয়া কার্য্য করাই সুযুক্তি!

মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একটা নিভৃত কক্ষে বসিয়া ছিলেন। সেখানে আর কেহ ছিল না,—একজন ভৃত্য গিয়া রায় রতন-

চাঁদের আগমনবার্ত্তা প্রদান করিল। মন্ত্রী ভৃত্যকে বলিয়া দিলেন,—"তাঁহাকে এখানে আসিতে বল।"

ভৃত্য সে সংবাদ প্রদান করিলে রতনচাঁদ, মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট আগমন করিলেন এবং যথাযোগ্য হইতেও কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় অভিবাদনাদি করিয়া বলিলেন—"প্রভুর সমস্ত মঙ্গল ত?"

একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্দ্ধণ বলিলেন,—"হাঁ, মঙ্গল বৈ কি, তুমি কেমন আছ?"

রতন। আপনি যাহার সহায়—যে আপনার আশ্রিত ও রক্ষিত, তাহার আর অমঙ্গল কোথায়?

মন্ত্রী। শারীরিক?

রতন। আপনার পবিত্র-স্নেহাশীর্ব্বাদে তাহাও ভাল।

মন্ত্রী। তৎপরে রবীশ্বরের আর কোন খোঁজ-খবর পাও?

রতন। কৈ, আর কিছুই পাই না। শুনিয়াছি,—সে নাকি শান দেশে গিয়াছে। আপনার মুখখানা অত গম্ভীর ও ম্লান দেখিতেছি কেন?

মন্ত্রী। কৈ না।

রতন। নিতান্ত অধীন-ভৃত্যের সহিত ছলনা করিবেন না। আপনার মুখ দেখিয়া স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যাইতেছে—আপনি কোন গভীর দুঃখের চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। আশা করি, অধীনকে তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। যদি সন্ধান পাই—প্রাণ দিয়াও সে চিন্তার কারণ দূর করিতে প্রয়াস পাইব।

মন্ত্রী মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"না হে, সেরূপ কিছুই নহে।"

রতনচাঁদ ব্যগ্রস্বরে বলিলেন,—"তবে কি?"

মন্ত্রী। কিছুই না,—কল্য শেষরাত্রে একটী স্বপ্ন দেখে, মনটা যেন কেমন হইয়াছে।

রতন। স্বপ্ন! স্বপ্ন মিথ্যা—অলীক। উহা বায়ুর কার্য্য মাত্র। আপনি কিছু মাত্র মনে করিবেন না। লোকে কথায় বলে "স্বপ্নের খেলা।" ওর ষোল আনাই ভুল।

মন্ত্রী। স্বপ্ন কখন কখন সত্যে পরিণত হয়।

রতন। সে সকল কিছু না,—কিছু না। আপনি মন খারাপ করিবেন না। আমি প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন প্রকারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকি,—কখনও ত ফলিতে দেখি নাই।

মন্ত্রী। যাক্—এখন পূর্ব্বাহ্নে কি মনে করিয়া আসা হইয়াছে?

রতন। আপনার চিত্তটা যেরূপ খারাপ আছে,—তাহাতে সে সকল কথা আর পাড়িবার আবশ্যক নাই।

মন্ত্রী। না,—না। আমি বুঝিতেছি স্বপ্ন মিথ্যা। তবে মনটা যেন কেমন কেমন করিতেছিল,—এখন পাঁচ কথায় একটু নরম পড়িয়া আসিতেছে। হাঁ,—কি জন্য আসিয়াছ,—তাহা বল।

রতন। কৃষ্ণানন্দঠাকুর কোন প্রকারেই আমার সহিত কমলের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইল না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগুলো ভারি একগুঁয়ে।

মন্ত্রী। তুমি তবে এখন কি করিবে?

রতন। আপনার বলে এক কায করিয়া ফেলিয়াছি।

মন্ত্রী। কি করিয়াছ?

রতন। কমলকে গোপনে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

মন্ত্রী। বুদ্ধিমানের কায করিয়াছ,—এবার আর যায় কোথায়? তারপর?

রতন। তারপরে যাঁহার বলে আমি বলীয়ান্, তাঁহাকে সেই কথাটা জানাইতে আসিয়াছি। যদি কোন গোলযোগ হয়, তখন আপনি ভিন্ন কে রক্ষা করিবে।

মন্ত্রী। ভাল দেখিয়াছ—একটা টীকি-নাড়া বামুন, সে আর কি করিবে ? বিশেষতঃ তার কিছু মেয়েও না। এখন, বাড়ী নিয়ে গিয়ে কমলের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলে ?

রতন। হাঁ, করিয়াছিলাম। কিন্তু সে বলে, মরিব ;—তবু তোমার বিবাহ করিব না।

মন্ত্রী। প্রথম প্রথম অমন করিয়া থাকে।

রতন। আমি একটা মৎলব ঠিক করিয়াছি।

মন্ত্রী। কি ?

রতন। আগামী চব্বিশে তারিখে যে দিন আছে,—সেই দিন পুরোহিত ডাকিয়া, জোর করিয়া বিবাহ কাযটা সারিয়া লই।

মন্ত্রী। উত্তম পরামর্শ,—বিবাহ হইয়া গেলে, তখন আর কি করিবে ?

রতন। বিবাহ স্থলে আপনার উপস্থিতি প্রার্থনীয়। কেন না যদি কোন হেঙ্গাম হয়।

মন্ত্রী। ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু গোটাকতক সুন্দরী মেয়ে-মানুষের যেন যোগাড় থাকে।

রতন। আর এক কথা,—

মন্ত্রী। কি বল ?

রতন। কৃষ্ণানন্দঠাকুর যদি ইহার মধ্যে সন্ধান পায়, যে আমি কমলকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছি,—আর সে যদি সামন্ত ও সর্দ্দারগণকে এই কথা বলে। আর তাহারা যদি আমার বাড়ীতে চড়াও হয়, তখন আমি কি করিব ? আমার ভরসা কেবল আপনি।

মন্ত্রী। ভাল, তাহার বন্দোবস্ত করিব। জনচল্লিশ সৈন্য তোমার বাড়ীতে রাখিয়া দিব।

রতন। আর এক কায করিলে হয় না।

মন্ত্রী। কি ?

রতন। কোন একটা অপরাধের অছিলায় অদ্যই কৃষ্ণানন্দঠাকুরকে বন্দী করিয়া কারাগারে পাঠাইলে হয় না ?

মন্ত্রী চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উত্তম পরামর্শ। আমি এখনই সহর কোতোয়ালের উপর পরোয়ানা পাঠাইতেছি।"

"তবে এখন বিদায় হই।"—এই কথা বলিয়া রতনচাঁদ মন্ত্রী মহাশয়ের চরণ-তলে চারিখানি বহুমূল্য মণি রাখিয়া বিদায় হইলেন।





ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ, কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছি—পথ আর ফুরায় না—কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই;—মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই—কবে চলা শেষ হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, ভাবিতে গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এপাশে ওপাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ! অ—হ—হ-কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব ছাড়িয়া, সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছুড়িয়া ফেলিয়া চলিতেছি—অবিরাম চলিতেছি, অনন্তকাল চলিতেছি! তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও একটু দয়ামায়া, একটু কৃপাকরুণা আছে যে, একটী যবপরিমিত পথ, একটী মুহূর্ত্তপরিমিত কাল কমিয়া যাইবে! যাহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতেছি,—তাঁহাতেও ত দয়ামায়া নাই, কৃপা-করুণা নাই। তিনি যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব

থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না—জড়ত্ব পরিহারের জন্য—দূরীকরণ জন্য, বহুজন্ম হইতে চেষ্টা করিতেছি, তথাপিও সাধন-সিদ্ধি হইল না।

একদিন দুপুর বেলায় নিস্তব্ধ পথের ধারের একটা নিস্তব্ধ বৃক্ষতলে বসিয়া, মুদ্রিত নয়নে একটী পথিক মনে মনে এই কথারই আন্দোলন করিতেছিল। মধ্যাহ্ন-রৌদ্র তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। বাতাস একটুও ছিল না;—প্রকৃতি যেন তখন যোগসাধনায় কুম্ভক করিয়া বসিয়া আছেন। পথশ্রান্ত পথিকের মুখমণ্ডল লাল হইয়া গিয়াছে—বিন্দু বিন্দু স্বেদনীরে মুখখানি শোভাতিশয় ধারণ করিয়াছে। দূরে একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের নবকিসলয় কুঞ্জে বসিয়া, শ্যামা খুব করুণস্বরে এক একবার ডাকিয়া ডাকিয়া প্রকৃতির দরবারে তাহার মনের ব্যথা জানাইয়া দিতেছে। পথিক,—রবীশ্বর।

রবীশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষ-মূলে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া, অলস-আবেশে চক্ষু মুদিত করিয়া অধ্যাত্মভাবনায় নিমগ্ন। কোন দিন দুপুরবেলায় এমন আধ্যাত্মিকতা জীবহৃদয়ে উদয় হয়,—কিন্তু সে তত্ত্বের স্থায়িত্ব হয় না। সন্ধ্যার মোহন-সুরে—অবিদ্যার কটাক্ষ-বিক্ষেপে মানুষ সব ভুলিয়া যায়।—ভুলাইবার জন্যই ত এত ষড়যন্ত্র। বাঁশীর স্বরে ক্রূর সর্প ভুলিয়া গিয়া, বেদের বোঝায় চড়িয়া বসিতেছে,—হরিণী, ব্যাধের বাগুরায় বিজড়িত হইতেছে।—বাঁধিবার জন্যই অয়োজন, বাঁধা না পড়িবে কে? কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন্ দৈবী শক্তির আবির্ভাবে এক একবার মনে পড়ে—মনে পড়ে, আমি কি ছিলাম, কি হইয়াছি—আর কতকালই বা ঘুরিব—ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি ঘোরার কায সারা হইবে না! সকলেরই মনে আসে—তাই রবীশ্বরেরও আসিতেছিল,—সহসা রবীশ্বরের চিন্তার স্রোতে বাঁধ পড়িল। একজন তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"নিদ্রিত না কি?"

এতটুকু আধ্যাত্মিকতা! এতটুকু নিদ্রা,—পূর্ণ জড়ত্বের অন্তরে এতটুকু চৈতন্য! ধ্যানটায় জড়ত্বেরই আধিক্য। জড়ের ঝঙ্কার কাণের প্রাণে সত্বরেই পঁহুছিল। রবীশ্বর চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ জয়সিংহ।

রবীশ্বর বলিলেন,—"আপনারই অপেক্ষায় এখানে বসিয়া আছি।"

জয়সিংহ বলিলেন,—"হাঁ, আমাকে এই স্থানে আসিতেই ত সংবাদ দিয়াছিলে।"

রবি। ওদিকের সংবাদ কি?

জয়। আমি কাল প্রভাত হইবার একটু পূর্ব্বেই মণিপুরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দরবার বসিবার পূর্ব্বেই দরবারগৃহে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলাম।

রবি। আপনাকে কেহ চিনিতে পারে নাই ত?

জয়। না;—যে লম্বা দাড়ি মুখে ছিল।

রবি। তার পর বিজয়সিংহের অদৃষ্টে কি বিচার হইল?

জয়। যাহা হইবার তাহাই হইল!

রবি। কি হইল,—ফাঁসির আদেশ হইল?

জয়। হাঁ।

রবি। ফাঁসি কবে হইবে?

জয়। আগামী পরশ্ব অতি প্রত্যুষে। আমি এমনই হতভাগ্য,—সেই ফাঁসির কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে দেখিয়া আসিলাম।

রবি। বিচারস্থলে বিজয়সিংহকে আনান হইয়াছিল?

জয়। হাঁ—তাহা হইয়াছিল বৈ কি?

রবি। তিনি কি অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন?

জয়। না, তাহা হন নাই। তবে মুখখানা ম্লান হইয়াছে।

রবি। আপনাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন ?

জয়। বোধ হয়, না।

রবি। সাক্ষী আদি হইল ?

জয়। সেই দলিলগুলি সাক্ষী হইল,—বিচারক বলিলেন, এই দলিলগুলিই তোমার বিদ্রোহিতার প্রমাণ দিতেছে।

রবি। দলিলগুলা শেষে কি হইল ?

জয়। সেই আদালতেই পুড়াইয়া ফেলা হইল।

রবি। কি হেতুবাদে তাহা পোড়ান হইল ?

জয়। আগেকার রাজাদের দলিল,—এখন আর কি হইবে ?

রবি। আপনি দেখিতে পান নাই যে, দলিল কি সবই একত্রে ছিল ?

জয়। বোধ হয় না,—যেন কিছু কম।

রবি। অবশ্য কমই হইতে পারে। মন্ত্রীর দলিলগুলা—যাহাতে মন্ত্রী দোষী হইবে, অবশ্য সে গুলা চাপিয়াই—মন্ত্রী রাখিয়া দিয়াছে। তারপর রাণীমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ?

জয়। রাত্রে তাঁহার সাহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

রবি। তিনি সমস্তই শুনিয়াছেন ?

জয়। হাঁ শুনিয়াছেন বৈ কি ;—কেবল কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিলেন।

রবি। দেখুন, রাজপুত্র ;—আমাদের জন্য ভাবি না, আমরা যেমন পথের ভিখারী পথিক—তেমনই থাকিব। বিজয়সিংহের ফাঁসি—ডাকিয়া আনিয়া আমরা তাঁহাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইলাম ; আর রাণীমার কথা ভাবিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে,—আমি এমনই কাপুরুষ,—তাঁহাকে নানা ছলনায়, নানা আশার প্রলোভনে ভুলাইয়া আনিয়া, তাঁহার কোমল হৃদয়ের নিরন্ত আগুন জ্বলন্ত করিয়া দিলাম। তাঁহার আঁখিঝরা

জলে আমাকে যেন অভিশাপ দিতেছে। রাজপুত্র;—কোন্ প্রাণে আবার সেই বিষাদ প্রতিমাকে তাঁহারই রাজত্ব হইতে ভিখারিণীর ন্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইব!

রাজকুমার জয়সিংহও অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন।

তৎপরে রবীশ্বর বলিলেন,—"চলুন, আমরা পুনরায় মণিপুরে গমন করিব। এবার অন্তিম চেষ্টা করিয়া দেখিব। বিজয়সিংহের পরশ্ব প্রভাতে ফাঁসি হইবে,—দেখি যদি ইহার মধ্যে কিছু করিতে পারি। যুবরাজ; বেলা আর কতখানি আছে?"

যুবরাজ একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"বেলা বোধ হয়, এখন তৃতীয় প্রহর।"

রবি। মণিপুর এখান হইতে তিন ক্রোশ হইবে,—আরও একটু বেলা যাক্। কেন না, এখন বাহির হইলে অনেক বেলা থাকিতেই আমরা মণিপুরে পঁহুছিতে পারিব। কিন্তু দিবাভাগে—কোন প্রকারেই সেখানে যাওয়া হইবে না।

জয়। রবীশ্বর;—তোমার জন্মস্থান কোথায় জান কি?

রবি। না;—তবে শুনিয়াছি, বঙ্গদেশে। যখন আমার বয়স দুই কি তিন বৎসর, তখনই কাকা আমাকে লইয়া মণিপুরে আসিয়াছিলেন।

জয়। তোমার পিতামাতা আছেন?

রবি। না।

জয়। তাঁহারা কি এই দেশে আসিয়া মারা পড়িয়াছেন?

রবি। না। আমার জ্ঞান হইয়া আমি তাঁহাদিগকে দেখি নাই শুনিয়াছি, তাঁহারা সেই দেশেই মরিয়াছেন।

জয়। তোমার সাহস—তোমার বিদ্যাবুদ্ধি—তোমার হৃদয় ক্ষত্রিয়ের ন্যায়।

রবি। রাজকুমার; আপনি দরিয়াবাজকে চেনেন ?

জয়। দরিয়াবাজ! কে দরিয়াবাজ ? আমি ত চিনি না।

রবি। তাঁহার অধিক পরিচয় আর কিছুই জানি না। তিনি বোধ হয় ঐন্দ্রজালিক হইবেন। তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত।

জয়। ও, হো, মনে হইয়াছে। তাঁহাকে কেহ বলে যাদুকর—কেহ বলে ঐন্দ্রজালিক, আবার কেহ কেহ বলে ভূত।

রবি। না,—ভূত নহে।

জয়। কেন, তাঁহার কথা কেন

রবি। যদি এই সময় একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতাম।

জয়। তাঁহার সাক্ষাতে কি হইত ?

রবি। আমাকে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন,—অনেক প্রকার উপদেশ দানে বাধিত করিয়াছেন।

জয়। যখন তাঁহার বাড়ী-ঘর-দুয়ারের ঠিকানা জান না,—তখন আর কি করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।

রবি। রাজকুমার; আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জয়। কি বল ?

রবি। আপনাদের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরোদ্যানের বান্ধাঘাটের সোপানের নিম্নে, একটী রৌপ্যপেটিকা, আপনারা কি পুতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন ?

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কেন, সে রৌপ্যপেটিকা কি পামহেবা প্রাপ্ত হইয়াছে ?"

রবি। না,—না, পামহেবা পায় নাই। ক্ষমা করিবেন,—পামহেবা তাহা তুলিয়া লয় নাই। আমিই লইয়াছি।

জয়। তুমি! তুমি তাহা পাইলে কি প্রকারে ?

রবি। সে কথা শুনিবার আগে আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বলুন,—সে রৌপ্যপেটিকাটী আপনাদের প্রোথিত করা কি না ?

জয়। না।

রবি। তবে যেই থাক্, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি ?

জয়। আমরা সে পেটিকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়া যাই নাই বটে,—কিন্তু আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহারাজা গম্ভীরসিংহ যখন ৺বৃন্দাবনধামে গমন করেন, তখনই তিনি পেটিকা পুষ্করিণী-সোপানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া যান।

রবি। আপনাদিগকে কি বলিয়া গিয়াছিলেন ?

জয়। না।

রবি। তবে জানিতে পারিলেন কি প্রকারে ?

জয়। আমরা যখন পলায়ন করি, তখন যে সকল কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছিলাম, ব্রহ্মদেশে গিয়া সেই সকল কাগজ পত্র খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার মধ্যে মহারাজা গম্ভীরসিংহের স্বাক্ষরিত একখানা কাগজে উহা পাঠ করিয়াছিলাম।

রবি। তিনি উহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন কেন ?

জয়। তাঁহার নিজের চাবি দেওয়া বাক্সে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সাধু হৃদয়ে পূর্ব্বেই মরণের ছায়া পড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন, যদি পথে কোন প্রকারে মৃত্যু হয়, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার চাবি দেওয়া বাক্স খুলিলে ঐ পেটিকার সন্ধান হইবে। কিন্তু তুমি সন্ধান পাইলে কি করিয়া ?

রবি। আমাকে দরিয়াবাজ তুলিয়া লইতে বলেন।

জয়। দরিয়াবাজ! দরিয়াবাজ কি করিয়া তাহার সন্ধান জানিলেন ?

রবি। দরিয়াবাজ যোগী—যোগবলে—অন্তর্দৃষ্টির বলে জানিতে পারেন। কিন্তু তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।

জয়। কি বলিয়াছেন ?

রবি। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—এ পেটিকা কাহার ? ইহার মধ্যে যে ধনরত্ন আছে, তাহা কাহার ? আমি অপরের ধন লইব না।

জয়। তাহাতে তিনি কি উত্তর করিয়াছিলেন ?

রবি। তিনি বলিয়াছিলেন,—উহা আমার, আমি তোমাকে দিতেছি —তুমি স্বচ্ছন্দে লইতে পার।

জয়। তাহার মধ্যে এক ছড়া সোণারকণ্ঠী ছিল ?

রবি। হাঁ, ছিল। সেই সোণারকণ্ঠীর জন্যই আমাকে ঐ পেটিকা তুলিতে আদেশ করেন।

জয়। কেন,—সে সোণারকণ্ঠীতে আপনার কি হইবে ?

রবি। তিনি বলিলেন,—সেই সোণারকণ্ঠী লইয়া খানদেশে বিজয়সিংহের নিকটে গেলে, তিনি তোমাকে অতি যত্নে রাখিবেন।

জয়। সে সোণারকণ্ঠী অভিজ্ঞান।

রবি। কাহার অভিজ্ঞান ?

জয়। মহারাজা গম্ভীরসিংহের পুত্রের।

রবি। তাঁহার সে পুত্র কোথায় ?

জয়। মহারাজের সঙ্গে বৃন্দাবন যাইতে, পথে ধলেশ্বরীতে ডুবিয়া মরিয়াছে।

আর কোন কথা হইল না। রণীশ্বর ও জয়সিংহ উভয়েই এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কে দরিয়াবাজ,—কেমন করিয়া এ পেটিকা তাহার হইল। সোণারকণ্ঠী যাহার অভিজ্ঞান, সে কোথায় ?

এ দিকে ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল,—প্রকৃতির শুদ্ধ শ্বাস ফুরাইল। মৃদু মৃদু বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। পত্রকুঞ্জ হইতে পাখীরা বাহির হইয়া আপন স্বর বিস্তার করিতে করিতে উড়িয়া উড়িয়া চলিতে লাগিল।

রবীশ্বর বলিলেন,—"রাজকুমার, কি ভাবিতেছ?"

জয়সিংহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"দরিয়াবাজের কথা ভাবিতেছিলাম।"

রবি। যদি তাঁহার সহিত দেখা হয়, সমস্ত প্রহেলিকা বুঝাইয়া লইব।

জয়। তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, আমি আরও কতক গুলি কথা জানিয়া লইব। তিনি কি যোগবলে সমস্তই বলিতে পারেন?

রবি। হাঁ পারেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদিগকে ও সকল চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া, অন্তিম চেষ্টা দেখিতে হইতেছে। চলুন, আমরা মণিপুরাভিমুখে যাই।

জয়। এখন আমরা মণিপুরে গিয়া কি করিতে পারিব?

রবি। ভগবান্ যাহা করিয়া রাখিয়াছেন—আমরা অবলম্বন মাত্র হইয়া তাহাই করিব। তাঁহার ইচ্ছায় যদি আপনার রাজ্য-ভোগ থাকে,—অবশ্যই তাহার উপায় হইবে। না হইলে সহস্র চেষ্টাতেও কিছু করিতে পারিব না।

জয়। তাঁহার যে ইচ্ছা আছে, এমন ত বোধ হইতেছে না। পদে পদে বিঘ্ন! পদে পদে বাধা!

রবি। তাহা কিছুই বলা যায় না। জগতে কোন্ সূত্রে কি হয়, কিছুই স্থির নাই। মানুষের চেষ্টায় বিরত হওয়া উচিত নহে। দৈবের সহিত পুরুষকার মিশান আবশ্যক।

জয়। আমি বলিতেছিলাম, সৈন্যাদি লইয়া মণিপুর আক্রমণ করিলেই হইত! আমাদের কৌশলজাল যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে,

তখন তরবারি সাহায্যে শেষ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করিব।

রবি। শেষে সেই—ই পথ। তবে আমাদের দুই শতমাত্র সৈন্য সম্বল। মণিপুরী সহস্র সহস্র সৈন্যের নিকটে তাহারা কতক্ষণ টিকিতে পারিবে? চলুন, আরও এক দিন ত সময় আছে, সে চেষ্টা তখন করা যাইবে।

জয়। এখন মণিপুরে কোথায় যাইবে?

রবি। আপনাকে লইয়া একবার রাজগুরু কৃষ্ণানন্দঠাকুরের নিকটে যাইব. তিনি আপনাদের গুরুদেব—হিতচিকীর্ষু। অধিকন্তু তিনি কৌশলী ও বুদ্ধিমান্। তাঁহার সহিত একটা যুক্তি করিয়া কার্য্য করাই ভাল।

জয়। হাঁ, আমারও তাহাই ইচ্ছা। মরি বাঁচি একবার গুরু-পাদপদ্ম দর্শনটা হউক।

রবি। মণিপুরের অনেক রাজভক্ত প্রজা, এখনও রাজগুরু বলিয়া তাঁহার খাতির-সম্মান করিয়া থাকে। তাঁহার দ্বারায় যদি তাঁহার বিশ্বাসী লোকদিগের সহিত আপনার আলাপ করিয়া দেওয়া যায়—আর সমস্ত বলা যায়, তাহা হইলেই অনেক কায হইতে পারে।

জয়। তবে তাহাই চলুন।

তখন উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উভয়েই ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া ঊর্দ্ধনত যুক্ত করে ভক্তিপূর্ব্বক ইষ্টচরণে প্রণাম করিয়া মণিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ, পরেই রবীশ্বর, জয়সিংহকে সঙ্গে লইয়া, কৃষ্ণানন্দ-ঠাকুরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

রবীশ্বর, যখন কৃষ্ণানন্দঠাকুরের বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর কেমন একটা অজানা রাগিণীর সঙ্গীত-ঝঙ্কার উত্থিত হইল;—সেই স্বরে রবীশ্বর কাঁপিয়া উঠিলেন। প্রকম্প-স্পন্দিত-হৃদয়ে—আবেগ-উচ্ছ্বাস-হৃদয়ে রবীশ্বর দরোজায় পা দিলেন,—ভাবিলেন, এখনই—কত দিন পরে, কমলের সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু কই কমল! তৎপরে বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন,—কৃষ্ণানন্দঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রবীশ্বর, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। জয়সিংহও সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত করিলেন।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর, উভয়কেই "স্বস্তি" বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটের আসনে উপবেশন করাইলেন।

রবীশ্বর বলিলেন,—"অনেক দিনের পর শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম। আপনার কুশল ত?"

কৃষ্ণা। গোবিন্দজির ইচ্ছায় সমস্তই হয়, তিনি কুশলাকুশল, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিতে যেমন রাখেন, তেমনই আছি। তুমি কেমন আছ, বাবা?

রবি। শারীরিক কুশলে আছি; কিন্তু মানসিক উদ্বেগে কালাতি-পাত করিতেছি।

কৃষ্ণা। মণিপুরে কবে আসিয়াছ?

রবি। অনেক দিন আসিয়াছি—প্রকাশ পাইবার ভয়ে, সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

কৃষ্ণা। কি অবস্থায়, কোথায় আছ?

রবি। আমরা কতকগুলি শান্‌-সৈন্য লইয়া মণিপুর আক্রমণ জন্য সীমান্তস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম।

কৃষ্ণা। তোমরা কে কে?

রবি। আমি, বিজয়সিংহ,—আর এই যুবরাজ জয়সিংহ।

কৃষ্ণা। যুবরাজ জয়সিংহ,—মণিপুর রাজ-বংশাবতংস—আমার প্রিয়তম শিষ্য যুবরাজ জয়সিংহ!—বাবা, কেমন আছ? তোমরা যে বাঁচিয়া আসিয়াছ, ইহাতে বড়ই প্রীত হইলাম।

জয়সিংহ পুনরায় গুরুদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে মণিপুর হইতে বহির্গত হইয়া, যে প্রকারে মহারাজা ও রাণীর সহিত ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন, যে প্রকারে তথায় ছদ্মবেশে কালাতিপাত করিয়াছিলেন,—তৎপরে মহারাজের মৃত্যু, তারপরে বিজয়সিংহের আদেশ মতে রবীশ্বরের ব্রহ্মদেশে গমন, রাণী ও তাঁহাকে আনয়ন প্রভৃতি সমস্ত একে একে বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে কৃষ্ণানন্দঠাকুর রবীশ্বরকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"যথার্থ—শাস্ত্রজ্ঞের ও বীরের কাম করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ করি,—ভগবানের কৃপায় সকল-মনোরথ হও।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"ঠাকুর; যে সকল দলিলপত্র আমরা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদ কি প্রকারে জানিতে পারিয়া, ছলনা করিয়া লইয়াছে; তাহাতেই আমরা কিছু ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িয়াছি। আর বিজয়সিংহ বন্দী হইয়াছেন,—আগামী পরশ্ব প্রাতে তাঁহার ফাঁসি হইবে। বিপদে পড়িয়া তাই শ্রীচরণ সমাপে আসিয়াছি।"

কৃষ্ণা। বিজয়সিংহ বন্দী হইলেন কি প্রকারে? আগামী পরশ্ব ফাঁসি হইবে—ওঃ! বিজয়সিংহ কি কিষণাজ নাম ধারণ করিয়াছিলেন?

রবি। আজ্ঞা হাঁ।

কৃষ্ণা। দলিলগুলি কোথায় ছিল ?

রবি। রাণীমায়ের নিকট।

কৃষ্ণা। রাণীমা কে ?

রবি। মহারাজ বলদেবসিংহের বিধবা মহিষী।

কৃষ্ণা। মণিপুর রাজ-কুল-লক্ষ্মী ? তিনিও কি মণিপুরে আসিয়াছেন ?

রবি। হাঁ।

কৃষ্ণা। তিনি কোথায় আছেন ?

রবি। যখন তাঁহার নিকট হইতে দলিল অপহৃত হয়, তখন তিনি মালী-পটোজীর বাড়ী ছিলেন। শত্রুগণ জানিতে পারিয়াছে,—পাছে, তাহার অন্য কোন অনিষ্ট করে ভাবিয়া, আমি তাঁহাকে আর এক বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি।

কৃষ্ণা। ভাল, আমার একটী আশ্রমও ত এখানে আছে—কেন তোমরা পূর্ব্বে আমার নিকটে আইস নাই ?

রবি। না আসিবার কতকগুলি কারণ ছিল ;

কৃষ্ণা। সে কারণ কি ?

রবি। দরিয়াবাজের আদেশ।

কৃষ্ণা। বুঝিয়াছি—ভাল, তুমি না আসিলেই হইত।

রবি। বিজয়সিংহের সহিত এই পরামর্শ স্থির হইয়াছিল—এদিকের সব কাজ স্থির করিয়া, তবে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

কৃষ্ণা। রাণীমাতাকে এক্ষণে আমার বাড়ীতে আনিতে হইবে,—যদি সম্ভবতঃ কণ্ঠী একটী অভিজ্ঞান ও রাজবংশাবলীখানিও পাওয়া যাইত, তাহা হইলে বড়ই সুবিধা হইত। জয়সিংহও অদ্য রাত্রে আমার বাড়ীতে থাকুন। মণিপুরস্থ কতকগুলি সামন্ত আমার বিশ্বস্ত আছেন,—আমি এখনই তাঁহাদিগকে ডাকিয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিব।

এখন যে বাড়ীতে রাণী আছেন, রবীশ্বর তাহার ঠিকানা বলিয়া দিলেন। কৃষ্ণানন্দ বলিলেন,—"তোমাদের সামরিক যোগাড়ের যে কোন সন্ধা-সন্ধান দেখিতে হয়, রবীশ্বর তাহাই তুমি অদ্য রাত্রির মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া স্থির করগে। আমার বিশ্বাস, বিনারক্তপাতে বিজয়সিংহের উদ্ধার হইবে না। এদিকের যত দূর যোগাড় আদি হইতে পারে, তাহা আমি করিব। ফাঁসির সময় যখন বিজয়সিংহকে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিবে, তখনই সেই স্থলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে,—আমি যতদূর পারি,—করিব। তোমরাও যথাযোগ্য সাজে আসিবে। জয়সিংহ যামিনী-প্রভাতের পূর্ব্বেই রওনা হইবেন।"

রবীশ্বর উঠি উঠি করিয়াও উঠিতে পারেন না। একবার কমলের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, কি করিয়া যাইবেন? কিন্তু কমল কোথায়? একবারও কি সে এদিকে আসিতে পারে না? রবীশ্বর কৃষ্ণানন্দঠাকুরকেও কমলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। কেন না, তাঁহারা এ মিলনে সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু, কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি বলিলেন,—"রবীশ্বর তোমারই উদ্যম, তোমারই সাহস, তোমারই বীরত্বের উপর মণিপুর সিংহাসন উদ্ধার নির্ভর করিতেছে। যদি সামান্য কোন পার্থিব অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হও—কদাচ যেন মোহগ্রস্ত হইয়া কার্য্য ভুলিও না। অন্যায় সমরে অভিমন্যুর নিধন হইলে, অর্জ্জুন অমিত-তেজে শত্রুদলন করিয়া, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।"

রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর; কি অশুভ সংবাদ পাইব! আমার কাকা ত ভাল আছেন?"

কৃষ্ণা। হাঁ—তাহার কোন অসুখ নাই।

রবি। জগতে আমার আপন বলিতে আর কেহই নাই। আর কাহার অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইব।

কৃষ্ণা। দেখ, রবীশ্বর ;—জগতে কে যে কাহার, তাহা কিছু বলা যায় না। কাহার সহিত কাহার কি সম্বন্ধ, কিছুই অবগত হইবার উপায় নাই। পূর্ব্বজন্মে যে মাতা ছিল, সে হয় ত ইহ জীবনে স্ত্রী হইয়াছে। যে দাসী ছিল, সে হয় ত মাতা হইয়াছে। ভাই হয় ত শত্রু হইয়াছে— পিতা হয় ত দাস হইয়াছে। জগৎ-রহস্য কিছুই বুঝা যায় না। জগতে সবাই আপন—সবাই পর। পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। সর্ব্ব-ভূতই ভগবানের—ভগবানই সর্ব্বভূতের। পর, আপন—কেবল মোহ। ফলে কেহ কাহারই নহে। নাট্য-শালায় যেমন মানবগণ এক দৃশ্যে রাজা সাজিয়া, যে দাস সাজিয়াছিল—তাহার উপরে তাড়না করিয়া গেল,—আবার অপর দৃশ্যে ভিক্ষুক সাজিয়া যে দাস সাজিয়াছিল— তাহারই দ্বারে ভিক্ষা লইতে আসিয়া, প্রহার খাইয়া প্রস্থান করিল। এক দৃশ্যে যিনি মাতা সাজিয়া, স্নেহের ক্ষীরধারায় সন্তানকে বর্দ্ধিত করিয়া—যুদ্ধগামী সন্তানকে স্নেহের বাহুডোরে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন,—যেন সেই পুত্ররত্নকে যুদ্ধে পাঠাইতে হইলে, তিনি কিছুতেই বাঁচিবেন না,—এইরূপ বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিলেন ; আবার দৃশ্যান্তরে সাজ বদ্‌লাইয়া শত্রুপত্নী সাজিয়া সেই তিনিই সেই পুত্রের প্রাণবধের জন্য স্বামীকে উত্তেজনা করিলেন। আমাদের এ মর-জগতেও ঐরূপ সাজ পরিবর্ত্তন—আর ঐরূপ অভিনয়। কে কাহার ? কাহার জন্য মোহ !

রবি। ঠাকুর ;—আসল কথাটা কি বলুন ?

কৃষ্ণা। কমল কোথায় গিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান নাই।

রবীশ্বরের বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা দ্রুতস্পন্দিত হইল। প্রাণের সমস্ত তারগুলা বড়ই বে-সুরা বাজিয়া উঠিল। রবীশ্বর অনেকক্ষণ স্তব্ধশ্বাসে কি ভাবিয়া ভাবিয়া বলিলেন,—“কমল কতদিন হইল, নিরুদ্দেশ হইয়াছে ?”

কৃষ্ণা। অধিক দিন নহে।

রবি। আপনি কোথায় তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ?

কৃষ্ণা। অনেক স্থানেই খুঁজিয়াছি—কোথাও পাই নাই। তবে সে আত্ম-জয় করিতে শিক্ষা করিয়াছে,—সে যোগাভ্যাস করিয়াছে, তাহার জন্য কোন ভয় নাই।

রবি। কোন পাপাত্মা যদি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে,—তবে ত তাহার বিপদ উপস্থিত হইতে পারে!

কৃষ্ণা। না,—কি বিপদ হইবে ? সে সহজেই দেহত্যাগ করিতে পারিবে। প্রাণায়ামের দীর্ঘ-কুম্ভকে দেহত্যাগ হয়।

রবি। তবে কি মৃত্যুই কমলের পরিণাম ?

কৃষ্ণা। জীব মাত্রেরই পরিণাম মৃত্যু। তুমি আমিও ঐ পথের পথিক।

রবি। আমার বোধ হয়, পাপাত্মা মন্ত্রী চিরঞ্জীব বর্ম্মণ তাহাকে অপহরণ করিয়াছে। কমলের দেহ-সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ ছিল। আর একদিন—অনেক দিন পূর্ব্বে মন্ত্রীর লোক তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিল,—দৈবক্রমে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া, সে দিন কমলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এবারও বোধ হয়,—সেই হতভাগ্যই লইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণা। আমি তোমাদের সে দিনকার ঘটনা জানি—এবং সেই জন্যই যে, তোমার কারাবাস হয়, তাহাও জানি। আরও জানি—

রবি। আর কি জানেন ঠাকুর ?

কৃষ্ণা। তোমার দীর্ঘ কারাবাস হইবার পক্ষে—তোমার কাকারও ষড়যন্ত্র ছিল ?

রবি। আমার কাকার, বলেন কি ?—তিনি যে আমাকে মুক্ত

করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মন্ত্রীকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণা। মিছে কথা। তোমার কাকার ইচ্ছা, তিনি কমলকে বিবাহ করিবেন,—লোক-পরম্পরায় শ্রুত হইলেন, তুমি কমলকে ভাল বাসিয়াছ—কমল তোমাকে ভালবাসিয়াছে। কাযেই তাঁহার আশা শূন্যে বিলীন হয় দেখিয়া, তিনি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া তোমাকে দীর্ঘ কারাবাসে প্রেরণ করেন। নতুবা তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন, নিশ্চয়ই তোমাকে খালাস করিতে পারিতেন। মন্ত্রী তাহার মুটার মধ্যে।

রবীশ্বর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,—এই জন্যই কি পিতৃব্য-মহাশয় মন্ত্রীর নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছিলেন? এই জন্যই কি আমাকে হাজির হইবার জন্য তত তাড়াতাড়ি করিয়াছিলেন? যাহা হউক, সে যাহা অদৃষ্টে ছিল,—তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে কমল কোথায় গেল! হা, কমল;—প্রাণের কমল, তুমি কোন্ দস্যু-করে পতিত হইয়া লাঞ্ছিত হইতেছ? হয় ত বা যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছ! আর কি তোমার দেখা পাইব না।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর বলিলেন,—"রবীশ্বর! আমি আগেই বলিয়াছি—তোমার উপর ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে। তুমি বিচলিত হইও না। মোহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।"

রবি। আপনি মন্ত্রীর বাড়ীতে কমলের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন?

কৃষ্ণা। অনুসন্ধান করিতে কোথাও বাকি রাখি নাই,—কিন্তু সন্ধান হয় নাই।

রবীশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কমল আমার জীবনের ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা বিচ্যুত হইয়াছে,—আমিও কক্ষবিচ্যুত গ্রহের ন্যায় ঘূর্ণায়মান—বুঝি আমার দ্বারা আর কোন কায হয় না।"

কৃষ্ণা। রবীশ্বর,—নরত্বে দেবত্বের বিনিময় করিও না। তুমি গীতাপাঠ করিয়াছ, তোমার কি মনে নাই—পার্থিব দুঃখে কাতর হইয়া, স্বজনবধাশঙ্কায় আশঙ্কিত হইয়া অর্জ্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "সখা, আমি যুদ্ধ করিতে পারিব না। আমাদের আর রাজ্যে কায নাই, জীবন ধারণেও প্রয়োজন নাই; কেন না, যাঁহাদের জন্য রাজ্যভোগ ও সুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারাই আজ এই যুদ্ধস্থলে বিরাজমান। ইঁহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য লইয়া কি সুখ পাইব? অতএব আমি এই সকল স্বজনবর্গকে নিধন করিয়া, রাজ্য বাসনা করি না।"—তখন ভগবান্ মৃদুহাস্য সহকারে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"অর্জ্জুন; তুমি অশোচ্য ব্যক্তিগণের নিমিত্ত নিরর্থক শোক করিতেছ কেন? পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত কাহারও জন্য শোক করেন না। আমি, তুমি ও এই সকল রাজন্যগণ যেমন এখন বর্ত্তমান আছি ও আছেন—তেমনি পূর্ব্বেও ছিলাম ও ছিলেন, এবং থাকিব ও থাকিবেন। দেহিগণ যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, দেহান্তর প্রাপ্তিও তেমনি একটা অবস্থান্তর বিশেষ,—ইহা জানিয়া ধীর ব্যক্তি মুহ্যমান হয়েন না। যে পুরুষ ব্যথিত না হইয়া, সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীরব্যক্তি অমরত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"—রবীশ্বর; তুমি ত এ সকল পাঠ করিয়াছ, এবং পাঠের অর্থ জ্ঞান করিয়া, ভাবগ্রহণ করিয়া অধিকারীও হইয়াছ। তবে কেন বালকের ন্যায় কথা বলিলে? কে, কমল? যাহাকে তুমি তোমার নয়ন-রঞ্জিনী-স্বরূপা কুমারী ভাবিতে—সে কি জড় নহে? আর জড়ের মধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনি ত নিত্য, বুদ্ধ ও অজ। জড়ের ধ্বংস আছে—তোমার যদি জড়ের সহিত প্রণয় হইয়া থাকে, তবে তোমার শোক করিবার কারণ নাই। কেন না, জড় ধ্বংসশীল—যাহা ধ্বংসশীল, তাহার ধ্বংসে শোক কেন? আর যদি

চৈতন্যের সহিত প্রেম করিয়া থাক,—তবে তাঁহার কখনও বিনাশ নাই—অবিনাশী নিত্য পদার্থের জন্যই বা শোক কর কেন? তুমি জ্ঞানী—জ্ঞানীর মত কার্য্য কর। যে কার্য্যে বরিত হইয়াছ, তাহা বীরের ন্যায় সম্পন্ন কর। মণিপুর শত্রুর হস্তগত—মণিপুরের প্রজা প্রপীড়িত—মণিপুরের স্ত্রীগণ ও বালকগণ অত্যাচারিত—তাহাদিগকে রক্ষা কর। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

রবীশ্বরের হৃদয়-দর্পণ হইতে যেন কালিমা দূর হইল। তিনি স্বচ্ছ-দর্পণে দেখিতে পাইলেন,—জীব-সাগরের মধ্যে তিনি একটা বুদ্বুদ—কর্ম্মসূত্রে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তবে তিনি কে? কর্ম্মই সব। কর্ম্মে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। রবীশ্বর উঠিয়া কৃষ্ণানন্দঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"আপনার আজ্ঞায় আমি সে চেষ্টায় চলিলাম। এ দিকের ভার আপনার উপরেই অর্পিত থাকিল।"

কৃষ্ণা। আশীর্ব্বাদ করি, জয়লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন কর।

রবীশ্বর বাহির হইয়া পথ বহিয়া চলিলেন। যাইতে যাইতে কমলের সেই সুন্দর মুখ খানি মনে ভাসিয়া উঠিল। রবীশ্বরের চক্ষুতে জল আসিল, "হায়, কমল তুমি কোথায়?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিস্তব্ধ নিশীথিনীর বুকের উপর দিয়া এক একবার কেবল হুহু-করা বাতাস স্বন্ স্বন্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। আর সর্ব্বত্র নিরব—নিস্তব্ধ।

এই সময় অন্ধকারে অঙ্গ ঢাকিয়া রবীশ্বর সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদের প্রাসাদ-সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ সেখানে

দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন, অবশেষে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রাচীরে ঘেঁসিয়া ধীরে ধীরে একেবারে গিয়া নিমকচাঁদের কন্যা ফুলরাণীর কক্ষ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ-দরোজায় আঘাত করিলেন। ফুলরাণী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি ?"

রবীশ্বর সঙ্কেতে পরিচয় দিলেন। ফুলরাণী দরোজা খুলিয়া দিয়া বলিল,—"গৃহমধ্যে আইস।"

রবীশ্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফুলরাণী দরোজা ভেজাইয়া দিয়া বলিল,—"তুমি আর আসিলে না কেন ? আমি সারা রাত্রি তোমার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাকি।"

রবি। আমার জন্য ? কেন, আমার জন্য জাগিয়া বসিয়া থাক।

ফুল। তুমি দলিলের কথা বলিয়া গিয়াছিলে—আমি তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি তাহা লইয়া না গেলে, আমি পাঠাইয়া দিব কি প্রকারে ?

রবি। তোমার সংবাদ দিবার কথা ছিল।

ফুল। হাঁ—আমার সংবাদ দিবার কথা ছিল,—কিন্তু আমি যাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, সে তোমাদের লোককে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই। শেষে কি হইতে কি হইবে ভাবিয়া, আর তাহাকে বলা হয় নাই। যে দলিলের উপর তোমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—তাহার সংবাদ কোন্ আমার নিকট আসিয়া একবার জানিয়া গেলে ?

রবি। জানিয়া যাই নাই, তাহার আরও একটী কারণ ছিল।

ফুল। কি ?

রবি। শুনিলাম, সেই সকল দলিলের বলেই বিজয়সিংহের বিচার

হইতেছে,—বলিল সমস্তই মন্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে। তখন ভাবিলাম—তুমি কিছুই করিতে পার নাই।

ফুল। আমি যাহা করিয়াছি—শোন। একদিন বাবা মদ খাইয়া অত্যন্ত অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তাঁহার বিছানার উপরে চাবির-তাড়া পড়িয়াছিল,—আমি চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিয়া দলিলের তাড়াটী লইয়া, নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া সবগুলি পাঠ করিলাম—তাহার মধ্যে যেখানায় রাজবংশের তালিকা ও সর্ত্তসম্বন্ধ আছে, সেই দলিলখানা ও চিরঞ্জীববর্ম্মণ যেখানা লিখিয়া নাগাদিগকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন,—সেইখানা, এই দুইখানা দলিল ও অভিজ্ঞান মুদ্রা দুইটী সরাইয়া লইয়া, অপরগুলি যেমন সিন্দুকে বাঁধা ছিল, তেমনই বাঁধিয়া রাখিয়া আসিলাম।

রবি। তোমার পিতা তারপরে কি আর দলিল খুলিয়া দেখেন নাই?

ফুল। বোধ হয় না। তিনি তাড়াশুদ্ধই মন্ত্রীকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রবি। ভাল, যদি তোমার বাপ উহা খুলিয়া দেখিতেন?

ফুল। আমার অদৃষ্টে যাহা থাকিত, তাহাই হইত। বিজয়সিংহের পরিবর্ত্তে আমি ফাঁসি যাইতে পারিলে, সুখী হই। তোমরা বিজয়সিংহকে কি বাঁচাইতে পারিবে না?

রবি। প্রাণ দিয়া চেষ্টা করিতেছি। এখন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় যাহা হয়। দলিল ও অভিজ্ঞানগুলি দাও দেখি।

তখন ফুলরাণী পার্শ্বের একটী চোরা-কুলঙ্গী হইতে সেগুলি বাহির করিয়া রবীশ্বরের হস্তে প্রদান করিল। রবীশ্বর তাহা লইয়া বলিলেন "বোধ হয়, প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি চলিলাম।"

ফুল। যাবে—তবে যাও।

রবীশ্বর বুঝিতে পারিলেন, আর কি কথা বলিতে গিয়া ফুলরাণী

বলিতে পারিল না। কথা বুঝি সরমে জড়াইয়া বাহির হইল না। কিন্তু রবীশ্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

রাজপথ বহিয়া রবীশ্বর রাজপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অরুণোদয় হয় নাই, এমন সময় রবীশ্বর কৃষ্ণানন্দঠাকুরের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণানন্দ রবীশ্বরকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা, কুশল ত ?"

রবি। যে কয়টী কার্য্য মনে করিয়া গিয়াছিলাম,—তাহার মধ্যে দুইটী কার্য্য মাত্র সম্পন্ন হইয়াছে।

কৃষ্ণা। সে দুইটী কার্য্য কি কি ?

রবি। রাজবংশের বংশতালিকা ও সর্ত্ত-সম্বন্ধের মূল দলিল পাইয়াছি—আর অভিজ্ঞান মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি।

কৃষ্ণা। সুদর্শনধারী বোধ হয় তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কি সুযোগে উহা প্রাপ্ত হইলে ?

রবীশ্বর প্রথমদিনে যেরূপে সহকারী-সেনাপতির ভবনে প্রবেশ করেন, তৎপরে যেরূপে ফুলরাণীর সহিত পরিচয় হয়,—ও অদ্যকার ঘটনা সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর বলিলেন,—"সকলই চক্রীর চক্র, আর কর্ম্মসূত্রের অলঙ্ঘনীয় ঘটনা।" যাহা হউক রবীশ্বর, দলিল ও অভিজ্ঞানাদি আমাকে দিয়া তুমি তোমাদের সৈন্যাবাসে চলিয়া যাও। আমি এখনও বিশেষ কিছুই বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই।

রবি। যে আজ্ঞা,—যুবরাজ জয়সিংহ এখন যাইবেন না কি ?

কৃষ্ণা। তাঁহাকে এখনও সকল সামন্তের সহিত সাক্ষাৎ করান হয়নি। আরও বড়ই ভাল হইয়াছে যে, অদ্য যুবরাজ সামন্তগণকে উহাদের রাজ-দলিল ও অভিজ্ঞান দেখাইতে পারিবেন। মহারাজ বভ্রুবাহনের হস্তাক্ষরিত পত্র দেখিয়া সকলেই যোগদান করিবে।

রবি। ঐ দলিলে কি মহারাজ অর্জ্জুন-তনয় বভ্রুবাহনের স্বাক্ষর আছে?

কৃষ্ণা। হাঁ—বভ্রুবাহন হইতে বলদেবসিংহ পর্য্যন্ত এখন যিনি রাজা হইয়াছিলেন, ঐ দলিলাদিতে প্রতিজ্ঞা বাক্যের নিম্নে পর পর স্বাক্ষর করিয়াছেন। কথিত আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া আসিয়া যখন অর্জ্জুন স্বীয় তনয় বভ্রুবাহনের নিকটে পরাজিত হইয়া পরিচিত হয়েন,—তারপরে পুত্রবাৎসল্যহেতু এখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করেন। তখনই তিনি পুত্র ও প্রজাগণের হিত-কামনায় দলিলের শীর্ষদেশস্থ কয়েকপংক্তি লিখিয়া দিয়া যান,—সে বংশে যিনি যখন রাজা হইবেন, ঐ প্রতিজ্ঞা-পালনে বাধ্য থাকিবেন।

রবি। তাহাতে কি লেখা আছে?

কৃষ্ণা। লেখা আছে,—

অনাসক্ত হইয়া প্রজাপালন করিব; বিচার ভার বিবেকের উপর।

পরলোক সত্য;

এবং পরলোকের বিচার ও কর্ম্মফলের দণ্ড পুরস্কার ও

পরম সত্য।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজার রাজা,—মণিপুরের সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার দাস হইয়া তাঁহারই কার্য্য করিব।

রবি। ঐ দলিল মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াও কৃতার্থ হইয়াছি। রাণীমাতাকে আপনার আলয়ে আনয়ন করা হইয়াছে কি?

কৃষ্ণা। হাঁ, তিনি আমার আশ্রমে আসিয়াছেন। অধিক বেলা হইলে লোকে চিনিতে পারিবে, এই সময়ই তুমি চলিয়া যাও।

রবি। আমি সৈন্য লইয়া সন্ধ্যার পরেই এই দিকে আসিব যুবরাজের সহিত আমার কোথায় সাক্ষাৎ হইবে?

কৃষ্ণা। রাজপুরের দক্ষিণ মাঠে "বৃষকেতুর হানা" নামক জঙ্গলে একটা দীঘি আছে, ঐ দীঘির পাড়ে তাল বাগানের মধ্যে জয়সিংহ তোমার জন্য অপেক্ষা করিবেন।

"যে আজ্ঞা, প্রণাম; এখন তবে বিদায় হই।"—এই কথা বলিয়া রবীশ্বর চলিয়া গেলেন।

রাণী বলিলেন,—"ঠাকুর! রবীশ্বরের মত ছেলে আমি আর দেখি নাই। রবীশ্বর কর্ম্মবীর, রবীশ্বর ধর্ম্মবীর, রবীশ্বর যুদ্ধবীর। রবীশ্বর দয়ালু, রবীশ্বর নীতিপরায়ণ, রবীশ্বর ইন্দ্রিয়জয়ী। মহারাজ বক্রবাহনের ন্যায় সমস্ত গুণ রবীশ্বরে বর্ত্তমান। গুরুদেব;—রবীশ্বর কে? রবীশ্বর কি যথার্থই রতনচাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

কৃষ্ণানন্দ মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রাণী বলিলেন,—"রতনচাঁদের বংশে এমন দেবদুর্লভ সন্তানের জন্ম সম্ভবে না।"

কৃষ্ণা। পঙ্কে ত পদ্ম হয়।

রাণী। হয়,—কিন্তু এরূপ দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ ললাট, দীর্ঘ নাসিকা দীর্ঘ স্থির অরুণাভ আভা—ক্ষত্রিয়েই সম্ভবে।

কৃষ্ণা। অসম্ভবও সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ ভৃগুরাম ক্ষত্রিয় জয় করিয়াছিলেন।

রাণী। রবীশ্বরের মুখ দেখিয়া আমার একখানি হারান ক্ষুদ্র শিশুর মুখ মনে পড়ে।

কৃষ্ণা। তুলনায় অনেক সাদৃশ্য মিলে।

রাণী। তাহার মুখে ও নাসিকার নিম্নে জড়ুলচিহ্ন ছিল,—রবীশ্বরের মুখেও আছে।

কৃষ্ণা। জড়ুল কোন অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষ চিহ্ন নহে। মা! কে সে?

রাণী। আমার ভাসুরের ছেলে—মহারাজ গম্ভীরসিংহের ছেলে দেবেন্দ্রসিংহ।

এই সময় একজন পরিচারক আসিয়া বলিল,—"ঠাকুর, মণিপুর হইতে চারি জন সামন্ত আসিয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। খুব শীঘ্র আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তাঁহারা এখনই চলিয়া যাইবেন?"

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণানন্দঠাকুর বহির্বাটী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। রাণীও কি চিন্তা করিতে করিতে অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। যেখানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন,—সে স্থান—যশোর প্রদেশ, ঠাকুর বাড়ী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মেঘাবিল ঘোলাটে ঘোলাটে জোৎস্নায় পথ বাহিয়া আসিয়া যুবরাজ জয়সিংহ, কৃষ্ণানন্দঠাকুরের কথিত দীঘির ধারে তাল বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুবরাজ একবার চাহিয়া দেখিলেন,—সৈন্যাদি কেহ সেখানে আসিয়াছে কি না। সৈন্যাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কেবল একটী লোককে একটা তালবৃক্ষের নিম্নে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। যদি কোন সংবাদ জানাইবার জন্য ঐ লোকটীকে রবীশ্বর এখানে রাখিয়া থাকেন,—এইরূপ ভাবিয়া জয়সিংহ তাহার নিকট যাইয়া, ডাকিয়া বলিলেন,—"কে তুমি?"

সে চমকিয়া ভীত কণ্ঠে কহিল,—"আমি একজন পথিক।"

জয়। এখানে কাহার অপেক্ষা করিতেছ ?

পথিক। কাহারও অপেক্ষা করিতেছি না। আমি বড় দুঃখে—বড় ক্ষোভে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

জয়। কেন তোমার কি হইয়াছে ?

পথিক। অরাজকতা আর পাপে এ দেশ পূর্ণ হইয়াছে।

জয়। তোমার বয়স হইয়াছে, দেখিতেছি,—পুত্রকলত্রাদি কিছুই সঙ্গে নাই, তুমি চলিয়া যাইতেছ ?

পথিক। পুত্রকলত্রাদি আমার কিছুই নাই।

জয়। পুত্রকলত্রাদি-হীন জনের আবার অত্যাচার করে কে ? অত্যাচার করে কি ?

পথিক। আমার উপরে অত্যাচার হয় নাই,—অপরের উপরে হইতেছে।

জয়। তাহাতে তোমার কি ?

পথিক। আজি যে অত্যাচার হইতেছে—তাহা আর দর্শন বা শ্রবণ করিতে পারিলাম না। তাই এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।

জয়। কি অত্যাচার হইতেছে।

পথিক। আপনি কে মহাশয় ?

জয়। পরিচয় দিব না,—তুমি কি অত্যাচার দেখিয়াছ বল।

পথিক। আপনি পরিচয় দিবেন না,—অথচ আমি আপনাকে সেই গুপ্তকথা বলিব. এ কেমন বিচারের কথা।

জয়। বলিতে হইবে। যদি প্রতিকার করিতে পারি।

পথিক। সে সাধ্য কাহারও নাই—বুঝি বর্ত্তমান মণিপুরেশ্বর পামহেবারও নাই।

জয়। এমন কি হইতেছে ?

পথিক। একটী যুবতীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহাকে বলপ্রকাশে লইয়া আসিয়া, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করা হইতেছে।

জয়। কে বিবাহ করিতেছে ?

পথিক। রায় রতনচাঁদ। মন্ত্রী চিরঞ্জীব সেই বিবাহে বর-কর্ত্তা।

জয়। কন্যা-কর্ত্তা কে ?

পথিক। বর্ত্তমানে কেহই নাই, যদি দয়া করিয়া যম এখন হন।

জয়। সে মেয়েটী কাহার ?

পথিক। কাহার তার ঠিক নাই। তবে—

পথিকের কথা অসমাপ্ত অবস্থাতেই সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। জয়সিংহ চাহিয়া দেখিলেন, এক তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রবীশ্বর সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অশ্বের পার্শ্বে আরও একটী সুসজ্জিত সমর-অশ্ব একটা সহিস ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল,—তাহার পৃষ্ঠ শূন্য ছিল, রবীশ্বরের ইঙ্গিত মাত্র জয়সিংহ তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। রবীশ্বর বলিলেন, "আর বিলম্ব করা হইবে না—চলুন। সৈন্যগণ ঐ আসিতেছে।" তৎপরে বৃক্ষতলে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"ও কে ? আপনার পথ প্রদর্শক কি ?"

জয়সিংহ বলিলেন,—"না, ও আমার পথপ্রদর্শক নহে। একজন পথিক,—ভাল কথা ! ও বলিতেছিল, "রায় রতনচাঁদ নাকি মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণের সহায়তায় কোন স্ত্রীলোকের অনিচ্ছাসত্বে তাহাকে বিবাহ করিতেছেন।" রতনচাঁদ ত তোমার পিতৃব্য ? বুড়োকালে আবার তোমার কাকার এ রোগ কেন ?

রবীশ্বরের মস্তকটা ঘুরিয়া গেল। তিনি সে অবস্থা সাম্‌লাইয়া লইয়া তখনই অশ্ব হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার দেখা দেখি জয়সিংহও নামিলেন। উভয়েরই হাতে অশ্ববল্‌গা। রবীশ্বর পথিককে

নিকটে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি? আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, কদাচ মিথ্যা বলিও না। সত্য কথা বলিলে, তুমি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আর যদি মিথ্যা বল,—এই ঘোড়ার পায়ের তলায় তোমাকে দলিত করিয়া চলিয়া যাইব।"

আবিল জ্যোৎস্নায় পথিক, অশ্বারোহি-দ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। গদগদকণ্ঠে কহিল,—"আমি আপনাদের সাক্ষাতে কখনও মিথ্যা কথা বলিব না। আমি বহুদিন ধরিয়া যাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, আজি তাঁহাদিগকেই সম্মুখে পাইয়াছি।"

রবি। কে তুমি?

পথিক। আমার নাম হরেরাম।

রবি। তুমি আমাদিগকে চিনিয়াছ কি?

হরে। হাঁ চিনিয়াছি বৈ কি,—আপনি রবীশ্বর রায়। আর ইনি মণিপুরের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ জয়সিংহ।

রবি। তোমার বাড়ী কোথায়?

হরে। আমার বাড়ী মণিপুর। মহারাজ গম্ভীরসিংহের বেতনভোগী ভৃত্য না হইলেও তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। যখন তিনি ৺বৃন্দাবন ধামে গমন করেন, তখন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। পথে ধলেশ্বরী নদীতে নৌকাডুবি হয়—আমরা সকলেই জলমগ্ন হই। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহারাজ সেই জলেই জীবন বিসর্জ্জন করেন,—তাঁহার শিশু পুত্রটী আমারই বক্ষমধ্যে ছিল—আমি একটা বংশখণ্ড অবলম্বনে স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কূলে উঠি। তারপরে রায় রতনচাঁদের সহিত সেই স্থলে সাক্ষাৎ হয়—তিনি বঙ্গদেশ হইতে স্ত্রী ও দুইজন ভৃত্যসহ মণিপুর আসিতে ছিলেন। আমিও তাঁহার সহিত পুনরায় মণিপুরে আগমন করি।

জয়সিংহ বলিলেন,—"দাদার সে ছেলেটীর নাম কি ছিল বল দেখি?"

হরে। তাঁহার নাম ছিল,—"দেবেন্দ্রসিংহ।"

জয়। আমাদের স্নেহের দেবেন্দ্রসিংহও বোধ হয় পিতার অনুগমন করিয়াছিল ?

হরে। সকল সংবাদ পরে পাইবেন। এক্ষণে যে অত্যাচারের কথা আপনাকে আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম—যদি আপনারা সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে অচিরে রায় রতনচাঁদের বাড়ীতে গিয়া সেই অনাথিনীকে রক্ষা করুন।

রবীশ্বর বলিলেন,—"হরেরাম; কাকা বোধ হয় কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের শিষ্যা কমলকে বিবাহ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন? এবং তাহাকেই ধরিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছেন?"

হরে। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

রবি। তুমি কি করিয়া সন্ধান পাইলে ?

হরে। আমি যে প্রকারেই সন্ধান পাই—কিন্তু কথা অতি সত্য। আপনারা এখনই যান,—আমি দেখিয়া আসিয়াছি, বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গিয়াছে, কেবল মন্ত্রী চিরঞ্জীব-বর্ম্মণের আসিতে যে বিলম্ব। তিনি আসিলে, তাঁহার সম্মুখেই এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

রবি। রতনচাঁদের বাড়ী বিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছেন কি ?

হরে। কিছু না। কেবল জন চল্লিশ সৈন্য আসিয়া পুরী রক্ষা করিতেছে।

রবি। বিবাহে সৈন্য কেন ?

হরে। কমলকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া আজি কয়েকদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছে—পাছে বিবাহের দিন কোন গোলযোগ হয়, এই জন্য সৈন্য আনান হইয়াছে।—চিরঞ্জীবই উহা পাঠাইয়াছেন।

রবি। কমল কি করিতেছে, জান কি ?

হরে। আমি সে বাড়ীর সব জানি। কমল কেবল কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে, তোমরা আমাকে বিবাহে সম্মত করিতে পারিবে না। আমার হাতে অস্ত্র না থাকিলেও—আমার নিকট বিষ না থাকিলেও আমি —মুহূর্ত্তে জীবন পরিত্যাগ করিতে পারিব, তবে দেখা হইল না, তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য—কেবল চোখের দেখা দেখিবার জন্য জীবন বহিয়া বেড়াইতেছি,—আমার সে সাধ—সে আকাঙ্ক্ষা—সে বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তোমাদের বাড়ী বাড়ী—আমার বাসনা লইয়া জন্ম জন্ম ঘুরিতে পারি না। একবার রবীশ্বরকে দেখিয়া মরিতে দাও। রতনচাঁদ হাঁসিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন,—"পাগলী, সে তোর সন্তান !"

জয়সিংহ কোষস্থিত অসিতে হস্তক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"রবীশ্বর, কমল তোমার অনুগামিনী। তাহাকে তোমার কাকা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতেছেন,—কৃষ্ণানন্দ আমাদের গুরু, তাঁহার আশ্রয়-পালিতা শিষ্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিতেছে,—মণিপুরের অবলাকে প্রবল অত্যাচার; তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতেছে,—যদি তুমি অসন্তুষ্ট না হও, আমি এই দণ্ডে গিয়া রতনচাঁদকে উচিত-প্রতিফল প্রদান করিয়া, কমলকে উদ্ধার করি।"

হরেরাম বলিল,—"এখনই, এখনও, রতনচাঁদ রবীশ্বরের কাকা নহে। কাকার কি এরূপ প্রকৃতি হয় ? ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগামিনীকে কি অঙ্কশায়িনী করিতে আকুলতা জন্মে।"

রবীশ্বর বলিলেন,—"এই দণ্ডেই সৈন্যাদি লইয়া গিয়া কমলকে উদ্ধার করিতে হইবে। আপনি কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য লইয়া গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রবলাক্রমণে কাকা ও মন্ত্রীকে বন্ধন করিবেন। কমলকে উদ্ধার করিবেন। আমি বাহির হইতে সৈন্য

মথিত করিব ;—আর পুনরায় যদি সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, তাহাও রক্ষা করিব।"

হরেরাম বলিল,—"যুবরাজ ; আপনি উদ্যানের পথে অন্দর মহল দিয়া উঠিবেন, রবীশ্বর বহির্দ্বারে যাইবেন। বহির্দ্বারেই সৈন্যগণ প্রহরায় নিযুক্ত আছে।

রবি। হাঁ—আপনি পঞ্চাশ জন সৈন্য লইয়া ঐ পথেই যাইবেন। হরেরাম ; তুমি ঐ পথে যুবরাজের পথ-প্রদর্শক হইয়া যাও। তুমি সে পথ ভালরূপ চেন ত ?

হরে। আজ্ঞে, আমি অনেকদিন সে বাড়ীতে ছিলাম। আমার আর একটী নিবেদন আছে।

রবি। কি বল ?

হরে। দুষ্টাত্মা রতনচাঁদ আজি বহুকাল ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহারই বাড়ীতে একটা কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাকে দিনান্তে একমুটা অন্ন দেয় মাত্র—সে অন্ন, সদয় দিয়া আসে। রমণী কঙ্কালসার ও উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছেন—তাঁহার কষ্টের অবধি নাই। যদি ভগবান্ দিন দেন,—মুখ তুলিয়া চাহেন,—তাঁহাকেও মুক্ত করিয়া দিবেন। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী মুক্তি পাইলে অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করিবে।

রবি। আমার কাকী মা,—কাকা-মা না মরিয়া গিয়াছেন,—তুমি কি বলিতেছ হরেরাম! তুমি ত কোন নেশা কর নাই—তুমি ত প্রকৃতিস্থ আছ ?

হরে। হুজুর, আমি প্রকৃতিস্থ আছি। আরও কত রহস্য আমি আপনাকে শুনাইব, এক্ষণে চলুন,—অধিক বিলম্ব হইলে বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যাইতে পারে—এতক্ষণেই বা কি হইয়াছে, তাহার ঠিক কি !

রবি। যুবরাজ ; মন্ত্রী প্রভৃতিকে আপাততঃ বাঁধিয়া আমাদের

সৈন্যাবাসের কারাগুহায় প্রেরণ করিতে হইবে,—সেইরূপ ভাবেই কায করিবেন। যেন কাহারও প্রাণের হানি না হয়।

রবীশ্বর অঙ্গাবরণী হইতে একটী বাঁশী বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন। পার্শ্বের জঙ্গল হইতে প্রায় দুই শত সশস্ত্র সৈনিক বাহির হইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। আর কোন কথা হইল না,—রবীশ্বর ও জয়সিংহ অশ্বারোহন করিলেন, ইঙ্গিতে আর একটা অশ্ব সেখানে আনান হইল—রবীশ্বরের আদেশে হরেরাম তাহাতে উঠিয়া বসিল। তখন সকলে অতি দ্রুত রাজপুর অভিমুখে ধাবিত হইল।

গ্রামের মধ্যে গিয়া পঞ্চাশজন সৈন্য ও হরেরামকে সঙ্গে লইয়া যুবরাজ একপথে ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া রবীশ্বর অন্যপথে গমন করিলেন।

এ দিকে রায় রতনচাঁদ বিবাহের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইয়াছেন—সেখানে একজন পুরোহিত কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন; আর তিন চারিজন ভদ্রলোক সম্মুখের বিছানায় উপবিষ্ট, পার্শ্বে সুসজ্জিত সিংহাসনে মন্ত্রী মহাশয় উপবিষ্ট। উপরে গোটাকয়েক স্ফটিকাধারে আলোক জ্বলিতেছিল।

মন্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"আর বিলম্ব কি, পুরুৎঠাকুর? কন্যা আনান যাক্?"

পুরুৎঠাকুর তাঁহার নাসিকারন্ধ্রে খানিক তাম্রকূট চূর্ণ প্রবেশ করাইয়া, শিখাটাকে একবার নাড়িয়া বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ—আজ্ঞা হাঁ—তবে একটা লগ্ন—ভবদীয় আগমনের অপেক্ষায়—অতীত করা হইয়াছে। যজ্ঞেশ্বর বিহনে যজ্ঞ সমাধা হয় না—তাতেই লগ্নটা গিয়াছে—আর একটা লগ্নের সময় আর একটু পরে।"

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"এটা কি যজ্ঞ, অশ্বমেধ কি?

পুরুৎঠাকুর গম্ভীর মুখে বলিলেন.—"জীবন যজ্ঞ।"

মন্ত্রী। পুরুৎঠাকুরের বিদ্যা বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এ যজ্ঞের আহুতি কি ?"

"তোমাদের প্রাণ"—এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুৎঠাকুরের পশ্চাৎ হইতে ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল এবং আলোক কিরণে ঝলসিয়া তরবারি উত্থিত হইল। পুরুৎঠাকুর চমকিয়া লাফাইয়া উঠিয়া, সমস্ত দন্তগুলি বাহির করিয়া, উর্দ্ধপদে চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন।—"এ কি সর্ব্বনাশ শীঘ্র সৈন্য ডাক—সৈন্য ডাক" বলিয়া মন্ত্রী মহাশয় চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরা থর থর করিয়া কাঁপিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বয়ং বর রায় রতনচাঁদ আসনের উপরে ঢলিয়া পড়িলেন। ভৃত্য সদয় ছুটিয়া বহির্দ্বারে সৈন্য ডাকিতে গেল।

কিন্তু সকলে সভয়ে শুনিল, বহির্দ্বারে সৈন্যগণের মধ্যে মরণের কোলাহল উত্থিত হইয়াছে,—বজ্রনিনাদে কামান গর্জ্জিতেছে। বাড়ীর মধ্যেও সৈন্যের পাল।

জয়সিংহ অসির আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—পাপাত্মাগণ! পাপের কি আর শেষ নাই। এত মহাপাতক করিয়াও কি নিবৃত্তি নাই। একটী অনাথা কুল-ললনার উপর এই অত্যাচার! রামা—রামা, বাঁধ মন্ত্রীকে, বাঁধ—রতনচাঁদকে, বাঁধ—পুরুৎঠাকুরকে বাঁধ।"

পুরুৎঠাকুর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"বাবা, আমার গিন্নীর আর কেউ নাই। মন্ত্রীকে বাঁধ—নিয়ে যাও—ওরা বড় লোক বাবা"—

জয়সিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"বড় লোকের গিন্নীর কি ঘরে দুই চারিটা থাকে নাকি ?"

পুরু। না বাবা,—আমার গিন্নীর আর কেউ নাই বাবা!

ততক্ষণ সৈন্যগণ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে ধরা দিলেন। রতনচাঁদকে তুলিতেই যে কষ্ট

হইয়াছিল, বাঁধিতে আর কষ্ট হয় নাই। কেবল মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ একটু নড়াচড়া করিয়াছিলেন, বন্ধনাবস্থায় জয়সিংহের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, চিরঞ্জীব চমকিয়া উঠিলেন। কাতরস্বরে বলিলেন, "যুবরাজ জয়সিংহ, বুঝিয়াছি। বিজয়সিংহের আগমনে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম। এখন আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবেন ?"

জয়। যেখানে আমার ইচ্ছা।

চির। আমাদিগকে লইয়া গিয়া কি করিবেন ?

জয়সিংহ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ডাকিলেন,—হরেরাম! হরেরাম!"—রতনচাঁদ নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। একবার হরেরামের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া চক্ষু নত করিলেন।

হরেরাম নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাত যোড় করিয়া বলিল,—"হুজুর!"

জয়। কমল কোথায় ?

হরে। ঐ যে আসিতেছেন।

জয়সিংহ চাহিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। ধীরে ধীরে মন্থরগমনে কমল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিংহ গদগদকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, মা, কমল! তোমার রবীশ্বর তোমার উদ্ধারার্থে আসিয়াছেন। বীর-বিক্রমে বাহিরে শত্রু-দলন করিতেছেন।"

কমলের চক্ষু দিয়া জলধারা নির্গত হইল। "রবীশ্বর—আমার রবীশ্বর —আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর—আসিয়াছেন। আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন। তিনি জীবিত আছেন। দাসীর দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছেন।"

কমল বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। বহির্দ্বারে বিজয়শঙ্খ বাজিয়া

উঠিল। জয়সিংহ বলিলেন. "হরেরাম ; রবীশ্বর বিজয়ধ্বনি বাজাইয়াছেন ; আর বিলম্ব করিও না। রতনচাঁদের স্ত্রী কোন গৃহে আবদ্ধ আছেন,— শীঘ্র মুক্ত করিয়া লইয়া আইস।"

হরে। হুজুর ;—এ দাস তাঁহাকেও মুক্ত করিয়া আনিয়াছে। তাঁহার উত্থানশক্তি নাই। একখানা ডুলির বন্দোবস্ত করিয়াছি।

তখন জয়সিংহ বন্দিগণকে লইয়া যাইবার জন্য সৈন্যগণের প্রতি আদেশ করিলেন। দশজন সৈন্য বন্দিগণকে লইয়া সৈন্যাবাস অভিমুখে চলিয়া গেল। জয়সিংহ অপর সৈন্যাদি লইয়া রবীশ্বরের সহিত মিলিত হইলেন। একখানা ডুলিতে করিয়া কমলকে কৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উষার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই,—পাখীরা তখনও পাদপ-কুঞ্জে বসিয়া প্রভাতী গাহিয়া উঠিয়া যায় নাই—ঠিক সেই সময়ে একজন অশ্বারোহী সৈনিক দর্পিত পদযুগল অশ্বোপরি দুলাইতে দুলাইতে অতি মন্থর-গমনে রাজদরবার অভিমুখে চলিয়া গেল। প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে ফুলরাণী তাহা দেখিতে পাইল। অশ্বারোহী সৈনিককে ফুলরাণী ভাল করিয়া চিনিতে পারিল না—তবে ভঙ্গী-ভাবে যেন তাঁহার বোধ হইয়াছিল, সৈনিক রবীশ্বর।

সমস্ত রাত্রি ফুলরাণী নিদ্রা যায় নাই,—একবার শয্যা স্পর্শ করে নাই। এই কাল-নিশি প্রভাতেই বিজয়সিংহের দেহ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রলম্বিত হইবে। যখন প্রভাতের তারা মিটি মিটি করিয়া পূর্ণ গগনে

উঠিয়া পড়িল—তখন ফুলরাণী দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছিল,—"যাও যামিনী, যাও চাঁদ—আবার দিনান্তে মিলিত হইও। কিন্তু এই প্রভাতেই আমার চাঁদ অস্তমিত হইবে, ইহজীবনে বুঝি আর মিলনের সম্ভাবনা নাই।" তারপরে অনেকক্ষণ সে হতাশ-নয়নে, উদাস-প্রাণে সেই দিকেই চাহিয়াছিল—এখন সৈনিককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, ভাবিল—তবে রবীশ্বর নিশ্চিন্ত নাই। "ভগবান্, বিজয়সিংহকে রক্ষা করিও।" সৈনিক যে মণিপুরী সৈন্য নহে, তাহা তাহার পোষাক দেখিয়াই ফুলরাণী বুঝিতে পারিয়াছিল।

ফুলরাণী সেখানে বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। অবশেষে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার পিতার শয়ন-কক্ষে গমন করিল।

তাহার পিতা সহকারী-সেনাপতি নিমকচাঁদ শয্যার উপরে জড়ের ন্যায় পড়িয়া আছেন। তিনি গতরাত্রির সমস্ত ভাগটা পান্থশালায় জাগিয়া জাগিয়া মদ খাইয়াছেন—শেষে যামিনীর শেষ ভাগে পাল্কী করিয়া বাড়ী আসিয়া শয্যা লইয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি অজ্ঞান—জড়!

ফুলরাণী ডাকিল "বাবা!"

কে কাহার বাবা! কে উত্তর দেয়। ফুলরাণী পুনরপি ডাকিল—"বাবা, বাবা!" অনেক কষ্টে চক্ষু টানিয়া নিমকচাঁদ বলিল,—"কে বাবা, হেমচাঁদ! আমি আর মদ খাব না বাবা—আর পেটে ধরে না বাবা!"

ফুলরাণী মুখ সরাইয়া লইল। ভর ভর করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফুলরাণী বলিল,—"বাবা! আমি হেমচাঁদ নই, ফুলরাণী।"

এতক্ষণ নিমকচাঁদ অজ্ঞান হইয়াছিলেন। আবার চমক হইল,—বলিলেন,—ফুলরাণী! আমার আদরের কন্যা ফুলরাণী—কি মা, তুমি একটু মদ খাবে?"

ফুল। ছি বাবা, মেয়েকে কি ওকথা ব'ল্‌তে আছে।

নিমক। তবে কাকে ব'ল্‌তে আছে মা;—মেয়ের মাকে। ডাক তোমার মাকে।

ফুল। যা হয়—এর পরে করিও। এখন একটা খবর শোন।

নিমক। খাবার খাব?—আমি খুব খেয়েছি—সারা রাত্রি খেয়েছি। এই দেখ—পেট দম্‌ হইয়া রহিয়াছে।

ফুল। একটা খবর আছে—একজন বিদেশী অশ্বারোহিসৈন্য নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলাম। আ'জ বিজয়সিংহের ফাঁসি হবে কি না, তাই বোধ হয়—তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সৈন্য আসিয়াছে।

ধাঁ করিয়া নিমকচাঁদের মাথার মধ্যে একটা ভার-ঝঙ্কার প্রবিষ্ট হইল। আজ বিজয়সিংহের ফাঁসি হইবে। সেখানে সৈন্য লইয়া উপস্থিত থাকিবার ভার তাঁহারই উপরে আছে। তাহার উপরে বিদেশী-সৈন্যের প্রবেশ সংবাদ পাইয়া,—আর নিজের অবস্থা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, নিমকচাঁদ ঢলিয়া বিছানায় পড়িলেন। বলিলেন,—"ফুলরাণী, মা;—আমি ত উঠিতে পারিলাম না। এখন রাত্রি কত?"

ফুল। আর রাত্রি নাই—ভোর হইয়া গিয়াছে।

নিমকচাঁদ আবার উঠিয়া বসিতে গেলেন, কিন্তু ঢলিয়া পড়িলেন। ফুলরাণী বলিল,—"বাবা; এখন উঠিবার জন্য এত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন? একটু নেশা না কাটিলে উঠিতে পারিবে না।

নিমক। ফুলরাণী; আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—তখন ভাবিয়াছিলাম, সামান্য একটু খাইয়াই বন্ধ করিব—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না খাইয়া ছাড়িতে পারি নাই। তাহার ফলে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

ফুল। কেন, বাবা?

নিমক। বিজয়সিংহের বধ্য-ভূমিতে সৈন্য লইয়া উপস্থিত থাকিবার আদেশ আমার উপরই ছিল। আমি যাইতে পারিলাম না—যদি অন্য-দেশের সৈন্যে বা লোকজনে কোনপ্রকার গোলযোগ বা বিদ্রোহ ঘটায়,—তবে সরকার-বাহাদুর স্থির করিবেন ঐ ষড়যন্ত্রে আমিও লিপ্ত ছিলাম। এবং সেই জন্যই আমি সৈন্য লইয়া যাই নাই। তখন চরম-দণ্ডই আমার দণ্ড—বিজয়সিংহের জন্য যে ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাতে আমাকে ঝুলিতে হইবে।

ফুল। বাবা, তোমার সনদ, তরবারি আর টুপী লইয়া অপর কেহ গিয়া কার্য্য করিলে হয় না?

নিমক। তাহা হয়। কিন্তু কে করিবে—মা; এখন তেমন বিশ্বাসী—আমি কাহাকে পাই মা! আমার কি পুত্র আছে?

ফুল। আমাকে ত আপনি অশ্বারোহণ, সমর-কৌশল, অস্ত্রচালনা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছেন,—আমি যাই না কেন?

নিমক। পুত্র নাই বলিয়া সখে সে শিক্ষা দিয়াছিলাম,—যুদ্ধ করিতে যাইবে বলিয়া দেই নাই।

ফুল। কেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা ত যুদ্ধ করিয়াছেন।

নিমক। কিন্তু তুমি বালিকা।

ফুল। এ ত আর একটা বড় যুদ্ধ নহে। আমি যাইব।

নিমক। তোমাকে ঐ বিপদ-সাগরে পাঠাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব?

ফুল। কোন ভয় নাই বাবা, আপনার সনদ কোথায় আছে?

নিমক। ঐ পার্শ্বের বাক্সের মধ্যে—কিন্তু তুমি যাইও না।

ফুলরাণী সে কথা কাণেও শুনিল না। সে বাক্স খুলিয়া সেগুলি বাহির করিয়া আপন কক্ষে চলিয়া গেল। তাহার উত্তম একটা

সৈনিকের পরিচ্ছদ ছিল, তাহা পরিধান করিয়া কটীতে তরবারি ঝুলাইল। মস্তকের কেশরাশি চারিদিক হইতে টানিয়া লইয়া মস্তকের উপরে তুলিয়া উষ্ণীষ দিয়া কসিয়া বাঁধিল। তারপরে গৃহদেওয়াল লম্বিত সুবৃহৎ দর্পণের কাছে গিয়া দেখিল, তাহাকে এক জন যুবক সৈনিকের মতই দেখাইতেছে। তখন মনে মনে হাসিয়া বলিল,—"বিজয়সিংহকে ফাঁসি দিতে যাইতেছি। হয়, তাঁহাকে ফুলরাণীর হৃদয়ের সমস্ত বাসনালৌহ দিয়া একটা প্রেমের ফাঁসি গড়াইয়া তাহাতে লটকাইয়া আনিব, আর না হয়—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পরলোকের পথে অগ্রসর হইব। যাহা করিবার সুবিধা পাইলাম—দুই পথের এক পথে অবশ্যই যাইতে পারিব।"

অশ্বশালা হইতে অশ্ব লইয়া ফুলরাণী দুর্গাভিমুখে চলিয়া গেল। সহকারী সেনাপতির সনদ ও উষ্ণীষাদি দেখিয়া, সৈন্যগণ ফুলরাণীর নিকট শিরোনমন করিল। ফুলরাণী বা সহকারী সেনাপতি রাজাদেশমত পাঁচ শত সশস্ত্র সিপাহী লইয়া দরবারের সম্মুখস্থ বধ্যভূমিতে গমন করিল।

সেখানে গিয়া সৈন্যদিগকে চক্রাকারে সারিদিয়া দাঁড় করাইল। চক্রের সম্মুখে নিজে অশ্বারোহণে নির্ম্মুক্ত অসিহস্তে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শত শত দর্শকবৃন্দ আসিয়া বধ্য-ভূমি পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইল, দশ বার জন সামন্তসর্দ্দারও বধ্যভুমির মধ্যস্থলে ফাঁসি মঞ্চের অতি সন্নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। একখানা নামাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, কৃষ্ণানন্দঠাকুর বধ্যভুমির অদূরে একটী নিম্ববৃক্ষতলে দণ্ডায়মান ছিলেন, একজন লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং অঙ্গাবরণী মধ্য হইতে একটী অভিজ্ঞান বাহির করিয়া দেখাইল। কৃষ্ণানন্দ বলিয়া দিলেন,—"বাহির হইতে আক্রমণ করিতে হইবে। ভিতরকার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক আছে।"

যে আসিয়াছিল, সে চলিয়া গেল। এ দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজয়সিংহকে লইয়া পঞ্চাশজন সৈন্য বধ্য-ভূমিতে প্রবেশ করিল।

তখন দর্শকগণের মধ্যে ভারি একটা ঠেলাঠেলি মেশামিশি—পেষা-পিষির তরঙ্গ উত্থিত হইল। বন্দী বিজয়সিংহকে দেখিবার জন্য সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অনেকখানি বেলা হইল—অনেকক্ষণ হইল বিজয়সিংহকে বধ্য ভূমিতে আনা হইয়াছে। এখনও তাঁহার দেহটা ফাঁসিকাঠে ঝুলান হইল না—এজন্য দর্শকগণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিলেন। এই বিলম্বের কারণ—মণিপুর রাজ্যের নিয়ম ছিল, কাহারও ফাঁসি হইলে প্রধান মন্ত্রী বধ্য-ভূমিতে গিয়া হুকুম দিলে তবে তাহার ফাঁসি হইবে। কিন্তু মন্ত্রী এখনও পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলেন না। তখন তাঁহার বাড়ীতে একজন ডাকিতে গেল। মন্ত্রীর সন্ধান নাই। তাঁহার বাড়ীর লোক বলিল,—তিনি কল্য রাত্রে কোথায় গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসেন নাই।

সে কথা শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী মহারাজার নিকটে আদেশ আনিতে গমন করিলেন। কিন্তু তখন বধ্যভূমিতে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইল,—যে সকল সামন্ত সর্দ্দারগণ সেখানে আসিয়া জমাট পাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের ইঙ্গিতে তৎপার্শ্বস্থ দর্শকগণ তড়িৎগতিতে প্রহরিগণের মধ্য হইতে বিজয়সিংহকে ছিনাইয়া লইয়া চারি পাঁচ জনে বাহির হইয়া পড়িল। প্রহরিগণ ছুটিয়া ধরিতে যাইতেছিল—কিন্তু সর্দ্দারগণ বস্ত্র মধ্য হইতে হাতিয়ার বাহির করিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল। প্রহরিগণ সে অস্ত্রের গতি প্রতিরোধ করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কাযেই বিজয়-সিংহকে ধরিবার জন্য তাহাদিগের আর যাওয়া হইল না।

সৈন্যগণ বিজয়সিংহকে ধরিতে যাইবে, কিন্তু সৈন্যাধিনায়ক নিশ্চল

নিরত। সেনাধিনায়কের আদেশ না পাইলে সৈন্যগণের একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

সহসা সৈন্যগণের পশ্চাতে বন্দুকের আওয়াজ হইল। সমবেত সিপাহী-সৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারাও বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল।

ত্রিকোণবৃত্তাকারে ব্যূহ রচনা করিয়া প্রায় দুইশত সৈন্য আসিয়া মণিপুরের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল, ব্যূহের দুই মুখে দুইজন সেনাধিনায়ক—এক রবীশ্বর; অপর জয়সিংহ।

মণিপুরের সহকারী সেনাপতিও বিজয় হুহুঙ্কার ছাড়িয়া মুহূর্ত্ত মাত্রে সৈন্যগণকে অর্দ্ধ-চক্রাকারে ব্যূহিত করিয়া অস্ত্র চালাইতে আদেশ করিলেন—নিজেই ভীম তরবারি ঘূর্ণায়মান করিয়া বিপক্ষ-শোণিত-পানে উদ্যত হইলেন।

তখন একটী ভীম যুদ্ধের অভিনয় হইতে লাগিল। প্রলয়ের কোলাহল উঠিয়া পড়িল।

মণিপুরী ও গুর্খাসৈন্যের ভীষণ তেজ—রবীশ্বর ও জয়সিংহের চালিত সৈন্যগণ আর সহ্য করিতে পারে না। বিশেষতঃ সহকারী সেনাপতির অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেছিল।

যেখানে থাকিয়া রবীশ্বর দৃপ্তসিংহের ন্যায় শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষতদেহ স্বীয় সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন, এবং যুদ্ধ করিয়া শত্রুবল ক্ষয় করিতেছিলেন,—তড়িতের ন্যায় সহকারী সেনাপতি অশ্ব লইয়া, তথায় তাঁহার অশ্বের সম্মুখীন হইলেন—হস্তের তরবারি রবি-কিরণে ঝলসিয়া চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছিল, দূর হইতে দেখিয়া জয়সিংহ বিষাদ গণিলেন, ভাবিলেন রবীশ্বরকে এইবার সংহার করিল।

কিন্তু তাহা হইল না। রবীশ্বরই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সহকারী সেনাপতি ধৃত হইলেন দেখিয়া মণিপুরী সৈন্যগণ হতাশ হইল।

সহকারী সেনাপতি রবীশ্বরের কাণের কাছে বলিল,—"আর একটু যুদ্ধ করিয়া, সেনাপতিহীন সৈন্যগণের নিকট হইতে বন্দুক গুলা কাড়িয়া লও। তোমাদের বন্দুকগুলা সেকেলে ধরণের; আসল লড়াইয়ের দিনে ওতে কায হইবে না।"

সবিস্ময়ে রবীশ্বর সেনাধিনায়কের মুখের দিকে চাহিলেন। সেনাপতি বলিল, "চিনিয়াছ?"

রবি। হাঁ—চিনিয়াছি।

সেনা। আমিও তোমাদিগকে চিনিয়াছি—এই বীরত্ব? ধরা দিলাম বলিয়া ধরিতে পারিলে।

রবি। তোমরা যে জাতি, ধরা না দিলে কে ধরিতে পারে?

তখনও লড়াই চলিতেছিল। সেনাপতি-হীন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মণিপুরী সৈন্যগণ তখন বড় হটিতেছিল। রবীশ্বর জয়সিংহকে ডাকিয়া বলিলেন—"আর বৃথা রক্তপাতে প্রয়োজন নাই। বিজয়সিংহ বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

তখন আর একবার ভীম তেজে সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া রবীশ্বরের সৈন্যগণ লড়াই করিল—এবং কয়েকটী বন্দুক কাড়িয়া প্রস্থান করিল।

রাজা, মন্ত্রী বা সেনাপতি কাহারই আদেশ না পাওয়াতে দুর্গ হইতে আর সৈন্য বাহির হইল না। রবীশ্বর ও জয়সিংহ আপন সৈন্যগুলি লইয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলেন।

যাইবার সময় রবীশ্বর মণিপুরী সৈন্যের সহকারী সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কি করিতে চাও?"

সে মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "সঙ্গে যাইতে চাই। এখানে থাকিলে রাজকোপে পড়িতে হইবে।"

রবীশ্বরের আদেশে সৈন্যগণ তাঁহাকেও অতি সম্ভ্রমে—অতি আদরে প্রভুর ন্যায় ভক্তিপূর্ব্বক লইয়া গেল। পথে যাইয়া রবীশ্বর সেনাপতির অশ্বকে আপন অশ্বের দক্ষিণ পার্শ্বে করিয়া লইয়া চলিলেন। জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপক্ষ সেনাপতির প্রতি অত সম্মান কেন? উহাকে অত স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে কেন?

রবীশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"উনি বিপক্ষ সেনাপতি হইয়াও, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী—উঁহারই কৌশলে আমরা এত সহজে জয়-লাভ করিয়া ফিরিয়াছি।—এত সহজে বিজয়সিংহকে লইয়া সৈন্যগণ বাহির হইতে পারিয়াছে।"

রবীশ্বর, জয়সিংহ ও তাঁহাদিগের সৈন্যগণ তীব্র-গতিতে সীমান্ত অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পর্ব্বতের সানুদেশস্থ একটা গহ্বরের পার্শ্বে সেই বস্ত্রাবাসের ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রবীশ্বর, জয়সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের বাসস্থান। রবীশ্বর তথায় পঁহুছিয়া দেখিলেন, বিজয়সিংহ অনেক আগেই তথায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন,—এখন তিনি বিমুক্ত-বন্ধন।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর গতরাত্রে মণিপুরের প্রধান প্রধান সামন্তসর্দ্দারগণকে আহ্বান করিয়া, মণিপুর রাজবংশের সম্বন্ধ-সর্ত্ত ও প্রতিজ্ঞাপত্রখানি দেখাইয়া ও অভিনন্দন দেখাইয়া, বলেন—"তোমরা থাকিতে, মণিপুরের পবিত্র সিংহাসনে পবিত্র ক্ষত্রিয় রাজার স্থলে নাগাজাতি অধিরোহণ করিয়াছে। তোমরা ক্ষত্রিয় সন্তান,—তোমাদিগের উপর অনার্য্যনাগা প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করিতেছে,—আর মহারাজা বভ্রুবাহনের বংশধর কাঙ্গালের মত পথে পথে ঘুরিতেছেন। মণিপুর রাজকুল-লক্ষ্মী মহারাজা বলদেবসিংহের মহিষী এই দেখ, পথের ভিখারিণী। উঁহারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন,—তোমরা সহায়তা করিলে,

তোমাদের রাজা আবার মণিপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন।"

আলোচনা আন্দোলনের পর,—অনেক তর্কবিতর্কের পর উহারা জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। অবশেষে বিজয়সিংহের কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছিল,—সেই যুক্তির বলে ও তাহাদেরই দ্বারা বিজয়সিংহের উদ্ধার হইয়াছিল।

যখন জয়সিংহ কৃষ্ণানন্দঠাকুরের বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, রবীশ্বরের সহিত মিলিত হইতে যান, তখনই কৃষ্ণানন্দঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন,—"এখনও সামন্তগণ কি প্রকারে বিজয়সিংহকে উদ্ধার করিবে, তাহা স্থির করিতে পারে নাই, তবে উদ্ধার করিবে—এ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তোমরা সৈন্য লইয়া আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া,—কি প্রকারে ও কি কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে—এবং কোন্ দিক্ দিয়া মণিপুরী সৈন্য আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা একজন দূত পাঠাইয়া আমার নিকট অবগত হইয়া সেই প্রকারেই কার্য্য করিবে।"—সেই জন্যই কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর রাস্তার উপরে নিম্ববৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং দূত আসিলে তাহাকে বহিরাক্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

রবীশ্বর বিজয়সিংহের নিকট গিয়া বলিলেন,—"কারাবাসে আপনার বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই ত ?

বিজয়সিংহ বলিলেন, "রবীশ্বর ; তোমার প্রতাপে, তোমার বুদ্ধিবলে বড়ই প্রীত হইলাম। তোমাদের সকল কুশল ত ?

রবি। হাঁ, বর্ত্তমানে আমাদের সকল কুশল।

বিজয়। আমি যখন বন্দী হইয়াছিলাম, তখনই সহকারী সেনাপতি দলিল পাইয়াছেন, শুনিলাম ; তখন রাণীমার জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল, তিনি কুশলে আছেন ত ?

রবি। হাঁ—তিনি কুশলে আছেন। আমি সে দিন পান্থশালায় গিয়া, ঐ সংবাদ শ্রুত হইয়া তখনই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে, তিনি কৃষ্ণানন্দঠাকুরের বাড়ীতে আছেন। কৃষ্ণানন্দঠাকুরের যত্নে সামন্তগণ বশীভূত ও পক্ষাবলম্বন করিয়া আপনাকে মুক্ত করিয়াছে।

বিজয়। শুনিলাম, তুমিও যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছ। মণিপুরের সহকারী সেনাপতিকে নাকি ধরিয়া ফেলিয়াছ ?

রবি। আজিকার যুদ্ধে আমার কিছুমাত্র বীরত্ব নাই। সহকারী সেনাপতি ধরা দিয়াছেন, বলিয়া ধরিতে পারিয়াছি।

বিজয়। সহকারী সেনাপতি কে ? নিমকচাঁদ ত ? নিমকচাঁদই ত আমাকে বন্দী করিবার মূল।

রবি। কি করিয়া আপনার সন্ধান পাইয়াছিল যে, কিষণজি নহেন, —বিজয়সিংহ। আর রাণীমার এবং দলিলাদিরই বা কি প্রকারে সন্ধান পাইয়াছিল ?

বিজয়। সমস্ত বিষয় আমি ত জানি। তবে ঘটনা শৃঙ্খলার অনুমানে মনে মনে যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়,—আমার একটা ভৃত্যের প্রয়োজন হওয়ায় একজন ভৃত্য রাখি,—সুচতুর নিমকচাঁদ আমার সন্ধান ও গতিবিধির সংবাদ লইবার জন্য তাহার বিশ্বস্ত একটী ভৃত্য গোপনে আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। সে আসিয়া বলে, আমি পরম্পর শ্রুত হইলাম, আপনার ভৃত্যের প্রয়োজন। নিমকচাঁদ পাঠাইয়াছে জানিলে, আমি কখনই তাহাকে রাখিতাম না। বোধ হয়, সে-ই দুলালী পটোহীর বাড়ী যাওয়ার সংবাদ নিমকচাঁদকে দেয়। অবশেষে নিমকচাঁদ সে বাড়ীতে গিয়া সমস্ত সন্ধান পায়। রাণীকে ছলে ভুলাইয়া দলিলগুলি বাহির করিয়া লয়।

রবি। নিমকচাঁদই যে, এই সকল ষড়যন্ত্রের মূল, তাহা আপনি জানিলেন কি প্রকারে ?

বিজয়। আমি যখন কারাগারে বন্দী—তখন নিমকচাঁদই আমার নিকট হইতে বন্ধুত্ব জানাইয়া—নানা ছলনা করিয়া, আমার হস্তের হীরকাঙ্গুরী লইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, রাণীমাতাকে সেই হীরকাঙ্গুরী দেখাইয়াই প্রতারণা করিয়া দলিল গুলি লইয়া গিয়াছিল।

রবি। আপনার অনুমান ঠিক। আমি পান্থশালায় নিমকচাঁদের নিজমুখেই ঐ সকল কথা শুনিয়াছি।

বিজয়। সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদ—তুমি বলিতেছিলে, সে নিজেই ধরা দিয়াছে! সাবধান! নিমকচাঁদ বড়ই ধূর্ত্ত—তাই আপনি ধরা দিবার তাহার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে। তাহার হাত-পায় দৃঢ় শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়া, খর-নজরে রাখিতে হইবে।

রবি। সহকারী সেনাপতি নিমকচাঁদ ধরা পড়ে নাই—আজ একজন নূতন সহকারী সেনাপতি আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদের হিতচিকীর্ষু—তিনিই নিমকচাঁদের সিন্দুক হইতে রাজবংশের সম্বন্ধ-সর্ত্ত দলিল চুরি করিয়া লইয়া আমাকে দিয়াছিলেন। তিনিই সৈন্যগণকে স্থির রাখিয়া, আপনাকে বাহিরে যাইবার পথ দিয়াছেন—তিনিই আপন ইচ্ছায় ধরা দিয়া, মণিপুরী সৈন্যগণকে বিশৃঙ্খল করিয়া আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন।

বিজয়। তুমি যখন তাঁহার এত সংবাদ রাখ, তখন তাঁহার পরিচয়ও অবগত আছ ?

রবি। হাঁ—তাঁহার পরিচয় জানি।

বিজয়। কে, তিনি ?

রবি। তিনি আপনার একান্ত প্রণয়ানুরাগিনী ফুলরাণী। তিনি নিমকচাঁদের আদরের কন্যা ফুলরাণী।

বিজয়সিংহ অন্যমনস্ক হইলেন। ফুলরাণী—সেই রাজবাড়ীর নৃত্য-কারিণী সর্ব্ব-শোভাময়ী ফুলরাণী! সে কি আমার প্রণয়ানুরাগিণী!

বিজয়সিংহ সে সম্বন্ধে তখন আর কোন কথা বলিলেন না। রবীশ্বর বলিলেন,—"তিনি ধরা দিয়াছেন, এই জন্য যে, তিনি যেরূপ ভাবে লড়াই করিয়াছেন—অথবা তাহা কর্ত্তব্য হয় নাই। রাজা শুনিয়া, রাগ করিতেও পারেন,—ধরা দিয়াছেন, ইহাতে রাজা বুঝিবেন, শত্রুগণের নিকট পরাস্ত হইয়া ধৃত হইয়াছেন,—তাহাতে আর কি হইবে। আরও বোধ হয়, ধরা দিয়া আপনাকে ধরিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহার পুরুষ-বেশ—কি অবস্থায় রাখা যাইবে?"

বিজয়। পৃথক্ গৃহের বন্দোবস্ত করিয়া দাও—পাহারা বন্দোবস্ত কর। বাহিরে ঐরূপ পোষাকই থাক।

রবি। আর একটা সুবিধা হইয়াছে—গতকল্য রায় রতনচাঁদ ও মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণকেও বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে?

বিজয়। কি প্রকারে?

রবীশ্বর আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া বিজয়সিংহ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তৎপরে বলিলেন;—"পামহেবা কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। এখন আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে—তিনি আমাদিগকে আক্রমণ না করিতে করিতে আমরা গিয়া মণিপুর ও রাজপাট আক্রমণ করি। তুমি সৈন্যদিগকে শীঘ্র শীঘ্র আহারাদি করাইয়া প্রস্তুত থাকিতে আদেশ কর। কিছুই বলা যায় না,—পামহেবা যদি এই স্থানে এখনই আসিয়া আক্রমণ করে। আর যদি তাহা না করে—আজই রাত্রে সমস্ত সৈন্য লইয়া আমাদিগকে মণিপুর আক্রমণ করিতে যাইতে হইবে। যতক্ষণ পামহেবা রাজ্যচ্যুত না হয়েন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নাই।"

রবি। বন্দিগণ কোথায় থাকিবেন?

বিজয়। পঞ্চাশজন সৈন্যের পাহারায়, এই স্থানেই থাকিবে।

রবি। সহকারী সেনাপতি?

বিজয়। তাহাকে নয় তুমি ঝোলায় পুরিয়া লইও।

রবীশ্বর নত বদনে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সে যে বীর, আমাদের সেনাপতি বিজয়সিংহকেই ঝোলায় পূরিবে।"

বিজয়সিংহ সে কথা শুনিতে পাইলেন। তিনিও মৃদু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সে বীরত্ব কেবল নয়নবাণে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মণিপুরের বর্ত্তমান অধীশ্বর পামহেবা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সংবাদ পাইলেন, রায় রতনচাঁদের বাড়ী হইতে কল্য রাত্রে চিরঞ্জীববর্ম্মণকে ও রায় রতনচাঁদকে বিপক্ষ সৈন্যেরা বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। অদ্য আবার সৈন্যদল মথিত করিয়া, সহকারী সেনাপতিকে এবং বন্দী বিজয়সিংহকে লইয়া বিপক্ষ সৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে।

তিনি বিশ্বস্ত দূতমুখে শ্রুত হইলেন,—এই বিপক্ষ অন্য কেহ নহে। যুবরাজ জয়সিংহ ও শান-সেনাপতি বিজয়সিংহ বহুল শানসৈন্য লইয়া আপনাদের পৈত্রিক সিংহাসন উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তিনি আরও শুনিতে পাইলেন, মণিপুরের সামন্ত সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়াছেন—তাঁহারা যুবরাজ জয়সিংহের সহিত যোগদান করিয়াছেন—এবং তাঁহারাই হাতিয়ার চালাইয়া বন্দী বিজয়সিংহকে লইয়া গিয়াছিলেন।

সংবাদ শ্রুত হইয়া পামহেবা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি

যে বীর-শক্তি লইয়া মণিপুর জয় করিয়াছিলেন,—নানা কারণে এখন আর তাঁহার সে সাহস, সে শক্তি নাই। মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণই এখন তাঁহার একমাত্র পরিচালক—কিন্তু দুর্দ্দিনের দিনে তিনিও বন্দী হইয়াছেন। প্রধান সেনাপতি অসুস্থ। পামহেবা চারিদিক শূন্য দেখিলেন। হতাশনয়নে সমস্ত রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার যেন মনে হইতে লাগিল,—এই বাড়ী হইতে তাঁহাকে জন্মের মত বিদায় লইতে হইবে। ফুল্লার-বিন্দবদনা মণিপুর-ললনাকুলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার যেন বোধ হইতে লাগিল—এই দেখাই শেষ দেখা। শিশু সন্তানগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার চক্ষুপূরিয়া জল আসিল, ভাবিলেন,—এমন কচিমুখের অমিয়-সৌন্দর্য্য বুঝি আর দেখা হইবে না।

পামহেবা বসিয়া বসিয়া কি ভাবিলেন। অবশেষে অন্তিমসাহসে ভর করিয়া, রাজ-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক দরবারে গমন করিলেন। দরবারের তূর্য্যনাদ হইল। পদাতিকগণ রাজাদেশে চারিদিকে ছুটিয়া লোকজন ডাকিতে গেল। প্রধান সেনাপতিরও আহ্বান হইল।

পদাতিকগণ বাড়ী বাড়ী প্রজা ডাকিয়া আসিল,—সামন্তসর্দ্দারগণকে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিল,—কিন্তু দরবারে কেহই আগমন করিল না। পামহেবা ইহাতে আরও বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিষম উদ্বেগ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় প্রধান সেনাপতি ও কয়েকজন মন্ত্রণাসচিব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের নিকট পামহেবা সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিয়া সুপরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রধান সেনাপতি বলিলেন,—"বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করা হইবে না।"

পাম। সামন্ত-সর্দ্দারগণ ও প্রজাগণ যুবরাজ জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মন্ত্রী চিরঞ্জীব ধৃত হইয়াছেন।

প্রধান। আমরা এখনও জীবিত আছি।

পাম। বিজয়সিংহ ভীমযোদ্ধা—রবীশ্বরও কৌশলী যোদ্ধা। শান-সৈন্যও অনেক আসিয়াছে।

প্রধান। বিনাযুদ্ধে সিংহাসন পরিত্যাগ করা কাপুরুষতা।

পাম। যুদ্ধ করিলেই কি সিংহাসন রক্ষা করিতে পারিবে?

প্রধান। যদি মণিপুরের প্রজাগণ বিদ্রোহী না হইত—তবে সে মুষ্টিমেয় শান-সৈন্যে কিছু মাত্র ভয় করিতাম না।

পাম। এখনকার কথা কি, তাহাই বল?

প্রধান। যুদ্ধ করিতে হইবে।

পাম। যদি যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ হয়, তবে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিও না, ত্বরায় দুর্গে গিয়া সৈন্য-শৃঙ্খলা সম্পাদন কর। তোমার ভরসাতেই আমার জীবন, ধন ও মান রাখিলাম।

সগর্ব্বে প্রধান সেনাপতি বলিলেন—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সিংহাসন আমিই রক্ষা করিব।"

তখন পামহেবা সেনাপতির নিকট কৃতজ্ঞতা ও কাতরতা জানাইয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন।

পামহেবা কিন্তু চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিয়া প্রধান মহিষীকে সুযুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"দুই কুলই বজায় রাখ। ওদিকে যুদ্ধায়োজন হউক, এদিকে পলায়নের আয়োজনও হউক। যুদ্ধে পরাজয় দেখিলেই পলায়ন শ্রেয়ঃ হইবে।

মহিষীর যুক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয় ভাবিয়া, মণিপুরের বর্ত্তমান

অধীশ্বর পলায়নের উদ্‌যোগে মনোনিবেশ করিলেন। তদর্থে দাসদাসীগণ —গৃহের দ্রব্যাদি স্থানান্তরীকরণ, বাক্স পেট্‌রা সাজান ও মোট-মুটুরী বাঁধা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহিষীগণ বিপন্ন অধরে কালিমার রেখা লইয়া আপন আপন ধন সম্পত্তি বাঁধিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল,—সাঁঝের প্রদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রাসাদের মধ্যে রাজা রাণী, দাস-দাসী, পরিজনবর্গ প্রভৃতি সকলেরই মুখ বিষন্ন—সকলেই চিন্তাকুল।

প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বিজয়সিংহের অনীকিনী তিনভাগে বিভক্ত হইয়া মণিপুর আক্রমণ করিল। তিনভাগ সৈন্যের, বিজয়সিংহ, জয়সিংহ ও রবীশ্বর পরিচালক হইলেন। বিজয়সিংহ ও রবীশ্বর দুই দল সৈন্য লইয়া দুই দিক্ হইতে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। জয়সিংহ সৈন্য লইয়া রাজপুরী আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন। মণিপুরের সামন্তগণ ও অনেক প্রজাগণ অস্ত্র লইয়া যুবরাজের সাহায্য করিতে ধাবমান হইল। অনেক প্রজা কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া নিস্তব্ধে থাকিল। চারিদিকে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। চারিদিকে অস্ত্রের মরণ-ঝঙ্কার শুনা যাইতে লাগিল। চারিদিকে রণবাদ্য ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। চারিদিকেই মরণের অভিনয়,—চারিদিকেই কৃতান্তের করাল তাণ্ডব। উভয় পক্ষেরই মানুষ মরিয়া ধরা চুম্বন করিতেছে—উভয় পক্ষেরই হতাহতের চীৎকার উঠিতেছে, কে কাহাকে দেখে?

যুদ্ধের কিন্তু বিরাম নাই। গোলাগুলি অবিরলই চলিতেছে। যত বেলা হইতেছে, ততই তাহা বাড়িতেছে। ক্রমে মণিপুর সৈন্যের বিপদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া দাঁড়াইল। পরিশেষে সেনপতি দুর্গ রক্ষার জন্য প্রাঙ্গণের প্রাচীরের উপরে উঠিয়া সৈন্যগণকে গুলি চালাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু রণোন্মত্ত সেনাধিনায়ক-পরিচালিত শান-সৈন্যগণ

তাহাতে নিবৃত্ত হইল না। লাভে হইতে আরও ভীষণ ক্ষিপ্রতায় শিলাবৃষ্টির ন্যায় গুলি পড়াতে মণিপুরী সৈন্যগণ ঝটিকাহত কদলীতরুর ন্যায় ভূপতিত হইতে লাগিল। শানসৈন্যের কামানের গোলাতে দুর্গের নানা অংশ ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে বিশৃঙ্খলার একশেষ এবং দুর্গ বিজয়সিংহের হস্তগত হয় হয় হইয়া উঠিল। এই সময় সেনাপতি শ্বেতপতাকা তুলিয়া দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

বিজয়সিংহ দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন,—"পামহেবা রাজা নহেন। পরসিংহাসনোপবেশী নাগা। তাঁহার সহিত আমাদের আর কি সন্ধি হইতে পারে। যদি জয়সিংহের সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, তবেই আমরা যুদ্ধ স্থগিত করি।"

সেনাপতি,—দেখিলেন—আর উপায় নাই। কামানের গোলায় দগ্ধ না হইয়া আত্মসমর্পণই শ্রেয়ঃ। সেনাপতি সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। বিজয়সিংহ ও রবীশ্বর দুর্গ দখল করিয়া বিজয় তোরণ তুলিয়া যথাবিধি বন্দোবস্ত করিলেন।

ওদিকে যুবরাজ জয়সিংহ সদলে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া রণ-দামামার বাদ্যের সহিত কামানের অনল-গর্জ্জন উত্থিত করিলেন। বিপক্ষ সৈন্যগণকে দেখিয়া প্রাসাদরক্ষক সৈন্যগণও কামানে আগুন জ্বালিল,—উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

আকস্মিক আক্রমণে রাজপ্রাসাদ রক্ষকেরা প্রথমে একটু থতমত খাইয়াছিল। সুতরাং জয়সিংহের সৈন্যের গুলিতে অনেক মণিপুরী হত ও আহত হইয়াছিল। জয়সিংহের পক্ষেরও কয়েকজন আহত হইয়াছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবরাজ রাজপ্রাসাদ দখল করিয়া লইলেন। তখন পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন,—পামহেবা নাই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরিজনবর্গেরও কোন সন্ধান নাই।

পামেহেবা সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্গ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই সপরিবারে প্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া জন্মের মত পলায়ন করিয়াছিলেন।

যুবরাজ জয়সিংহের বিজয়পতাকা রাজবাড়ীতে উড্ডীন হইল,—মণিপুরের রাজসিংহাসনে আবার রাজবংশের অধিরোহণ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অতি সামান্য মাত্র যুদ্ধে সমস্ত নগর যুবরাজ জয়সিংহের দখলে আসিল,—সকলেই তাঁহার নিকটে মহারাজা বলিয়া শিরোনমন করিল।

সমস্ত মণিপুর হর্ষোৎসবে নিরত হইল। বিজয়সিংহ, রবীশ্বর ও শানসৈন্য প্রভৃতি দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

তৎপরদিবস, সীমান্ত হইতে বন্দী ও সৈন্যগণকে সেই কারারক্ষী রূপে রাখা হইল,—পুরাতন কারারক্ষাদিগকে বিদায় দেওয়া হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পার্শ্বোপবিষ্টা কমলের দিকে চাহিয়া, ঠাকুর বাড়ীর পাষাণ-বেদিকার উপরে বসিয়া কৃষ্ণানন্দঠাকুর বলিলেন;—"আজি সেই পূর্ণিমা তিথি।"

কমল বলিলেন,—"হাঁ ঠাকুর; আজি সেই পূর্ণিমা তিথি।

কৃষ্ণা। এখন বুঝিয়াছি—তোমার চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইয়াছে। যে সর্ব্বভূতে একদর্শী হইয়াছে,—অনলে অনিলে মরুদ্ব্যোমে একরূপ নিরীক্ষণ করিতেছে।—এখন একবার কূটস্থ হইয়া জন্ম-জন্মান্তরীয় ব্যাপার দর্শন কর।

কমল এতদিনের শিক্ষায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সে পার্থিবজীবনে রবীশ্বরের মিলনাশা ছাড়িয়া দিয়াছে; শিক্ষাসংঘর্ষণে তাহার হৃদয় হইতে

বর্ষাজল-তাড়িত তটভূমির মত মরজগতে মিলনাশা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। সে জড়ত্বের অনাদর করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার বেশরচনায় আর স্পৃহা নাই, জগতের সুখে আর শান্তি নাই, প্রিয়তমের চিত্র প্রতিকৃতিতে আর শান্তি নাই। নীলাকাশের দীপ্ত তারকায় অস্তোন্মুখ সূর্য্যের অরুণ-কিরণ-মালায়, সঞ্চরণশীল মেঘ-বিতানে, গগনবিহারী বিহগগানে, সচল নদীতে, অচল ভূধরে, তরুলতায়, ফলে ফুলে, জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্র কমল এক মহাশক্তির চিন্ময় বিকাশ দেখিতে পাইয়াছে,—সেই সুন্দরের সঙ্গে রবীশ্বরের সৌন্দর্য্য মিলনের সেইরূপই কমলের ধ্যেয়। কমল বুঝিয়াছে—জড় থাকে না; স্থূলের ধ্বংস হয়। মরজগতের ফুল শুকাইয়া যায়।

কমল বলিল,—"ঠাকুর; যাহা ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহে, তাহা কি প্রকারে দেখিতে পাইব? ব্যাপার ভেল্কা নয় ত?"

কৃষ্ণানন্দঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"কাযটী ভেল্কীর মতই বটে। কিন্তু ভেল্কী নয় কি মা? এ জগতের কতটুকু বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? একবিন্দু বালুকাকণার শক্তি-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিবার সাধ্য কাহার আছে। এ জগতের রহস্য উদ্ভেদ কে করিতে পারে! তুমি বলিতেছিলে, যাহা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, তাহা বুঝিব কি করিয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—ইন্দ্রিয় কি?"

কমল। আপনারই নিকটে শিখিয়াছি, ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ।

কৃষ্ণা। হাঁ,—ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ। শক্তিমাত্রেরই ক্ষুদ্রত্ব, মহত্ত্ব পরিমাণভেদে ভেদকল্পিত হয়। ইন্দ্রিয়শক্তিরও এইরূপ। সকলের সকল ইন্দ্রিয়শক্তি সমান তীক্ষ্ণ নহে। প্রথম বহিরিন্দ্রিয়ের কথা ধরা যাউক। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ এই পাঁচটী বহিরিন্দ্রিয় সকল জীবেই সমান ভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকলে সমান শক্তিশালী নহে।

কমল। এই তারতম্যের কারণ ত প্রকৃতি?

কৃষ্ণা। প্রকৃতি এবং অনুশীলন দুই-ই। প্রকৃতি মুখ্য; অনুশীলন গৌণ। শত শিক্ষাতেও বোধ হয় তুমি গর্দ্দভকে সঙ্গীত শিখাইতে পার না। কিন্তু অনুশীলনও নিরর্থক নহে। অসভ্যের অপেক্ষা সভ্যের,—অশিক্ষিতের অপেক্ষা শিক্ষিতের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত।

কমল। আপনি বলিলেন, এই উপলব্ধির ইতর বিশেষে, প্রকৃতিও অনুশীলন-সাপেক্ষ। এখানে আমার একটী সন্দেহ হইয়াছে।

কৃষ্ণা। কি সন্দেহ হইয়াছে?

কমল। সন্দেহ এই হইয়াছে যে, রূপ ও রস, সুখ ও দুঃখ, সত্য ও অসত্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুন্দর ও অসুন্দর,—হয় ত ইহাদের ভেদ কাল্পনিক।

কৃষ্ণা। এ আশঙ্কা অমূলক। যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক না, তাহাতে রূপ বই রসের জ্ঞান হইবে না। রসনেন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক না, তাহাতে রস বই গন্ধের জ্ঞান হইবে না। আন্তরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক, তাহাতে সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। এই ভেদ কাল্পনিক নহে, কিন্তু তেজঃ-তিমিরের মত অত্যন্ত অভিন্ন।

কমল। আপনার কথায় ইহাই বুঝিলাম, আত্মা ইন্দ্রিয়-শক্তির আধার। এই ইন্দ্রিয়-শক্তি—বাহির, অন্তর, সত্য, ধর্ম্ম ও রূপভেদে পঞ্চবিধ। এক একটীর সহকারে আত্মা যথাক্রমে বহির্জ্জগৎ, অন্তর্জগৎ, অধ্যাত্মজগৎ প্রভৃতির সত্তা অনুভব করেন।

কৃষ্ণা। হাঁ, তাহাই। কিন্তু মনুষের এই শক্তি-বিকাশের এই ইন্দ্রিয়স্ফূর্ত্তির একটা সীমা আছে; বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি, ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি চক্ষুর যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই শতযোজন দূরে দেখিতে পাইবে না। তুমি কর্ণের যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই সূক্ষ্মতর গীতাংশ শুনিতে পাইবে না। অতএব সকল ইন্দ্রিয়-স্ফূর্ত্তিরই

একটা সীমা আছে, মানুষে তাহার অতিক্রম করিতে পারে না। তবে মানুষ যদি মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিতে পারে, মানুষ যদি দেব-মানব হইতে পারে, তবে এই সীমানা-বিচার থাকে না। তখন চক্ষুর দূর-নিকট বিচার থাকে না; কর্ণের সূক্ষ্ম-স্থূল বিচার থাকে না,—দূরত্ব সূক্ষ্মত্ব সকলই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়।—তাহার উপায় আত্মার কূটস্থ।

কমল। কূটস্থ কেমন করিয়া হইতে হয়?

কৃষ্ণা। মূলাধার স্থিত জীবাত্মাকে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাবেষ্টন করিয়া দেবযানের পথে ষট্‌চক্র দিয়া দ্বিদল কমলে ভ্রূমধ্যে লইতে হয়। তাহার পথে বায়ু, আকাশ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব গুলিকে তাহার সহিত লীন করিয়া বায়ু-বীজ আশ্রয় করতঃ বহ্নি বীজে জড়ত্ব দগ্ধ করিয়া মূল-বীজে চৈতন্যের গঠন করিয়া একটা গুপ্তবীজে দর্শন করিতে হয়।

কমল। সে গুপ্তবীজ কি?

কৃষ্ণা। তোমাকে আগেই শিখাইয়াছি—তাহাকে অর্কবীজ বলে।

কমল। আমি প্রাণায়ামে জীবাত্মাকে ষট্‌চক্রের উপর পর্য্যন্ত তুলিতে পারি। কিন্তু ভ্রূমধ্যে লইয়া কূটস্থ করিতে পারি না।

কৃষ্ণা। প্রাণায়ামের দ্বারা ইহা পারাও দুর্ঘট।

কমল। কেন?

কৃষ্ণা। কলিতে লোক দুর্ব্বল বলিয়া—এবং ঘন জড়ত্ব বলিয়া।

কমল। তবে কিসে হয়।

কৃষ্ণা। শাস্ত্র সে উপায়ও রূপকে গোপন করিয়াছেন। গুরুর সহায়তা পাইলে সকলেই সহজে পারে। কলির অল্পায়ু ও ঘন জড়ত্ব জীবের জন্য ভগবান্ আরও সহজ পন্থা করিয়া দিয়াছেন।

কমল। আমায় শিখাইয়া দিন।

কৃষ্ণা। হাঁ—আজি শিখাইব, প্রতিশ্রুত আছি। কিন্তু আমি তাড়িৎ প্রচার ব্যাপারের দ্বারাতে তোমার সহায়তা করিব। তুমি প্রক্রিয়া আরম্ভ কর। প্রথম প্রথম গুরুকে এই রূপেই সহায়তা করিতে হয়। তারপরে অভ্যাস হইলে আর গুরুর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কূটস্থ হইলেই জীব সর্ব্বত্র দর্শন-ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকেন।

কমল। আমি কোন্ আসন করিয়া বসিব?

কৃষ্ণা। পদ্মাসন।

যোগিনী কমল পদ্মাসন করিয়া অঙ্কোপরি হস্তদ্বয় উত্তানভাবে লইয়া বসিল। কৃষ্ণানন্দঠাকুর চক্ষুর জল মুছিয়া প্রণাম করিলেন,—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

কমলও ভক্তিনম্রস্বরে প্রণাম করিল,—

কৃষ্ণানন্দঠাকুর কমলের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন মেরুদণ্ডস্থ জীবস্থান পর্য্যন্ত তাড়িত-ন্যাস প্রদান করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যেই পৃথিবীর ভাষায় কমল ঘুমাইয়া পড়িল। সর্ব্বাঙ্গ অসাড়—কেবল দ্বিদল কমলে ভ্রূমধ্যে গতি। তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বহির্ভাগ অচেতন—কিন্তু তন্মাত্রে সূক্ষ্মাংশে পূর্ণ চৈতন্য। কমল তখন কূটস্থ। কমল তখন সূক্ষ্মের রাজ্যে জন্মজন্মান্তরের তত্ত্বদর্শিনী।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর দূরে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। কমল স্বরূপে সূক্ষ্মদর্শনে দেখিতে লাগিল,—সে যেন এক বিন্দু জ্যোতির কণা; তজ্জ্যোতিতে জড়েতে মিলিয়া মর্ত্ত্যের পৃথিবীতে আগমন। সে কত অতীতের কাহিনী। কমল দেখিল,—বুঝি গুরুদেব কৃষ্ণানন্দঠাকুরের ইচ্ছাতেই পর পর তিন জন্মের ঘটনা—পর পর তিন জন্মের জীবনী সে

দেখিতে পাইল। দেখিতে পাইল যেন, পর পর তাহার সকল ঘটনা ঘটিতেছে। এই তিন জন্মেই রবীশ্বরকে লইয়া তাহার ছুটাছুটি—আর কোন সুখ নাই। জীবনে শান্তি নাই—ভিত্তিহীন নরত্বের বৈফল্য-সাধনায় এই তিন জন্মই রবীশ্বরের পশ্চাতে পশ্চাতে কক্ষবিচ্যুত গ্রহের ন্যায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

কমল দেখিল, সে স্বামী-সোহাগিনী গৃহস্থপত্নী। তাহার স্বামী রূপে-গুণে কীর্ত্তি-কলাপে মনোহর। স্বামী তাহাকে রক্তবিন্দু দিয়া ভালবাসেন। এ জন্মের রবীশ্বর, সে জন্মের কমলের ভগিনীপতি। ভগিনীপতির রূপের আগুন কমলের হৃদয়ে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। কমল ভগিনীপতির উপরে মনে মনে আসক্তা হইল,—কিন্তু কামনা সিদ্ধ হইল না। না হউক,—মনের পাপও পাপ। সেই পাপে সতীর পতন হইল,—সেই হইতে কমলের কপালে আগুন লাগিল,—কমল মরিয়া,—এক বারবিলাসিনীর কন্যা হইল।

কমলের পার্থিব জীবনে যৌবন আসিল। এ জন্মের রবীশ্বর, সে জন্মের ব্রাহ্মণপুত্র। যে নগরে কমল বেশ্যা সাজিয়া রূপের ব্যবসা চালাইতেছিল, সেই নগরেই এবং সেই পাড়াতেই ব্রাহ্মণপুত্রের বাড়ী। জন্মান্তরীয় আসক্তি যায় নাই—বাসনা-আগুন তখনও বুকে আছে। একদিন ঘটনাক্রমে রবীশ্বর সেই পথে যাইতে যাইতে কমলের দানবী-দীপ্তিপূর্ণ চক্ষুর সম্মুখে পতিত হইল। কমলের জন্মান্তরীয় স্মৃতি জাগিয়া উঠিল,—বহুদিনের উদ্গীর্ণ কবলের মত তাহার জীর্ণ দীর্ণ ভগ্ন স্মৃতি ব্রাহ্মণ-পুত্রকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। ব্রাহ্মণপুত্র বেশ্যার চাহনির শত হস্ত দূরে সরিয়া গেলেন। পাপীয়সীর জন্মান্তরীয় বাসনার স্রোত উধাও হইয়া ছুটিল,—ব্রাহ্মণপুত্র সুশিক্ষিত এবং বেদপারগ। তিনি সে পাপের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করিলেন। বেশ্যা, তাহার বাসনা

ঘুটাইতে পারিল না—রূপ বিক্রয় করিতে লাগিল,—এই ব্যবসায়ে বড় লোকসান হইয়া সে প্রকৃতির দণ্ডে দণ্ডিত হইল। একদিন করিপদ-দলিত লতার ন্যায় বেশ্যা একটা বৃক্ষতলে পড়িয়াছিল, সেই পথ দিয়া ঐ ব্রাহ্মণপুত্র গমন করিতেছিলেন,—কমল তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার প্রাণের তারে সেই সাধাস্থর বাজিয়া উঠিল। সে কাতরে ব্রাহ্মণপুত্রকে নিকটে ডাকিল। পথপার্শ্বপতিতা বিপন্না কাতরা রমণীর করুণ আহ্বানে ব্রাহ্মণপুত্র নিকটস্থ হইলে, সে জন্মের কমল উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"প্রভু আমি ঝল্লু বাই। আমি বেশ্যা। আমি তোমাকে অন্তরে অন্তরে বড় ভালবাসি—আমি তোমাকে যৌবনে কত আহ্বান করিয়াছি, কত সাধিয়াছি, কাঁদিয়াছি—কিন্তু তুমি ফিরিয়াও চাও নাই। কেন তোমায় এত ভালবাসি, তাহা জানি না। জানি না, কিন্তু ইহা জানি—তোমায় আমি বড় ভালবাসি। যৌবনের বাসনা বিদূরিত হইয়াছে,—জীবনের বসন্ত চলিয়া গিয়াছে, তথাপিও এখনও তোমায় ভালবাসি। প্রাণের সহিত ভালবাসি। ঠাকুর; পাপ কার্য্যের—পাপ ব্যবসায়ের সাজা পাইতেছি। তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণ—আমায় বলিয়া দাও—আমি কিসে পরিত্রাণ পাই। বলিয়া দাও ঠাকুর, কিসে তোমার মত প্রাণের মানুষ সর্ব্বদা নিকটে পাই?"

আর্ত্তের করুণ ক্রন্দনে ব্রাহ্মণের দয়া হইল। উভয়েই তখন বয়োবৃদ্ধ। ব্রাহ্মণ, তাহাকে এক বৈষ্ণবের নিকটে—বৈষ্ণবের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের এই কাজটা বেশ্যা ঝল্লুবাইয়ের বাসনার আগুনের প্রদীপ্ত আহুতি হইল। বৈষ্ণবাশ্রমে অনেক দিন পর্য্যন্ত হরিনাম শুনিয়া, সামান্য পরিমাণে যোগের আচরণ করিয়া ব্রাহ্মণের রূপ হৃদয়ে লইয়া ঝল্লুবাই তনুত্যাগ করিল।

কমল দেখিল—এবার কমল। অনুঢ়া চন্দ্রা এবার কমলের মাতা।

মহারাজ বলদেবসিংহের গোপন মিলনের ফলে চন্দ্রা গর্ভধারণ করিয়াছিল —সেই সংযোগে কমলের অধ্যাসন।

কমল, জন্মিয়া দেখিল, রাক্ষসী মাতা—পাপীয়সী চন্দ্রা মহারাজকে বলিল,—আমি অবিবাহিতা,—তোমার সহিত প্রণয় করিয়া গর্ভ হইয়াছে। এতদিন তুমি আমাকে, আমার গর্ভপ্রকাশ জন্য লুকাইয়া রাখিয়াছ—এখন এই খুকীর উপায় যাহা হয় কর; আমি আর কতদিন লুকাইয়া থাকিব। আমি আর লুকাইয়া থাকিতে পারিব না। মহারাজ, কমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এমন সুন্দর মেয়ে ফেলিয়া দিতে পারিবে?" পাষাণহৃদয়া চন্দ্রা বলিল, "কি করিব—মহারাজ; আমি অবিবাহিতা—মেয়ে লইয়া আমি কেমন করিয়া মুখ দেখাইব।" তখন মহারাজ একজন ধাত্রী ডাকাইয়া তাহার বাড়ী লইয়া গিয়া কন্যাটীকে প্রতিপালন করিতে বলিলেন, এবং সমস্ত কথা গোপন রাখিতে বলিলেন। কমল ধাত্রীর বাড়ী দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

কমল দেখিল, কমল যখন ছয় মাসের, তখন এক ব্রাহ্মণ ধাত্রীর নিকট হইতে কমলকে চাহিয়া লইয়া কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলেন না—একজন ধাত্রী রাখিয়া কমলকে প্রতিপালন করিলেন। কমল তাঁহাকে পিতা বলিয়া জানিল,—কমলের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন সেই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল,—তখন কমল আশ্রয়হীনা—দুয়ারে দুয়ারে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্নের কষ্ট পাইয়া, আশ্রয়ের কষ্ট পাইয়া কমল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে কৃষ্ণানন্দঠাকুর তাহাকে দয়া করিয়া ধরিয়া আনিয়া আপন বাড়ীতে রাখিয়া, শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

কমল দেখিল, সহসা তাহার জন্ম জন্মান্তরীয় আকর্ষণ ফুটিয়া উঠিল, কামনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল—সে জন্মের ভগিনীপতি এ জন্মে রবীশ্বর

হইয়া, তাহারই আকুল আকর্ষণে তাহারই নিকটে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কমল দেখিল, সে তাহার কামনার বাহুযুগল আন্দোলন করিয়া রবীশ্বরকে ধরিতে গেল। আকর্ষণের প্রবল আঘাতে আর কতদিন,—রবীশ্বরের আত্মাও কমলের দিকে আকর্ষিত হইল। কিন্তু সাধ পূরিল না—

এই সময় কৃষ্ণানন্দঠাকুর বিপরীত তাড়িতন্যাস প্রদান করিয়া, কমলের যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কমলের জীবাত্মা কূটস্থ অবস্থা হইতে স্বস্থানে চলিয়া গেল।

কমলের পার্থিব জ্ঞান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যোগিনী কমলের দুই চক্ষু বহিয়া শতধারে অশ্রু বিগলিত হইল। কৃষ্ণানন্দঠাকুরের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

কৃষ্ণানন্দঠাকুরেরও চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুপাত হইল। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"মা; অনেক দিন ধরিয়া তোমাকে শিক্ষা দিতেছি—আজ আমার বাসনা পূর্ণ হইল। যে জন্য তোমাকে রবীশ্বরের সহিত প্রণয় করিতে আমি এবং মুক্তাত্মা দরিয়াবাজ নিষেধ করিতাম, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ।"

কমল। গুরুদেব,—এক্ষণে কতকগুলি কথা আমার জানিবার আছে, দয়া করিয়া উত্তর দিবেন। সদ্‌গুরু লাভই জীবের পক্ষে দুর্লভ। সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইলে, জীবের সৌভাগ্য-দ্বার খুলিয়া যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই—আমার পাপময় জীবনের কোন পুণ্য বলে, আপনার ন্যায় সদ্‌গুরু লাভ করিতে সমর্থ হইলাম।

কৃষ্ণা। তুমি যখন বেশ্যাজীবনে আত্মকৃত মহাপাতকের ফলভোগ করিতেছিলে,—কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি ঐকান্তিকী-প্রেম এবং তৎপরে যোগানুষ্ঠান করিয়াছিলে—অল্প হউক, আর অধিকই হউক, যোগানুষ্ঠান করিলে, তাহা ব্যর্থ হয় না। সেই ফলে তুমি এই উৎকৃষ্ট পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছ।

কমল। যদি সেই অল্পকৃত যোগফলে এই উত্তম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে চন্দ্রার গর্ভে—পাপীয়সীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলাম কেন?

কৃষ্ণা। বেশ্যাজীবনের সমস্ত মাতৃশক্তি বিনষ্ট করিয়াছিলে, সেই মহাপাতকে কয়েক জন্ম বেশ্যা-গর্ভে জন্মিয়া আঁতুড়েই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলে। তার পরে এই দুঃখময় গোপনমিলনের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।

কমল। ভাল ঠাকুর! আপনারা বোধ হয় আমার এ জন্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার অবগত ছিলেন?

কৃষ্ণা। হাঁ, তা জানিতাম বৈ কি,—নতুবা আর রবীশ্বরের সহিত প্রণয় করিতে তোমায় নিষেধ করিতাম কেন?

কমল। কি জন্য নিষেধ করিতেন?

কৃষ্ণা। নিষেধ করিতাম এক কারণে নহে।

কমল। কি কি কারণে?

কৃষ্ণা। প্রথমে তোমার আত্মা পূর্ব্বজীবনের যোগবলে উন্নতির

দিকে অগ্রসর হইয়াছে, ইহ জীবনে তাহাকে শিক্ষা দিতে পারিলে. আরও উন্নতির দিকে যাইবে। নতুবা, রবীশ্বরের দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর—জড়ত্বের উপর, তোমার যে আকর্ষণ আছে—তাহা লইয়া এখনও বহু জন্ম নরকের নিকটে নিকটে ঘুরিবে।

কমল। আর?

কৃষ্ণা। চন্দ্রা অসতী—কাম-কামনাময়ী রমণীর গর্ভে হইয়াছ। মাতৃগুণ লাভ করিলে, সংসারে অসুখী হইবে। শিক্ষায় সে দোষ যাইবে।

কমল। আর?

কৃষ্ণা। তোমার যেরূপ জন্ম, তাহাতে রবীশ্বরের সহিত বিবাহ হইলে, সমাজে তাহার মুখ হেঁট হইতে পারে; তুমি কে,—তাহা কেহ কিছুই জানে না।

কমল। আর কিছু আছে কি?

কৃষ্ণা। হাঁ—আছে। সম্বন্ধে তুমি রবীশ্বরের ভগিনী।

কমল। কি সর্ব্বনাশ! কি প্রকার ভগিনী?

কৃষ্ণা। তুমি রাজা বলদেবসিংহের ঔরসজাতা।

কমল। আর, রবীশ্বর?

কৃষ্ণা। মহারাজা গম্ভীরসিংহের পুত্র।

কমল। রবীশ্বর মহারাজা গম্ভীরসিংহের পুত্র! এই যে দরিয়াবাজের পুত্র বলিয়াছিলেন?

কৃষ্ণা। দরিয়াবাজ কে? কেহই নহে! কৃত্রিম নাম—আমিই ঐ নামে অভিহিত করিতাম। যখন তিনি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সকলকেই দর্শন দিতেন, তখন সাধারণের নিকট একটী সংজ্ঞা ত চাই। দরিয়াবাজই মৃত মহারাজ গম্ভীরসিংহের প্রেতাত্মা।

কমল। ভাল, আমার জন্ম যখন পাপীয়সী অনূঢ়া চন্দ্রার গর্ভে

হইয়াছে,—আমার জন্ম যখন অবৈধ মিলনের ফলে হইয়াছে,—তখন আপনি আমাকে এত পবিত্রভাবে রাখিয়াছেন কেন! এমন কি, আপনি আমার হাতের জল পর্য্যন্ত পান করেন। রাজবংশের পুরাতন বিগ্রহ গোবিন্দজীউর ভোগ পর্য্যন্ত আমি রাঁধিয়া দিয়াছি,—কই, কখন ত নিষেধ করেন নাই।

কৃষ্ণা। কেন নিষেধ করিব? তুমি অপবিত্রা কিসে? কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ অধম জাতিও বিপ্রের সমান। তারপরে তুমি শাস্ত্রপাঠ ও যোগাভ্যাস-নিরতা। আরও কথা আছে—

কমল। কি?

কৃষ্ণা। চন্দ্রা যখন রাজা গম্ভীরসিংহের অনুরাগিণী হইয়া তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, তখন চন্দ্রা অবিবাহিতা ও অনন্যাসক্তা। সুতরাং তোমার আশ্রয়-গর্ভ পাপগর্ভ নহে। সেরূপ হইলে, কর্ণ ও ব্যাস প্রভৃতিও অস্পৃশ্য হইতেন।

কমল। রবীশ্বর ইহ জীবনের যে সম্পর্কই হউক—জন্মজন্মান্তরীয় আকর্ষণ আমার যাইবে না। আমি ইচ্ছা করিতেছি—আমি কোন পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়া যোগ সাধনা করি।

কৃষ্ণা। উত্তম সংকল্প।

কমল। আরও একটী কথা।

কৃষ্ণা। কি বল?

কমল। শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছি—সংকল্প-সম্ভূত-কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া, যোগীজন মন ও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক একচিত্তে সমাধি অভ্যাস করিবেন। ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সহিত যোগী শনৈঃ শনৈঃ মনস্থির করিবেন। আত্মাতে মন নিশ্চল রাখিয়া, আর কিছুই চিন্তা করিবেন না।

কৃষ্ণা। হাঁ।

কমল। যদি তাহাই হইল,—তবে আত্মার কি বৃথা শ্রম করিবে না! আপনার কৃপায় আমার চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে বটে,—কিন্তু সেই একাগ্রতা পরমাত্মার দিকে না হইয়া রবীশ্বরের রূপের দিকে হইয়াছে।

কৃষ্ণা। সান্ত রূপের চিন্তাও ত বটে। জড় বলি দিয়া—সর্ব্বভূতে রবীশ্বরকে দেখিও। আরও কথা আছে। তুমিও পাঠ করিয়াছ—অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধাসত্বেও যিনি যোগে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, অথবা চিত্তচাঞ্চল্য-দোষে যিনি সিদ্ধিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তিনি কিরূপ গতি লাভ করিবেন? তদুত্তরে কৃপা-নিদান কৃষ্ণ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট জনগণ বিনষ্ট হইবেন না, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীদের ইহলোক ও পরলোকে দুর্গতি হয় না। ভ্রষ্ট যোগিগণ স্ব স্ব কৃত পুণ্যফলে স্বর্গাদি লাভ করিয়া বহুকাল তথায় বাস করেন, পরে ভূমণ্ডলে পবিত্র ধনবানদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণের বংশে জন্মলাভ করেন,—জগতে এরূপ জন্ম অতীব দুর্লভ। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা (যোগভ্রষ্ট পুণ্যাত্মগণ) পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অনুসারে সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হওত অধিকতর যত্নের সহিত ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। পূর্ব্বের সংস্কার প্রযুক্ত তাঁহাদের আপনা হইতেই ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন।"

শোন কমল,—মৃত্যু আর কিছুই নহে। সাপের খোলস পরিত্যাগের ন্যায় একটী স্থূল দেহের আবরণ পরিত্যাগ। পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম—সমস্তই সংস্কাররূপে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া থাকে। তোমার ভবিষ্য জীবনে যাহা দেখিয়াছি—শুনিয়া যাও। ইহ-জীবন রবীশ্বরের অসীম প্রেমের ছবি লইয়া বিশ্বের সমস্ত পদার্থে মিশাইয়া দাও। যথার্থ স্ত্রীলোকের মত

উপাসনা হইবে—সেই ফলে রবীশ্বরের সহিত বহু জন্ম স্বামী স্ত্রী-রূপে মর্ত্ত্যভূমে বসতি করিতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে তোমাদের দুইটী হৃদয় এক হইয়া ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে।

কমল। ঠাকুর, তাহা হইলেই আমার যোগসিদ্ধি হইল।

কৃষ্ণা। সমস্তই শুনিলে ও বুঝিলে; এখন তুমি কি করিতে চাও?

কমল। আজি শুভ তিথির শুভযোগে আমাকে একটী পুণ্যময় স্থানের কথা বলিয়া দিন,—আমি তথায় গিয়া দিন কাটাইব।

কৃষ্ণা। তোমার কর্ম্মসূত্রের পার্থিব পরমায়ু—আর দশ বৎসর। দশ বৎসর পরে বাসন্তী পূর্ণিমার অর্দ্ধ রাত্রিতে মৃত্যু হইবে। সে দিন কুম্ভকযোগে ঊর্দ্ধলোকে গমন করিও। যোগই জ্যোতির পথ—জ্যোতির পথই দেবযান।

কমল। ইহার মধ্যে আর কি আপনার শ্রীচরণদর্শন পাইব না?

কৃষ্ণা। বোধ হয়, না। তবে সেই বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রে সাক্ষাৎ করিব।

কমল। এই দশ বৎসর পরে? ভাল, তাহাই করিবেন,—অনুগ্রহ করিয়া, পার্থিব জীবনের সেই শেষ লগ্নে—যেন গুরুগোবিন্দ উভয়েরই দর্শন পাই।

কৃষ্ণা। চেষ্টা করিব।

কমল। কোন্ আশ্রমে যাইব?

কৃষ্ণা। ব্রহ্মদেশের পথে যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহার দক্ষিণে যোগিনী পাহাড়,—সেই পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করিয়া ইরাবতী ও সীতাজানি নামক নদীদ্বয় চলিয়াছে। ঐ আশ্রমে অনেক যোগী ও যোগিনী আছেন,—তুমি তথায় যাইতে পার।

কমল। আমাকে সেখানে কে রাখিয়া আসিবে?

কৃষ্ণা। তুমি যোগ শিক্ষা করিয়াছ,—চিন্তাব্যূহ,—ভাবব্যূহ এবং শক্তিপরিচালন সমস্তই শিক্ষা করিয়াছ,—তোমার ভয় কি ? দস্যু তস্কর বা শ্বাপদ পশ্বাদি তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।

কমল। তবে একাই যাইব ?

কৃষ্ণা। সমস্ত বিশ্বই তোমার রবীশ্বর ; একা কিসে ? মণিপুরের সীমানা পর্য্যন্ত নৌকায় যাও—সীমানা ছাড়াইয়া পদব্রজে যাইও।

কমল। যে আজ্ঞা। আজিই যাইব।

কৃষ্ণা। তাহাই হউক। তুমি বেশ পরিবর্ত্তন কর—আমি নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ করি গে।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর চলিয়া গেলেন। কমলও উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। তাহার মুখে যেন জ্যোতির কিরণ জ্বলিয়া উঠিল।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীর গাত্রে বৈকালের শীতল সমীর ধীরে ব্যজন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণীর মুখে শান্তির কিরণ দেখা দিয়াছে।

কৃষ্ণানন্দঠাকুরের বাড়ীর নিম্ন দিয়া বিতস্তা প্রবাহিতা—বিতস্তার ঘাটে লোকে লোকারণ্য। একখানা নৌকার উপরে গালিচা পাতা,—আস্তরণে সুবাস কুসুমরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। নৌকা আচ্ছাদন-বিহীন,—গালিচার উপরে কমল পদ্মাসনে সুকুমার দেহ উন্নত করিয়া বসিয়া আছে। মস্তকের আগুলফ-বিলম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি, নবীন মেঘের ন্যায় পশ্চাতে পৃষ্ঠে, অংশে, বাহুতে, কপোলে পতিত হইয়া বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। কমলের পরিধানে গৈরিক-মৃৎ-রঞ্জিত বসন,—, সমুন্নত পীবরস্তন-ভারাবনত বক্ষোদেশে গেরুয়া বসন আচ্ছাদিত। হস্তে অক্ষসূত্র। কমল চক্ষুদ্বয় স্থির করিয়া সকলের দিকে চাহিয়া আছে—দর্শকগণও তাহার দিকে চাহিয়া আছে, বিদায়ের করুণ সঙ্গীতের করুণ

উচ্ছ্বাসে যেন সে স্থানটী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনুমতির অপেক্ষা করিয়া, নৌকার দুইধারে দাঁড়ি মাঝিগণ বসিয়া রহিয়াছে।

কৃষ্ণানন্দঠাকুরের গৃহিণী আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"মা কমল; আজি চলিলে? মা, তোমায় যে আমি বুকের সমস্ত স্নেহটুকু দিয়া পালন করিয়াছি—আমায় ছাড়িয়া যাইতে কি তোমার প্রাণে ব্যথা লাগিল না?"

কমল মধুর স্বরে বলিল,—"মা, আমি তোমার মেয়ে। তোমার মেয়ে শ্বশুর বাড়ী চলিল. তাহার জন্য কাঁদিও না মা! মেয়েকে, মা কবে ঘরে রাখিতে পারিয়াছেন?"

কমলের সহচরীগণ বলিল,—"কমল; এত ভালবাসা-বাসি. সব ভুলিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে?"

কমল। সখি; তোমাদের কমল তাহার স্বামীর ঘর করিতে চলিল।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর বলিলেন,—"তবে যাও কমল; যিনি সর্ব্বভূতের সমাশ্রয়, সর্ব্বজীবের সদাশ্রয়—যিনি যোগীর হৃদয়ের রত্ন, যোগিনীর হৃদয়-নিধি—মহাযোগসাধনে যোগিনী হইয়া তাঁহার চরণে শরণ লও।"

এই সময় সেই প্রভাত-সুভগ লতা-প্রতান-শোভী বিতস্তা-তীরে সেই বিদায়-সঙ্গীতের করুণ উচ্ছ্বাসের কালে রবীশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কত দীর্ঘ দিনের পরে রবীশ্বর কমলকে দেখিতে পাইলেন,—কিন্তু একি মূর্ত্তি! কমল যোগিনী সাজিয়াছে—কমল গেরুয়া বসন পরিয়াছে,—কমল মালা পরিধান করিয়াছে—কমল নৌকায় আরোহণ করিয়াছে,—কমল কোথায় যাইবে?"

রবীশ্বর ব্যগ্রকণ্ঠে কৃষ্ণানন্দঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর; কমল কোথায় যাইবে?"

কৃষ্ণানন্দঠাকুরের নিকটে উত্তর না পাইয়া ব্যস্তভাবে রবীশ্বর পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কমলের এ বেশ কেন,—কমল কোথায় যাবে ?"

কৃষ্ণানন্দ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কমল যোগিনী হইয়াছে,—যোগ সাধনার জন্য যাইতেছে।"

রবীশ্বরের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল, বলিলেন,—"কবে আসিবে ?"

কৃষ্ণা। বোধ হয়, আর আসা হইবে না।

রবীশ্বর অশ্রুপূর্ণ লোচনে কমলের দিকে চাহিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কমল; কোথায় চলিলে কমল ? আমি যে, কত আশা করিয়া, তোমায় দেখিতে আসিয়াছি।"

কমল রবীশ্বরের স্বর শুনিয়া বড় বিচলিত হইল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আকুল হইল,—তরু-লতা, সখী-স্বজন, পৃথিবী ভুলিয়া, যোগৈশ্বর্য্যের সুপথ ভুলিয়া, গুরুদেব কৃষ্ণানন্দের কথা ভুলিয়া কমল স্থিরদৃষ্টে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে রবীশ্বরে লীন হইতেছিল।

কমলের চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল, হুকুমে চক্ষুর জল চক্ষুপ্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া শত-মধুকর-ঝঙ্কারে রবীশ্বরকে ডাকিয়া বলিল,—"রবি; আমি চলিলাম। আর আসিব না। আমার সমস্ত বিষয় ঠাকুরের নিকটে অবগত হইও। রবি; একদিন দেখা হইবে। আ'জ চলিলাম। প্রাণের রবি,—তুমি গীতার্থ-পরিজ্ঞাত। তোমায় আমায় অনেকদিন ঘুরিতেছি—যাহাতে আর ঘুরিতে না হয়, এবার তাহারই জন্য চলিলাম। তুমি কামনাশূন্য হইয়া—আত্মসুখ বলিদান দিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।"

কমল, মাঝিদিগকে নৌকা খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। মাঝিরা নৌকা খুলিয়া বিতস্তার নীলজলে ভাসাইয়া দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকা দর্শকগণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দঠাকুর রবীশ্বরকে ডাকিয়া নিজাশ্রমে লইয়া গেলেন। দর্শকগণ ফিরিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

সোণারকণ্ঠী।

নৌকা তরঙ্গ-ভঙ্গে উল্লাস-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে মণিপুরের বাহির হইল।

ক্রমে, সন্ধ্যার দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের ছায়া পৃথিবীতে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল—নিম্নে কল্লোলিনীর কাল জল, উপরে হুহুকরা বাতাস, চারিদিকে সন্ধ্যার বিষাদ আঁধারের ছায়া,—কমল সেই ভাবে সেই স্থানেই বসিয়া আছে। তাহার হৃদয় মধ্যে কেমন একটা করুণ-বিরহের সৃষ্টি হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের মত হৃদয়খানা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল; আর মনে হইতে লাগিল, কাতর হৃদয়ের শেষ নিশ্বাসের মত সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দনের মত কি করুণ কোমলতম শেষ দৃষ্টিতে রবীশ্বর আমার দিকে চাহিয়াছিলেন। ভগ্নতার বীণার শেষ আওয়াজের ন্যায় কি স্বরেই আমায় ডাকিয়াছিলেন! কিন্তু রবীশ্বর—রবীশ্বর সম্পর্কে আমার ভ্রাতা। আমরা উভয়ে ভ্রাতা-ভগিনী।

কমল ভাবিতে লাগিল—ভ্রাতাভগিনীতে প্রেম! পূর্ব্বজন্মের সংস্কার; কর্ম্মফলের কি ঘৃণ্য দৃশ্যপট! তবে কে কাহার! এক জন্মের মাতা হয় ত পরজন্মের স্ত্রী। ইহজন্মের ভ্রাতা হয় ত পরজন্মের দাস! কয়টা দিন,—তারপরে রবীশ্বরকে বুকে লইয়া স্বর্গভোগ করিব।

কমলের অধরে ক্ষীণ হাসি ফুটিল,—সন্ধ্যা হইতেই পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়া নীলজলে, পাহাড়ের তলে, পাদপের পত্রে সোণার কিরণ ছড়াইয়া দিল।

সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নায় জলে মাখামাখি। মাঝিরা কেবল ঝপ্ ঝপ্ করিয়া ক্ষেপণী ক্ষেপণ করিয়া চলিয়াছে। দূরে দূরে নৈশ বায়ু কুসুমের পরিমল লইয়া কাহার উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কমল, বায়ুবিচ্যুত কপোলপতিত চুলের রাশি সরাইয়া দিয়া পার্শ্ব-পতিত বীণা তুলিয়া লইয়া তাহাতে সুর বাঁধিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

তখন মাঝি বলিল,—"ঠাকুরাণী, একটু ঘুমাও। রাত আর বড় অধিক নাই।"

জ্যোৎস্না-প্লাবিত খোলা নৌকার বিছানায় কমল শয়ন করিল। মাঝিরা দেখিল, যেন একছড়া পদ্মের উপরে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে।

যখন প্রভাত হইল,—তখন কমল নিদ্রা হইতে উঠিয়া মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সম্মুখের ঐ জায়গাটার নাম কি?"

মাঝিরা বিষন্নমুখে বলিল, "ঐ জায়গার নামই চরণরেখা—লোকে বলে, যখন ভগবান্ বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তখন রথ হইতে প্রথমেই ঐ জায়গায় নামেন,—তাই ঐ জায়গার নাম "চরণরেখা।" আর ঐ পাহাড়টীকেও চরণরেখার পাহাড় বলে।"

কমল হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রণাম করিল। তৎপরে মাঝিদিগকে বলিল,—"ঐ স্থানেই ত আমাকে নামিতে হইবে?"

মাঝি বিষন্ন মুখে বলিল,—"ঐ স্থানেই নামিতে হইবে।"

অল্পক্ষণ পরেই নৌকা "চরণরেখার" নিকটে পঁহুছিল—মাঝিরা তীরে নৌকা ভিড়াইয়া দিল,—কমল নৌকা হইতে তটভূমিতে নামিয়া পড়িল।"

অশ্রুপূর্ণ লোচনে মাঝিরা বলিল,—"আমরা তবে যাই।"

কমল বলিল. এস। আশীর্ব্বাদ করি, ধর্ম্মে মতি হউক।"

নবম পরিচ্ছেদ।

যুবরাজ জয়সিংহ প্রজাগণের সমবেত স্বস্তি লইয়া, চিরাগত প্রথানুসারে দলিলে স্বাক্ষর করিয়া মণিপুরের পবিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। বিজয়সিংহ বীরবাহু-আন্দোলনে সৈন্যরক্ষার ও দেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—প্রজাগণ সকলেই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে,—

সকলেই কর প্রদানে মহারাজকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। মণিপুরের চারিদিকেই মাঙ্গল্যের হর্ষধ্বনি। চারিদিকেই আনন্দের সাফল্য সংবাদ।

দরবার বসিয়াছে, রাজা জয়সিংহ রাজাসনে উপবিষ্ট,—পাত্রমিত্র, সুহৃদ্-বান্ধব ও সেনাপতি প্রভৃতি সকলেই যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট রাজগুরু কৃষ্ণানন্দঠাকুর রাজার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আসনে উপবিষ্ট।

আজি বন্দিগণের, বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকগণের বিচার হইবে। প্রহরিগণ সঙ্গীন ঘাড়ে করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে; হাবিলদার দূরে দাঁড়াইয়া ডাকে হাঁকে আর গুম্ফ-মর্দ্দনে জমকাইয়া তুলিতেছিল।

সকলেই নিস্তব্ধ—সকলেরই গম্ভীরমূর্ত্তি। এই বিচারের প্রথম আসামী মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ।

প্রহরিগণ যথাসম্ভব প্রহরা দ্বারা চিরঞ্জীববর্ম্মণকে রাজদরবারে আনিয়া হাজির করিল।

ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারকের দ্বারা বিচার কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। রাজ্যের সমস্ত সামন্ত-সর্দ্দার ও ধনিগণের নির্ব্বাচন মত একটী বিচারক-সমিতি গঠিত হইয়াছে,—ঐ সমিতি বা ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক সকলেরই নির্ব্বাচিত।

বিচারকগণ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। সরকারপক্ষীয় উকীল বলিলেন,—"মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্ম্মণ আমাদের প্রথম আসামী। যেহেতু ইনি মহারাজ বলদেবসিংহের রাজত্বের সময় মহারাজার প্রজা থাকিয়াও নাগাসর্দ্দার পামহেবার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তাঁহাকে নগরে আনয়ন করেন।"

বিচারকগণ। কেমন মহাশয়; একথা সত্য?

চিরঞ্জীবের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। ঠোঁট শুকাইয়া ধূলা

উঠিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠে ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—"আমিই যে উহা করিয়াছিলাম—তাহার প্রমাণ কি ?"

উকীল সরকার একখানা দলিল বাহির করিয়া বিচারকগণের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"প্রমাণ এই দলিল।"

বিচারকগণ সেই দলিল, চিরঞ্জীবকে দেখাইয়া বলিলেন,—"এই দলিল কি আপনার হাতের লেখা ?"

দলিল দেখিয়া চিরঞ্জীবের আর কথা ফুটিল না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন।

উকীল সরকার বলিলেন,—"ইহা আপনার হাতের লেখা নহে ? আপনার হাতের অন্য দলিলের সহিত এই দলিলের লেখা মিলাইলেই হইবে ?"

তখন চিরঞ্জীববর্ম্মণ বলিলেন,—"তা হইলেও পারে।"

উকীল সরকার বলিলেন,—"ইহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। মহারাজ বলদেবসিংহ যখন বাতরোগে শয্যাগত—সেই সময়ে ইনি নাগাগণকে সংবাদ দিয়া পুরী আক্রমণ করেন,—তৎপরে চন্দ্রার দ্বারা মহারাজের গৃহ হইতে তাঁহার তরবারি ও মোহর চুরি করাইয়া আনিয়া সেই মোহরাঙ্কিত এক জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া ও মহারাজের অসি হস্তে করিয়া তোপগারদের দরজায় গিয়া দাঁড়ান। "মহারাজা তোপগারদে প্রবেশ করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়াছেন"—ইনি দলিল ও তরবারি হস্তে করিয়া এই কথা বলায় কেহই তোপগারদে প্রবেশ করিতে পারে নাই—সেইজন্য শত শত মণিপুরী হত হয়, আর নাগাসর্দ্দার সিংহাসন গ্রহণ করে।

বিচারকগণ শিহরিয়া উঠিয়া চিরঞ্জীববর্ম্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কথা সত্য কি ?"

চিরঞ্জীব এদিক্ ওদিক্ করিতে যাইতেছিলেন। উকীল বলিলেন,—"চন্দ্রা এখনও জীবিত আছে। চন্দ্রা সাক্ষ্য দিবে।"

চিরঞ্জীব তাহাও স্বীকার করিলেন।

উকীল সরকার বলিলেন,—"তৃতীয় অভিযোগ—ঐরূপ ছলনা দ্বারা রাজ্য গ্রহণ করিয়া, এই কয় বৎসর মহারাজার মণিপুরী প্রজাগণকে অযথোচিত কষ্ট প্রদান করিয়াছেন, অবিচারে অনাচারে দেশ উৎসন্ন দিয়াছেন,—রাজবংশসম্ভূতা কামিনীকে কুল-কলঙ্কিনী করিয়া প্রকাশ্যে রক্ষিতা রাখিয়াছেন।"

চিরঞ্জীব এই সাধারণ-জানিত অভিযোগে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বীকার করিলেন।

বিচারকগণ উঠিয়া পরামর্শ-গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া—প্রধান বিচারক আজ্ঞা দিলেন,—"চিরঞ্জীবের ফাঁসি হইবে।"

প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিয়া, চিরঞ্জীববর্ম্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রহরিগণ ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে কারাগারে লইয়া গেল।

তৎপরে দ্বিতীয় আসামী প্রধান সেনাপতি নাগাজান্ কাম্বু সিং। উকীল বলিলেন,—"ইনি সাহেবার সহিত মণিপুর আক্রমণ করেন। যে রাত্রে ইঁহারা পুরী দখল করেন, সেই রাত্রে অনেকগুলি রাজপুরীস্থ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাকে কাপুরুষ ভাবে হত্যা করেন,—গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন। তৎপরে রাজবংশ-সম্ভূতা দুইটী কামিনীর সতীত্ব নষ্ট ইহার দ্বারাই সম্পন্ন হয়।"

বিচারকগণ পরামর্শ করিয়া, তাঁহারও ফাঁসির আদেশ প্রদান করিলেন। প্রহরিগণ তৃতীয় আসামী রায় রতনচাঁদকে আনয়ন করিলেন,

—রতনচাঁদের পরিধানে এখনও সেই বরের-চেলি। তাহার বার্দ্ধক্য-ক্লিষ্ট শরীরটা শুকাইয়া গিয়াছে।

উকীল সরকার বলিলেন,—"এই আসামী যদিও রাজবিদ্রোহাদি ব্যাপারে অভিযুক্ত নহেন, তথাপি ইনি চিরঞ্জীববর্ম্মণের, ব্যবস্থাকৃত অনেক মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।"

বিচারক, উকীল সরকারকে বলিলেন,—"আমাদিগকে তাহা এক এক করিয়া বুঝিতে দিয়া অনুগৃহীত করুন।"

বিজয়সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"এই ব্যক্তির মোকদ্দমায় সরকারপক্ষীয় সওয়াল জবাব আমি করিব।"

উকীল সরকার বসিয়া পড়িলেন। বিজয়সিংহ বলিলেন,—"ইনি বঙ্গদেশবাসী। যখন বঙ্গদেশ হইতে মণিপুরে আগমন করেন, তখনই ইনি একটি ভয়ানক অপরাধ করেন,—সেই অপরাধজনক কার্য্যে রাজপরিবারের মনে যথেষ্ট কষ্টপ্রদান করা হইয়াছে। সে কি অপরাধ, তাহা মাননীয় বিচারকগণ আসামীর মুখেই শ্রুত হউন। তিনি না বলিলে, আমি প্রমাণ সহ সমস্তই বিচারকগণকে বুঝাইয়া দিব।"

বিচারকগণ আসামী রতনচাঁদের মুখের দিকে চাহিলেন। রতনচাঁদ থতমত খাইয়া বলিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে আমি সে কার্য্য ভালর জন্যই করিয়াছিলাম।"

বিচারক। সে কি কার্য্য?

রতন। আমি যখন বঙ্গদেশ হইতে আগমন করি, তখন ধলেশ্বরী নদীতে একখানি নৌকাডুবি হয়—কিন্তু আমি তাহা চক্ষে দেখি নাই। আমিও আমার স্ত্রীর সহিত নৌকায় আসিতেছিলাম। সহসা আমাদের নৌকার কাছে একটা লোক ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া লাগিল—এবং শীঘ্র তাহাকে তুলিতে বলিল। তাহার বুকে একটী ক্ষুদ্র শিশু।

আমরা তাহাদিগকে তুলিয়া নৌকায় উঠাইলাম। শিশুটী প্রায় মৃত—আগুন জ্বালিয়া সেঁকিয়া পেটের জল বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বাঁচান হইল। সেই বয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিলাম—ধলেশ্বরীতে নৌকাডুবি হয়—বোধ হয় মণিপুরের মহারাজা জীবিত নাই, এটী তাঁহারই একমাত্র শিশুপুত্র—দেবেন্দ্রসিংহ।

বিজয়। তার পরে?

রতন। আমরা মহারাজের কি হইয়াছে জানিবার জন্য—সেখানে অপেক্ষা করিলাম—পর দিন লোকপরম্পরায় শ্রুত হইলাম, তিনি জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন—জেলেরা তাঁহার মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিজয়। তখন তোমরা কি করিলে?

রতন। আমরা মণিপুরের দিকে আগমন করিলাম।

বিজয়। যে লোকটা গম্ভীরসিংহের পুত্র দেবেন্দ্রসিংহকে লইয়া জল হইতে উঠিয়াছিল, সে কোথায় গেল?

রতন। সে আমাদের সঙ্গেই আসিয়াছিল।

বিজয়। তাহার নাম কি?

রতন। তাহার নাম—হরেরাম।

বিজয়। তার পর তুমি মণিপুরে আসিয়া ঐ পুত্রটীকে রাজসরকারে পঁহুছিয়া দিলে না কেন?

রতন। আমি কোন অসদুদ্দেশ্যে যে দেই নাই—তাহা নহে। তাহার সুন্দর মুখ দেখিয়া আমার বড়ই স্নেহ হইয়াছিল। আমি নিঃসন্তান—সন্তানের ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিলাম।

রাজা জয়সিংহ সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন,—বলিলেন "রতনচাঁদ; বল, বল—আমার জ্যেষ্ঠের পুত্র আমার প্রাণাধিক দেবেন্দ্রসিংহ কোথায়?"

রতনচাঁদ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিয়া অঙ্গুলীহেলনে রবীশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, রবীশ্বরই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রসিংহ। প্রভু; মণিপুরেশ্বর,—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার হৃদয়ে অবশ্যই আনন্দ হইয়াছে,—অধীন প্রজাকে ক্ষমা করিয়া জীবন ভিক্ষা প্রদান করুন।"

মণিপুরাধিপতির চক্ষু বহিয়া জলধারা পতিত হইল। তিনি গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "রতনচাঁদ, তুমি খুনী হও, জালিয়াৎ হও; দস্যু হও—আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আর তোমার বিচার হইবে না। তুমি আর বন্দী নও। কিন্তু আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিও।"

প্রহরিগণ রতনচাঁদের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দিল। জয়সিংহ তাঁহার দীর্ঘ বাহুযুগলে রবীশ্বরকে বেষ্টন করিয়া মিলনাশ্রু পরিত্যাগ করিলেন। রবীশ্বরকে লইয়া আপন পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। পুরীমধ্য হইতে রাণী তাহা শুনিয়া মাঙ্গল্য শঙ্খনাদ করিতে মহিলাগণকে আদেশ করিলেন।

বিজয়সিংহ বলিলেন, রবীশ্বর যে দেবেন্দ্রসিংহ—তাহার আরও প্রমাণ চাই। হরেরাম এখনও জীবিত আছেন—রতনচাঁদের ভৃত্য সদয় আছে, রতনচাঁদের স্ত্রী জীবিত আছেন—তাঁহাদের সকলের সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞান এসম্বন্ধে প্রয়োজন।

রতনচাঁদের মুখখানা ম্লান হইয়া উঠিল। কেন না, তাহাদিগকে আনিলে আবার সেই গুম-খুন—ভার্য্যাকে বহুকাল বিরলে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতির কথা প্রকাশ হইবে। "রাজা না গোঁজা" এখন আনন্দে ছাড়িয়া দিল,—তখন আবার হয় ত ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিবে।

বিজয়সিংহ মুখ দেখিয়া রতনচাঁদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—মহারাজ যখন তোমাকে অব্যাহতি দিয়াছেন, তখন পূর্ব্বকৃত

শত অপরাধে অপরাধী থাকিলেও তোমার আর কোন সাজা হইবে না তবে আ'জ তুমি নজরবন্দী অবস্থাতে কারাগারেই থাকিবে। আগামী কল্য বিচার শেষ হইলে, মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।"

রতনচাঁদ—"আবার কিসের বিচার ?"

বিজয়। তোমার অপরাধের।

রতন। আমার সমস্ত অপরাধ ত মহারাজা ক্ষমা করিয়াছেন।

বিজয়সিংহ মৃদু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"এ বিষয়ে ত দুঃ দেখিতেছি ?"

রতন। আমার বিচার আবার কেন ?

বিজয়। তোমার বিচারে তোমার দণ্ড না হউক—অনেক রহস্য উদ্ভেদ হইবে।

বিজয়সিংহের আদেশে প্রহরগণ বিমুক্তবন্ধনাবস্থায় রতনচাঁদকে কারাগারে লইয়া গেল,—সে দিনকার মত দরবার সভা ভঙ্গ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস দরবারে রাজা জয়সিংহ, বিচারকগণ ও বিজয়সিংহ, রবীশ্বর এবং সামন্তসর্দ্দারগণ, সম্ভ্রান্ত প্রজাগণ ও বহুল প্রজাসাধারণ সমাগত হইলে, বিজয়সিংহ, রতনচাঁদ, হরেরাম, সদয় ও রতনচাঁদের স্ত্রীকে দরবারে আনিতে আদেশ করিলেন।

বন্দিগণ আগমন করিলে, সকলেই স্তব্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল,—রতনচাঁদের স্ত্রীর মূর্ত্তি কঙ্কালসার; মস্তকে এক গাছিও কেশ নাই—মাথাটী হাতের তেলোর মত হইয়া গিয়াছে—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। সহসা তাঁহাকে দেখিলে ভয়ের সঞ্চারই হয়।

হরেরামকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলিয়া দিয়া বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি ?"

হরে। আজ্ঞা, আমার নাম হরেরাম।

বিজয়। তোমার বাড়ী কোথায় ?

হরে। এই মণিপুরে।

বিজয়। এই রবীশ্বরকে তুমি চেন ?

হরে। আজ্ঞে হাঁ চিনি—

বিজয়। কতদিন হইতে চেন।

হরে। উঁহার বয়স যখন দুই বৎসর, তখন হইতে চিনি। তখন উঁহার নাম ছিল,—দেবেন্দ্রসিংহ। উনি মণিপুরের অধীশ্বর মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্র।

বিজয়। এই সম্বন্ধে তুমি যাহা জান,—মাননীয় বিচারকগণের সাক্ষাতে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বল।

হরেরাম বলিতে লাগিল,—

"আমি যদিও মহারাজ গম্ভীরসিংহের বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারী ছিলাম না, কিন্তু মহারাজা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। কোন দেবালয় দর্শন করিতে যাইতে হইলে, সান্ধ্য-ভোজে, প্রমোদ-কাননে বা মৃগয়ায় যাইতে হইলে, তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। যখন তিনি মহাতীর্থ ৺বৃন্দাবন ধামে গমন করেন, তখনও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশের ধলেশ্বরী নদীতে নৌকাডুবি হইয়া আমরা সকলেই জলমগ্ন হই। কুমার দেবেন্দ্রসিংহ তখন ক্ষুদ্র শিশু। আমি উঁহাকে বুকে করিয়াই জলে ভাসি,—অনেক দূর গিয়া একখান নৌকা দেখিতে পাই। চীৎকার করিয়া তাহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁহারাও সাহায্য প্রদানে

আমাদিগকে উদ্ধার করেন। পরে জানিলাম—সেই নৌকায় রতনচাঁদ ও তাঁহার স্ত্রী এবং ভৃত্য সদয় ও সদয়ের কতকগুলি আত্মীয়-স্বজন আছে।

অনেক সেঁকতাপে দেবেন্দ্রসিংহ সুস্থ হইলেন। মহারাজ ও রাণীমাতার কি হইল, জানিবার জন্য আমি রতনচাঁদকে অনুরোধ করিয়া সেদিন সেই স্থানেই থাকিলাম—পরে সন্ধানে জানিলাম, তাঁহারা যথার্থই প্রাণ হারাইয়াছেন। মাছ ধরিতে গিয়া জেলেরা তাঁহাদের শবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন রতনচাঁদকে বলিলাম—এই শিশুকে রাজধানী পঁহুছিয়া দিতে পারিলে, আমরা উভয়েই প্রচুর পুরস্কার পাইতে পারিব।

রতনচাঁদ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন.—না হরেরাম, তাহা হইবে না; বালকটীকে এখন দেওয়া হইবে না। আমার সন্তানাদি নাই—ইহাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিপালন করিব। তুমিও আমার বাড়ী থাকিবে। তার পরে কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইলে,—মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্রকে রাজা করিবার চেষ্টা করিব। প্রজাগণ তাহাতে স্বীকৃতও হইবে। তখন রাজা হইলে, আমাদের প্রভুত্ব পোল আনায় বিকাশ পাইবে। আর এখন রাজবাড়ীতে এই শিশুকে প্রদান করিলে, সংসার বশবর্ত্তী হইয়া, ইহার প্রাণ নষ্ট করিলেও করিতে পারে, কেননা গম্ভীরসিংহের পুত্র জীবিত থাকিতে অন্যের রাজ্য প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত। মহারাজ গম্ভীরসিংহের প্রীতি ভালবাসা স্মরণ করিয়া, তাঁহার পুত্রের হিতার্থে আমি রতনচাঁদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া, রতনচাঁদের বাড়ীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। রতনচাঁদও অতি যত্নে শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিবস রতনচাঁদের বাড়ীতে অতি সুখে এবং নির্ব্বিঘ্নেই বসবাস করিয়াছিলাম। তারপর, কেন এবং কিসে জানি না, রতনচাঁদের হৃদয়ে এক আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমাকে তাঁহার স্ত্রী একটু স্নেহ-যত্ন

করিতেন,—আমার সহিত বন্ধুর ন্যায়,—ভ্রাতার ন্যায় অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতেন, রতনচাঁদ ইহাতে অন্যভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমাকে সংহার করিবার উদ্যোগ করিলেন,—আমি তাহা জানিতে পারিয়া, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম, কিন্তু রতনচাঁদের স্ত্রী স্বামীর কোপানলে পড়িয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন। রতনচাঁদ তাঁহাকে প্রহারে জর্জ্জরীভূতা করিয়া অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া, প্রভূত যাতনা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেন নাই—যে ঘরে বাতাসটুকু পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। রতনচাঁদ যে দিন ধৃত হয়েন,—সে দিন পর্য্যন্তও সে দিকে কাহাকেও যাইতে দেন নাই। কেবল ভৃত্য সদয় সমস্তই জানিত। রতনচাঁদের স্ত্রী যে জীবিত আছেন,—এতকাল রতনচাঁদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়া রবীশ্বরও তাহা বোধ হয় জানিতে পারেন নাই।

আমি পলাইয়া গিয়া শ্রীহট্টে অনেক দিন ছিলাম! তার পরে একদিন কুমারকে দেখিবার জন্য মন অত্যন্ত উতলা হওয়ায় মণিপুরে ফিরিয়া আসিয়া, রবীশ্বরকে সন্ধান করিতে লাগিলাম। আমার দুর্ভাগ্য—রবীশ্বরের সন্ধান না পাইয়া, রতনচাঁদের সন্ধানে পড়িয়া গেলাম—রতনচাঁদ রাজপুরের ক্ষমতাশালী জমীদার; তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার সঙ্গী লাঠিয়ালেরা আমাকে তখনই ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল,—এবং রতনচাঁদের আজ্ঞায় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রথমে আমাকে বাহির প্রকোষ্ঠের একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,—শেষে সদয়কে বলিলেন,—ইহাকে বাড়ীর মধ্যে যে দিকে মানুষ যায় না, অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী যে দিকে আবদ্ধ আছেন—সেই দিকের অপর একটী কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখ; এইরূপ আদেশ দিলে সদয় আমাকে লইয়া গিয়া সেইরূপেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

তারপর একদিন রাত্রে সদয় আমাকে আহার করাইতে আসিয়াছে,—

সময় ও সুবিধা বুঝিয়া, আমি সদয়কে একটা ধাক্কা মারিয়া খুব জোরে সেই শানের মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছিলাম,—তারপর আবার শ্রীহট্টে চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখান হইতে আসিয়া শুনিলাম—রবীশ্বর আর এদেশে নাই, তিনি শান দেশে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না।—তখন ভাবিলাম, রতনচাঁদের স্ত্রীর কি দশা ঘটিয়াছে,—তিনি মরিয়াছেন, কি তখনও জীবিত আছেন; তাহাই জানিবার জন্য সেখানেই রতনচাঁদের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে গিয়াছিলাম,—সেখানে গিয়া দেখি, রতনচাঁদ বিবাহ-বাসরের আয়োজনে ব্যস্ত। কৃষ্ণানন্দঠাকুরের শিষ্যা বিবাহার্থ বন্দিনী।—পুরোহিত, বরযাত্র, দানসামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত—মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলেই বিবাহ হয়। কমলের অবস্থা বুঝিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—আমি চক্ষুর জল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যাইতে-ছিলাম। ভগবানের রাজত্বশৃঙ্খলা ভগবান্‌ই রক্ষা করিয়া থাকেন। পথে মহারাজ জয়সিংহ ও কুমার দেবেন্দ্রসিংহ বা রবীশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা সমস্ত অবগত হইয়া ব্যাঘ্রগর্জ্জনে সেখানে গিয়া পড়িলেন, এবং মন্ত্রী, রতনচাঁদ, পুরোহিত এবং অন্যান্য সকলকে বন্দী করিয়া, কমলের উদ্ধার করিলেন।"

বিজয়সিংহ সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চাহিলেন। সকলেরই মুখে আনন্দের চিহ্ন অঙ্কিত হইল। বিচারকগণ বলিলেন,—"আরও প্রমাণ দর্শন কর্ত্তব্য। কেন না, এই লোকটী নিজেই বলিয়াছে, রতনচাঁদের সহিত উহার শত্রুতা আছে।"

বিজয়সিংহ ব্রীড়াবনত মুখে বলিলেন,—"প্রমাণ শত সহস্র আছে। কিন্তু এ যাহা বলিয়াছে, রতনচাঁদও তাহাই বলিয়াছে। সুতরাং বিচারের স্থলে ইহার সাক্ষ্য বলবান্‌ই হইতেছে।"

বিচারক। সদয়কে জিজ্ঞাসা করুন।

রবীশ্বর বলিলেন,—"যদি মহারাজের অনুমতি হয়, সদয়কে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। অনেক রহস্য আছে।"

রাজা জয়সিংহ হাসিয়া বলিলেন,—"রবীশ্বর—প্রাণের বন্ধু তোমাকে কি অনুমতি দিব? দেবেন্দ্রসিংহ—প্রাণতম পুত্র, স্নেহের আধার তোমাকে কি অনুমতি দিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

রবীশ্বর বিচারকগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই সদয়ের দ্বারা একটী অতি রহস্যজনক বিষয়ের মীমাংসা হইবে বলিয়াই আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ভরসা করি, আপনারা তাহাতে মনে কিছু করিবেন না। তৎপরে সদয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"সদয়! আমাকে চিনিতে পারিতেছ?"

শুষ্কমুখে সদয় বলিল—"আপনাকে আপনার শিশুকাল হইতেই চিনি। হরেরাম আপনার সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিল, তাহার একবর্ণও মিথ্যা নহে।"

রবি। আমি সে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না।

সদয়। তবে কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

রবি। আমার কাকা ঐ রায় রতনচাঁদের বাগানের কজেহ্ মালীকে চেন?

সদয়। খুব চিনি—সে ত আমাদের মালী। কিন্তু সে বড় চোর; ফুল ফল আম কমলের-চারা বড় চুরি করিয়া বেচে।

রবি। তা বেচুক। সে একদিন বাগান হইতে মানুষের একটী কাঁচামাথা তুলিয়া আনিয়াছিল, তাহা তুমি জান?

সদয়। না, হুজুর,—আমি তাহা কেমন করিয়া জানিব? বোধ হয়, সে কজেই মালী পুতিয়া রাখিয়াছিল,—আর না হয় সেই খুন ক'রেছিল।

রবীশ্বর, রতনচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনাকে মহারাজা স্বয়ং যখন অভয় দিয়াছেন, তখন আপনার কোন ভয় নাই। কিন্তু ঐ কাঁচামাথাটা কাহার, কাহাকে আপনারা হত্যা করিয়া, তাহার মস্তকটা রাত্রে বাগানে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন! জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল আছে। যে রাত্রে আপনি ও সদয়•থলিয়ায় করিয়া ঐ মুণ্ড লইয়া যান—সেদিন আমি তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে, আপনারা নরহত্যা করিয়া উদ্যানে মুণ্ড পুতিয়াছেন। তৎপরে যে দিন আপনি ও আমি মণিপুর আসিবার পূর্ব্বে একত্রে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, সেই দিন কজেই মালী ঐ মুণ্ডটা তুলিয়া আনিয়া দেখায়। তখনই আমি বুঝিতে পারি—আপনারা সেদিন রাত্রে উহাই করিয়াছিলেন। অনুগ্রহ করিয়া বলুন,—সেই মুণ্ড কাহার? কাহাকে আপনারা হত্যা করিয়াছিলেন?"

রতনচাঁদ ক্ষিপ্তের ন্যায় চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রহেলিকা! ধাঁ ধাঁ—সব ধাঁ ধাঁ! সত্য গোপন করিব না,—অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক! আমি যাহাকে হত্যা করিতে আদেশ করিয়াছিলাম,—যাঁহার মস্তক স্বহস্তে উদ্যানে প্রোথিত করিয়াছিলাম—সে ত ঐ। সে হরেরাম।

রবি। বুঝিতে পারা গেল না।

রতন। আমিই বুঝিতে পারি নাই,—তুমি কি পারিবে? আমি হরেরামকে শেষে যেদিন ধৃত করি, সেই দিন প্রথমে উহাকে বহির্বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অবশেষে বাটীর মধ্যের একটা কক্ষে রাখিতে সদয়কে আদেশ করি। হরেরাম আবদ্ধ হয়। তার পর যে রাত্রে তুমি এবং রাণী চন্দ্রা সুড়ঙ্গ পথে আমার বাড়ী যাও—সেই দিন সদয় হরেরামকে কাটিয়া ফেলিবার আদেশ প্রার্থনা করে,—সে বলে উহাকে হত্যা না করিলে, আর কিছুতেই চলিবে না, কারণ সে বড় উদ্ধত—

সর্ব্বদাই চেঁচামেচি করে—আপনার বাড়ীতে চন্দ্রা ও মন্ত্রী প্রভৃতির গমনাগমন হইতেছে, কি জানি কখন কি হয়। আমি তাহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলাম ; হরেরামকে কাটিতে আদেশ করিলাম। সদয় হরেরামকে কাটিয়া আমাকে আসিয়া সংবাদ দিল, তখন আমি গিয়া তাহার দেহ ও মুণ্ড দর্শন করিলাম। দেহটা একস্থানে ও মুণ্ডটা একস্থানে আমি সঙ্গে থাকিয়া প্রোথিত করিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না,—হরেরাম কি করিয়া আবার জীবন্ত হইয়া, তাহার হৃদয়ের প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইল। সেই ত আমাকে আমার বিবাহ-আসরে মরণের মন্ত্র পড়াইয়া দিয়াছে।

রবীশ্বর সদয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—সদয়, এই রহস্যের সমস্ত তুমিই জান, কোন কথা গোপন না করিয়া আদ্যোপান্ত সরলভাবে সমস্ত বর্ণনা করিয়া বল। বিচারকগণ তোমার প্রতি দয়া করিবেন। কিন্তু মিথ্যা বলিলে, নিশ্চয়ই দণ্ড পাইবে। সত্য গোপন থাকে না—তোমার মিথ্যা কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িবে?

সদয় মুখভাব অতি অপ্রসন্ন করিয়া যাহা বলিল,—"তাহা একটা মস্ত কাহিনী। তাহার সারাংশ এইরূপ,—তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুইটী পুত্রসন্তান ছিল,—দুইটীই প্রাপ্তবয়স্ক। যখন সে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া মনীব রতনচাঁদের সঙ্গে এই দেশে আসে, তখন ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটীকেও সঙ্গে আনে। তাহাদের পিতামাতা কেহই ছিল না। বড়টী ও ছোটটীকে দুই জায়গায় চাকুরী করিয়া দেয়। বড়টীর স্বভাব নির্ম্মল, সে তাহার প্রভুর মনস্তুষ্টি করিয়া সুখ্যাতির সহিতই চাকুরী করিতেছিল। কিন্তু ছোটটীর চরিত্র—বড়টীর চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে প্রভুর কাযে আদৌ মনোযোগ প্রদান করিত না। অধিকন্তু অনেক সময় জুয়াখেলা ও মদ্যাদি পান করিয়া অতিবাহিত করিত। সে যে সামান্য বেতন

পাইত, তদ্দ্বারা তাহার ঐ সকল বাজে খরচ কুলাইত না। কাযেই সে চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চুরি করিতে করিতে একদিন সে ধরা পড়িয়া জেলে গেল। কিন্তু মন্ত্রী চিরঞ্জীববর্দ্ধণ রতনচাঁদের প্রিয়তম বন্ধু, একদিন সদয় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য চিরঞ্জীবকে অনুরোধ করিয়াছিল, চিরঞ্জীবের আদেশে সদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের কারামুক্তি হয়, অধিকন্তু চিরঞ্জীবের কৃপাতে সে সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করে।"

"কিন্তু তাহার স্বভাব কোথায় যাইবে? কিছু দিন পরেই সে অপর একজন সৈনিকের কি চুরি করে, ধরা পড়িয়া সামরিক বিচারে আবার তাহার জেল হয়। এবার আর উপরোধ অনুরোধ করিতে সদয় লজ্জা বোধ করিল,--কাযেই তাহা ঘটিল না। সে জেলেই থাকিল। সহসা একদিন রাত্রে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সদয়ের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্তধারা নির্গত হইতেছে। তাহার সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া, সদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, সদয়ের স্ত্রী এবং সদয় সকলেই চমকিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপার কি?"

সদয়ের ছোট ভ্রাতুষ্পুত্র বলিল,—"আমি কথা কহিতে পারিতেছি না। আমাকে শীঘ্র একটী শুইবার জায়গা দাও। আমি জেলের পাহারাওয়ালাকে মারিয়া, জেল হইতে পলাইয়া আসিয়াছি।"

সদয় ও সদয়ের বড় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি সকলেই বুঝিতে পারিল,—"পাহারাওয়ালার সঙ্গে মারামারিতে ইহার এদশা ঘটিয়াছে।"

সদয়ের বড় ভ্রাতুষ্পুত্র বলিল,—"উহাকে এখনই পুলিশের হাতে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। একটী খুন করিয়া জেল হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে, অথচ উহাকে যদি এই বাড়ীর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের বিপদ্ ত আছেই—অধিকন্তু রায় রতনচাঁদেরও বিপদ্

হইবে। উহার যখন চরিত্র কিছুতেই সংশোধিত হইল না, তখন আর আমরা কি করিব—উহার কর্ম্মফলে যেমন হয়, হউক।"

সদয় কিন্তু তাহা পারিল না। সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই মলিনার্ত্ত মুখ দেখিয়া, প্রাণের মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। সে তখন মনে মনে একটা যুক্তি স্থির করিল। প্রভু রতনচাঁদের আজ্ঞায় হরেরামকে সে যে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এবং হরেরাম যে পলায়ন করিয়াছে, ভয়েতে তাহা এ পর্য্যন্ত সে, প্রভুকে জানায় নাই—সে ভাবিল, এক কাযে দুই কায সারা হইবে। ইহাকে সেই গৃহে রাখা যাউক, প্রভু জানিবেন হরেরামই আছে। সে তখনই আর্ত্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া, যে গৃহে হরেরাম আবদ্ধ ছিল, তথায় রাখিয়া আসিল, এবং নিত্য-নিয়মিত শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল। কিন্তু সে বাঁচিল না—অত্যন্ত আহত হইয়াছিল, ক্ষতস্থানগুলি পাকিয়া জ্বর হইল,—সেই জ্বরেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন সদয় বিষম বিপদে পড়িল—কি করিয়া তাহার শবদেহ বাহির করিয়া ফেলে। কেন না তাহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা ছিল,—এখন তাহার মৃতদেহ বাহির করিলে পুলিশে ধরিবে, এবং রায় রতনচাঁদ জানিতে পারিলে, তাহার চাকুরী পর্য্যন্ত যাইবে। তখন সে কূটবুদ্ধিবলে ছলনা করিয়া রতনচাঁদকে জানাইল, "প্রভু! হরেরাম বড় চাৎকার করে—আপনার বাড়ীতে রাণী চন্দ্রা ও মন্ত্রী প্রভৃতির আগমন হইতেছে, বিশেষতঃ রবীশ্বরও জানিতে পারেন,—এতদবস্থায় তাহাকে কাটিয়া ফেলাই যুক্তিযুক্ত। রতনচাঁদও তাহাতে সমর্থন করিলেন; ইহাতে সদয়ের দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল,—হরেরাম যে, তাহাকে, ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহাও তাহার প্রভু জানিতে পারিলেন না, অধিকন্তু ভাইপোর দেহটীকেও স্থানান্তরিত করিতে পারিল।"

সদয় তাহার মৃত ভ্রাতুষ্পুত্রের দেহ হইতে কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিয়া রতন-

চাঁদকে সেই মুণ্ড দেখাইয়া রতনচাঁদকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে পুতিয়া রাখে। আর দেহটী স্থানান্তরিত করিয়া প্রোথিত করে।

সদয়ের মুখে এই সংবাদ শ্রুত হইয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। রতনচাঁদের চরিত্রের আর এক অঙ্কের দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হইল।

রবীশ্বর রতনচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

রতন। বাবা;—যাই হোক্, দশদিন আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছ। আমার সমস্ত দোষগুলি ঘাঁটিয়া তুলিয়া দিয়া, আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান কি তোমার উচিত?

রবি। সে ভয় আপনি করিবেন না। মহারাজ যখন আপনাকে মুক্তি দিয়াছেন—যখন শতদোষে দোষী হইলেও আপনাকে মার্জ্জনা করিবেন বলিয়াছেন,—তখন আপনার আর ভয় নাই।

রতন। সে তোমাদের ধর্ম্ম,—কি বলিতে হইবে, বল।

রবি। আমি রাণী চন্দ্রাকে লইয়া যে রাত্রে আপনার বাড়ী যাই—সেই সুড়ঙ্গপথের গৃহে যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহার রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারি নাই। সে কি,—তাহা বলুন।

রতন। ঐ গৃহটী সুড়ঙ্গের দ্বার স্বরূপ; তাহা বোধ হয়, জানিতে পারিয়াছ?

রবি। হাঁ—তাহা পারিয়াছি।

রতন। ঐ বাড়ীটী যে, মণিপুর রাজবংশের গুপ্তভবন, তাহাও বোধ হয় জান?

রবি। হাঁ, তাহাও শুনিয়াছি।

রতন। ঐ গৃহ এরূপ প্রস্তরাদির দ্বারা এরূপ শিল্পকৌশলে প্রস্তুত যে, উহার মধ্যে একজন কথা কহিলে, শতজনের স্বর বলিয়া ভ্রম হয়,

একজন হাসিলে অগণ্য লোকের হাসির শব্দ শুনা যায়—এমন কি এক ফোঁটা জল পড়িলে ভয়ানক বৃষ্টিপাতের শব্দ হয়। আমার স্ত্রী ঐ গৃহের পার্শ্বের গৃহে আবদ্ধ থাকিত—সে আবদ্ধ থাকিয়া উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিল। কি প্রকারে ঐ গৃহের সংলগ্ন দরজা সে দিন বুঝি খোলা ছিল,—তাই সে ছুটিয়া আসিয়া হাসিয়া, কাঁদিয়া, চীৎকার করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছিল। তোমরা ঐ গৃহের প্রস্তুত কৌশলের শব্দে ভাবিয়াছিলে, বুঝি শত শত লোক ঐরূপে কাঁদিতেছে—হাসিতেছে——নৃত্য করিতেছে।

রবীশ্বর স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন বিজয়সিংহ উঠিয়া রাজা জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মহারাজ; এই ব্যক্তি যে সকল গর্হিত আচরণ করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাণ-দণ্ড। মহারাজ তাহাতে উঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন। কিন্তু রাজধন দখল প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষয়িক অপরাধ থাকাতে বিচারকগণকে ঐ বিষয়ের বিচার করিতে অনুরোধ করিতে পারি কি?"

রাজা তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন বিচারকগণ আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া, বলিলেন,—"ছল ও বলের দ্বারা রতনচাঁদ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অতএব সেই সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। সরকারি বাড়ী,—অবশ্যই সরকারে দখল করা হইবে। রতনচাঁদ ও তাঁহার স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন রাজ সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি পাইবেন।"

"উত্তম বিচার হইয়াছে" বলিয়া সকলেই অনুমোদন করিলেন। বিজয়সিংহ রতনচাঁদের স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন,—আপনি রবীশ্বর সম্বন্ধে কিছু জানেন কি?"

তিনি বসিয়া ছিলেন,—সেইরূপেই বসিয়া থাকিলেন। উঠিলেন

না,—নড়িলেনও না। কেবল কট্‌মট্‌ চক্ষুতে কয়েকবার বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিলেন। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি ঘোর উন্মাদ হইয়াছেন।

সদয় ও হরেরাম মুক্তি পাইল। রতনচাঁদও ঐরূপ ব্যবহারে বিমুক্ত ছিলেন। বিচারকগণ বলিলেন,—"আসামীর তালিকায় একজনের নাম আছে, তাহার বিচার শেষ হইলেই আমাদের কার্য্য ফুরায়।"

রবীশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কে?"

একজন বিচারক বলিলেন,—"সহকারী সেনাপতি।"

রবি। নিমকচাঁদ?

বিচারক কাগজখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"না, যিনি সেদিন বিজয়সিংহের ফাঁসির দিন সহকারী সেনাপতির পদে অভিষিক্ত ছিলেন,—এবং আপনারা বন্দী করিয়াছিলেন।"

রবীশ্বর, বিজয়সিংহের মুখের দিকে ঈষন্নমিত চক্ষুতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তাঁহার বিচার ভগবান্ করিবেন। তিনি মরিয়া গিয়াছেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই সময় তথায় কৃষ্ণানন্দঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণানন্দঠাকুরকে দেখিবামাত্র রাজা জয়সিংহ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রবীশ্বরও উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সভা-শুদ্ধ সমস্ত লোকই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজা জয়সিংহ কুল-গুরু কৃষ্ণানন্দঠাকুরের পাদ-বন্দনা করিয়া

আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণানন্দ আসন পরিগ্রহ করিলে, সকলেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর সকলের সহিত স্নেহ-সম্ভাষণ সমাপনপূর্ব্বক রাজা জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রবীশ্বর যে মহারাজা গম্ভীরসিংহের পুত্র কুমার দেবেন্দ্রসিংহ, তাহা বোধ হয়, আপনারা সকলেই অবগত হইয়াছেন ?"

রাজা জয়সিংহ, এবং সভাস্থ সমবেত লোকগুলিই সমস্বরে বলিলেন,—"হাঁ, তাহা আমরা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি।"

কৃষ্ণা। দরিয়াবাজ নামক কোন এক ঐন্দ্রজালিক বা যোগিপুরুষের আবির্ভাব আপনারা কেহ অবগত আছেন ?

সভাস্থ সকলেই প্রায় বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, মহাশয়; আমরা তাহাকে জানি। তিনি অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছি—কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন, কোথা হইতে আসেন, কোথায় যান—তাহা আমরা কেহই অবগত নহি।"

কৃষ্ণা। তাহা অবগত হইবার উপায়ও নাই। তিনি মানুষ নহেন।

"তবে কি ?" এই প্রশ্ন করিয়া সভাস্থ সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণা। তিনি আভাসিক তনু। মহাত্মা গম্ভীরসিংহের বিদেহী আত্মা। দরিয়াবাজ নাম ও ঐরূপ রূপ ধারণ করিয়া, অপত্যস্নেহের প্রবলাকর্ষণে আমাদিগকে দর্শন দিতেন।

সকলেই সভয়ে চমকিয়া উঠিলেন।

কৃষ্ণা। আমি তাঁহারই নিকটে রবীশ্বর ও কমলের পরিচয় প্রাপ্ত হই রবীশ্বর তাঁহার পুত্র—আর কমলেশ্বরী, মহারাজ বলদেবসিংহের কন্যা।

সভাস্থ সকলেই বিস্ময়াপ্লুত হইলেন। মহারাজ জয়সিংহ বিস্ফুতনেত্রে

গুরুদেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মধ্যম দাদার ত সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। রাণী বন্ধ্যা।"

কৃষ্ণা। যে চন্দ্রা এখন চিরঞ্জীবের রক্ষিতা—ঐ চন্দ্রা কিশোরী অবস্থায় মহারাজা বুলদেবসিংহের প্রণয়ে আবদ্ধ হয়; সেই মিলনের ফলে—চন্দ্রার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে কমল গর্ভে থাকে। গর্ভ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, মহারাজ চন্দ্রাকে অতি গোপনে প্রমোদ-আবাসে রাখেন—সেইখানেই প্রসব করে। তার পর, অনূঢ়া কালের কন্যা—মহারাজের মাথা হেট হইবে বলিয়া কন্যাটীকে এক ধাত্রীর আলয়ে রাখা হয়—কিছুদিন পরে চন্দ্রা যখন রূপের হাটের বিপণী সাজাইয়া ক্রেতা ডাকিতে লাগিল, তখন মহারাজ কন্যাটীর স্নেহ ভুলিয়া গেলেন, ধাত্রীকে আর খরচাদি দিতেন না। কিছুদিন দেখিয়া ধাত্রী এক ব্রাহ্মণের নিকটে বালিকাকে বেচিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রাহ্মণ উহাকে প্রতিপালন করেন—এবং কমলেশ্বরী নাম রাখেন। তৎপরে ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে কমল সংসার-সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, অবশেষে আমি তাহাকে আনিয়া আমার আশ্রমে রাখিয়াছিলাম।

কৃষ্ণানন্দঠাকুরের কথা শ্রবণ করিয়া সভাশুদ্ধ লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। রবীশ্বরের হৃদয়ে একটা যুগান্তরব্যাপী ঝটিকা বহিতে লাগিল। বিজয়সিংহের মুখে হাসি ফুটিল।

কৃষ্ণা। মহারাজ গম্ভীরসিংহের আত্মিকতনু রবীশ্বরকে তাঁহার স্নেহ-করুণ-বাহুযুগলে রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই উহাকে কমলের সহিত বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনিই উহাকে সোণারকণ্ঠী প্রদান করিয়া শানদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

জয়সিংহ ব্যস্ততা সহকারে বলিলেন, "কৈ, কৈ—সে সোণারকণ্ঠী কোথায়?"

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"সে সোণারকণ্ঠী আমার নিকটে আছে। আমি আমার বাসা হইতে এখনই আনিয়া দিতেছি।"

বিজয়সিংহ উঠিয়া গেলেন।

কৃষ্ণানন্দ বলিলেন,—"আর একটী কৌশল-সম্পন্ন কৌটা আমার হস্তগত হইয়াছে। সেটা চন্দ্রা যখন মহারাজা বলদেবসিংহের গৃহে যাতায়াত করিত, তখনই লইয়া গিয়াছিল। ইহার কারুকার্য্য অতীব মনোহর—তারপর আশাভগ্ন জীর্ণ দীর্ণ চন্দ্র..—শেষ জীবনে আপন কন্যা কমলকে না চিনিতে পারিয়া, তাহারই নিকটে ধর্ম্মোপদেশ পাইবার জন্য আমার আশ্রমে যাইত—ইহাতে বুঝি আমারও একটু স্নেহ-করুণ আকর্ষণ ছিল—সেই সময় চন্দ্রা কমলকে দেয়। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আমি খুলিতে পারি নাই।"

মহারাজ জয়সিংহ, তাহা হস্তে লইয়া খুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না। তৎপরে সভাস্থ সকলেই একে একে দেখিলেন, কেহ পারিলেন না। কথাটা লইয়া ভারি আন্দোলন হইতেই রাণী সে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একজন দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন দাসী আসিয়া বলিল,—"রাণী-মা উহা খুলিতে পারিবেন।"

তাহাই হইল, রাণী-মা অতি সহজে খুলিয়া ফেলিলেন। তাহা একটী সাঙ্কেতিক কৌশলে বিনির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কুমার দেবেন্দ্রসিংহের কোষ্ঠী ছিল। কৃষ্ণানন্দ কোষ্ঠীর কথা পাঠ করিলে,—শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, যে, জলে ডোবা হইতে সমস্ত ব্যাপার গুলিই তাঁহার জীবনের ঘটনার সঙ্গে মিলিয়া গেল।

এই সময় বিজয়সিংহ "সোণারকণ্ঠী" লইয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠী দেখিয়া জয়সিংহ বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার তিনটী সোণার স্থলপদ্ম উত্তান ও উপুড়ভাবে একত্র করিলে, মহারাজা গম্ভীর-

সিংহের মহিষীর নাম হয়,—দুইখানি কেবল উত্তানভাবে একত্র করিলে, মহারাজা গম্ভীরসিংহের নাম হয়, আর চারিখানা একত্র করিলে কুমার দেবেন্দ্রসিংহের নাম হয়।

জয়সিংহ স্নেহের অশ্রুতে রবীশ্বরকে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—বাবা;—হারানিধি; মণিপুর-রাজকুলতিলক;—তোমারি বাহুবলে, তোমারি অক্লান্ত পরিশ্রমে, তোমারি অমিত সাহস ও বুদ্ধিবলে মণিপুর-রাজসিংহাসন পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এ সিংহাসনে তুমিই আরোহণ কর—আমি তোমার কাকা হইয়া সুখে বাস করি।—আর "সোণারকণ্ঠী" তুমি গলায় পর।

রাণী অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া বলিলেন, "সোণারকণ্ঠী" আমার বড় মা'য়ের! অতএব ঐ কণ্ঠী আমার বধূমাতাকে দিব।

রবীশ্বর বলিলেন,—"কাকা; আমি আপনার দাস; আপনি রাজা—আমি আপনার সন্তান। আপনি রাজ্য করুন, আমি আপনার চরণ সেবা করিব। কেন কাকা—আমাকে অপ্রতিভ করিতেছেন?"

জয়সিংহ কৃষ্ণানন্দঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব; আমাদের এই শুভ মিলন ও সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই দেবেন্দ্রসিংহের বিবাহ দিতে হইবে; মাসব্যাপী মহাসমারোহের মধ্যেই আমি আমাদের পুত্র-বধূ দেখিতে চাই?"

কৃষ্ণানন্দঠাকুর মৃদু হাস্য সহকারে বলিলেন,—"মহারাজও ত বিপত্নীক। আগে আপনার বিবাহ দিয়া, পরে—কুমার দেবেন্দ্রসিংহের বিবাহ দেওয়া যাইবে।"

জয়সিংহ। যদি আমাকে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে হয়,—তবে এক সময়েই হউক, দেবেন্দ্রসিংহের বিবাহও এই সময়েই দিতে হইবে।

বিজয়সিংহ বলিলেন,—"মহারাজ! দেবেন্দ্র সিংহের বিবাহ একটু বিলম্বে হইবে।"

জয়সিংহ। কেন,—তাহার কারণ কি?

বিজয়। শানাধিপতির কন্যা কুমারী চঞ্চলা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া আমি বিশেষরূপে অবগত আছি,—চঞ্চলা দেবেন্দ্র সিংহের একান্ত প্রণয়ানুরাগিণী।

জয়। তাহা হইলে, আপনি বলিতে চান,—সেই কন্যার সহিতই দেবেন্দ্রের বিবাহ হইবে!

বিজয়। আমার তাহাই ইচ্ছা।

জয়। আপনারা যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, মণিপুর-রাজবংশ তাহাই করিবে।

তৎপরে রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় আরও নানা কথাতে সে দিনকার সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া, সভাভঙ্গ হইয়া গেল।

জগতে কাহারও হৃদয়ের তপ্তশ্বাস, কাহারও মহোৎসবের মাঙ্গল্য ধ্বনি লইয়া রজনী প্রভাত হইয়া থাকে। হয় ত প্রতিবাসীর হৃদয়-নিধি পুত্র, কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া, শত আত্মীয়ের প্রাণভেদী হাহাকার লইয়া, শবদেহে শ্মশানে চলিয়াছে,—আবার তৎপার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর গৃহস্থ পুত্রের গর্ভাধান সংস্কারের আনন্দ-শঙ্খ বাজাইয়া দিতেছে প্রকৃতির এইরূপই নিয়ম—এই বিচিত্রতাই সংসারের গতি।

রাজপরিবার হৃত-রাজ্য, হৃত-সম্ভ্রম, হৃত-আনন্দ, হৃত-আত্মীয়-স্বজন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সুখের সাগরে ভাসমান। অপর দিকে চিরঞ্জীববর্ম্মণ ও সেনাপতির মৃত্যুদণ্ডের ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া জীবন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন।

যামিনী প্রভাত হইল,—চারিদিকে কাক, কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া

ডাকিয়া উঠিল! তখন হইতেই ফাঁসি কাষ্ঠ প্রোথিত ও অন্যান্য ব্যবস্থা হইতে লাগিল, যে স্থানে চিরঞ্জীববর্ম্মণ ও প্রধান সেনাপতি মদগর্ব্বে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন,—যেখানে যাইতে যাইতে কত আর্ত্তের অশ্রু পদতলে দলিত করিতেন, যেখানে তাঁহাদের আদেশে কত নরমুণ্ড গড়াগড়ি দিয়াছে—যেখানে প্রতিদিন শত শত নরনারী হাট-বাজার করিতে আইসে, মণিপুর নগরের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাণ্ড ময়দান-ভূমে, দুইটী ভয়াবহ ফাঁসি-কাষ্ঠ মুখোমুখি ভাবে স্থাপিত হইল। অপরাহ্নকালে পঞ্চাশজন পদাতিক বন্দুকধারী সৈন্য, কারাগার হইতে চিরঞ্জীববর্ম্মণ ও প্রধান সেনাপতিকে আনিতে গেল।

তাঁহাদের দুই পায়ে রজ্জুবন্ধ। সেই রজ্জুর দুইপার্শ্বে দুইজন সশস্ত্র বলবান্ গুর্খা-সৈনিক ধরিয়া রহিল! দুর্দ্দান্ত মহিষ-পশুকে বলিদান সময়ে যে ভাবে রজ্জুবন্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই লইয়া চলিল। অদ্য চিরঞ্জীবর্ম্মণের ও সেনাপতির ফাঁসি।

বধ্য-ভূমিতে পাঁচশত সশস্ত্র সৈন্য চতুষ্কোণাকারে দণ্ডায়মান ছিল, এবং দুর্গের সমস্ত সৈন্যই সৈনিকাবাসে সুসজ্জিত এবং রণোন্মুখী হইয়া সেনাপতির আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু পাপের সহায় কোথায়? পাপীর বন্ধু জগতে কে আছে? যে চিরঞ্জীববর্ম্মণ মণিপুরী প্রজার তপ্তনিশ্বাস না লইয়া কোন দিনই সুখী হয়েন নাই, আজি তাঁহার চরমদণ্ডে কাহার হৃদয় ব্যথিত হইবে? কেন তাহার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত বিজয়সিংহের অস্ত্র-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিবে?—কেহই তাঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য যত্ন-চেষ্টা করিল না।

মণিপুর মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান ব্যাপার দেখিতে বহু-সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছিল। চারিদিকের রাস্তা সকলেও বহুদুর পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারী কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সাম্‌না-সাম্‌নি ভাবে ফাঁসিমঞ্চের উপরে উভয়কে উঠাইয়া দেওয়া হইল,—এবং উভয়ের গলদেশে ফাঁসিরজ্জু লাগাইয়া দেওয়া হইল। তখন প্রধান রাজপুরুষ একবার ঈশ্বরের নিকটে আত্মবিবেকের কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন,—ও ঘাতকদ্বয়কে ইঙ্গিত করিলেন। অমনি একই নিমিষে উভয়েরই আশ্রয়-তক্তা যেমন টানিয়া লওয়া হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহারা উভয়েই ঝুলিয়া পড়িলেন—দুইটী দেহ দোদুল্যমান হইয়া পড়িয়া মহানিদ্রার কোলে নয়ন মুদ্রিত করিল।

অবশেষে চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া যখন বলিলেন,—"দেহে আর প্রাণ নাই।" তখন শবযুগলকে তাহাদের আত্মীয় হস্তে অর্পণ করা হইল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরেই চন্দ্রা শুনিল, "চিরঞ্জীবের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার শবদেহ অনলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।"

চন্দ্রার বক্ষ-পঞ্জরাস্থিগুলা একবার আমূল কাঁপিয়া উঠিল। জীর্ণ, দীর্ণ, ভগ্ন প্রাণের অন্তস্তল হইতে একটা গম্ভীর তপ্তশ্বাস বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রা মূর্চ্ছিত হইয়া মেঝেয় পড়িল। তাহার বুকের ক্ষতমুখ দিয়া তীরবেগে রক্তধারা ছুটিল—দাসী আসিয়া মুখে চোখে জলদান করিল,—কিন্তু চন্দ্রা আর চাহিল না। আর উঠিল না,—চিরদিনের মত জগৎ হইতে বিদায় লইল!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে,—বিজয়সিংহ ও দেবেন্দ্রসিংহ—রবীশ্বরকে এখন হইতে আমরা দেবেন্দ্রসিংহ নামেই অভিহিত করিব—দুর্গমধ্যস্থ একটা কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। বিজয়সিংহ

বলিলেন,—"নিমকচাঁদই আমাকে কষ্ট দেওয়ার মূল, তাহাকে কোন প্রকার শাস্তি দিবার পক্ষে তোমার অমত হইল কেন ?"

দেবেন্দ্রসিংহ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"নিমকচাঁদের কন্যা, আমাদিগের সহায়তা না করিলে, আমরা কখনই মণিপুর জয় করিতে পারিতাম না কাযেই তাঁহার কাছে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, অবশ্যই তাহা আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ?"

বিজয়। কি সাহায্য করিয়াছিল ?

দেবেন্দ্র। যথেষ্ট। তিনি যদি দলিল সংগ্রহ করিয়া না দিতেন, কখনই সমস্ত সামন্তগণ আমাদের পক্ষাবলম্বন করিত না। আমরা ঐ দলিলগুলি হারাইয়াই বসিয়াছিলাম।

বিজয়। আর ?

দেবেন্দ্র। তিনি সেনাপতি হইয়া না গেলে, আপনাকে যখন বধ্য-ভূমি হইতে সামন্তগণ লইয়া গিয়াছিল, তখন মণিপুরীসৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিত, এবং সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, আপনাকে পুনরায় ধৃত করিত। কিন্তু তিনি সৈন্যগণকে শান্ত রাখিয়াছিলেন।

বিজয়। তাহাতে নিমকচাঁদের দোষের ক্ষালন হইল কি করিয়া ?

দেবেন্দ্র। নিমকচাঁদের কন্যা এই সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন যে,—আপনাদের জয় হইলে কোন প্রকারেই আমার পিতাকে শাস্তি দিবেন না।

বিজয়। নিমকচাঁদের কন্যার এত কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল ?

দেবেন্দ্র। তিনি আপনাকে ভাল বাসেন। বিবাহের আশা করেন।

বিজয়। এখন তিনি কোথায় আছেন ?

দেবেন্দ্র। পিত্রালয়ে—নিমকচাঁদের বাড়ীতেই আছেন ?

বিজয়। ইহার মধ্যে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?

দেবেন্দ্র। হাঁ, হইয়াছিল।

বিজয়। কি বলেন?

দেবেন্দ্র। বলেন,—

"সাগর ছেঁচিনু, মাণিক লভিতে,
না মিলিল আজো তাহা।"

বিজয়। (হাসিয়া) নিমকচাঁদ কি বলেন?

দেবেন্দ্র। হাত ধুইয়াই বসিয়া আছেন। আপনার অনুমতির অপেক্ষা।

বিজয়। ভাল, তাহা না হয় হইবে। কিন্তু তুমি বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? শানকুমারী চঞ্চলা তোমার একান্ত অনুরাগিণী, তাহার পাণিগ্রহণ করতঃ সংসারাশ্রমে লিপ্ত হও। শাস্ত্রে আছে—সংসারী ব্যক্তির অকৃত-দার থাকিতে নাই।

দেবেন্দ্রসিংহ বলিলেন,—"হৃদয়টা অন্যপথে ফেলিয়া, এখন আর সঙ্কুচিত করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

বিজয়। তোমার ভুল!

দেবেন্দ্র। কি ভুল?

বিজয়। আগা-গোড়াই ভুল।

দেবেন্দ্র। কিসে?

বিজয়। কৃষ্ণানন্দঠাকুরের নিকট সমস্ত বিবরণই ত শোনা হইয়াছে।

দেবেন্দ্র। তথাপিও মনটাকে এখনও ফিরাইতে পারি নাই।

বিজয়। আমি দুই চারি দিনের মধ্যেই শানদেশে যাত্রা করিব—সেখানে গিয়া মহারাজকে বলিয়া, চঞ্চলার সহিত তোমার বিবাহের উদ্যোগ করিব।

দেবেন্দ্র। আপনি ফুলরাণীর পাণিগ্রহণ কবে করিবেন?

বিজয়। ঘটকের যে দিন ইচ্ছা।

দেবেন্দ্র। কে ঘটক ?

বিজয়। কেন তুমি ?

দেবেন্দ্র। আমাকে নিমিত্তের ভাগী করিবেন না,—মানসিংহই আপনাদের এ বিবাহের ঘটক। যাহাই হউক, কল্যই আমি তাহাদের বাড়ী গিয়া, দুই একদিনের মধ্যেই যাহাতে এই শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা করিতে বলিব।

বিজয়। সে বলিও—কিন্তু আমি শানদেশে গিয়া অতি শীঘ্র যাহাতে তোমার ও চঞ্চলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়, তাহা করিতে বলিব।

দেবেন্দ্রসিংহ সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া সেদিনকার মত বিদায় হইলেন।

কুমার দেবেন্দ্রসিংহ মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্র—সুতরাং রাজপ্রাসাদেই তিনি অবস্থানাদি করিতেছেন। রাজবাড়ীই তাঁহার বাড়ী। আহারান্তে দেবেন্দ্রসিংহ সুসজ্জিত শতদীপোদ্ভাসিত গৃহে কারুকার্য্যময় পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলেন,—কমলকে আমি বড় ভাল বাসিয়াছিলাম, কিন্তু সে চন্দ্রার গর্ভজা। মহারাজ বলদেব সিংহের কন্যা, সম্পর্কে আমার ভগিনী হয়, তাহাকে কখনই বিবাহ করা যাইতে পারে না। তবে কেন তাহার উপরে আমার প্রাণের এ জ্বলন্ত আকর্ষণ ? বুঝি যাহাকে পাই না, যাহাকে পাইবার উপায় নাই—তাহার উপরে এমন আকর্ষণ—হয় ত পূর্ব্বজন্মের কোন অনুস্মৃতি হইতে পারে। শানাধিপতির কন্যা চঞ্চলা, সুন্দরী—চঞ্চলা, গুণবতী—চঞ্চলা, আমায় ভালবাসে,—বিজয়সিংহ বলিতেছেন, চঞ্চলাকে বিবাহ করিয়া, অপূর্ণ জীবন পূর্ণ কর। দোষ কি ? একদিন দেখিয়াছিলাম—বেশ ডাগড় ডাগড় চক্ষু—বেশ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ !

দেবেন্দ্রসিংহ, বহুকাল পরে চঞ্চলাকে পরমাসুন্দরী বলিয়া ধারণা করিলেন। চঞ্চলার যে রূপ—যে গুণ ছিল, তাহা শতগুণে দেবেন্দ্রসিংহের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। কেন উঠিল ?

প্রেম যে, পরশমণি। এ মণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়। দেবেন্দ্রসিংহের হৃদয়ে তখন কমলের ছবি, প্রেমের সিংহাসনে ছিল,—শত চঞ্চলা অসুন্দরী। এখন, কমল আপনার স্মৃতিটুকুর স্থানেও ভগিনীত্ব জানাইয়া সেখান হইতে রেখাটুকুও মুছিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে,—কাযেই চঞ্চলার আকর্ষণ ব্যর্থ যায় নাই। প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে চঞ্চলা এখন পাকা সোণা।

প্রেম জগতের স্পর্শমণি। এই স্পর্শমণির স্পর্শেই মাটির ধরণী, অমরাবতী সাজিয়া তোমার আমার সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। ইহারই স্পর্শবলে সুন্দর যুবকের পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী অতুল রূপসী সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইহারই স্পর্শ বলে ভৃঙ্গকৃষ্ণ সন্তান ক্রোড়ে লইয়া মাতা মদনলাঞ্ছন মুখ দর্শন করিতেছেন। ইহারই স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া, ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-শ্যাম-অঙ্গে ব্রজবিহারিণী ত্রৈলোক্যের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহারই স্পর্শে বিদেশী বিরহা মসীলিপ্ত পত্র পাইয়া কবিত কাঞ্চন ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়, দুঃখিনী বিধবা-বালা স্বামীর পরিত্যক্ত পাদুকাপানে চাহিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করে। দরিদ্র ভগিনীরা ভ্রাতৃ-ভালে ফোঁটা দিয়া ভ্রাতার রাজটীকা ভাবিয়া আনন্দিত হয়। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখাইয়া যখন যৌবন পলাইয়া যায় তখনও প্রেম-স্পর্শমণির স্পর্শে প্রবীণাকে নবীনার চেয়ে সুন্দরী দেখা যায়।

দেবেন্দ্রসিংহ তাই এতদিন পরে ভাবিলেন, চঞ্চলা বড় সুন্দরী—বড় গুণবতী। সেই স্পর্শমণির প্রথম স্পর্শে দেবেন্দ্রসিংহ ভাবিলেন,—

সেই কষিত হৈমকান্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে, বুঝি তাঁহার শূন্য বুক পূর্ণ হইতে পারে।

ইহার তিন দিন পরে বিবাহের দিন ছিল,—সেই দিন একটী সুন্দরী যুবতীর সহিত মহারাজ জয়সিংহের এবং বিজয়সিংহ ও ফুলরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের মহোৎসবটা খুব জমকাল রকমই হইয়াছিল। বিজয়োৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহোৎসব মিলিত হইয়া নগরটাকে কয়েক দিন খুব পুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

তৎপরে আরও কয়েক দিন সেখানে থাকিয়া মণিপুরসৈন্য-গঠনাদি-কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক, শানদেশ হইতে যে সৈন্য লইয়া বিজয়সিংহ আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শানদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

তাঁহারা, গোকর্ণনামক পাহাড়ের সানুদেশে ছাউনি করিয়া সেদিন মাধ্যাহ্নিক ভোজনাদির উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় এক জীর্ণ দীর্ণ কঙ্কালসার পুরুষ আসিয়া, বক্ষ পঞ্জর ধরিয়া, ছাউনির সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

কে সে? আর্ত্তের দীর্ঘ নিশ্বাসে বিজয়সিংহ ব্যথিত হইয়া, ভৃত্যদ্বারা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আনাইলেন। সে আসিয়া বিজয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে বিজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি? তোমার এ দুর্দ্দশা কেন?"

কঙ্কালবিশিষ্ট পুরুষ বলিল,—"সেনাপতি, আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি, শানদেশের থাঙ্গাল সিংহ। আমি সৈনিক বিভাগে কায করিতাম—আমাকে উপেক্ষা করিয়া তোমাকে সরকার-বাহাদুর—উঃ! বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আবার প্রবল ব্যথা ধরিয়াছে।"

থাঙ্গাল সিংহ আর কথা কহিতে পারিল না। মাটিতে পড়িয়া

ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গে ধূলিরাশি—কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুতে জল। থাঙ্গালসিংহ দমে দমে বলিতে লাগিল,—"সেনাপতি, কথা কহিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে—তথাপি বলিতেছি,—তোমার কাছে না বলিলে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।—আমাকে উপেক্ষা করিয়া, সরকার-বাহাদুর তোমাকে সহকারী সেনাপতির পদে অভিষিক্ত করিলে, তোমার উপরই আমার মর্ম্মান্তিক রাগ হইল। রন্ধ্রগত শনির ন্যায় আমি তোমার অনিষ্ট করিবার জন্য তোমার পিছু লাগিয়াছিলাম—কিছুতেই কিছু করিতে পারি নাই, অবশেষে তুমি যখন ব্রহ্মদেশে যাও—সেই সময়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশে আমিও গিয়াছিলাম। ঝড়জলের দিন ঝড় জল থামিয়া গেল—তোমরা যখন তিনজনে শিলাসনে বসিয়াছিলে, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই তীর ছুড়ি—কিন্তু সে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার স্ত্রীর বক্ষঃ ভেদ করিয়াছিল—উঃ! আর বলিতে পারি না। একটু জল—সেনাপতি! তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে.—একটু জল।" থাঙ্গালসিংহ বক্ষঃপঞ্জর চাপিয়া ধরিয়া, নিস্তব্ধ হইল। বিজয়সিংহের আদেশানুসারে ভৃত্য জল আনিয়া দিলে, থাঙ্গালসিংহ তাহা পান করিল। একটু সুস্থ হইয়া বলিল,—"কিন্তু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। দারুণ শূল-ব্যথায় দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বক্ষপঞ্জর ধসিয়া যাইতেছে। আজ সাতদিন ধরিয়া, এ ব্যথার আর বিরাম নাই! এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়াছিলাম—তিনি তাড়াইয়া দিয়াছেন,—দেশে যাইতেছিলাম। কিন্তু শক্তি নাই। সেনাপতি; আর বাঁচিব না। আমার, ক্ষমা কর।"

রোষাবেগপূর্ণ নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিজয়সিংহ বলিলেন—"থাঙ্গালসিংহ, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! আমি

তোমাকে চিনিতে পারিলে, তুমি যদি অগাধ-জলরাশিতলে লুক্কায়িত হইতে, তথাপি তোমাকে শাস্তি দিতাম—কিন্তু—”

পাগলের মত চীৎকার করিয়া থাঙ্গালসিংহ বলিয়া উঠিল,—“এর চেয়ে কি শাস্তি দিতে সেনাপতি? না হয়, একটা তরবারির আঘাতে একমুহূর্ত্তে আমার দেহ হইতে মুণ্ডটা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের যন্ত্রণা—আর এ যে, যন্ত্রণার আগুনে অহরহঃ পুড়িয়া মরিতেছি। কেহ নাই—জুড়াইতে স্থান নাই। সেনাপতি;—সেনাপতি—আমায় ক্ষমা কর। আমার আত্মা যেন পরলোকে গিয়া এমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া না মরে—ইহলোকের যাতনা আমার ফুরাইয়া আসিয়াছে।

তাহার কষ্টময় মুখভঙ্গি—তাহার কষ্টকর অঙ্গাদির চালনা দেখিয়া বিজয়সিংহ ব্যথিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, বিশ্বেশ্বরের কি অক্ষুণ্ণ বিচার; কি অক্ষুণ্ণ প্রতাপ! দেখিতে দেখিতে বেচারার পাপের কি শাস্তিই আরম্ভ হইয়াছে।

অতঃপর থাঙ্গালসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“থাঙ্গালসিংহ, তোমার দুঃখ কষ্ট দেখিয়া, তোমার রোগের যাতনা দেখিয়া, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। কিন্তু বিনা দোষে যে রমণীর কোমল বক্ষে বাণ বিদ্ধ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্বালা দিয়াছিলে,—তিনি তোমায় ক্ষমা করিবেন না?”

থাঙ্গালসিংহ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঙ্কোচন-বিকোচন হইল। কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল, চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—“তিনি ক্ষমা করিবেন না। ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ দেখ—আগুনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিয়াছে,—আমায় অভিশাপের আগুনে দগ্ধ করিতেছে—রক্ষা কর।—রক্ষা কর।—রক্ষা কর।”

থাঙ্গালসিংহ একবার লাফাইয়া উঠিয়া, মাটিতে পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে নিস্তব্ধ হইল। আর নড়িল না—আর কথা কহিল না। বিজয়সিংহ, ভৃত্যকে দেখিতে বলিলেন। ভৃত্য দেখিয়া বলিল,—"মারা পড়িয়াছে। ইহার দেহে প্রাণ নাই।"

বিজয়সিংহের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। ভগবানের নামে জয়োচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—"দয়াময়, তোমার রাজ্যে এমন বিচার!"

অতঃপর যথাসময়ে সৈন্যাদি লইয়া তিনি শানদেশে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শানাধিপতির সুরম্য প্রাসাদের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে রমা বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সেই গৃহে রাজকুমারী চঞ্চলা আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "সখীর যে আ'জ ভারি গানের ধূম।"

রমা, তাহার আয়ত আঁখির কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

চঞ্চলা হাসিয়া বলিল,—"পুরুষ হইলে ভস্ম হইতাম।"

রমা। সকলে হয় না।

চঞ্চলা। কে হয় না?

রমা। রবীশ্বর।

চঞ্চলা। ছাইকে আর কি ছাই করা যায়? তিনি যে কমলের নয়নাগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া রহিয়াছেন। বলি, আজি তোমার এত স্ফূর্ত্তি কেন? গানের এত ঘটা কেন?

রমা। তোমার যে বিবাহ।

চঞ্চলা। তুমি ষাঁড় দাগিতে পারিবে ?

রমা। না ভাই—তা হবে না। ধূপে ঘুরিব। দাগাদাগির মধ্যে নাই।

চঞ্চলা। চিত্রগুপ্তের হিসাবের ভুলে বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছে।

রমা। বালাই! বিবাহের দিন যে সন্নিকট।

চঞ্চলা। কই,—এখনও ত বিকার হয় নাই।

রমা। লুসাইগণ যে দিন পুরী আক্রমণ করিয়াছিল—বিকার সেই দিনই ধরিয়াছে।

চঞ্চলা। সে বিকারে প্রাণটাকে লইয়া গিয়াছে,—দেহটার উপায় ?

রমা। আর ভয় নাই—কবিরাজ যুটিতেছে।

চঞ্চলা। সত্যি ?

রমা। রাজকুমারীর সখী কি মিথ্যা কথা বলে ?

চঞ্চলা। কাহার সহিত বিবাহ ? সূর্য্যপুত্রের ছেলের সঙ্গে কি ?

রমা। বালাই! মণিপুরের মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্র যুবরাজ দেবেন্দ্রসিংহের সহিত।

চঞ্চলা। যুবরাজ—অঙ্গদ !

রমা। তোমার পোড়ার মুখ।

চঞ্চলা। জানিয়া শুনিয়া যে, ও কথা বলে, তাহারও সোণার মুখ নহে।

রমা। সত্যি।—যুবরাজ অঙ্গদ নহেন,—রবীশ্বর।

চঞ্চলা। বুঝিতে পারিলাম না—তোমার কথা বুঝা দায়।

রমা। মনের মত নামটি শুনিয়া বুকটা শিহরিয়া উঠিয়াছে, রবীশ্বর—যুবরাজ দেবেন্দ্রসিংহ।

চঞ্চলা। মাইরি ?

রমা। মাইরি।

চঞ্চলা। খুলে বল।

রমা। তস্‌সইলো না!

চঞ্চলা। সহে কি,—বল না।

রমা। সেনাপতি বিজয়সিংহ এসেছেন, শুনেছ?

চঞ্চলা। তা ত শুনেছি।

রমা। তিনিই এ খবর এনেছেন।

চঞ্চলা। কি খবর এনেছেন—সখি?

রমা। রবীশ্বর যিনি—তিনি মণিপুরের যুবরাজ দেবেন্দ্রসিংহ। তাঁহারা শত্রুকর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়াছিলেন। এখানে এসে বিজয়সিংহের সহিত সে সমস্ত ব'লে উভয়ে আমাদের এখানকার কিছু সৈন্যসংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়ে মণিপুর গিয়া রাজ্য উদ্ধার করেছেন।

চঞ্চলা। তারপর?

রমা। তারপর এখন তোমাকে বিবাহ করিয়া, পাটরাণী করিবার অভিলাষা।

চঞ্চলা। মিছে কথা।

রমা। তবে মিছে কথা।

চঞ্চলা। তোমায় কে বলিল?

রমা। বিবাহের কথা সমস্ত ঠিক হইয়াছে। মহারাজ ও মহারাণী সন্ধ্যার সময় সেই কথা বলাবলি করিতেছিলেন,—কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। বিবাহ বোধ হয়, এই মাসেই হইবে।

চঞ্চলা। তিনি কি আসিবেন?

রমা। না,—চিঠিতে বিবাহ হবে।

চঞ্চলা। তিনি বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন?

রমা। না,—আমায় বরাত দিয়াছেন।

চঞ্চলা। তাঁহার কমল?

রমা। কমল নাকি তাঁহার ভগিনী। কমল উদাসিনী—যোগিনী, সংসার-বিরাগিণী।

চঞ্চলা। তবে মাথার উষ্ণীষে নাম লেখা কেন?

রমা। বুঝি, মণিপুরে ভগিনী মাথায় থাকে—আমাদের এখানে লোকে মাগ মাথায় করে।

চঞ্চলা। সত্য ভগিনী?

রমা। সেটা গোপন ছিল, তারপরে প্রকাশ পাইয়াছে। আসল ভাল রকমের ভগিনী নহে। তাঁহার খুড়ার রক্ষিতার গর্ব্ভজাতা।

চঞ্চলা। তুমি একটা গান গাও।

রমা। এমন সু-খবরটা দিলাম, আগে পুরস্কার দাও।

চঞ্চলা। আগে কায সারা হউক।

রমা। কায সারিলে কি আর মনে থাকিবে?

চঞ্চলা। সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাযও সারিয়া দিব।

রমা। সে গুড়ে বালি।

চঞ্চলা। কেন লো?

রমা। সহকারী মন্ত্রী মহাশয় অনিচ্ছুক।

চঞ্চলা। ওমা সে কি—কি বলেন?

রমা। বলেন,—কাশী যাবেন, বৈরাগী হবেন।

চঞ্চলা। কেন?

রমা। আমায় না পেয়ে।

চঞ্চলা। তোমার পোড়ামুখ। তুমি গান গাও।

রমা, বীণা তুলিয়া লইল। গৃহ মধ্যস্থ সুগন্ধি প্রদীপ আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। বাসন্তী রজনী। চাঁদিনীরাতে—মলয়ার রাজত্বে কোকিলের কুহুরবে, জালাময় প্রতিধ্বনির মধ্যে, পুষ্পমাল্য সুগন্ধিত হর্ম্ম্যের গবাক্ষ

বায়ুস্তরে, সে নিজের কোমল কণ্ঠ হইতে আবেগময়, মোহময়, ভাবময় সুর তুলিয়া গাহিতে লাগিল,—

আজি এ দীরঘ রজনী,
যাপিব কেমনে বিরহ-শয়নে
বিনা ব্রজেশ্বর গুণমণি।
বহিছে মলয় চুম্বিয়া কুসুমে,
কোকিলা ডাকিছে কোকিলে সরমে
আমি আছি শুধু মরিয়া মরমে
লইয়ে ভাঙ্গা হৃদয়খানি।

ভোর, এ পথে আমিকে কি দায় আছে,
বাসিতে ভাল কত জন আছে,
প্রেম-ফুল লয়ে কত জন যাচে
চরণে ঢালিয়ে দিতে সজনী।

অতঃপর চঞ্চলা জানিতে পারিল, যথার্থই যুবীশ্বর দেবেন্দ্রসিংহ, এবং যথার্থই তাহাদের বিবাহের বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। চঞ্চলা রমার গলা জড়াইয়া বলিল,—“সখি, দেখ গো, ভাবিয়া-ভাবিয়া, তাঁহাকে আপন করিয়া লইতে পারিলাম কি না।”

রমা হাসিয়া বলিল, “সত্য তোমার স্বামী পাওয়ার তপস্যা।”

চঞ্চলা বলিল,—স্বামী কি কেবল তপস্যায় মিলে? স্বামী কি যে সে ... ...?”

অনন্তর, একদিন মণিপুরী নৈবেদ্য সিংহনাদের সহিত জয়-বাজনা বাজিয়া উঠিল,—সকলেই জানিতে পারিল, মণিপুরের মহারাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রসিংহকে লইয়া, তাঁহার বিবাহ দিতে

আসিয়াছেন। নগরময় আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। গীত বাদ্য নৃত্য—মহোৎসবের একটা পালা পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্রই আনন্দ—সর্ব্বত্রই উৎসব।

গরাব দুঃখীরা প্রায় পনরদিন আর ভিক্ষায় যায় নাই। ব্রাহ্মণগণের বাড়ীতে লুচি সন্দেশে গন্ধ ধরিয়া গিয়াছিল। উদরে ত স্থান ছিলই না—মহা-উৎসবে দেবেন্দ্রসিংহের সহিত চঞ্চলার বিবাহ হইয়া গেল।

চঞ্চলা, বাসন্তী-বল্লরীর মত দেবেন্দ্র-সহকারে আশ্রয় লইল।

উভয়ের প্রেমের হৃদয়, একত্রে মিশিয়া বড় তুফানের তরঙ্গ তুলিয়া দিল।

চঞ্চলার উদ্যোগে সহকারী মন্ত্রীর সহিত রমারও বিবাহ হইয়া গেল। তারপর জয়সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্র ও বধূ লইয়া দেশে যাইবার জন্য বৈবাহিক শানাধিপতির নিকট বিদায় চাহিলেন। শানাধিপতি বলিলেন,—"চঞ্চলা আমার একমাত্র কন্যা। আর সন্তান নাই। আমারও বয়স হইয়াছে,—কঠোর রাজকার্য্যে আর লিপ্ত থাকিতে পারি না। দেবেন্দ্রসিংহ উপযুক্ত পাত্র; অতএব আমার রাজসিংহাসন উনিই গ্রহণ করুন। আমি জীবনের অবশিষ্ট কয়টাদিন শান্তির আশ্রয়ে ভগবদুপাসনা করিব।"

কিন্তু সেবারে তাহা হইল না। জয়সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্র ও বধূ লইয়া দেশে গমন করিলেন,—তার পরে কিছুদিন পরে আসিয়া দেবেন্দ্রসিংহ শানের রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। চঞ্চলা পাটরাণী হইয়াছিল।

বিজয়সিংহ উভয় রাজ্যেরই পরামর্শদাতা ও প্রধান সচিব-স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন।

উপসংহার।

দশ বৎসর কাল, কালের অনন্ত গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে,—দেবেন্দ্রসিংহ শানাধিপের কন্যার পাণিগ্রহণ ও রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সুখ ও শান্তিতে এতটা দিন কাটাইয়া দিয়াছেন।

শানদেশের প্রকৃতিপুঞ্জ দেবেন্দ্রসিংহের ন্যায় রাজা পাইয়া পরম সুখেই কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। গীতাশাস্ত্রাধ্যায়ী যোগপথাবলম্বী দেবেন্দ্রসিংহ আদর্শ রাজা। তাঁহার দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক সকল শক্তিই পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ আয়ত, বাহু সুদীর্ঘ, দেহ উন্নত। তাঁহার বল, সকলের অতিরিক্ত, সকলের অভিভবকারী,—শরীরী সকলের উৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রজ্ঞা দেহের অনুরূপ, বিদ্যা প্রজ্ঞার অনুরূপ, ক্রিয়া বিদ্যার অনুরূপ, সিদ্ধি ক্রিয়ার অনুরূপ। জলবর্ষণের জন্যই যেমন দিবাকর জল-বাষ্প গ্রহণ করেন, তিনিও তেমনি প্রজাগণের মঙ্গলার্থ কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাদিগের রক্ষা, পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া তিনি তাহাদিগের পিতৃস্থানীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার দণ্ড-প্রয়োগ দুষ্ট-দমনে, বিবাহ গার্হস্থ্যাশ্রমপ্রতিপালনে, পুরুষার্থ ধর্ম্মে এবং প্রীতি সাধুজনে ছিল। নগর, তোরণ, প্রাসাদ, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি সমস্তই তিনি নূতন প্রণালীতে—নূতন গঠনে—পৌরাণিক বর্ণনার ধরণে সমস্ত সজ্জিত করিয়াছেন। একদিন মধ্যাহ্নে রাজসিংহাসনে বসিয়া, পাত্রমিত্রাদি লইয়া দেবেন্দ্রসিংহ রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়, তালপত্রের ছাতা মাথায় দিয়া, মণিপুর রাজবংশের গুরু কৃষ্ণানন্দঠাকুর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, দেবেন্দ্রসিংহ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে

সভক্তিতে আহ্বান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। কৃষ্ণানন্দ দেবেন্দ্রসিংহের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনঃপুনঃ প্রণত হইয়া দেবেন্দ্রসিংহ কুশলাদি বিজ্ঞাপ্তি করিয়া, ঠাকুরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যখন নিভৃত স্থানে উভয়ে উপস্থাপিত হইলেন, তখন কৃষ্ণানন্দঠাকুর মৃদু মন্দ হাস্য-সহকারে বলিলেন—"রাজ্য পাইয়া সুখে রাজা হইয়াছ, স্ত্রী পাইয়া প্রেমের মধুর আস্বাদ পাইয়াছ—কিন্তু একটী প্রাণ তোমার জন্য নিরাহারে, বাতাহারে কঠোর যোগসাধনে আজি কত বৎসর অতীত করিতেছে,—তাহার কথা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, সেই কথা মনে করিয়া দিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।"

ঔৎসুক্য নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া দেবেন্দ্রসিংহ বলিলেন, —"আপনি বোধ হয় কমলের কথা বলিতেছেন?"

ঠাকুর। হাঁ।

দেবেন্দ্র। তাহার সংবাদ আর কিছু জানেন কি?

ঠাকুর। জানি বৈ কি। সে, সেই পর্ব্বতে যোগসাধনে নিরত আছে। তোমারই ধ্যানে জীবন কাটাইয়া দিতেছে।

দেবেন্দ্র। আমি ত আপনারই আদেশে রাজকুমারী চঞ্চলার পাণি-গ্রহণ করিয়াছি।

ঠাকুর। চঞ্চলার পাণিগ্রহণ করিতে তুমি বাধ্য,—চঞ্চলা তোমার জন্ম-জন্মের স্ত্রী। কেবল মায়ের ফেরঘোর বৈ ত নয়।

দেবেন্দ্র। আর আপনার নিকটেই ত শুনিয়াছি—এবং অন্যান্য প্রমাণেও বুঝিয়াছি, কমল আমার খুল্লতাতের ঔরসজাতা, ভগিনী।

ঠাকুর। সম্পর্ক একজন্মের—আকর্ষণ জন্ম-জন্মান্তরের। এ জন্মে যাহাকে মাতা বলিয়া জানিতেছ, পূর্ব্ব জন্মে তিনি হয় ত স্ত্রী ছিলেন,

অথবা এ জন্মের ভগিনী অপর জন্মের প্রণয়িনী। কেবল বাসনার বদ্‌লাই বৈ ত নয়।

দেবেন্দ্র। তবে যে বলিলেন, চঞ্চলা আমার জন্ম-জন্মান্তরের স্ত্রী, উহার কি আর বদ্‌লাই হয় না?

ঠাকুর। সবাই কি সহধর্ম্মিণী? যাহারা যথার্থ সহধর্ম্মিণী—যাহারা ছায়ার ন্যায় অনুগতা—যাহারা কায়মনোবাক্যে পতির সঙ্গে মিশ্রিতা—তাহারা কি সঙ্গ ছাড়ে? আর সখের ভার্য্যা—গহনা-কাপড়ের ভার্য্যা—মনে মুখে ভালবাসার ভেদকারিণী ভার্য্যা, স্রোতে ভাসা কুটার মত একবার এদিকে একবার সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার সঙ্গে তোমায় যাইতে হইবে।

দেবেন্দ্র। কোথায় প্রভু?

ঠাকুর। যে সিদ্ধাশ্রমে কমল যোগিনী হইয়া, যোগসাধনে দিনাতিপাত করিতেছে।

দেবেন্দ্র। সেখানে কেন, দেব?

ঠাকুর। কমলকে একবার দেখা দিতে।

দেবেন্দ্র। কেন?

ঠাকুর। আমি প্রতিশ্রুত আছি।

দেবেন্দ্র। কিসের প্রতিশ্রুতি? কাহার নিকট প্রতিশ্রুতি?

ঠাকুর। কমলের নিকট; তাহার মৃত্যুকালে তোমায় একবার তাহাকে দেখাইব।

দেবেন্দ্র। মৃত্যুকাল কি? তাহার কি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে?

ঠাকুর। হাঁ, জ্যোতিষমতে গণনাদ্বারা স্থির জানা আছে,—আগামী ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রাত্রে যোগাশ্রয়ে তাহার মৃত্যু হইবে।

দেবেন্দ্র। আজি ত্রয়োদশী—পূর্ণিমার রজনীর আর দুই দিন আছে।

ঠাকুর। অদ্যই আমাদিগকে বাহির হইতে হইবে। অনেক লোকজন সঙ্গে লইও না। ক্ষিপ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতে হইবে।

দেবেন্দ্র। আপনি ?

ঠাকুর। আমি চলিয়া যাইব।

দেবেন্দ্র। পদব্রজে ?

ঠাকুর। তা নয় ত কি ?

দেবেন্দ্র। জানি আমি, যোগবলে আপনি নিমেষে বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে পারেন, কিন্তু আমি অশ্বে যাইব, আর আপনি পদব্রজে যাইবেন, ইহাতে আমার মনে বড়ই গ্লানি উপস্থিত হইবে।

ঠাকুর। তবে তুমিও হাটিয়া চল। রাজা হইলে ত আর মানুষ মাখন হইয়া যায় না।

দেবেন্দ্র। নিশ্চয়ই নহে। হাটিতেও আমি সমধিক পটু,—কিন্তু এত শীঘ্র এত পথ অতিক্রম করা আমার যে সাধ্যাতীত !

ঠাকুর। আমি তোমায় সে বিদ্যা শিখাইব।

তখন তাহাই স্থির হইল। সন্ধ্যার পর, মন্ত্রীর উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, কৃষ্ণানন্দঠাকুরের সহিত দেবেন্দ্রসিংহ কমলকে দর্শন দান করিতে পদব্রজে গমন করিলেন।

* * * *

ফাল্গুন মাস, সায়াহ্নকাল। নব বসন্তাগমে বৃক্ষের নবপত্রবিকাশ ও নব মুকুলোদ্গম হইতেছে,—জীবজগতেও নব আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপের ডালি, রূপে রসে, ফুলে ফলে সাজাইয়া বিশ্বপতির চরণে উপহার দিতেছেন। চারিদিক্ কাঞ্চন ফুলের বর্ণে আলো হইয়া উঠিয়াছে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে বসন্তের শোভা সমধিক রমণীয়। সেই নবপত্র-শোভিত শাল-অরণ্যময় পর্ব্বতশৃঙ্গ, স্থানে স্থানে শত শত বনপুষ্প

ফুটিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী হাস্যময়ী, পুষ্পভূষণা! এক একটা গাছ সর্ব্বাঙ্গ ফুটন্ত পরগাছায় ঢাকিয়া উচ্চশির তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরে সুনীল নির্ম্মল আকাশ, নিম্নে পুষ্পভূষিতা আনন্দময়ী ধরণী।

ছোট ছোট দুইটা পাহাড়শ্রেণীর ঊর্দ্ধপ্রদেশে, এক সমতল স্থানে সিদ্ধাশ্রম,—যোগী ও যোগিনীর অবস্থানের জায়গা! এই সিদ্ধাশ্রম, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এক অপূর্ব্ব ভাব, এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লইয়া অনাদি অনন্তকাল অবস্থান করিতেছে। এখানে মেঘ-গম্ভীর-মৃদঙ্গ-ধ্বনি-মুখর অভ্রভেদী মণিময় সচিত্র প্রাসাদমালায় বিদ্যুৎবরণী ললিত-ললনা বিহার করে না। এখানে কালের শাসন না মানিয়া ছয় ঋতু একত্রে বিরাজ করে না; এবং যক্ষবধূ ফুলসাজে সাজিয়া, লোধ্রপরাগে মুখরাগ করিয়া, চূড়ায় নবকুরুবক বাঁধিয়া, কুন্দকুসুমে কেশ গাঁথিয়া, কর্ণে শিরীষ ধরিয়া, সীমন্তে কদম্ব দোলাইয়া, হস্তে লীলা-কমল লইয়া ফুলময়ী সাজে না। তবে এখানে, তরু নিত্য পুষ্পিত হইয়া মধুমত্ত ভ্রমরে মুখরিত হয়; সরোবরে নিত্য নলিনী ফুটিয়া হংস-সমাকুল হয়, ময়ূর নিত্য পুচ্ছ তুলিয়া কেকা রব করে, প্রদোষে নিত্য জ্যোৎস্না ফুটিয়া অন্ধকার নাশ করে। এখানে শুধু আনন্দের অশ্রুজল, অন্য অশ্রুজল নাই। এখানে শুধু তাপশূন্য আলোক-লহরীর লীলা-তরঙ্গ। এখানে শুধু এক ধ্বনি ধ্বনিত—কেবলই ওঙ্কারের ঝঙ্কার। এখানে লাবণ্যহীন জ্যোতির খেলা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সায়ন্তন শোভায় দিগন্ত প্রশোভিত। সিদ্ধাশ্রমের সানুদেশে শোভাময়ী বাপী বিকচ-কমলে শোভিত হইয়া রহিয়াছে—তাহার তীরে কুরুবকমণ্ডিত মাধবীমণ্ডপপার্শ্বে চঞ্চলজল রক্তাশোকের বৃক্ষশ্রেণী। উপরে, শিখরি-শিখরদেশ ইন্দ্রনীলমণিখচিত হইয়া বিদ্যুৎ-দীপ্ত নীরদখণ্ডের মত শোভা পাইতেছিল। বাপীর অপর পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া, উঁহা দেখিয়া মেঘভ্রমে ময়ূরী তালে তালে নৃত্য করিতেছিল।

সন্ধ্যা হইতে দেখিয়া, একটী সুপুষ্টবপু জ্যোতির্ম্ময়ী যোগিনী আসিয়া সেই বাপীতীরে দণ্ডায়মান হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন যোগৈশ্বর্য্যের দৈবদ্যুতি উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছিল। যোগিনী, কমল।

কমল জানিত, আজি ফাল্গুনীপূর্ণিমায় তাহার নশ্বর দেহ ছাড়িয়া তাহার আত্মা ঊর্দ্ধজগতে গমন করিবেন,—আজি তাহার কর্ম্মসূত্রের শেষ হইবে। সে যোগিনী, দেবযানের পথেই যাইবে—যোগেই দেহত্যাগ করিবে। তাই সন্ধ্যায় স্নান করিতে আসিয়াছে—তাই আজি তরু লতা বিহগ-মৃগ প্রভৃতি সঙ্গীস্বজন ছাড়িয়া, পৃথিবী ভুলিয়া বাঞ্ছিত-দেবতায় লীন হইবে। তাই আজি সে যখন স্নান করিতে বাহির হয় তখন তাহার চিরতরে শিক্ষাশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার ভাব বুঝিতে পারিয়াই বুঝি, তাহার স্নেহাসারে বর্দ্ধিত বকুলতা শাখা-বাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল, বনবাসসুহৃৎ বিহঙ্গকুল কুহরবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, হরিণী দর্ভকবল ভুলিয়া অনিমেষে চাহিয়াছিল, ময়ূরী নর্ত্তন ছাড়িয়া উৎসবহীন হইয়াছিল। সে সকল দেখিয়া যোগিনী বুঝিয়াছিল,—এত জড়ের আকর্ষণ! যাহার কিছু নাই, যে পুত্রকন্যাদি-বঞ্চিত, সে বুঝি এই রূপেই মনের পাখীর বাঁধনের আকর্ষণে পুনরাগমন করিয়া থাকে। সে, হৃদয় হইতে সে সকলের ছবি দূর করিয়া দিয়া, নদী-সৈকতশায়িনা হেমন্তের বাষ্পময়ী সন্ধ্যার মত আধভোলা হুহুকরা প্রাণ লইয়া গাহিতে লাগিল,—

আজ ত আসিতে ডাকি,
দিন ত ফুরায়ে গেছে, আসিয়াছে রাতি।
সারা দিন ডাকিয়াছি,
সারা দিন খুঁজিয়াছি;
এখন এস গো তুমি, পরাণে পরাণ বাঁধি।

হৃদয়ে রণিত গান
মদিরা মিশ্রিত তান,
গাহিব দু'জনে বসিয়া সুতানে
অলস-স্বপনে মাখি।
মানস-সরসী-পার
বাহিব সোণার তরি
হেরিব দু'জন দুলিবে কেমন
লহর-আঘাতে ঠেকি!
জোছনা ভূষিত রা'তে
মৃদুল মলয় বাতে
পরাণে পরাণে মিশায়ে দু'জনে
(তোমাতে আমাতে) অটুট বাঁধনে থাকি।

গানের স্বর-লহরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া দিগন্তের কোলে মিশাইয়া গেল তখন যোগিনী কমল, বাপী-জলে নামিয়া স্নান করিয়া উঠিল। তী একখানি গৈরিকরসরঞ্জিত কাপড় রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা পরিধ করিল। কেশরাশি মুছিয়া পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া দিল। বনফুল তুলি মালা গাঁথিয়া গলায় পড়িল। তদনন্তর পাষাণবেদিকার উপরে বসি নিত্যসন্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক হৃদয়ে আনন্দ-ধারা প্রবহমান করিয়া সে দিগন্তব্যাপী বাসন্তী পূর্ণিমার দিকে চাহিয়া, ফুটন্ত ফুলের স্নিগ্ধ সুবা প্রাণ মাতাইয়া, একবার প্রাণায়াম করিল। প্রাণায়ামের বলে কুট হইয়া দেখিল,—দৈবী-আলোকে দিগন্ত-উদ্ভাসিত। প্রেমের নন্দনকা স্বর্ণসিংহাসনে সে আর রবীশ্বর দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া রহিয়াছে ভাব আর প্রাণে মিশিয়াছে—কর্ম্মরূপা চঞ্চলা কর্ম্মের আহ্বানে জগ ডাকিতেছে। মর্ম্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিল,—

ূরে ব্রজভূমি; মহাবিরহে বিরহিনী রাধিকা—দ্বারকায় রুক্মিণী আর শ্রীকৃষ্ণ। তারপর রাধাকৃষ্ণের একত্র মিলন—নদীয়া নগর সমুজ্জ্বল। বাহিরে রাধা—অন্তরে কৃষ্ণ! প্রেমের বলে মিশামিশি,—আর শচীর গৃহে জগৎপালয়িত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া! হংস ইতি জীবাত্মাকে স্বস্থানে চালনা করিয়া, পাষাণবেদিকার উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া কমল গাহিতে লাগিল,—

আমার নিরাশা কাননে ফুটিল কুসুম
ছুটিল মলয় বায়,
আজি অনল আঁধারে প্রেমের আলোক
উধাও ছুটিয়া যায়।
আমি তাহার বিরহে মরম-যাতনা
পেয়েছি জনম-ভোর,
আজো মুছেনি আমার, হৃদয়-বেদনা
ঘুচেনি নয়ন-লোর।
কত জনম জনম তাহারি বিরহে
কাঁদিয়া হ'য়েছি হত,
তবু পাইনি তাহার মিলনের সুখ
শুধু, ক্ষণিকের মত।
আজি জাগিয়া উঠেছে প্রেমের আলোক
হৃদয়ের গেহে মোর,
আমায় ডেকেছে বাঁশীতে ত্বরিতে যাইতে
না হইতে নিশি ভোর!

গান গাহিয়া গাহিয়া কমল নিস্তব্ধ হইল। একবার নীরবে নিথর রজনীতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—তার পরে আচমন করিয়া, ধ্যানে বসিল।

ধ্যান-ধারণায় কমলের হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। তখন নীলাকাশে দীপ্ত তারকায়, গগনবিলম্বী সুধাংশুর অংশুমালায়, সঞ্চরণশীল মেঘবিতানে, গগনবিহারী বিহগগানে, সচল-সাগরে, অচল-ভূধরে, তরু-লতায়, ফলে-ফুলে, জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র কমল, এক মহাশক্তির চিন্ময়বিকাশ দেখিতে পাইল,—যাহার সত্তায় জীব ও জড়জগৎ সত্তাবান্, যাহার অমর কল্পনা-সঙ্গীতে তাহার কবিতা প্রতিধ্বনিময়,—তাহার মধ্যে সেই প্রেমের শ্যামসুন্দররূপ দেখিল। গীতার মহাধ্যায়ে অর্জ্জুন, আদি-অন্ত-মধ্য-হীন চরাচর বিশ্বব্যাপী যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, যাঁহার দীপ্তি কোটীসূর্য্যপ্রভ, যাঁহার স্থিতি ত্রিকালব্যাপী, দেব, দৈত্য, নর, নাগ যাঁহার ভগ্নাংশে অন্তর্ভূত, প্রলয় সংক্ষুব্ধ যাঁহার বিশ্বোদরে, দংষ্ট্রাকরাল যাঁহার কোটিমুখে মুষ্টিমেয় কৌরবসেনা অদর্শন হইয়াছিল—নদীর প্রবাহনিচয় যেরূপ সাগরে অদর্শন হয়, চঞ্চল পতঙ্গনিচয় যেরূপ অনলে অদর্শন হয়, সেইরূপ বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ দর্শন করিল,—সেই অনন্তপুরুষের অসীমতার ধারে সসীম দেবীশ্বরকে পাইয়া সে, আনন্দে অধীরা হইল,—ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল।

তখন উচ্ছ্বসিত বিকম্পিত দৈবীস্বরধারা বিস্তার করিয়া কমল গাহিতে লাগিল।

প্রাণ ত আজি পূর্ণকাম ;
সুনীল অম্বর-পরে
মোহন মূরতি ধ'রে
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মোরে করিছে আহ্বান !

নাহি আর ছড়ান' সে
প্রাণে প্রাণে গেছে মিশে,

ভেদত্ব বহুত্ব গেছে—দুরিত অজ্ঞান;
প্রাণ ত আজি পূর্ণকাম!
নিখিল বিপুল বিশ্বে
ছিল বহু নানা দৃশ্যে
সমাধি আজি সব—একত্ব মহান্;
তাই এবে প্রাণ খুলে
নিষাদেতে স্বর তুলে
গাহিতেছি প্রাণ ভ'রে ইমন কল্যাণ।
ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্ব্যোম
গ্রহ তারা রবি সোম
নিম্নে ধরা উপরেতে অনন্ত বিমান,
মাতি সবে প্রেমানন্দে
নানা সুরে নানা ছন্দে
চরাচর করিতেছে, তারি গুণ গান—
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে মম বিমোহিত প্রাণ,
প্রাণ ত আজি পূর্ণকাম!

গানের স্বর-লহরী সমীরণে মিশিয়া দিকে দিকে হিল্লোলিত হইতে-ছিল। এই সময় দুই ব্যক্তি, সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কমলের যোগ-কুটীরে গিয়া কমলের অন্বেষণ করিলেন। সেখানে তাহার সন্ধান মিলিল না।—অপর একজন যোগিনী বলিয়া দিলেন,—"সে কোথায় গিয়াছে সন্ধান নাই। বোধ হয়—ঊর্দ্ধ শিখরে গমন করিয়াছে,—সে বলিয়াছিল আজি তাহার দেহত্যাগ হইবে।"

যে দুই ব্যক্তি তাঁহাকে খুঁজিতেছিলেন, তাঁহার একজন দেবেন্দ্রসিংহ বা রবীশ্বর, অপর কৃষ্ণানন্দঠাকুর।

তখন তাঁহারা আশ্রমকুটীর হইতে বাহির হইয়া, লতাকুঞ্জে, মাধবী-মণ্ডপে, বৃক্ষবীথিকায়, পর্ব্বতগুহায় কমলকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদের কাণে মরণ-সঙ্গীতের স্বর প্রবিষ্ট হইল,—তাহারা তাড়াতাড়ি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া, বাপীতীরাভিমুখে গমন করিলেন,—সেখানে গিয়া দেখেন, জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ন্যায় বন আলো করিয়া, পাষাণবেদিকার উপরে বসিয়া কমল স্নিগ্ধপ্রাণে, তন্ময়মনে গান গাহিতেছে। সে গানের স্বরভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে, বিবেচনায় তাঁহারা দুইজনে পাশাপাশি কমলের ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কৃষ্ণানন্দ-ঠাকুর বুঝিলেন, কমলের এখন বাহ্যজ্ঞান নাই।

অনেকক্ষণ পরে, গান থামিল,—স্বর-বিস্তার দূরে—দিগন্তে বাতাসের গায়ে মিশিয়া গেল। কমল চমকিত চক্ষে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে দুইজন লোক—চাহিতে চাহিতে, সে দুইজনকে চিনিয়া ফেলিল। সুস্থিরচিত্তে প্রফুল্ল আননে বলিল,—

"ঠাকুর; গুরুগোবিন্দ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু আমার আর সময় নাই।"

কৃষ্ণানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"জড়ত্যাগে আনন্দ। তজ্জন্য কিছু বলিতে চাহি না। তবে প্রতিশ্রুত ছিলাম, দেখাইতে আসিয়াছি।"

যোগিনী কমল প্রণাম করিল,—

নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম,
জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তর্ষিলোকামরভূতলেশ,
সর্ব্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে॥

প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা,—করযোড় করিয়া কমল বলিল, "আমার

অনুমতি দিন। আমার কর্ম্মসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—এখনও যে একটু আছি, কেবল গুরুর কৃপায়—কিন্তু আর থাকিতে পারিতেছি না।"

কৃষ্ণানন্দঠাকুর গম্ভীর স্বরে, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন,—"জগন্নাথ—একটী তাপিত প্রাণের তপ্ত আত্মা, অনেকদিন ধরিয়া, এই মর্ত্ত্যধামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যোগে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়াছে—সূত্র ধ্বংস করিয়াছে—তোমার চরণে স্থান দাও প্রভু!"

দূর-গহ্বর হইতে প্রতিধ্বনি ডাকিয়া বলিল,—"এখনও কামনা-বাসনা অপহৃত হয় নাই। প্রেম পাইবে—রবীশ্বরকে পাইবে; পাশবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে—কিন্তু বন্ধন যায় নাই,—লৌহশৃঙ্খল খুলিয়াছে—কিন্তু সোণারকণ্ঠী গলায় পরিয়াছে।"

তৎক্ষণ, কমল পদ্মাসন করিয়া বসিয়া, দেবযানের পথ অবলম্বন করিল। তাহার আত্মা তাহার দেহ হইতে বাহির হইয়া, জ্যোতিঃ পথ অবলম্বন করিল। তাহার মৃতদেহের মস্তক দিয়া একরূপ জ্যোতির ছটা বাহির হইল,—অধ্যাত্মচক্ষুষ্মান্ কৃষ্ণানন্দঠাকুর দেখিলেন,—কমলের আত্মা উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া, তাহার মৃতশরীর-বিনিঃসৃত সেই জ্যোতির ছটার উপর দিয়া, তাহারই দেহের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধদেশে উঠিতেছে। শূন্যব্যোম ভেদ করিয়া, কুয়াশাজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার স্থূলদেহের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে লাগিল,—তখনও তাহার সূক্ষ্মদেহে আর পৃথিবীপতিত স্থূলদেহে একটা সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় জীবনারজ্জু বা সূক্ষ্মতাড়িত অবলম্বিত ছিল। কৃষ্ণানন্দঠাকুর কমলের স্থূলদেহটাকে সেই পাষাণবেদিকার উপরে পাতিত করিয়া নিজ উত্তরীয়বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া দিলেন,—এই সময় ধীর-মলয়-সংস্পর্শে পুষ্পবৃক্ষ হইতে অগণ্য সুরভিকুসুম পড়িয়া তাহার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া দিল। কৃষ্ণানন্দঠাকুর তখনও তাহার মৃতদেহের

ইষ্টনাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, যতক্ষণ এই জীবনীরজ্জু বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ—স্থূল ও সূক্ষ্মে সম্বন্ধ থাকে।

কৃষ্ণানন্দঠাকুর দেখিতে পাইলেন,—একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময় জীবনীরজ্জু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তখনও কমল, সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্ম চক্ষুতে রবীশ্বরের প্রতি চাহিয়া আছে। তারপর ধীরে ধীরে মেঘ হইতে মেঘান্তরে সে মূর্ত্তি কোন্ অজানা দিগন্তের কোলে মিলাইতে গেল।

তখন কৃষ্ণানন্দঠাকুর বলিলেন,—"এস রবীশ্বর আমরা যোগিনীর পবিত্র দেহের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করি।"

কোকিলের কুহুরবে, ঝিল্লীর ঝিঁঝিঁ নাদে, কলনাদিনী নির্ঝরিণীর কল কল তানে, তাহার মৃতদেহের সৎকার করিয়া, কৃষ্ণানন্দঠাকুর এবং রবীশ্বর দেশাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

কমল আর নাই। কিন্তু প্রেমে আর যোগে সম্মিলিত হইয়া, সেই সিদ্ধাশ্রমে একদিন যাহার সাধনা হইয়াছিল, এখনও তাহার স্বর ভারতের অনেকস্থলে শ্রুত হওয়া যায়।

কমল গিয়াছে,—এখনও তাহার স্মৃতি আছে।

কমল গিয়াছে,—এখনও তাহার আসন আছে।

কমল গিয়াছে,—এখনও তাহার বীজমন্ত্র আছে।

এখনও ভারতের পাপিয়া ললিত কণ্ঠে গাহিয়া থাকে—

পরলোক, আত্মা, পুনর্জ্জন্ম,

সত্য।

কর্ম্মফল পুরুষকার

সত্য।

প্রেমের বাঁশীতে প্রাণ পুলকিত হয়,

যোগে পুরুষকার লাভ হয়।

[illegible]র জন্য

প্রেম ও যোগ সাধনা ;

পুরুষকারের মসৃণ চাদর মুড়ি দিয়া একটা জন্ম কাটাইতে পারিলে

ক্রমে আত্মার উন্নতি হয়।

সেই পুরুষকারের

নামই

সোণারকণ্ঠী।

সমাপ্ত।

—০—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।